

সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ১০

২০২৫ সালে মিডিয়াতে প্রকাশিত

সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ



সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ১০

২০২৫ সালে মিডিয়াতে প্রকাশিত
সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ



সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ১০

২০২৫ সালে মিডিয়াতে প্রকাশিত
সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ



প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন)
ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৪১০২১৭৮০-২
ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৪১০২১৭৮৩
ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্বত্ব

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারগুলোতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবে লেখকদের নিজস্ব।
এর সাথে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে।

প্রচ্ছদ

অব্র ভট্টাচার্য

অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাস

মোঃ সাইফুল হাসান

মূল্য

৪০০ টাকা

সিপিডি পরিচিতি

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ১৯৯৩ সালে যাত্রা শুরু করে। নীতিনির্ধারণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সহযোগীদের সাথে সংযোগ ও সংলাপের প্রসার এবং নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে একটি নাগরিক উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় সিপিডি। নীতি গবেষণার ফলাফলকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে নিরলস কাজ করছে এই থিংক ট্যাঙ্কটি।

দীর্ঘ ৩৩ বছরের পথ চলায় সিপিডি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি স্বাধীন থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সিপিডি'র অন্যতম কার্যক্রম হলো দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা এবং গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সংলাপের আয়োজন করা। গবেষণা ও সংলাপ এই দুই কার্যক্রমের সমন্বয়ে নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্টদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থেকে সিপিডি দেশের উন্নয়ন গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

সিপিডি তার পথপরিক্রমায় ক্রমাশয়ে একটি স্বনামধন্য থিংক ট্যাঙ্কে পরিণত হয়েছে যা কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় বের করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। সিপিডি'র গবেষণা ফলাফল বরাবরই সুশাসন, গণতন্ত্র, সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণের উপর গুরুত্ব দেয়। এর গবেষণার বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতি, রাজস্ব নীতি, দারিদ্র্য ও বৈষম্য, বাণিজ্য, আঞ্চলিক যোগাযোগ, ব্যাংকিং খাত, শ্রমবাজার, তৈরি পোশাক শিল্প, সুশাসন, গণতান্ত্রিক উত্তরণ, মানব উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, সামাজিক সুরক্ষা, কৃষি, জলবায়ু ইত্যাদি।

সিপিডিই প্রথম বাংলাদেশে সংলাপের ধারা চালু করেছে যা গঠনমূলক মতবিনিময়কে উৎসাহিত করে। সিপিডি তার গবেষণার ফলাফলগুলোকে কেবল একটি নির্দিষ্ট ছকে সীমাবদ্ধ না রেখে সংলাপের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরে এমনকি প্রান্তজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। সেইসাথে সামগ্রিক নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অংশীদারদেরকে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জনমতকে প্রতিফলিত করে বিভিন্ন প্রস্তাবনা তুলে ধরে।

এই কাজের ধারাবাহিকতা হিসেবে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ), দক্ষিণ এশিয়া অর্থনৈতিক সম্মেলন (সোয়েস), বিসিআইএম (বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মায়ানমার) অর্থনৈতিক করিডোর ফোরাম, সাউথ এশিয়ান সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ (সাসেপস), সাউদার্ন ভয়েজ ইত্যাদি বিভিন্ন খ্যাতিনামা নেটওয়ার্ক ও পার্টনার-এর সাথে সিপিডি কাজ করছে। সিপিডি একটানা

দুইবার বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থিংক ট্যাঙ্ক ইনিশিয়েটিভ (টিটিআই) পুরস্কার লাভ করেছে।

সিপিডি প্রকাশিত বই, মনোগ্রাফ, সাময়িকপত্র, সংলাপ প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্ত নীতি-পরামর্শের সংখ্যা ইতিমধ্যে ৬০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সিপিডি'র প্রকাশনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি নিয়মিতভাবে সিপিডি'র ওয়েবসাইটে (www.cpd.org.bd) প্রকাশ করা হয়।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান

ড. ফাহিমদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো

অধ্যাপক রওনক জাহান
সম্মাননীয় ফেলো

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
গবেষণা পরিচালক

তামিম আহমেদ
জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী

হেলেন মাশিয়াত
জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী

আতিকুজ্জামান সাজিদ
গবেষণা সহযোগী

ফয়সাল কাইয়ুম
সাবেক গবেষণা সহযোগী

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ১৯৯৩ সাল থেকে বাংলাদেশের একটি স্বাধীন খিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন অর্থনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য ও অসমতা, জলবায়ু পরিবর্তন, সবুজ রূপান্তর, তৈরি পোশাক শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সুশাসন, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিনিয়োগ প্রভৃতি নিয়ে সিপিডি তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করে আসছে। নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি সেই গবেষণার ফলাফলকে বৃহত্তর পরিমন্ডলে তুলে ধরার জন্য সিপিডি'র গবেষকরা নিরলস কাজ করছেন।

উন্নয়ন ইস্যুতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে সিপিডি'র গবেষণাধর্মী মতামতসমূহ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় যা তার তিন দশকের কর্মকাণ্ডের এক ঐতিহ্যগত অংশ। এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় নির্বাচিত মতামত ও সাক্ষাৎকারগুলো ২০১৫ সাল থেকে পূর্ণাঙ্গ বই আকারে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান গ্রন্থটি ২০২৫ সালে প্রকাশিত সিপিডি'র গবেষকদের নির্বাচিত বিশেষ মতামত, কলাম ও সাক্ষাৎকারের সংকলন।

এ লেখাগুলোতে রাজনৈতিক পরিবর্তন, নির্বাচন ও অন্তর্বর্তী সরকার; রাজনীতি, রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র; সামষ্টিক অর্থনীতি ও বাজেট; বিনিয়োগ, শিল্প ও কর্মসংস্থান; বাণিজ্য, শুল্ক ও বৈদেশিক খাত; এলডিসি উত্তরণ ও উন্নয়ন কৌশল; জ্বালানী, অবকাঠামো ও খাতভিত্তিক অর্থনীতি; বৈদেশিক সম্পর্ক ও ভূরাজনীতি; বৈষম্য, দারিদ্র্য ও সামাজিক ন্যায় ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে বর্তমান সংকলনটিকে ১২টি আলাদা অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

প্রকাশনার সময়ানুক্রমে প্রতিটি অধ্যায়ের প্রবন্ধগুলো সাজানো রয়েছে। বিষয় অনুযায়ী অধ্যায়গুলো বিন্যাস করার পর যে প্রবন্ধগুলো আগে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোকে ঐ অধ্যায়ে আগে রাখা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক, সহনশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সিপিডি'র গবেষকরা প্রতিনিয়ত কাজ কাজ করে যাচ্ছেন। বইটির বিভিন্ন প্রবন্ধ তারই প্রতিফলন। নানামুখী বিষয় নিয়ে অনন্য এই সংকলনটি উৎসুক পাঠকদের আগ্রহ পূরণে সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সিপিডি'র গবেষণাকর্ম বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব গণমাধ্যম সুযোগ করে দিয়েছেন, এ গ্রন্থের সকল লেখকের পক্ষ থেকে আমি সেসব গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। উল্লেখ্য যে, মিডিয়ায় প্রকাশিত বক্তব্যসমূহ গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করে প্রকাশের উপযোগী করতে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্তন করা হয়েছে।

সিপিডি'র সংলাপ ও যোগাযোগ বিভাগের সহকর্মীরা, বিশেষ করে ইমা আজার লেখা ও মন্তব্যসমূহের নির্বাচন ও বাছাই, পাশাপাশি সেগুলো বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যাস ও পরিমার্জন করে প্রকাশনা উপযোগী করে তুলতে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। এছাড়াও সারোয়ার জাহান, এইচ.এম. আল ইমরান খান এবং এস. এম. খালিদ এ সংকলন প্রকাশের জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন। প্রোগ্রাম সহযোগী (ডিটিপি) মোঃ সাইফুল হাসান সংকলনটি প্রকাশে একনিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। এ বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক অত্র ভট্টাচার্য এক্ষেত্রে সার্বিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা

ফেব্রুয়ারী ২০২৬

ফাহিমদা খাতুন

নির্বাহী পরিচালক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

মুখবন্ধ

নয়

অধ্যায় ১: রাজনৈতিক পরিবর্তন, নির্বাচন ও অন্তর্বর্তী সরকার

২০২৫ সাল হবে কার্যকরী ঐকমত্য সৃষ্টির বছর
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

৩

জুলাই-পরবর্তী রাষ্ট্র সংস্কার ও আগামীর পথরেখা
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

৮

রাজনৈতিক কারণে বিনিয়োগ কমছে
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

১৬

একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ
অধ্যাপক রহমান সোবহান

১৮

একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার পথরেখা
অধ্যাপক রেহমান সোবহান

২৪

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হলে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়বে বলে আশা করা যায়
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

৩৩

নির্বাচন দেরি করলে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

৩৯

অর্থনীতি নিয়ে রোডম্যাপ না থাকায় হতবাক হয়েছি
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

৪১

মানুষের প্রত্যাশা মোকাবিলা করাই বড় চ্যালেঞ্জ
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

৪৫

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা থাকলে বিনিয়োগ আসবে না
ড. ফাহিমদা খাতুন

৫০

ফ্রন্টলাইন ৫৪
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অন্তর্বর্তী সরকারের এক্সিট পলিসি চিন্তা করার সময় এসেছে ৬৯
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার ও সামনের পথ ৭১
ড. ফাহিমদা খাতুন

ইশতেহারে অর্থনৈতিক সংস্কারের স্পষ্ট অঙ্গীকার থাকতে হবে ৭৫
ড. ফাহিমদা খাতুন

স্থিতিশীলতা এসেছে, ঘুরে দাঁড়াইনি ৭৮
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নির্বাচনী ইশতেহারে থাকতে হবে অর্থনৈতিক সংস্কারের রূপরেখা ৮১
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

ভালো অর্থনীতি হলে রাজনীতিও ভালো হবে ৮৪
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বিশেষ সাক্ষাৎকার ৮৯
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জনগণ এবারের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন ৯৭
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যায় ২: রাজনীতি, রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র

অগণতান্ত্রিক চর্চা থেকে বের হওয়াই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ ১০৩
অধ্যাপক রওনক জাহান

স্মারক বক্তৃতা ১০৯
রাজনীতিবিদেরা বয়ান তৈরি করেন নিজেদের স্বার্থে
অধ্যাপক রওনক জাহান

বিশেষ লেখা ১১১
স্বাধীনতা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন
অধ্যাপক রওনক জাহান

গণ-অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১১৪
‘আলংকারিক’ রাষ্ট্রপতিকে এভাবে ক্ষমতায়নের চেষ্টা নজিরবিহীন ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	১১৫
নেতারা বলবেন, জনতা শুনবে—এই সংস্কৃতি বদলাতে চায় মানুষ: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১১৮
নির্বাচনী রাজনীতি এখনও অর্থ ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নয় অধ্যাপক রওনক জাহান	১২১
মতামত পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধনে বাংলাদেশের জন্য যে শিক্ষা ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	১২৭
বিশেষ সাক্ষাৎকার গণতান্ত্রিক ব্যর্থতার সুযোগ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি অধ্যাপক রেহমান সোবহান	১৩১
বাংলাদেশ: ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি দুর্বল করবে বাংলাদেশকে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১৩৯
অধ্যায় ৩: শাসন, সংস্কার ও প্রতিষ্ঠান	
ব্যাকিং সেক্টরকে পুনর্গঠন করা, সংস্কার করা সহজ কাজ নয় অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	১৪৫
প্রথম আলোর গোলটেবিল অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতরেও আরেকটা সরকার আছে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১৪৯
বিশ্লেষণ জবাবদিহি নিশ্চিত করতে উচ্চকক্ষের ভূমিকা কতটুকু খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	১৫২
শুধু দলিলে স্বাক্ষর করলেই সংস্কার হয় না অধ্যাপক রেহমান সোবহান	১৫৮

ব্যাংক একীভূতকরণ উদ্যোগকে 'স্টেট কেস' হিসেবে দেখা যেতে পারে
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ১৬০

মৌলিক সংস্কার ছাড়া টেকসই পরিবর্তন সম্ভব নয়
ড. ফাহিমদা খাতুন ১৬৫

দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার জরুরি
ড. ফাহিমদা খাতুন ১৭২

শ্রম সংস্কার সরকারি উদ্যোগে স্বাধীন পর্যালোচনা
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ১৭৯

দেড় দশকের উন্নয়ন বয়ানে লাভবান রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও আমলা
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ১৮৪

বাজার নিয়ন্ত্রণে তথ্য উপাত্তের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা দরকার
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ১৮৭

অধ্যায় ৪: সামষ্টিক অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

শুধু মুদ্রানীতি দিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান ১৯৩

কেমন চলছে বাংলাদেশ?
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ১৯৫

স্থিতিশীলতা নিশ্চিত না হলে অর্থপাচার বন্ধ হবে না
ড. ফাহিমদা খাতুন ২১০

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা ঝুঁক
অনিশ্চয়তা কেটেছে, কিন্তু কী ছাড় দিলাম জানা দরকার
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান ২১২

আমরা কিছুটা স্বস্তির জায়গায় এসেছি
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ২১৪

অর্থনীতি যে জায়গায় ছিল সেখান থেকে বেশকিছু সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান ২১৬

অধ্যায় ৫: বাজেট, রাজস্ব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সংস্কার পরিকল্পনা নির্ভর বাজেট চাই অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	২২৩
অনানুষ্ঠানিক খাত বড় হচ্ছে বলে রাজস্ব আয় বাড়ছে না অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	২২৬
মতামত: চ্যালেঞ্জের সময় বাজেট কী ভূমিকা রাখতে পারে ড. ফাহিমদা খাতুন	২২৮
বাজেট প্রস্তুতিতে সহযোগিতা, সমন্বয় ও স্বচ্ছতার অভাব ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	২৩১
এবারের বাজেটে বৈষম্যবিরোধী চরিত্র থাকবে তো? ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	২৩৮
২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের কোনো উদ্ভাবনী কৌশল নেই অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	২৪৭

অধ্যায় ৬: বিনিয়োগ, শিল্প ও কর্মসংস্থান

নতুন বছরে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্যোগ প্রত্যাশা করি অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	২৫৭
গ্যাস-বিদ্যুৎ না দিলে বিনিয়োগ আসবে না অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	২৫৯
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ বাড়তে হবে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	২৬১
নারী উদ্যোক্তা হওয়ার অনুকূল পরিবেশ অনুপস্থিত ড. ফাহিমদা খাতুন	২৬৭
কর্মসংস্থান না বাড়লে দীর্ঘ মেয়াদে শঙ্কা তৈরি হতে পারে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	২৭০

অধ্যায় ৭: বাণিজ্য, শুল্ক ও বৈদেশিক খাত

সাক্ষাৎকার - অবহেলিত সার্ক কার্যকর হলে বাড়বে আমদানি-রপ্তানি ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	২৭৫
টিকফার মাধ্যমে আমাদের অবস্থান তুলে ধরে শুল্ক হ্রাসের আলোচনা শুরু করতে হবে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	২৮০
অপ্রত্যাশিত শুল্কের মাত্রা আশ্চর্যাব্বিত করেছে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	২৮২
রপ্তানির ভেতরে শুল্কের মধ্যে সমাধান খোঁজা বিবেচনাপ্রসূত হবে না ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	২৮৪
বিরোধ কমিয়ে বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	২৮৮
ট্রাম্প প্রশাসনের বাণিজ্যনীতি বাংলাদেশের করণীয় অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	২৯০
ভিয়েতনামসহ প্রতিযোগীদের তুলনায় আমরা বড় বাধার সম্মুখীন হব অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	২৯৯
বাড়তি শুল্ক ভিয়েতনামের সমপর্যায়ে নামাতেই হবে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	৩০২
২% শুল্ক কমানো হতাশাজনক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	৩০৪
ভূরাজনৈতিক সমীকরণে না জড়িয়ে শুধু অর্থনৈতিক এবং শুল্কের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত ড. ফাহিমদা খাতুন	৩০৬
ট্রাম্প শুল্ক নতুন মার্কিন বাণিজ্য ব্যবস্থা মোকাবিলায় যা করতে হবে ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	৩১১
বিশেষ সাক্ষাৎকার: যুক্তরাষ্ট্রের শর্ত পূরণে অভিঘাত আসতে পারে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	৩১৫

দেশ বাণিজ্যের আলাপ
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

৩১৯

দেশে বাণিজ্যনীতি ও শিল্পনীতির মধ্যে সমন্বয় জরুরি
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

৩২৮

অধ্যায় ৮: এলডিসি উত্তরণ ও উন্নয়ন কৌশল

এলডিসিতে যাওয়াটা ঐচ্ছিক, বেরিয়ে আসাটা পূর্বনির্ধারিত
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

৩৩৫

এলডিসি উত্তরণে চ্যালেঞ্জ ও প্রস্তুতি
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

৩৪৪

এলডিসি থেকে উত্তরণ: হুগিতাদেশ পেতে আমাদের হাতে আড়াইটি পথ খোলা আছে
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

৩৪৭

বিশ্লেষণ

৩৫১

বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ কি বিলম্বিত হবে
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

মধ্যম আয়ের ফাঁদ: বাংলাদেশ কিভাবে এড়াবে
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

৩৫৭

বিশ্লেষণ

৩৬০

এলডিসি উত্তরণ প্রক্রিয়া নিয়ে কেন নতুন করে ভাবতে হবে
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যায় ৯: জ্বালানি, অবকাঠামো ও খাতভিত্তিক অর্থনীতি

জ্বালানি তেলের দাম লিটারে ১০ থেকে ১৫ টাকা কমানো সম্ভব
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

৩৬৭

কাঁচা চামড়ার মান, মূল্য, রপ্তানি ও পরিসংখ্যানের গরমিল
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

৩৭১

অধ্যায় ১০: বৈদেশিক সম্পর্ক ও ভূরাজনীতি

চীনের বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে হবে
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান ৩৭৯

ভারতের উচিত আগে মুসলিমদের সঙ্গে আচরণের প্রভাব স্বীকার করা
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ৩৮১

যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে ইইউ জোটে হিস্যা বাড়াতে হবে
প্রফেসর রেহমান সোবহান ৩৯১

অধ্যায় ১১: বৈষম্য, দারিদ্র্য ও সামাজিক ন্যায়

কাজিফত বৈষম্য হ্রাস অনর্জিত থেকে যাবে
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান ৩৯৫

নারীরা চলাফেরা, আচরণের ক্ষেত্রে যে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তা কল্পনা করা যায় না
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ৩৯৮

উন্নয়ন টেকসই করতে প্রবৃদ্ধির গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে
ড. ফাহিমদা খাতুন ৪০০

অধ্যায় ১২: স্মারক ও ব্যক্তিত্ব

বিকাশমান উদ্যোক্তা শ্রেণিকে তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিতে হবে
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ৪০৭

খালেদা জিয়া
একজন রাজনৈতিক নেতা যিনি শুনতেন, প্রশ্ন করতেন এবং জাতীয় স্বার্থে সিদ্ধান্ত নিতেন
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ৪০৯

রওশন জাহান: বোন, শিক্ষক ও সহযোদ্ধা
অধ্যাপক রওনক জাহান ৪১৪

একজন যোগ্য প্রশাসক, মেধাবী নীতিপ্রণেতা ও নীতি বিশ্লেষক
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ৪১৮

অধ্যায় ১

রাজনৈতিক পরিবর্তন, নির্বাচন
ও অন্তর্বর্তী সরকার



২০২৫ সাল হবে কার্যকরী ঐকমত্য সৃষ্টির বছর

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি অভূতপূর্ব বছর পার করে আমরা নতুন বছরে উপনীত। আমি নিশ্চিত, নতুন বছরটিও অনন্য অভিজ্ঞতায় জাতীয় ইতিহাসে ও মননে স্থান করে নেবে।

৫ আগস্ট সম্পূর্ণ সময়কালকে আমরা যদি বিবেচনা করি, তাহলে তার একটি ‘পূর্ব পর্ব’ লক্ষ্য করা যায়। এটি মূলত গত দেড় দশকের শেখ হাসিনার শাসনামল। আওয়ামী লীগের না বলে আমি একনায়কতন্ত্রের বিবেচনায় শেখ হাসিনার শাসনামল বলছি। এই পূর্ব পর্বের ভেতরে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছিল, তার প্রকাশ আমরা ২০২৪ সালে দেখেছি। এই প্রকাশের সময়কে আমি বলছি ‘কাল পর্ব’। আর ২০২৫ হবে ‘উত্তর পর্ব’। কাল পর্ব শেষ করে নতুন পরিস্থিতিতে নতুন ভারসাম্যে পৌঁছানোই হচ্ছে উত্তর পর্বের চিহ্ন।

২০২৪ সালের ভেতরে একদিকে যেমন পূর্ব পর্ব ছিল, আরেক দিকে কাল পর্বও ছিল। কালপর্বের মধ্যে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাতি হিসেবে আমরা একটি স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে সরাতে সক্ষম হয়েছি। এর মাধ্যমে আরেকটি নতুন যাত্রার সূচনা করতে পেরেছি। কালপর্বের একটা অংশে ধ্বংসের জায়গাটাই বড় ছিল। আরেকটি অংশে ধ্বংসের পর নতুন সৃষ্টির ভিত্তি তৈরি হয়েছে। সুতরাং কালপর্বের শেষ এবং উত্তর পর্বের শুরু নিয়ে ২০২৫ সাল এসেছে।

সংস্কারের দুই ধারা

এখন আমরা দেখছি, অনেকের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্র সংস্কারের, শুধু সরকার বদল নয়। তাদের মধ্যে রাষ্ট্র ও তার বিভিন্ন অঙ্গের ম্যাডেট ও তার পরিচালন ইত্যাদি পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। আবার অনেকে মনে করেন, সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ত যেসব বিধিবিধান এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় রয়েছে, সেগুলোকে ঠিক করতে হবে। আগের

সরকারের আমলের দুর্জনদের শাস্তি দিতে হবে। ফলে আমরা এই মুহূর্তে দুই ধরনের সংস্কার বা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার ধারা লক্ষ্য করছি। সেই অর্থে পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংস্কারের যে অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, সেটা নতুন স্থিতিবস্থায় উত্তরণের প্রত্যাহাকে ধারণ করে নতুন বছর এলো। ২০২৫ এর মধ্যে ওপরের দুই ধারার ব্যবস্থাপনার তথা সংস্কারের কোনটা প্রাধান্য পাবে, তা দেখার বিষয়। সংস্কারের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার কতখানি উচ্চাভিলাষী হবে, তা ২০২৫ সালের বাস্তবতার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ইতোমধ্যে নির্বাচনের সীমান্ত রেখা ঘোষণা করেছেন। ২০২৬ সালের মাঝামাঝি নির্বাচন হবে ধরে নিলেও নির্বাচনের মূল কাজটা ২০২৫ সালের মধ্যে হবে। ২০২৫ সালে মানুষের মূল প্রত্যাশার জায়গা হবে, নির্বাচনী ধারা যাতে সৃষ্টিভাবে বেগবান হয়। নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুধু রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিতে নয়, মানুষের, অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলীর দৃষ্টিতে কতটুকু অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক পরিস্থিতিতে হচ্ছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনী ধারা বেগবান করার অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে সংস্কারের বিষয়টি আছে। আমরা অন্য সব পুনর্লিখন, সংশোধন বা পরিমার্জন স্থগিত রাখলেও নির্বাচন সম্পর্কিত সংস্কারকে পেছনে ঠেলার সুযোগ নেই।

আমার কাছে মনে হয়, সরকারি প্রক্রিয়ার সংস্কারের চেয়ে এই মুহূর্তে আমরা কাঠামোগত সংস্কারে বেশি ব্যাপৃত আছি। এটি অভিল্যাবের দিক থেকে হয়তো উত্তম, কিন্তু সরকার এবং এর প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়াটা প্রয়োজনের নিরীখে বেশি উপযুক্ত। দ্বিতীয়টা করলে জনজীবনে অধিকতর স্বস্তি আসত। উপরন্তু, নির্বাচনের ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বের হওয়ার সুযোগ ছিল। উচ্চাশা ও বাস্তবতার মিথস্ক্রিয়া ২০২৫-এ আমাদের কোথায় নিয়ে যায়, সেটাই দেখার বিষয়।

রাষ্ট্র সংস্কারে বেশি মনোযোগ এবং উচ্চাঙ্ক্ষার কারণে চলমান সম্ভাবনাগুলোর জায়গায় অথবা মূল্যাক্ষীতি বা নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি বিষয়ে আমরা কম নজর দিচ্ছি কিনা, ভাবতে হবে। যেমন— রাষ্ট্র সংস্কারের ক্ষেত্রে আনুপাতিক ভোট, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য, দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী না থাকা ইত্যাদি বিষয় সংবিধান সংস্কারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নির্বাহী আদেশ বলে এগুলো করলে পরবর্তী সময়ে সংসদের মাধ্যমে বৈধতা দিতে হবে। এগুলো যারা করতে চাচ্ছেন, তারা কিন্তু চূড়ান্ত বিচারের সিদ্ধান্তের মালিক নন। চূড়ান্ত বিচারের মালিক হবেন আগামী দিনের সংসদ সদস্যরা। এ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মতি লাগবে এবং তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে তা থাকতে হবে। তবে এটি নিয়ে কোনো রাজনৈতিক এবং সামাজিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে অন্যান্য সংস্কার বিশেষত সামষ্টিক অর্থনীতি এবং বিভিন্ন খাতওয়ারি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ভেঙে যেতে পারে। কারণ, তখন মনোযোগ অন্যদিকে চলে যাবে। একই সঙ্গে যারা বিধিবিধান এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারগুলো করছেন, তারা ভীত না হোক, সংকুচিত হয়ে যাবেন। কারণ, তারাও তো এক ধরনের ‘কথিত বৈধতার শূন্যতা’র মধ্যে কাজ করছেন।

কার্যকরী ঐকমত্যের প্রয়োজন

২০২৫ সালে বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের জায়গা হলো সংস্কার এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তার পক্ষে ন্যূনতম কার্যকরী জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা। এটি সর্বজনীন ঐকমত্য হতে হবে, এমন নয়। কার্যকরী ঐকমত্য হলো এমন এক মূল বা নিয়ামক অংশীজনের মাঝে সমঝোতা, যা নিয়ে সরকার তাঁর ঘোষিত লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারবে। ওই রকম কার্যকরী ঐকমত্য সৃষ্টির বছরই হবে ২০২৫ সাল। বাংলাদেশের উত্তরণকে স্থিতি হওয়ার জন্যই এই কার্যকরী ঐকমত্য সৃষ্টির প্রয়োজন হবে।

এখন এর জন্য অভিল্যেখের মাত্রা কী হবে, তা বুঝতে হবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্র সংস্কারে চূড়ান্ত যা চেয়েছিলাম, হয়তো তা হবে না, কিন্তু আগামী দিনের সরকারে যারা আসবে, তারা আগের মতোই চালাবে, তা যেন না হয়। ন্যূনতম প্রয়োজনটা হলো, আমরা যেন আগের ক্ষমতাহীনতার অবস্থায় ফিরে না যাই। তাই আগের অবস্থায় ফিরে না যাওয়ার জন্য কিছু রক্ষাকবচ তৈরি করতে হবে। রক্ষাকবচ তৈরির জন্য রাষ্ট্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো। কিন্তু সরকারের ভেতরও এমন অনেক কিছু আছে, যেগুলো আমরা যদি ঠিকমতো সংস্কার করতে পারি, তাহলেও কিন্তু একটা নাগরিক অধিকারের রক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি হবে। এই পরিবর্তন আগামী দিনের প্রগতিশীল ও মানবিক বাংলাদেশের ভিত্তি তৈরি করতে পারবে।

আমার প্রত্যাশা, ২০২৫ সালে সরকারের ভেতর তথা সমাজের সব ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্তের সঠিকতা এবং স্বরূপ নিশ্চিত করার একটা প্রক্রিয়া শুরু হোক। স্বচ্ছতার প্রক্রিয়াটাই জবাবদিহির পূর্বশর্ত। এতদিন কারা কত টাকা নিয়ে গেছে, কোথা থেকে নিয়ে গেছে, এগুলো আমরা বিস্তারিতভাবে জানতাম না। অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে প্রণীত শ্বেতপত্রের ভেতর দিয়ে আমরা তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। এগুলো কেন হয়, তাও বুঝতে পেরেছি। এখন সেই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। আমরা শ্বেতপত্রে বলেছি, এগুলোর তিনটি খারাপ নির্বাচনের (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪) মধ্য দিয়ে সূত্রপাত হয়। আমরা ভোট দিতে পারিনি। স্বৈরতান্ত্রিক সরকার তার গণতান্ত্রিক জবাবদিহির ঘাটতি বিভিন্ন ধরনের দৃশ্যমান প্রকল্প দিয়ে আড়াল করতে চেয়েছে। এর ভেতর দিয়ে তারা এমন কিছু ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, যার ফলে জাতীয় অর্থনীতির বিরাট ক্ষতি হয়েছে। সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা রাজনৈতিক কিছু ব্যক্তির সঙ্গে সমঝোতার মধ্যে ঢুকেছে। এই কলুষ সংযোগে আমলারা ভাগ বসিয়েছে। সুতরাং পরিবর্তনটা এমনভাবে হোক, যাতে এ ধরনের পরিস্থিতি আর ফেরত না আসে।

আমরা জানি, সংস্কারের ক্ষেত্রে গঠিত কমিশনগুলো ২০২৫ সালের প্রথম দিকেই তাদের রিপোর্ট জমা দেবে। শ্বেতপত্র প্রকাশ-পরবর্তী অর্থনীতির ওপর আলোচনাও শক্তিশালী হবে। ব্যাংক, জ্বালানি খাতসহ যেসব বিষয়ে টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে, তাদের সুপারিশ পাওয়া যাবে। এ ছাড়া জাতীয় বাজেট সামনে রেখে একটা মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো তৈরির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সমস্যা

এই মুহূর্তে মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, উচ্চমাত্রার দ্রব্যমূল্যের কারণে তারা জীবন ধারণের জন্য দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতে পারছে না। উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সরকার সংকোচনমূলক পদ্ধতি নিয়েছে। এর ফলে আবার সুদের হার বাড়ছে। এর উল্টো দিকের ফলাফল হলো, সুদের হার বাড়ার ফলে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। এর সঙ্গে ব্যক্তি খাতে জ্বালানির সংকট রয়েছে। আবার এখন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হলো, শিল্পাঞ্চলে শান্তি নেই। মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুদের হারের বাইরে আর যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলোর সুরাহা করতে পারলে ব্যক্তি বিনিয়োগ কিছুটা বৃদ্ধি পেত। করের ক্ষেত্রে যে হয়রানি হয়, সেখানে করদাতাদের সুরক্ষা দিতে হবে। বিনিয়োগ করতে গিয়ে যত ধরনের ‘লাল ফিতা’ আছে, সেখান থেকে সুরাহা দিতে হবে। আমদানি করতে গেলে বন্দরে যেসব সমস্যা হয়, তার সমাধান করতে হবে। শ্রমিকদের ভালোভাবে জীবন ধারণের সুযোগ এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার দেওয়ার মতো বিষয়ও রয়েছে।

এই সময়কালে সরকারি খাতে যতটুকু বিনিয়োগ হবে, তার ভেতর থেকে কতখানি সেই বিনিয়োগ স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক চাপ্তল্য সৃষ্টি করবে, সেই বিষয়ও দেখতে হবে। এর প্রতিফলনের বড় জায়গা হবে সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি। সরকারের নতুন প্রচেষ্টা শুধু বরাদ্দ বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে নয়, সেই বরাদ্দের কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমে দেখাতে হবে। অর্থাৎ, বর্ধিত বরাদ্দ যেন শুধু ইমারত তৈরিতে চলে না যায়। সরকার কি জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবে নাকি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষায় গুণগত পরিবর্তন আনবে, সেটাই দেখার বিষয়। এর সঙ্গে ব্যাংকগুলোর মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি করার বিষয় রয়েছে। জ্বালানি খাতের জন্যও মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তাবনাগুলো রয়েছে। একই সঙ্গে যেসব মেগা প্রকল্প চলমান রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেখানে দ্রুতগতিতে অর্থ দেওয়া এবং সময়মতো শেষ করা জরুরি।

সম্মানজনক প্রস্থানের ভিত্তি

অবশ্যই সংস্কার-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২০২৫ সালে একটি কার্যকরী জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কিছু মনোযোগ নষ্টকারী বিষয় থাকবে। আমরা দেখব কালপর্ব থেকে উত্তরপর্বে উত্তরণের এই প্রচেষ্টাকে বিলম্বিত বা বিঘ্নিত করার চেষ্টা হবে। ‘পার্শ্ব অভিনয়’ আমাদের মনোযোগ মূল মঞ্চ থেকে অন্যদিকে সরিয়ে নিতে পারে। যেহেতু উত্তরণের এই সময়কালে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নির্ভরযোগ্যভাবে স্থিতিশীল নয়। অনেক ক্ষেত্রে আমরা উগ্র মতবাদ প্রকাশ করছি এবং বিভিন্ন ধরনের অসহিষ্ণুতা দেখাচ্ছি, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এটি কিন্তু আগে উল্লেখ করা দুই ধরনের সংস্কারকের আকাঙ্ক্ষাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে আগামী বছর।

পরিশেষে বলব, যারা সীমিত সময়ের মধ্যে রাষ্ট্র সংস্কার করতে চান, তারা বিরাজমান আর্থিক চ্যালেঞ্জগুলো আগামী দিনের উত্তরণের ক্ষেত্রে কতখানি নির্ধারক হয়ে দাঁড়াবে, তা হয়তো যথেষ্টভাবে উপলব্ধি করছেন না। অথবা তাদের উচ্চাশা এত, দেখা গেল, সর্বোত্তম করতে গিয়ে হয়তো উত্তমটাই করতে পারলেন না। আমি ইতিবাচকভাবেই বলছি। আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার গ্রহণযোগ্য সমন্বয়ের ভিত্তিতে আমি বাস্তবসম্মতভাবে ২০২৫ কে দেখার পক্ষপাতী। ঐকমত্য সৃষ্টির জন্য ‘ন্যূনতম ভালো’ যেটুকু করতে চাই, তাকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। সীমাবদ্ধ সময়ে, সীমিত সামর্থ্যে এবং অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিবেশে কী করে অন্তর্বর্তী সরকার সম্মানের সঙ্গে প্রস্থান করবে, সেটাই হবে ২০২৫-এর নির্বাচন-পূর্ব অন্যতম বিবেচ্য। বর্তমান সরকার যদি ২০২৫-এর শেষে বা ২০২৬-এর প্রথমার্ধের মধ্যে একটি সফল জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করে, তাহলে ২০২৫ হবে তাদের সেই গৌরবপূর্ণ উত্তরাধিকারের ভিত্তি বছর।

সমকাল

১ জানুয়ারি ২০২৫



জুলাই-পরবর্তী রাষ্ট্র সংস্কার ও আগামী পথরেখা

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মানজুর আল মতিনঃ আজকে আমরা কথা বলতে চাই জুলাইয়ের পরে বাংলাদেশের সামনে যে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে পরিবর্তনের সংস্কারের, সেটা নিয়ে। এবং এর আগে যখন এই ধরনের সম্ভাবনা বাংলাদেশে তৈরি হয়েছিল, তারপরে কেন পুরোপুরি সেগুলো করা যায়নি, সমস্যা কোথায় হয়েছিল—সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই। ৮০-র দশক জুড়েই বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, সিভিল সোসাইটি সবাই একসাথে কাজ করেছিলেন একটা গণতন্ত্রমুখী অভিযাত্রার জন্য। এরপর পরে যখন নতুন সরকার গঠিত হলো, তিন জোটের রূপরেখা হলো, সেখানে কিছু টাস্ক ফোর্স হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে সেই টাস্ক ফোর্সগুলো আসলে বেশ মোটা বালামে ভুক্ত হয়ে ছাপা হওয়া ছাড়া আর খুব একটা আমরা কাজে লাগাতে পারিনি। এই সময় জুলাইয়ের পরেও সংস্কার কমিশন হয়েছে, শ্বেতপত্র নিয়ে আপনারা কাজ করেছেন এবং তারপরেও আসলে যে সম্ভাবনাগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো বাস্তবে যাবে নাকি আশঙ্কাগুলোই সত্যি হবে—সে প্রশ্নগুলো ঘুরে ফিরে আসছে ৮০ এবং ৯০ দশক থেকে আমাদের কি শেখার আছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ ধন্যবাদ আপনাকে আজকে ডাকার জন্য এবং সকলকে সম্প্রতি অতিবাহিত স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা এবং একই সাথে ঈদ মোবারক জানানো আপনার দর্শক শ্রোতাদের। খুবই প্রণিধানযোগ্য একটি বিষয়। কারণ ইতিহাসে যখন বেশ কিছু সময় পার হয়ে যায় তখন পিছন ফিরে দেখে উপলব্ধিটা হয়তো আরো বেশি সঠিক হয়। অনেক এটি আমরা ধারণা করি। সেহেতু দেখুন ওই এরশাদ উত্তর কালে প্রফেসর রেহমান সোবহানের নেতৃত্বে এবং আমি সেখানে খুবই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলাম, আমরা যে টাস্কফোর্সগুলো করেছিলাম প্রায় ২৫২ জন পেশাজীবী সপ্রণিতভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। চার খণ্ডে সেটা প্রকাশিত হয়েছিল। এটা থেকে এবং পরে পরবর্তী সরকার এটাকে নিয়ে সেরকমভাবে আত্মস্থ করে

বাস্তবায়নের দিকে এগলো না। এটার একটা বড় কারণ হলো তারা এটার কোন রাজনৈতিক সেই অর্থে ধারণ নিজেদের মনে করেননি। নিজেদের ওই আগের সরকারের বা একটা অন্তর্বর্তীকালীন বেসরকারি উদ্যোগকে উনারা সেইভাবে নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তার অংশ হিসেবে মনে করেননি। সেহেতু এটার ইংরেজিতে যাকে আমরা ওনারশিপ বলি বা মালিকানা সংকট সৃষ্টি হয়। এবং তারা হয়তো কিছু অংশ উনারা বাস্তবায়ন করেছেন বিভিন্নভাবে কিন্তু কোন সময় স্বীকৃতি দেননি।

এবারের সাথে ওই আগেরটার পার্থক্যটা হলো এই জায়গাটায়—সেটা হলো যে এইবার যেই সরকার আমাদের দিয়ে শ্বেতপত্র প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছেন এবং অন্যান্য টুকটাক বিভিন্ন ধরনের টাস্কফোর্স কমিটি ইত্যাদি করেছেন, সেটা হলো যে এই সরকারই এগুলিকে বাস্তবায়ন করবেন এই প্রত্যাশার ভিত্তিতে। সেহেতু এইখানে কিন্তু সেই অর্থে মালিকানা সংকট হওয়ার কথা না বা এটাকে ধারণ করে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার কথা না। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের কাছে মনে হয় একই সরকারের ভিতরেও মালিকানার প্রশ্নে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা অবস্থান করে। অর্থাৎ সরকারের যেই উপদেষ্টা মন্ডলী আছেন তারা যে সকলে একই রকম মনে করেন প্রধান উপদেষ্টার মত তা না। প্রধান উপদেষ্টা যতখানি আগ্রহ উদ্যোগ নিয়ে এটা করেছেন এবং উনি যেভাবে ডিসেম্বরের বিজয় দিবসের বক্তৃতায় সাড়ে তিন মিনিট ধরে এ বিষয়ে বলেছেন—এখনো বলছেন ২৬শে মার্চের বক্তৃতার ভিতরে উনি যেসব তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করেন আমাদের প্রতিবেদন থেকে—প্রাসঙ্গিক উপদেষ্টারা যে এটা নিয়ে খুব উৎসাহিত আছেন সেটা আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়নি।

দ্বিতীয়ত যেটা হলো, যেহেতু সরকারের সেই অর্থে কোন সাংগঠনিক রাজনৈতিক কাঠামো নেই, সেহেতু তারা অনেক অর্থে আমলা বা পুরনো প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল হয়েছেন। এবং আমলা এবং প্রশাসন কোন সময় স্থিতিাবস্থা থেকে বের হয়ে এসে উদ্যোগী হয়ে একটি পদক্ষেপ নিবে এইটা আর আশা করা যায় না। সেহেতু ওনারাও নির্ভরশীল থেকেছেন, জিম্মি থেকেছেন এই প্রশাসন এবং আমলাদের কাছে। যারা যে সমস্ত অর্থনৈতিক সংকটের কথা আমরা শ্বেতপত্রে বলেছি, তাদের কিন্তু অনুষ্ণ তারাি ছিলেন। তারাি এ তথ্য উপাত্ত সৃষ্টি করেছিলেন যেটা দিয়ে আমাদের দেশজ আয়ের মাত্রাকে বেশি করে দেখানো হয়েছে অথবা দেশ থেকে টাকা পাচার হচ্ছে ইত্যাদিকে উনারা বিবেচনায় রাখেন নাই। সেহেতু ওনাদের ওখানেও কিন্তু স্বার্থের সংঘাত ছিল।

আর তৃতীয় যেটা হয়েছে, সেটা হলো যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে বৃহত্তর সমাজের কাছে যে আপনার সমর্থন নিতে হয় সেটার জন্য ওনাদের কোন কাঠামো ছিল না। সেহেতু এমনকি যে সমস্ত পেশাজীবীরা এগুলির সাথে যুক্ত, যে নাগরিক সংগঠনগুলো এগুলির সাথে যুক্ত, তাদের কাছেও কিন্তু উনারা সেই অর্থে পৌঁছানোর আগ্রহ প্রকাশ করেননি। ওটা সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা থাকবে, হয়তো রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা ছিল। এই তিনটি কারণ—উপদেষ্টা মন্ডলীর ভিতরে মালিকানা সমস্যা, আমলাতন্ত্রের

উপর নির্ভরশীলতা এবং বৃহত্তর জনগণের কাছে সমর্থন উৎসাহ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তাদের প্রক্রিয়া না থাকা—এসব কারণে ওনাদের যে সমস্ত আমাদের শুধু শ্বেতপত্র না, আমার আশঙ্কা হলো অন্যান্য সংস্কারের যে আলোচনা আমরা করি, সেগুলি সীমাবদ্ধতার ভিতরে কিছুটা হলেও কষ্টে থাকবে।

মানজুর আল মতিনঃ ধন্যবাদ জনাব মায়া আপনার কাছে আসতে চাই। ৯০ এর সাথে ২৪ এর অনেক মিল হয়তো খুঁজে পাওয়া যায়, পার্থক্য হয়তো রয়েছে। একটা মিল বোধ হয় এটা যে সে সময় মানুষ আসলে প্রচুর স্বপ্ন দেখেছিল। এখন যে বলা হচ্ছে যে আমরা এমন একটা ব্যবস্থা চাই যেখানে অন্তত গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু নির্বাচনের একটা ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে পরিবর্তনটা আমরা এর আগে একবার করেছিলাম সেটা ভেঙে পড়েছে, সেই ভেঙে পড়ার থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারে এটাকে আরেকটু দীর্ঘস্থায়ী করার কি বুদ্ধি হয়েছে? ... এই রাষ্ট্রে সংস্কার বা মেরামত বা স্থায়ী পরিবর্তন নিয়ে কি তখন আলোচনা ছিল না এতটা?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ ভাইকে একটা প্রশ্ন, দেখুন প্রথম কথা হলো তিনজোটির রূপরেখা দেখার আমার প্রক্রিয়ার কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল বিভিন্ন কারণে। যারা ব্যক্তির সেখানে যুক্ত ছিলেন বিশেষ করে নাগরিক সম্প্রদায়ের যারা যুক্ত ছিলেন, আইনের লোকেরা—আমি দেখার সুযোগ হয়েছে। দেখুন ওটা খুবই সীমিত একটি বিষয় ছিল। সীমিত বিষয় এই ছিল যে এটা একটা গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য একটি একমতের জায়গা, একটা ভালো নির্বাচনের জন্য। রাষ্ট্রের গভীর সংস্কারের জন্য তখন সেইভাবে আমাদের অভিজ্ঞতাও ঠিক ছিল না, চিন্তার ভিতরেও এই অংশটা ছিল না। সেহেতু সেই অর্থে তিন জোটির যে বিষয়টা ছিল এটা গণতান্ত্রিক উত্তরণ, মিডয়ার স্বাধীনতা ইত্যাদি বিচার ব্যবস্থা—এইগুলির ভিতরেই সীমিত ছিল। এইবারের যেটা বলছেন মায়া ভাইয়ের কথা আমি মেনে নিয়ে বলছি যে যেই বিস্তৃতি আমরা দেখেছি লোকের ভিতরে, যে এটার ভিতরে যে উৎসাহ উদ্দীপনা আকাঙ্ক্ষা—এটা ঠিকই আছে। প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। প্রশ্নটা হলো আমরা তিনজোটির রূপরেখাকে সেই অর্থে হেঁচট খেতে দেখেছি। যারা এটার মানে স্বাক্ষরকারী ছিলেন তারা এটার প্রতি অনুরক্ত থাকেননি। নিষ্ঠা দেখাননি। আমরা ওখানে উনারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বিষয়টা হলো এই—আজকের এই জনসম্পৃক্তি কি আমাদের এমন কোন বিশ্বাস দেয় যে আগামী দিনে এখন যে আলোচনা করছি এটা সুষ্ঠু এবং সেই অর্থে নিরাপদভাবে আমরা টেকসই করতে পারব? ওই আস্থাটা রাজনীতিবিদদের কাছে ওনাদের আছে কিনা সেটিই প্রশ্ন।

মানজুর আল মতিনঃ কেন না কেন আপনি আমাকে পরে জিজ্ঞেস করেন আপনি বলেন কোথায় কেন আছে? আপনি মনে করছেন যে সংবিধানের বাইরে গেলে এই সরকারের ম্যান্ডেটের বাইরে চলে যাবেন তারা?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ প্রশ্নটা তুলতে পারি। আপনি কনস্টিটিউশনে তো হাত দিতে পারেন না। আপনি সংসদ সংবিধানের যদি কোন ধারাকে সংবিধানকে আপনি যদি নির্বাহী আদেশ দিয়ে করেনও, তাহলে পরবর্তী সরকারকে সংসদকে এটাকে আপনার বৈধতা দিতে হবে। সেহেতু সেইটা আপনি সেই অর্থে কিন্তু নির্ভরশীল থেকে যাবেন যে এটা ঠিক সেই হবে কি হবে না। আপনি এখন ১২৬ টি আপনি সংশোধন করতে পারেন নির্বাহী আদেশ দিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনি টিকাতে পারবেন কিনা সেটা হলো পরবর্তী সংসদের বিষয়। না সেটা তো মতামত, এটা তো মতামতের বিষয়।

মানজুর আল মতিনঃ আমি আপনাদের অন্য একটা আপনি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আন—এই প্রশ্নটা একটু শেষ করতে চাচ্ছি। মানে ধরুন সংবিধান সংস্কার কমিশন যে কথাগুলো বলছে এখানে জাতীয় সংবিধান কাউন্সিলের কথা বলা হচ্ছে এবং যেটা আসলে নির্বাচনী ব্যবস্থা যেটা এর পরে হবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বলুন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলুন সেটার জায়গাটা নিতে চলেছে। সেটা তো সংবিধান সংস্কার না করে সম্ভব নয়। তাহলে নির্বাচনের ব্যাপারে যদি আমরা একটা সংস্কার না করতে পারি তাহলে কি আদৌ কোন পরিবর্তন করতে পারছি আমরা? এর পরের ব্যবস্থাটা কি দাঁড়াবে? কারণ সরকার মানে রাজনৈতিক সরকারের অধীনে নির্বাচন... ন্যূনতম ঐক্যমত জায়গাতে পুরনো বিতর্ক আবার ঘুরে আসবে যে বিচার বিভাগকে যেভাবে এখানে টেনে আনা হয়েছিল সেটা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজনীয় হবে... এই ব্যাপারে তো ব্যাপক ঐক্যমত।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমি মনে করি উত্তর পরিস্থিতিতে আমাদের টাস্ক ফোর্সের অভিজ্ঞতা সংস্কারের অভিজ্ঞতা—কারণ সংস্কারের একাধিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেছি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ভিতরে। আর দ্বিতীয়ত হয়েছে এই সাম্প্রতিককালে যেগুলি চলছে যার সাথে বিভিন্নভাবে আমিও যুক্ত। কিন্তু এর মধ্যে একটা বড় অভিজ্ঞতা গেছে আমাদের সেটা তথাকথিত ওয়ান ইলেভেন এর পরে। ২০০৬-০৭ সময়ে যখন সরকার বদল হলো এবং ফখরুদ্দিন-মইনুদ্দিন সাহেবদের সরকার আসলো, তখনও কিন্তু আমি নিজে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছিলাম ইলেকশন প্লাস প্লাস—শুধু নির্বাচনের জন্য সরকার বদল হবে এটা হবে না, সংস্কার লাগবে। সংস্কার দুটো—প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও নির্বাচনের সংস্কার। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ভিতরে বড় বিষয় ছিল দুর্নীতি দমন। পরবর্তীতে সেই সময় তথাগতিত ১/১১ সরকারের পরবর্তীতে একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছিল সেটা হলো যে আপনি কতখানি চাবাতে পারবেন অতটুকুই কামড় দিইন। বুঝেছেন? ইংরেজিতে বলে “Don’t bite more than what you can chew”।

এখন সেটি আমি আপনাকে বলছি যে আপনার সক্ষমতা, আপনার বাস্তবতা, আপনার পরিস্থিতি এবং সময়কাল—এগুলি বিবেচনা করেই আপনার সংস্কারের কাঠামো তৈরি হবে বা তার গভীরতা তৈরি হবে। আমি যেটা আপনাকে বলছি আমাদের একাধিক অভিজ্ঞতা ইতিহাসের ভিতরে আছে। এতখানি গভীরভাবে কোনদিন এর আগে হয়নি। কিন্তু এটার যে

বিপদগুলো আছে আমি যেটা বললাম—সক্ষমতার ব্যবহার, আপনার এটার জন্য যে আপনার অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন করার তাগিদ এগুলোকে বিবেচনা রেখে আপনার মনে রাখতে হবে কতখানি আমি কামড় দিব যেটুকু আমি চিবাতে পারব। যেটা চিবাবো সেটাও হজম করতে পারবো কিনা টিকবে কিনা—এই বিবেচনাটা আমি অনেক সময় দেখি না।

মানজুর আল মতিনঃ এবারের সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পরে ঐক্যমত কমিশনের তরফ থেকে দলগুলোকে যে প্রশ্নগুলো পাঠানো হলো সেখানে একটা বিষয় এসেছে সেটা হচ্ছে আমাদের এতদিন পর্যন্ত সংবিধানে অল্প বস্ত্র বাসস্থান এগুলোকে মৌলিক চাহিদা এবং রাষ্ট্রের যে মূলনীতি তার মধ্যে রাখা হয়েছিল, এটাকে এখন অধিকারের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা কথা হচ্ছে। এই আকাজক্ষাটা যেটা মুক্তিযুদ্ধের সময়ও মানুষের মধ্যে ছিল—এদিকে এগনোর যে প্রয়াসটা এখন দেখা যাচ্ছে এই ঐক্যমত কমিশনের কাজের মধ্য দিয়ে এটাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমি এইটা কয়েকদিন আগে আমাদের নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এসডিজি নিয়ে আলোচনায় সরকারের সাথে মিলিতভাবে করেছি। দেখুন আমাদের যে বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচির যে ধারণা সেখানে আমরা বলি যে কাউকে পিছনে রাখা যাবে না, আর বৈষম্যের ধারণা যে আমরা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ভিতরে আমরা ছিলাম আছি সেটা হলো যে কারোর প্রতি বৈষম্য করা যাবে না। অধিকারের ভিত্তিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে যদি হয় তাহলে তো আপনাকে স্বীকার করতে হবে সব মানুষের সমান অধিকার। তাহলে সর্বজনীন মানবাধিকারের কথাটা তাহলে একদম নূনতম ঐক্যের জায়গা। আপনি কি একবারও শুনেছেন সর্বজনীন মানবাধিকারের কথা? বরঞ্চ কিছু কিছু মানুষ তারা নৈতিক ব্যবস্থাপনা তাদের চিন্তাধারাকে মানুষের উপর চাপানোর চেষ্টা করছে। আপনি কি যারা সংস্কারের কথা বলে তাদের নাগরিকদের এই ধরনের নৈতিক খবরদারী থেকে সুরক্ষার কথা শুনেছেন? আমি তো শুনি নাই।

আপনি দেখবেন এর ভিতরে যে আলোচনা হয় আমরা নতুন জাতিসত্তার উন্মোচনের প্রয়াসের ভিতরে আছি। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী বা আদিবাসীদের কথা কি আপনি শুনতে পান? তাই তো আমি পাই না। এমনকি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কথা কি আপনি শুনতে পান? সেটার ভিতরেও তো আসে না। আমি বলছি আপনি যখন বৈষম্যের কথা বলি আমরা কি সর্বজনীন সর্বব্যাপী বৈষম্যের বিরুদ্ধে বলি কিনা এই জায়গাটাতে আমি অসুবিধা দেখতে পাচ্ছি। আর দ্বিতীয়ত হলো এই বৈষম্যগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য আপনার যে আদর্শিক অবস্থান সে আদর্শিক অবস্থানের ভিতরে তো আপনার বড় ধরনের পার্থক্য আছে। সেহেতু শেষ বিচারে এটা যে রাজনৈতিক অবস্থানে যাবে। তখন আপনি এটার সঠিকতা যাচাই করার পদ্ধতিটা কি হবে? বড় ধরনের রাজনৈতিক বিতর্ক বৈধতার ব্যতিরেকে আপনি এটাকে আনতে পারবেন কিনা? আমার সবসময় মনে হয় এটাকে আত্মস্থ করতে হলে আরো বৃহত্তর রাজনৈতিক বিতর্ক

লাগবে। ... মনে করি যে এটা নির্ভর করে আমরা এই শব্দগুলোর ভিতরে কি তাৎপর্য দেই বা এটার প্রয়োগিক দিকগুলো কি হয়। কারণ ধারণা যখন কার্যকর হয় তখনই তার ভিতর দিয়ে বোঝা যায়। বহুত্ববাদ দরকার আছে এ ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু একই সাথে ওই বহুত্বের ভিতরে জাতিসত্তার বিষয়টি, ধর্মীয় অনুশাসনের বা স্বাধীনতার বিষয়টি আমরা যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিফলন করতে পারবো কিনা, সুরক্ষা দিতে পারবো কিনা, সে বিতর্ক হয়তো হালকাভাবে হতেই পারে।

মানজুর আল মতিনঃ জনাব মায়া আপনার কাছে ফিরে আসতে চাই... আপনাদের যে অভিজ্ঞতা সেখান থেকে এখনকার ছাত্রদের কি শেখার রয়েছে? ... এখানে কোথায় একটা পুরনো বিতর্ক থেকে যাচ্ছে যেটা অষ্টম সংশোধনীর পর থেকে আছে যে সংবিধানের কিছু মৌল কাঠামো আছে যেগুলো পরিবর্তন আসলে সংসদ করতে পারে না... অষ্টম সংশোধনী মামলার রায় সেগুলোর কি অবস্থা দাঁড়াবে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ সেটা হলো একটা উত্তরণকালীন সময় দিয়ে যাচ্ছি তো। এবং আবার আমি বলি এরকম উত্তরণকালীন সময় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র নিয়ে বাংলাদেশের ষেটি দশকের সময়কালে বিভিন্ন সময় এসেছে। সেহেতু আমরা যে একেবারেই শূন্য থেকে শুরু করছি এমন না। আমাদের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের মনন আমাদের এখন সাথে আছে। উত্তরণটা দেখা দিয়েছে এই যে মৌলিকভাবে আমাদের যে গণতান্ত্রিক কাঠামো ছিল সেই গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং এটার ফলে এক ধরনের সৈরতন্ত্রে জন্ম হয়েছে এবং একসাথে একটা চোরতন্ত্রে জন্ম হয়েছিল। একটা চোরতন্ত্র আরেকটা সৈরতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছিল। এখন আমরা মনে করছি এইটার পুনরাবৃত্তিকে আটকাতে হলে এমন কিছু কাঠামোগত সংস্কার দরকার যেটা আগামী দিনে এই ধরনের প্রতিবন্ধক হিসেবে থাকবে।

মূলটা হলো যে আপনার তো একটা গণতান্ত্রিক উত্তরণ লাগবে। বর্তমানে যে পরিস্থিতি চলছে এই পরিস্থিতিতে আপনি পূর্ণভাবে মাত্রা নির্ধারণ করে ওইটাকে বৈধতা দিতে পারবেন না। সেহেতু আমার যেটা বক্তব্য, মূল দেখতে হবে যে নূন্যতম এমন জায়গায় আমার যেতে হবে যাতে আমি ওইটার সম্ভাবনাটাকে নষ্ট না করে দিই। সর্বোত্তম করতে গিয়ে আমরা উত্তমটাকে যেন হারিয়ে না ফেলি। আমার মনে হয় সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বলে যে বৈপরিত্ব বা দ্বন্দ্ব আগের চেয়ে বেড়েছে। আমাদের দায়িত্ব হওয়া উচিত যে কোন অবস্থাতেই এই মৌল অনিশ্চয়তা সৃষ্টি না করা, অস্থিরতা সৃষ্টি না করা এবং সেটার ভিতর দিয়ে এমন একটা জায়গায় যেন না যাই যাতে আমরা পিছিয়ে যাই। ভালো সর্বোত্তম করতে গিয়ে ভালোটা যেন না হারিয়ে ফেলি।

মানজুর আল মতিনঃ এর সাথে আরেকটা প্রশ্ন জুড়তে চাই সেটা হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে দ্রব্যমূল্য একটা স্বস্তির জায়গা ছিল মানুষের জন্য... চোরতন্ত্র সমস্যা হচ্ছে গিয়ে এই কাঠামোগুলো তো থেকে যায় এবং হয়তো তারা নতুন একটা ব্যবস্থা খোঁজে। রাজনৈতিক

সরকার যখন আসবে তখনই আমাদের অর্থনৈতিক মৌলিক জায়গাগুলোকে আমরা কিভাবে রক্ষা করব?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি তাহলে আপনাকে প্রশ্ন করি এবং আপনার মাধ্যমে ওনাকে প্রশ্ন করি রাজনীতির যারা মানুষরা আছে—উনারা যেরকমভাবে কাঠামো সংস্কারের কথা বলেন, সংবিধানের সংস্কারের কথা বলেন, উনাদের মুখের থেকে কি একবারও শুনেছেন ভালো করে যেই অলিগার্করা এই দেশের এই পরিস্থিতি করলো? যারা এখন পর্যন্ত নির্ভয়ে নির্বিচারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের ব্যাপারে কি আপনারা একবার ওনাদের মুখে কিছু শোনে? তো নতুন সরকার লাগবে কেন? আমি তো এই সরকারের আমলেই দেখি না। তাদের কাকে আপনি শাস্তি দিতে দেখেছেন? কাকে আপনি জেলখানায় নিতে দেখেছেন? তাদের কোন জায়গায় ক্রোক করা সম্পত্তিকে নিলাম করতে দেখেছেন? কই তারা তো একবারও এই কথা বলে না। বরঞ্চ এখন আশঙ্কা হলো তারা তো আগামী দিনের এই নির্বাচনকে অর্থায়ন করবে। চেঞ্জ অফ গভার্নমেন্ট ডাজ নট মিন চেঞ্জ ইন গভার্নেন্স—আপনার সরকার বদল হলেই শাসন ব্যবস্থা বদল হয় নাই। সেহেতু অব্যাহতভাবে আপনি নতুন পদ্ধতিতে আপনি ঘুষ দুর্নীতি অব্যাহত রাখবেন আর আপনি আমাকে বলবেন যে একেবারে কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে—আমি উৎসাহ পাবো কেমন করে? আপনার প্রতি আমার আস্থার জায়গাটাও তো আপনাকে সৃষ্টি করতে হবে।

মানজুর আল মতিন: উনি কিন্তু যেটা আপনি বলছেন সেটার উপরে তো পলিটিক্যাল পার্টিগুলো বলছে... পরবর্তীকালে যিনি ক্ষমতায় আসবেন তার ক্ষেত্রেও এই যে অলিগার্ক যাদেরকে বললেন ডক্টর ভট্টাচার্য তারা যে একই ভূমিকা নেবেন না তার নিশ্চয়তা কি?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না ধরেন নিশ্চয়তা অন্য কোনভাবে দিতে পারবেন না। এটা কেবল চেতনার উপরই নির্ভর করছে। ... আমি তত্ত্বে ফিরে যাই আপনাকে। সেটা হলো যে আপনি কাঠামো যখন পরিবর্তন করবেন সেই কাঠামো আপনার ভিত্তির সাথে হবে। অর্থাৎ আপনি সয়েল টেস্ট না করে তো আর বিল্ডিং বানাতে পারেন না। তো আপনি বিল্ডিং নিয়ে আলোচনা করছেন কিন্তু যে ভিত্তির উপরে যে অর্থনীতি সামাজিক সম্পর্কের উপরে এই ভিত্তিটা তৈরি হবে সেটা নিয়ে আপনার কোন আলোচনা নেই। এই আলোচনাটার জায়গাটাই হলো—আপনি বলছেন যে এটা সংবিধান, কিন্তু আমি বলছি এটা বৃহত্তর সমাজের ভিতরে যদি আপনার আচরণের ভিতরে না প্রকাশ পায় তাহলে আপনি ওই সংস্কারটাই বাতাসের ভিতরে হবে। আবার এটা কিন্তু হাইজ্যাক হয়ে যাবে।

মানজুর আল মতিন: রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ঘুরে ফিরে আসে। যে রাজনৈতিক দলের পরিবর্তন তো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার করতে পারে না উচিতও নয় কিন্তু সেই পরিবর্তন আসবে কিভাবে? ... সেক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলার কথা বলা হয় সেটা কি এই সময় কিছুটা করে রাখার সম্ভব?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ এটা প্রতিষ্ঠান গড়ে থাকে। নাগরিক সমাজের ভূমিকা থাকে। পেশাজীবী সম্প্রদায়ের স্বাধীন ভূমিকার বিষয় থাকে। আমরা জানি যে আগের সরকারের আমলে পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে নির্বাচনহীনভাবে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এবং নাগরিক সমাজের কণ্ঠ চেপে ধরার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। আপনার মিডিয়াকে সেভাবে কথা বলতে পারে নাই। উত্তরণকালে আমাদের সকলের দায়িত্ব জবাবদিহিতা নিয়ে আলাপ করা উচিত। বর্তমান যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আছে, এই সরকারের জবাবদিহিতার জায়গাটা কোন জায়গায়? এই জবাবদিহিতার জায়গাটা যদি পরিষ্কার না থাকে এবং ওনাদের যদি নিজের—বর্তমান সরকারের কোন নিজস্ব ঘোষণাপত্র নেই। সেই জায়গাটায় জবাবদিহিতার জায়গাটা ফেরত নিয়ে আসার খুবই প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

চ্যানেল ২৪

১ এপ্রিল ২০২৫



রাজনৈতিক কারণে বিনিয়োগ কমছে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বৈদেশিক বিনিয়োগ আসছে না বললেই চলে। যা আসছে তা যৎসামান্য। গত আট মাসে ২০৮ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ কম হয়েছে। আর গত জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে বিনিয়োগ কমার যে চিত্র দেখা যাচ্ছে তা রাজনৈতিক কারণে হয়েছে।

আগামী দিনে বিনিয়োগ আনার জন্য ক্ষেত্র তৈরির সময় হয়েছে। এরই মধ্যে বিনিয়োগ সম্মেলন হয়ে গেছে। এতে বিনিয়োগকারীরা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আগেও আগ্রহী ছিল।

তবে এই আগ্রহ বাস্তবায়ন করতে হবে। এর জন্য নজর দিতে হবে। এখন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ নিষ্কণ্টক জমির বন্দোবস্ত করেছে। এতে জমির অবকাঠামো নিশ্চিত সহজ হবে।

তবে এক দরজায় সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এসব সেবার মূল্য অনেক বেশি আছে, এটি কমাতে হবে। দুর্নীতির কারণে আগে থেকেই সেবার মূল্য বেশি ছিল। এসব সমস্যা সৃষ্টির মূলে প্রাতিষ্ঠানিক অক্ষমতা। এই দক্ষতার দুর্বলতায় ব্যয় বেশি হচ্ছে।

এ ছাড়া বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি দ্রুত করতে হবে।

বিনিয়োগ আকর্ষণে বন্দর ও কাস্টমস সুবিধা নিশ্চিত করতে সহজীকরণ করতে হবে। পাশাপাশি লজিস্টিক সুবিধা বাড়াতে নীতির বাস্তবায়ন করতে হবে। সার্বিকভাবে ব্যবসার পরিচালন ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে। এসব বিষয়ে নজর দিলে বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হবে।

দেশে অনেক বিনিয়োগ আসার কথা। অথচ কম্বোডিয়ার চেয়েও কম বিনিয়োগ আসছে। ভিয়েতনামের সঙ্গে তুলনা করার এখন সুযোগই নেই। বিনিয়োগ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারলে এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হবে।

আশার কথা হলো, ট্রাম্পের শুষ্কনীতির কারণে দেশে বিনিয়োগ বাড়বে। বিশেষ করে চীনের বিনিয়োগ আমাদের দেশে আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তা ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নে আরো পাঁচ বছর শুষ্ক সুবিধা থাকবে। এ কারণে বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগ আসবে। এই বিনিয়োগ টানতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়তে হবে। বিনিয়োগ বাস্তবায়নে ওয়ানস্টপে সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার ব্যয় কমিয়ে প্রতিযোগিতামূলক করতে হবে। পাশাপাশি বিরোধ নিষ্পত্তি দ্রুত ও সহজ করতে হবে। এসব বাস্তবায়িত হলে বিনিয়োগ আসার বড় সম্ভাবনা আছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানে হামলা ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে নেতিবাচক বার্তা যায়। এসব ক্ষেত্রে জিরো টলার্যান্স নীতি অনুসরণ করতে হবে, যাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এসব বিষয়ে ইতিবাচক বার্তা পায়। বিদেশি বিনিয়োগ টানতে প্রস্তুতিমূলক কাজ করে যেতে হবে। এখনো স্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে অনেক বিনিয়োগকারীরা। রাজনৈতিক সরকার এলে তখন স্থিতিশীলতা আসবে। তার জন্য আগামী দিনে বিনিয়োগ পেতে প্রস্তুতি এখনই নিতে হবে। এখন বিনিয়োগকারীরা প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু করেছে। তারা বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এসব বিনিয়োগের আগ্রহ বাস্তবায়ন করতে পারলেই দেশের বিনিয়োগ বাড়বে।

কালের কণ্ঠ

২২ এপ্রিল, ২০২৫

একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ

অধ্যাপক রহমান সোবহান

বাংলাদেশে সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস নিয়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বহু নতুন প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছে। রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনীতির প্রশ্নগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের মতো মোকাবিলা করছেন। সেই প্রেক্ষাপটে সংস্কার, নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপথ নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান। লেখাটি প্রকাশিত হবে দুই পর্বে। আজ প্রকাশিত হলো প্রথম পর্ব।

ক. এক শাসকের পতনের পথরেখা

জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের যাত্রাপথ

জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের যাত্রা যে পথে শুরু হয়েছিল, শেখ হাসিনার অচিন্তনীয় এক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে তা চূড়ান্ত রূপ নেয়। তাঁর শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্রদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণ-আন্দোলন মোকাবিলায় তিনি ওই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। শিশুসহ সাধারণ নাগরিক এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের গুলি করতে আইনপ্রয়োগকারী বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে তিনি রাজনৈতিক ও নৈতিকতার দিক থেকে অমার্জনীয় এক কাজ করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে পুলিশ, র‍্যাব ও বর্ডার গার্ডের পথে না হেঁটে সেনাবাহিনী নির্দেশটি মানতে অস্বীকৃতি জানায়। তা না হলে একটি গণহত্যা ঘটে যেতে পারত।

মানুষের ওপর গুলি চালানোর জন্য সেনাবাহিনীকে সর্বশক্তি প্রয়োগের যে নির্দেশ শেখ হাসিনা দিয়েছিলেন, সেনাবাহিনী সেটি না মানায় পুরো ঘটনার মোড় বদলে গিয়েছিল। এর পরিণতিতে ৫ আগস্ট ৪৫ মিনিটের নোটিশে তাঁকে গণভবন ছাড়তে হয়। আন্দোলনকারীদের ওপর সেনাবাহিনী গুলি চালাতে রাজি না হওয়ার কারণে সরকার পরিবর্তনের ঘটনা এটিই প্রথম নয়।

১৯৯০ সালে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পতনের সময়ও একই ঘটনা ঘটেছিল। তখন সেনাপ্রধান নুরুদ্দিন খান তাঁর সর্বাধিনায়কের (রাষ্ট্রপতি) সমর্থনে সেনা মোতায়েন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে বিএনপির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে রক্ষায় সেনা মোতায়েনের প্রস্তাব খারিজ করে দেন সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ। এর মধ্য দিয়ে তিনি সেনা-সমর্থিত ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সহায়তা করতে উদ্যোগী হন। তাঁকেও বেছে নিয়েছিলেন খালেদা জিয়া। তাঁর ভাই মেজর সাঈদ এক্সান্দার আর মইন ইউ আহমেদ ছিলেন একই ব্যাচের।

এসব ঘটনা থেকে মনে হয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ রয়েছে, যা ব্যক্তিগত আনুগত্যের উর্ধ্বে। ঐতিহাসিকভাবে যখন কোনো অজনপ্রিয় সরকারের সুরক্ষার জন্য বলপ্রয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন তা প্রত্যাখ্যানের প্রবণতা দেখিয়েছে সেনাবাহিনী। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে এ ধরনের নজির কেমন আছে, আমি জানি না।

যেটি ঘটেছে, জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী তা হলো, শেখ হাসিনার নির্দেশে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে প্রায় ১ হাজার ৪০০ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন তরুণ। অধ্যাপক ইউনুসের অনুরোধে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ঘটনা অনুসন্ধান করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনের কার্যালয় (ওএইচসিএইচআর)। জাতিসংঘ পাঁচ শতাধিক পাতার তথ্যসমৃদ্ধ একটি প্রতিবেদন দিয়েছে। প্রতিবেদনটি আমাদের কাছে জুলাই ও আগস্টের ঘটনাগুলো নিয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য হিসেবে কাজ করবে। প্রতিবেদনটি সম্প্রতি জেনেভায় অনুষ্ঠিত নিজেদের বার্ষিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করেছে ওএইচসিএইচআর। দেশের নাগরিকদের হত্যার নির্দেশ দেওয়ার জন্য ঢাকায় শেখ হাসিনা ও তাঁর সহযোগীদের যে বিচার হতে যাচ্ছে, সেখানেও সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করবে এই প্রতিবেদন। তবে ওএইচসিএইচআরের সম্পূর্ণতা বাংলাদেশের বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর সুনির্দিষ্ট কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারে, যাতে বিচারের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া, স্বচ্ছতা ও বাইরের তদন্তের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা যায়।

শেখ হাসিনার শাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা ২০২৪ সালের জুলাই মাসে হ্রাস পেতে শুরু করেনি। বিরোধীদের নির্বাচন প্রকৌশল, নাগরিকদের গুম, নির্ধাতিত, গণমাধ্যমের ওপর দমন-পীড়নের মাধ্যমে মানবাধিকারের লঙ্ঘনও শেখ হাসিনার ১৬ বছরের অগণতান্ত্রিক শাসনকে কালিমালিষ্ট করেছে। প্রশাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মূলে যে অপশাসন ছিল, ইউনুসের গঠন করা বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে তা উঠে এসেছে। নানা অগ্রগতি সত্ত্বেও একটি টার্সফোর্সের তৈরি শ্বেতপত্রে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অনেক অপকর্ম চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলো পর্দার অন্তরালে থাকা অঙ্ককারকে সামনে এনেছে। এসব অপকর্মের মাত্রা হতবাক করে দেওয়ার মতো। তা অর্থনীতির ওপর, বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতে ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছে। তিনটি ভূয়া নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রাখা নাগরিকদের চোখে শেখ হাসিনাকে আরও অবৈধ করে তুলেছিল।

সীমান্তের ওপারের বিচ্যুত দৃষ্টিভঙ্গি

বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড এবং শেখ হাসিনার অন্তরঙ্গ পুঁজিপতি চক্রের লাগামহীন দুর্নীতি তাঁর এবং তাঁর দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি করেছে এবং তা নিজেই আমাদের পরিস্থিতি মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছে। শেখ হাসিনা সরকার-সংশ্লিষ্ট হত্যাকাণ্ড, নির্বাচন-জালিয়াতি, মানবাধিকারের পদ্ধতিগত লঙ্ঘন এবং শিল্পপর্যায়ের দুর্নীতি ভারত সরকার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে বলে মনে হচ্ছে। **ভারতে ক্ষমতাসীন দলের লোকজন গণমাধ্যমে ইউনুস-সরকারকে নিয়ে খেলাখুশিমতো কথা বলে যাচ্ছেন, শেখ হাসিনার পতন নিয়ে পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলক বয়ান প্রচার করছেন। সৌভাগ্যবশত ভারতের সব বিপ্লবক এই মিথ্যা বয়ানে বিশ্বাস করেন না।** যদিও বাংলাদেশের ভারতীয় শুভাকাঙ্ক্ষীরা এই অভ্যুত্থানের অন্ধকার প্রেক্ষাপট এবং এর পরিণতি সম্পর্কে কম কথা বলছেন বা কিছুই বলছেন না। বর্তমান ঘটনাবলি নিয়ে তাঁদের মন্তব্য যতই ভালো হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা এসব ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা নিচ্ছেন, ততক্ষণ অবধি গল্পটা অসম্পূর্ণ ও ব্যাখ্যাহীন থেকে যাচ্ছে। আর তা বাংলাদেশিদের চোখে ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতা কমিয়ে দিচ্ছে এবং বাংলাদেশের ভেতরে ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাব তীব্রতর করে তুলছে।

সরকারি পর্যায়ে যেকোনো অর্থবহ আলোচনায় অংশ নিতে ভারত সরকার যে অনীহা দেখিয়ে যাচ্ছে এবং অধ্যাপক ইউনুসের সঙ্গে আলাপ শুরু করতে প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রথম দিকে যে অনিচ্ছা দেখিয়েছেন, তা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের পরিবেশকে আরও খারাপ করে তুলেছে। ভারতে শেখ হাসিনার অবস্থানের কারণে এ সম্পর্ক এরই মধ্যে আবিল হয়ে উঠেছে। বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশিকে ভিসা দেওয়ার বিষয়টি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের অনীহাও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এর মাধ্যমে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতিবাচক অবস্থান সামনে এসেছে, যা আমাদের দুই দেশেরই স্বার্থের বিরুদ্ধে। বর্তমানে ভারতে পর্যটকদের সবচেয়ে বড় উৎস সম্ভবত বাংলাদেশ। কলকাতায় তাঁদের অনুপস্থিতির কারণে স্থানীয় ব্যবসায় মন্দা দেখা দিয়েছে।

বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস শক্তিশালী ও ভারসাম্যপূর্ণ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের গুরুত্ব নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার এই প্রয়াস অবশেষে অগ্রগতি পায় সম্ভ্রান্তি ব্যাংককে বিমসটেক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রধান উপদেষ্টা ইউনুসের বৈঠকের মধ্য দিয়ে। বহুল প্রতীক্ষিত ওই বৈঠকে দুই পক্ষের অভিন্ন উদ্বেগের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়। ওই সাক্ষাৎের সময় মোদিকে একটি ছবি উপহার দিয়েছিলেন ইউনুস। ২০১৫ সালের ওই ছবিতে তাঁকে একটি বিশেষ সম্মাননা দিতে দেখা যায় মোদিকে। ভারতজুড়ে ইউনুসকে যে কতটা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়, ওই ছবির মাধ্যমে সেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ব্যাংককের সাক্ষাৎ হয়তো উভয় পক্ষের সাদৃশ্যপূর্ণ বয়ানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। তবে তা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, আরও নিয়মিত ও অর্থবহ সংলাপ আবার শুরু করা যেতে পারে। আগাম কোনো নোটিশ ছাড়াই ভারতের বিমানবন্দর ব্যবহার

করে কার্গোতে করে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির সুযোগ (ট্রান্সশিপমেন্ট) স্থগিত করার ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ইঙ্গিত দেয় না।

ইতিহাসের বয়ানের পুনর্লিখন

ঢাকা থেকে পরিস্থিতি যেভাবে দেখা যাচ্ছে, তার প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় নিলে বোঝা যায়, এখানে বিকাশমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীলতা থেকে বহু দূরে অথবা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। শেখ হাসিনার শাসনের প্রকৃতি ও পরিণতি প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দিয়েছে এবং বিবাদ-বৈরিতার অন্তত শক্তিগুলো আবার বেরিয়ে এসেছে। জামায়াতে ইসলামীর পুনর্জন্ম হয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে তারা আরও প্রাসঙ্গিক শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। বক্তৃতা-বক্তব্যে সংযম প্রদর্শন করলেও তাদের অন্যতম প্রধান একটি উদ্দেশ্য হলো ঐতিহাসিক বয়ান পুনরায় লেখা, যেন তাদের ১৯৭১ সালের বীর না হলেও অন্তত ভুক্তভোগী হিসেবে দেখানো হয়, যেখানে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভুল শত্রুর বিরুদ্ধে ভুল যুদ্ধে জড়িয়েছিল।

অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রনেতারা যারা এখন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন, তাঁদের একটি অংশ জামায়াতে ইসলামীর এই বয়ান নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করছেন। এ কারণে তাঁরা ১৯৭২ সালের সংবিধান বাতিলের দাবি তুলেছেন। রাজনৈতিক দৃশ্যপটে পথবিচ্যুত এই দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবন ধ্বংস করা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এমন আরও কিছু কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। এসব হামলা বন্ধের জন্য ইউনুস অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তবে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে দৃঢ়তার ঘাটতি ছিল। ফলে আমাদের ইতিহাসকে নতুন করে লেখার স্বপ্ন দেখা গোষ্ঠীগুলোকে থামানো যায়নি।

আওয়ামী লীগের সদস্য, এমনকি তাঁদের সন্দেহভাজন সহযোগীদের ওপর হামলার জন্য জড়ো হওয়া উচ্ছৃঙ্খল জনতা এখন পর্যন্ত দায়মুক্তি পেয়ে আসছে। এটি লুটতরাজে আগ্রহী দুষ্কৃতকারীদের বৃহত্তর একটি গোষ্ঠীকে ছাড়পত্র দিয়েছে, যারা বিগত সরকারের সহযোগী তকমা দিয়ে যে কারও বাড়িতে হামলা চালাতে পারে। উচ্ছৃঙ্খল জনতার সহিংসতার বিরুদ্ধে সরকারের এই অক্ষমতা তথাকথিত নীতিপুলিশের ভূমিকা একটি গোষ্ঠীকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই গোষ্ঠী মনে করে, নতুন ব্যবস্থা তাদের অসহিষ্ণু বহুত্ববাদবিরোধী বিশ্বাস বাস্তবায়নের জন্য আরও বেশি অনুকূলে। এসব গোষ্ঠী তাদের মূল্যবোধ শুধু নারীদের ওপরই নয়, অন্যান্য দুর্বল সম্প্রদায়ের ওপরও চাপিয়ে দিতে চায়।

বাংলাদেশ ও দেশের বাইরের কিছু বিশ্লেষক যুক্তি দিয়েছেন, ১৯৪৭ বনাম ১৯৭১ নিয়ে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক যে অসীমায়িত দ্বন্দ্ব ছিল, তা এখনো মিটে যায়নি, যদিও আঞ্চলিক পটভূমিতে উল্লেখ করার মতো প্রাসঙ্গিক কিছু পরিবর্তন এসেছে। যারা শুধু মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব নিয়ে অস্বস্তিতে ছিলেন না; বরং বাংলাদেশের জন্মেরই বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরাই এই বিতর্কটিকে

দিয়েছেন, যা খোলাখুলিভাবে মোকাবিলা করা হয়নি। আর তাই এটি কখনো সমাধান হয়নি। বাংলাদেশের মানুষ যে অসংখ্য সমস্যার মুখে রয়েছে, তা জরুরি ভিত্তিতে সমাধানের ক্ষেত্রে এর বাস্তবিক প্রাসঙ্গিকতা হয়তো তেমন নেই। তবে আমরা আমাদের আন্ত-আঞ্চলিক সম্পর্ককে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করব; সে ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

১৯৭১ সালের ঘটনাবলির আলোচনা এমন কিছু রাজনৈতিক শক্তিকে সামনে নিয়ে এসেছে, যারা ভারতবিরোধী মনোভাব পোষণ করে। মনে করা হয়, হাসিনা-পরবর্তী বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতের একতরফা দৃষ্টিভঙ্গি সেই বিষয়কে আরও জোরালো করেছে। ভারতের প্রতি এই মনোভাবকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আরও উসকে দিচ্ছেন কিছু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ইনফ্লুয়েন্সার। এঁদের কেউ কেউ দেশের বাইরে থেকে কাজ করছেন। ‘ভারতপন্থী’ বলে আখ্যা দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা চালাতে তাঁরা তাঁদের অগুনতি ফেসবুক অনুসারীদের উৎসাহিত করেছেন, যদিও সেই আখ্যা একেবারে ভিত্তিহীন।

১৯৭১ বিরোধী এই বয়ানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন টেলিভিশনের টকশো অনুষ্ঠান, ছাপা পত্রিকা এবং কিছু জনপরিসরে প্রতিরোধ চলছে। তবে জোরালোভাবে প্রকাশ্যে কথা বলার ক্ষেত্রে তথাকথিত উদারপন্থী বা ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী পিছিয়ে আছে, যেমনটা আওয়ামী লীগের শাসনামলেও দেখা গিয়েছিল। বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার ও জনরোষের শিকার হওয়ার আশঙ্কায় উদারপন্থীদের মধ্যে এমন দ্বিধা তৈরি হয়েছে।

ভারত থেকে, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এবং দেশটির কিছু সাবেক কূটনীতিক ইউনুস সরকারের প্রতি যে স্পষ্ট বৈরিতা দেখিয়েছেন, তাতে বাংলাদেশের মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের একটি ঝোঁক তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি ও নাগরিক সমাজ—উভয় পর্যায়েই এমন প্রবণতা দেখা গেছে। ১৯৭৫ সাল-পরবর্তী সরকারগুলোর মধ্যেও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। দৃশ্যত বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্যবাদী প্রভাব ঠেকাতে পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে এমনটা করা হয়েছিল। তখন দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান ছিল ভারতের বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন-সমর্থিত একটি কৌশলগত শক্তি।

একবিংশ শতাব্দীর ধারাবাহিকতায় এসে সেই পুরোনো রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে গেছে। **বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কিছু রাজনৈতিক শক্তি ভারতের প্রভাব ঠেকাতে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক করার যে রঙিন যুক্তি দেখাচ্ছে, তা অর্থহীন। গত দুই দশকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার ক্ষমতার ভারসাম্য পুরোপুরি পাণ্টে গেছে।** বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ (ক্রয়ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে হিসাব) ভারত এখন বিশ্বমঞ্চে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক এখন ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে। আর চীন ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য সহযোগী। বিপরীতে পাকিস্তানের অর্থনীতি এখন একপ্রকার ‘লাইফ সাপোর্টে’। কারাবন্দী ইমরান খানের দলের গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেটকে বানচাল করতে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন জোট এবং তাদের সামরিক সমর্থকদের চলমান পদক্ষেপে দেশটির শাসনব্যবস্থা অস্থিতিশীল অবস্থায় আছে।

এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের সীমান্তের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার মতো সক্ষমতা পাকিস্তান তেমন একটা দেখায় না। প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রম হলেও সেখানেও পাকিস্তানের চেষ্টা অনেকাংশেই অকার্যকর থেকে গেছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়নের সূচকগুলোতে পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে আছে। কৌশলগত বা অর্থনৈতিক যেভাবেই হোক, বিদ্যমান আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে পাকিস্তান আমাদের জন্য তেমন কিছুই করতে পারবে না।

ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পরস্পরসাপেক্ষ হওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং তা দ্বিপাক্ষীয় এবং স্বতন্ত্র রাখা উচিত। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে বিবেচনা না করে পারত না। আর সে কারণে তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। নতুন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ চাইলে অর্থনৈতিক আদান-প্রদান ও মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে।

ভারতকে বুঝতে হবে যে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নয়ন ভারতের প্রতি উসকানিমূলক কোনো পদক্ষেপ নয়। তবে একটি বিষয় অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে এবং এটিকে ভারতের ঠাঁকে দেওয়া লাল রেখা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে; তা হলো, পাকিস্তানি সংস্থাগুলো যেন বাংলাদেশ ভূখণ্ড ব্যবহার করে আমাদের প্রতিবেশী দেশে আন্তর্জাতিক জঙ্গি তৎপরতায় সহযোগিতার কাজটি আবারও শুরু করতে না পারে।

একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার পথরেখা (দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব)

প্রথম আলো

২৩ এপ্রিল ২০২৫

একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার পথরেখা

অধ্যাপক রেহমান সোবহান

বাংলাদেশে সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস নিয়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বহু নতুন প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছে। রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনীতির প্রশ্নগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের মতো মোকাবিলা করছে। সেই প্রেক্ষাপটে সংস্কার, নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপথ নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান। দুই পর্বের লেখাটির শেষ পর্ব আজ প্রকাশিত হলো।

আন্দোলনের রাজনীতি থেকে দল গঠন

১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পরে ২০০৯ সাল পর্যন্ত অবাধ, নিরপেক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আওয়ামী লীগ দুবার এবং বিএনপি দুবার সরকার গঠন করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ দুই দল তাদের ক্ষমতার মেয়াদে গণতান্ত্রিক চর্চার উন্নয়নে লক্ষণীয়ভাবে কোনো কাজ করেনি; বরং তারা নিজেদের ক্ষমতাকে সংহত করা এবং বিজয়ীর জন্যই সব—এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি চিরস্থায়ী করার জন্য ব্যস্ত ছিল।

দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিএনপি দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে বিএনপির সরকার গঠন করার মতো সম্ভাবনাও অনেকে দেখছেন। সাধারণভাবে জনগণের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ যে তারা উন্নততর গণতন্ত্রের চর্চাকারী হিসেবে ফিরে আসবে কি না।

গণ-অভ্যুত্থানের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র, সরকার ও গণতন্ত্রচর্চা নিয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতাদের অনেক বক্তব্য মানুষের মধ্যে সমাদৃত হয়েছিল। মাঠপর্যায়ে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতির ফলে ক্ষমতার যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, সে জায়গা দখল করেছেন বিএনপি

কর্মীরা। এই শূন্যতার সুযোগ নিয়ে বিএনপির কর্মীদের অনেকে দখলদারি ও চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়েছেন। যার ফলে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে যে পুরোনো অভ্যাসের মৃত্যু সহজে হয় না।

এ ধরনের অভিযোগে অনেককে বহিষ্কার করা সত্ত্বেও এর দৌরাণ্য কমানো যায়নি। স্থানীয় পর্যায়ের মানুষদের মধ্যে এ নিয়ে অসন্তোষ আছে। সাধারণ মানুষের এই অসন্তোষ বিএনপিকে আমলে নিতে হবে।

পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে যেসব শক্তি এক্যাবদ্ধ হয়েছিল, তারা একটি নিজস্ব রাজনৈতিক ধারণা সামনে এনেছে। সেখানে তরুণ প্রজন্ম নিজেদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে শুরু করেছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিজেদের অগ্রণী ভূমিকার জন্য ছাত্রা শ্রদ্ধা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন, বিশেষ করে তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে। পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা যাতে স্থায়ীভাবে গেড়ে বসতে না পারে, সে জন্য তাঁরা যৌক্তিকভাবেই সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন। একটি নতুন, আরও ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা নিশ্চিত করতে তাঁরা সত্যিকারের সংস্কার বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছেন।

অধ্যাপক ইউনুস যে সংস্কারপ্রক্রিয়া শুরু করেছেন, ছাত্রা সেটিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে এই সংস্কারপ্রক্রিয়াকে তাঁরা এগিয়ে নিতে চান। এ লক্ষ্যে ছাত্রদের একটি অংশ জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছে। এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

চার দশক ধরে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দ্বিদলীয় আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে একটি তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন ছিল। এই দ্বিদলীয় আধিপত্য জাতীয় রাজনীতিতে একধরনের ‘গোত্রীয় বিভাজন’ তৈরি করেছে।

অধ্যাপক ইউনুস ২০০৭ সালে এমন একটি তৃতীয় শক্তি গঠনের চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু অনুপযুক্ত সময় ও কৌশলের অভাবে সেটি আগে বাড়েনি। তবে শুরুতেই ওই প্রচেষ্টা মাঠে মারা গেলেও দুই দলের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে একটি রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজনীয়তাকে তা বাতিল করে দেয় না।

জামায়াতে ইসলামী অবশ্য এ ধরনের আরেকটি রাজনৈতিক শক্তি; কিন্তু দলটির রাজনীতি এখন পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শিক গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে, গোটা জনগোষ্ঠীকে ঘিরে নয়। বর্তমানে দলটি হয়তো আরও বৃহৎ পরিসরে ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর আশা করছে এবং আগামী জাতীয় নির্বাচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে ওঠার অঙ্গীকার করছে।

আমাদের পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতির সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এনসিপির উত্থানের মধ্যে রয়েছে অভিনবত্বের আকর্ষণ এবং অতীতে শাসনকার্যে জড়িত থাকার কোনো দায় বহন না

করার সুবিধা। এই পুঁজি কাজে লাগাতে হলে এনসিপির উচিত হবে ইতিহাস নিয়ে পুরোনো বিতর্কে জড়ানোর পরিবর্তে নিজেদের ভবিষ্যতের দল হিসেবে উপস্থাপন করা।

এ পর্যন্ত কিছু ছাত্রনেতা সংবিধান পুনর্লিখন এবং দ্বিতীয় রিপাবলিক ঘোষণা নিয়ে অনেক বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন। বাংলাদেশের সংবিধানের মূল ভিত্তি—চার মৌলিক নীতিকে প্রতিস্থাপনের বিষয়ে দলটির পাঁচ দফা ঘোষণাটি যখন প্রকাশিত হচ্ছে, তখন এটিকে মূলত শব্দগত একটি খেলা বলে মনে হচ্ছে।

এটি এমন কিছুই বলছে না, যা ইতিমধ্যে থাকা মূল সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলোতে নেই। যেমন ‘বহুত্ববাদ’ গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তর্নিহিত ধারণা। ‘সাম্য’ ও ‘সামাজিক ন্যায়বিচার’ সমাজতন্ত্রের ধারণার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাংবিধানিক দ্বন্দ্বিকতায় জড়িত হওয়ার এই উদ্যোগ জাতীয় লক্ষ্যকে পরিচালিত করা মৌলিক মূল্যবোধগুলোকে পুনর্নির্ধারণ করার চেয়ে ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা বেশি পরিচালিত বলে মনে হয়।

ইতিহাস নিয়ে এভাবে বিতর্কে ছাত্ররা জড়িয়ে পড়ার কারণে বৈষম্যবিহীন একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সমাজ গঠনের আকাঙ্ক্ষা কীভাবে তৈরি করা যায়, সেটি তাদের পক্ষে স্পষ্ট করে বলার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে।

এই অতীতমুখিতা ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে নিজেদের প্রাথমিক দায়িত্ব থেকেও তাঁদের বিচ্যুত করেছে। সেটি হলো, বাংলাদেশের বিধবস্ত আর্থসামাজিক পরিবেশে স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে অধ্যাপক ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে সহায়তা করা। তারা ছাত্রসংগঠনগুলোকে সংগঠিত করে দুর্বল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারত। তারা দুর্বল গোষ্ঠীর সমস্যার প্রতি মনোযোগ দিয়ে বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করার সক্রিয় অঙ্গীকার প্রদর্শন করতে পারত এবং এ ধরনের গোষ্ঠীগুলোকে নিপীড়ন ও শোষণের হাত থেকে রক্ষায় আরও সক্রিয় হতে পারত।

শিক্ষার্থীদের এ ধরনের উদ্যোগ কেবল কথার মাধ্যমে নয়; বরং কাজের মাধ্যমে পরিবর্তনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি নতুন শক্তি হিসেবে দৃশ্যমানতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা দুটিই দিত। নাগরিক সুশাসনে এ ধরনের আরও কার্যকর ভূমিকা তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয়কে আরও স্পষ্ট করতে সহায়তা করত এবং ছাত্রদের গণ্ডির বাইরেও সমর্থন বৃদ্ধি করত।

রাজনীতির চিরন্তন শিক্ষা হলো সঠিক সময়ে সঠিক লড়াই করা। গত সাত মাসে ভবিষ্যতের জন্য একটি পরিষ্কার দর্শন আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হওয়ায় ছাত্র আন্দোলনের দীপ্তি কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে।

জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এনসিপির সক্ষমতা কমছে। কারণ, ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন অংশ তাঁদের অনুসরণ করে এখনো

এনসিপিতে যোগ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত। মনে রাখা দরকার, অভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার দিক থেকে শিক্ষার্থীদের সবাই একই শ্রেণির নয়; তাঁদের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হলো পড়াশোনা করা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং চাকরির বাজারে প্রবেশ করা। এর ফলে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা একটি ক্ষণস্থায়ী অঙ্গীকার হিসেবেই থেকে যাচ্ছে।

ছাত্রদের মধ্যে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে এবং নিজেদের প্রভাব আরও বিস্তৃত করতে এনসিপিকে জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের শক্তিকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। এটি করতে নিজেদের রাজনৈতিক স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং জনগণের সামনে একটি নতুন কর্মসূচি তুলে ধরার অঙ্গীকার করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এনসিপি ইতিমধ্যেই অপ্রয়োজনীয়ভাবে সেই ইতিহাসকেন্দ্রিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে, যে বিতর্ক আরও কার্যকর দ্বিদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাবকে অতীতে থামকে দিয়েছিল।

এনসিপি দ্রুত নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা (খুব বেশি নয়) এবং ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাবের মতো বিষয়গুলোতে রাজনৈতিকভাবে ইতিমধ্যে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেছে। এ বিষয়ে দলটির অবস্থান জামায়াতে ইসলামীর কাছাকাছি। এ সময়ে এ ধরনের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এনসিপি ও জামায়াতে ইসলামীকে বিএনপির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

বিএনপি প্রতিনিয়ত দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছে, যে নির্বাচনে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে তারা স্বচ্ছন্দে জয়লাভের আশা করছে। বিপরীতে এনসিপির নিজেদের দল গোছানোর জন্য আরও সময় প্রয়োজন। তাই তারা যুক্তি দিচ্ছে, নির্বাচনের আগে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন উচিত। জামায়াতে ইসলামী এই অবস্থানকে সমর্থন করে; কিন্তু বিএনপি এই অবস্থানের ঘোরতর বিরোধী। দলটি এই অবস্থানকে নির্বাচন বিলম্বিত করার কৌশল হিসেবে দেখছে।

নির্বাচন যখনই আয়োজন করা হোক, তার প্রস্তুতির জন্য এনসিপি যখন অগ্রসর হচ্ছে, তখন দলটি বাংলাদেশের রাজনীতির এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে, দুঃখজনকভাবে কোনো সংস্কার কমিশন যা এখনো সমাধান করেনি। নির্বাচনে লড়তে তাদের প্রয়োজন বড় অঙ্কের তহবিল। নিজেদের জন্য স্বচ্ছ তহবিল গঠন করে তারা অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য অনুসরণীয় একটি দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারে।

সংস্কার বনাম নির্বাচন

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস নিজে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার শক্ত সমর্থক। তবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তাঁর সবচেয়ে বাস্তব অঙ্গীকার। কারণ, এটিই তাঁর সবচেয়ে বাস্তবায়নযোগ্য লক্ষ্য। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে নির্বাচন হতে পারে। এই লক্ষ্য এখনো সুনির্দিষ্টভাবে চূড়ান্ত হয়নি এবং দেশকে নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্পষ্টভাবে একটি

পথরেখা তৈরি করা হয়নি। তবে সামনে এমন কিছু জটিলতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ তৈরি কঠিন করে তুলতে পারে।

অধ্যাপক ইউনুস যুক্তিসংগতভাবে বলছেন, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাজনৈতিক অপশাসনের অবস্থা যদি স্থায়ী হয়, তবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করেও খুব একটা লাভ হবে না। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে বিএনপির দেওয়া প্রতিশ্রুতির বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতি আস্থাহীনতার বিষয়টিই উঠে এসেছে যে তারা কাঠামোগত সংস্কারের প্রতি আদৌ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কি না।

অধ্যাপক ইউনুস ও শিক্ষার্থীরা প্রকৃত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার চান, যা সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে পারে। এই লক্ষ্যে অধ্যাপক ইউনুস সংবিধান, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, পুলিশ, দুর্নীতি দমন, নির্বাচন কমিশন, গণমাধ্যম, নারী, স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য খাত বিষয়ে কমিশন গঠন এবং অর্থনীতি বিষয়ে শ্বেতপত্র তৈরির জন্য টাস্কফোর্স গঠন করে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সুপারিশ তুলে ধরতে খ্যাতিমান ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের যুক্ত করেছেন।

এসব কমিশন থেকে অনেক প্রশংসনীয় সংস্কার প্রস্তাব এসেছে। বিস্ময়ের বিষয় হলো, এসব কমিশনে শিক্ষার্থী বা তরুণ প্রতিনিধিত্ব খুবই কম ছিল। নারী ও ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘু প্রতিনিধিও প্রায় ছিলেন না বললেই চলে।

সংস্কারের পরিকল্পনা কাগজে-কলমে লেখা এক জিনিস আর সংস্কারের ওপর রাজনৈতিক ঐকমত্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি সেগুলো কার্যকর করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। অধ্যাপক ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার ‘ঐকমত্য কমিশন’ নামে একটি কমিশন গঠন করেছে।

এতে ছয়টি সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যানরা আছেন; আর এটি পরিচালনা করছেন ঐকমত্য কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান, যিনি সংবিধান সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত সংস্কার এজেন্ডা তৈরি করেছেন। এরপর এই সংস্কার এজেন্ডা রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

সংস্কারের এই প্রক্রিয়ার পথটি কিছুটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কারণ, এতে অধ্যাপক ইউনুস বা তাঁর অন্তর্বর্তী সরকারকে ঐকমত্য গঠনের রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ বা নির্দেশনা দিতে যুক্ত করা হয়নি। ফলে সংস্কার এজেন্ডাটি যে অধ্যাপক ইউনুস বা তাঁর সরকারের, তা স্পষ্ট হয় না। এটি ছয়টি আলাদা বিশেষজ্ঞ গ্রুপের বিভিন্ন মতামতের ফল, সংস্কারের জন্য যাঁরা নিজেরাও পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সুনির্দিষ্ট ঐক্য গড়ে তোলার কোনো দায়িত্ব ছিলেন না। অধ্যাপক ইউনুস এখন ঐকমত্য কমিশনকে সংস্কারের বিষয়ে বিভিন্ন রাজনীতিবিদের মধ্যে ঐকমত্য তৈরির রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দায়িত্ব দিয়েছেন। এসব

দলের নির্বাচনী সমর্থন ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যাপক বৈপরীত্য রয়েছে।

একমত্য কমিশনের প্রাথমিক কর্মপদ্ধতি অনুসারে একটি স্প্রেডশিট (ছক) তৈরি করা হয়েছে, যেখানে তাদের প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচির সারসংক্ষেপ ১৬৭টি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি দল কুইজের আদলে উত্তর দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রশ্নকাঠামোয় তিনটি সম্ভাব্য বিকল্পের মধ্যে একটিতে ‘টিক’ চিহ্নের মাধ্যমে উত্তর দিতে হবে: ‘একমত্য’, ‘দ্বিমত্য’ অথবা ‘আংশিকভাবে দ্বিমত্য’; আর ছিল মন্তব্য লেখার একটি ঘর।

প্রতিটি সংস্কার প্রস্তাবে নিজেদের পছন্দ উল্লেখ করার পাশাপাশি সংস্কার বাস্তবায়ন অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাহী আদেশে, নির্বাচিত গণপরিষদের মাধ্যমে, নাকি নির্বাচিত সংসদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে; সে বিষয়েও রাজনৈতিক দলগুলো তাদের পছন্দের পদ্ধতিটি ‘টিক’ চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সরকার পরিচালনার এই জটিল চ্যালেঞ্জগুলো স্প্রেডশিটে সারসংক্ষেপ আকারে বর্ণিত হয়েছে। যাঁরা এ ধরনের মার্কিন-পদ্ধতির পরীক্ষার আয়োজন করেছেন, তাঁরা জানেন, প্রতিটি প্রশ্নে থাকা অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতা ও জটিলতা যথাযথভাবে তুলে ধরতে এই প্রক্রিয়া সক্ষম না-ও হতে পারে।

বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিসহ বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল এই প্রশ্নোত্তর-কাঠামোয় তাদের উত্তর জমা দিয়েছে। নগণ্য ভোট পাওয়া অনেক দল এবং দেশব্যাপী ব্যাপক ভোট থাকা কয়েকটি দলের দেওয়া উত্তর একমত্য কমিশন কীভাবে মূল্যায়ন করবে এবং কীভাবে গুরুত্ব নির্ধারণ করবে—তা স্পষ্ট নয়। অন্তর্বর্তী সরকার কমিশনের একমত্য গঠনের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হবে, সে বিষয়টিও স্পষ্ট নয়। কারণ, অধ্যাপক ইউনুস ও অন্তর্বর্তী সরকারই বর্তমানে একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা। যাদের এসব প্রশ্নের মূল্যায়ন ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে সংস্কার বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

অধ্যাপক ইউনুস সরকারের সংস্কার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের এমন একটি অনির্ধারিত বাস্তবতায় সংস্কার বনাম নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক কিছুটা তাত্ত্বিক। এটি মূলত প্রতিদ্বন্দ্বী ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক কৌশল থেকে এসেছে, নীতিগত পার্থক্য থেকে নয়। কিছু সংস্কারকে ‘সহজ সংস্কারের’ শ্রেণিতে রাখা হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকার যেগুলোকে তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নের জন্য বেছে নিতে পারে। তবে সত্যিকার অর্থে এসব সংস্কার কার্যকর করার প্রক্রিয়ায়ও সূক্ষ্ম পেতে সময় লাগবে। তাই সংস্কারগুলোর বাস্তবায়ন মূলত আসন্ন নির্বাচনে যে দল বা জোট বিজয়ী হবে, তাদের অঙ্গীকার ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে।

বড় সমস্যা, যা সবাই এড়িয়ে যাচ্ছে

চলমান রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে বড় সমস্যা আওয়ামী লীগ। এনসিপি চায় দলটি নিষিদ্ধ হোক। বিপরীতে এ বিষয়ে বিএনপির অস্পষ্ট যুক্তি এই যে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে জনগণ বা আদালত, এর ফলাফল যা-ই হোক। এ ইস্যুতে বিএনপি এখন

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত আছে। বিএনপি প্রকৃতপক্ষে এ দাবি করতে চাইবে যে তারা একটি অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে লড়েছে, যেখানে সব পক্ষ, বিশেষ করে আওয়ামী লীগকে স্পষ্টভাবে হারিয়েছে। বিএনপি মনে করে, নিষিদ্ধঘোষিত হলে আওয়ামী লীগ রাজপথে আন্দোলনের একটি স্থায়ী উৎস হয়ে থাকবে এবং দলটি বিজয়ী বিএনপি সরকারকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আরও ভালো অবস্থানে থাকবে; নির্বাচনে হারলে যা তারা পারবে না। তবে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আনা অনিশ্চিত। কেননা, দলটির প্রধান শেখ হাসিনা নির্বাসিত, শীর্ষস্থানীয় অন্য নেতা-কর্মীদের বড় অংশই হয় আত্মগোপনে, নয়তো কারাগারে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) একটি গ্রহণযোগ্য বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেখ হাসিনা ছাড়াও আওয়ামী লীগের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নেতাদের কতটা দোষী সাব্যস্ত করতে ও সাজা দিতে সক্ষম হবে, সেটি এখনো দেখার বিষয়। বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির জন্য আওয়ামী লীগের এ নেতাদের অনেককেই, তিনি মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য যা-ই হন, জবাবদিহি করানোর আশাও করা যেতে পারে। এটি বিচারিক প্রক্রিয়া করা প্রয়োজন, যে প্রক্রিয়া তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন কি না, সে যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে পারে।

বাংলাদেশে আইনের শাসন মেনে কারাপ্রকোষ্ঠ ও রিমান্ড থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়া ও সাজা দেওয়া এক সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। তাই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সক্ষমতার বিষয়টি এখনো একটি ধোঁয়াশার ক্ষেত্র হিসেবে রয়ে গেছে। যদি এ ধরনের সমস্যা সময়মতো সমাধান করা হয় এবং নিজেদের মনোনীত প্রার্থীদের রাস্তায় প্রচার চালানো এবং মিছিল ও সমাবেশ করার অধিকার দিয়ে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তা নির্বাচনী প্রচারে অত্যন্ত কলহপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

এনসিপি ও তার মিত্রদের চাপের মুখে অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ বা নির্বাচন থেকে দূরে রাখার পদক্ষেপ নিলে তা আইনগত ও রাজনৈতিকভাবে দেশের জন্য সমস্যা হতে পারে। আন্তর্জাতিকভাবেও এটি সমর্থন পাবে না, বিশেষ করে জাতিসংঘ থেকে। জাতিসংঘ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন করার আহ্বান জানিয়েছে। ভারত বিশেষ করে এটিকে একটি দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যু বানাতে পারে। মনে রাখা দরকার, ২০১৪ ও ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির মতো প্রধান দল অংশ না নেওয়া এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের গ্রহণযোগ্যতা দেশের ভেতরে ও বাইরে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। এক দশক ধরে আওয়ামী লীগ সরকার এ চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়েই গেছে। একইভাবে যত নিন্দিতই হোক না কেন, আওয়ামীলীগের মতো একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলকে আগামী নির্বাচন থেকে বাদ রাখা হলে সামনের নির্বাচনকেও নিরুপদ্রব রাখা কঠিন হবে।

অধ্যাপক ইউনুস সম্প্রতি বলেছেন, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন হবে সবচেয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ। এ প্রসঙ্গে আমরা মনে রাখতে পারি, ১৯৯১ সালে সাহাবুদ্দীন আহমদের

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, আমি নিজেও যে সরকারের সদস্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, তেমন একটি নির্বাচন করে দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছিল। সাহাবুদ্দীন আহমদের অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে পতিত সামরিক স্বৈরাচার এরশাদের জাতীয় পার্টি অংশ নিয়ে সংসদে ৩৫টি আসন লাভ করে। এরশাদ জেলে থেকেও নিজে জিতেছিলেন পাঁচটি আসনে।

২০২৫ সালের ডিসেম্বরেই হোক বা ২০২৬ সালের জুনে, জাতীয় নির্বাচনের পথ মসৃণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। যখন নির্বাচনী প্রচার রাস্তায় গড়াবে, তখনই আমরা বুঝতে পারব—অধিকতর শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের একমত তৈরির প্রচেষ্টা কতটা কার্যকর হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের দেওয়া অনুকূল পরিবেশে নিজেদের আরও প্রকাশ্যে তুলে ধরতে ধর্মীয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর তৎপরতা ক্রমে বেশি দৃশ্যমান হচ্ছে। এটি ইতিমধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃশ্যপটে দেখা যাচ্ছে। উন্মুক্ত পরিবেশে এটি নারীদের অনিরাপত্তার বোধ ক্রমেই বাড়িয়ে তুলেছে এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্যও ঝুঁকি বাড়িয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে কটরপন্থী গোষ্ঠী ও প্রবাসী ইনফ্লুয়েন্সারদের সহিংসতার হুমকি এই ইঙ্গিত দেয় যে কোনো নির্দিষ্ট ঘরানার রাজনীতি বা অস্বস্তিকর মতপ্রকাশের কণ্ঠস্বর আর মেনে নেওয়া হবে না। যদি মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনেও গণতান্ত্রিক চর্চার ক্ষেত্রে সহিংসতামূলক এমন কর্মকাণ্ড একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে থেকে যায়, তবে জনমতের ভিত্তিতে সংস্কার হওয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থান অধরাই থেকে যাবে।

দ্রুত বিকাশমান রাজনৈতিক পরিবেশে অন্তর্বর্তী সরকার হয়তো মনে করতে পারে, অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঠেকানো ও নিজেদের মেয়াদে কিছু দৃশ্যমান উন্নতি করাই তাদের জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে কিছু অগ্রগতি হলেও সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাতে উচ্চ শুল্ক আরোপ বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অব্যাহত উদ্বেগের বিষয় হয়ে আছে। অন্তর্বর্তী সরকার অর্থনীতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলে তার গ্রহণযোগ্যতা ও কর্তৃত্ব খর্ব হতে পারে। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে উত্তরণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নির্বাচিত সরকারের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এ গ্রহণযোগ্যতা ও কর্তৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সৌভাগ্যবশত পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে—সেই আশা বাদ দেওয়ার মতো নয়। বাংলাদেশ আজ মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি সর্বজন-সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, যাঁর সততা প্রশংসিত। সীমান্তের ওপার থেকে তাঁকে ক্ষমতালোভী, অসহিষ্ণু ও কটরপন্থী হিসেবে চিত্রিত করার যে চেষ্টা চলছে, তাতে বিশ্বাসযোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য পক্ষপাতমূলক বলে মনে হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে তাঁর উপস্থিতি দেশকে এক বিরল মুহূর্ত এনে দিয়েছে, যেখানে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা ও নীতিগত সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হচ্ছে মূলত

ব্যক্তিস্বার্থে নয়; বরং সবার ভালোর জন্য। এসব সিদ্ধান্তের কোনো কোনোটিতে বিচক্ষণতার ঘাটতি থাকতে পারে, শাসনব্যবস্থা পরিচালনার কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু এই সরকারের অঙ্গীকার এখনো আন্তরিক। যদি এ ধরনের শাসনব্যবস্থা বাস্তবসম্মত পরিবর্তনের পথ দেখাতে না পারে, তবে বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবে হতাশা ও অসন্তোষের আরেক যুগের মুখোমুখি হতে পারে।

প্রথম আলো

২৪ এপ্রিল ২০২৫

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হলে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়বে বলে আশা করা যায়

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মাননীয় ফেলো। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ২৫ বছর শিক্ষকতা করেছেন। গবেষণাকর্মের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টির মর্যাদাপূর্ণ ইব্রাহিম শ্মৃতি স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। মূল্যস্ফীতির সাম্প্রতিক চিত্র, ঘাটতি বাজেট মেটাতে ও আসন্ন বাজেট প্রণয়নের আগে সরকারের করণীয়, চলমান পরিস্থিতিতে আর্থিক ও ব্যাংক খাতের পুনরুদ্ধারসহ নানা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন বণিক বার্তায়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাবরিনা স্বর্ণা

সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে আগামী অর্থবছরের জন্য মূল্যস্ফীতির একটা লক্ষ্যমাত্রার কথা বলা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হারের লক্ষ্যমাত্রা ছিল সাড়ে ৬ শতাংশ, যা এখনো পূরণ হয়নি। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে মূল্যস্ফীতির সামগ্রিক চিত্রটা কীভাবে দেখছেন?

এ চড়া মূল্যস্ফীতির হার বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বৈশ্বিক বাজারে খাদ্যদ্রব্যের দাম অনেক বেড়ে যায়, যার অভিঘাত আমাদের অর্থনীতিতেও পড়ে। এ জের এখনো টানতে হচ্ছে। যদিও অনেক দেশ দ্রুতই এ বাড়তি মূল্যস্ফীতির রাশ টানতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু আমাদের দুই সংখ্যার উচ্চ মূল্যস্ফীতি এখনো অব্যাহত আছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকার চলতি অর্থবছর যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা এখনো সেভাবে কাজে আসেনি। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতির পরিবর্তন তথা অনেক পণ্যের শুল্ক প্রত্যাহার করা বা কমানো হয়েছে, বাজার ব্যবস্থাপনায় বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তার পরও আশানুরূপভাবে মূল্যস্ফীতি কমেনি।

যদিও বর্তমানে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে। তবে মূল্যস্তর এখনো অনেক ওপরে আছে। জুনের মধ্যে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে ৬ বা সাড়ে ৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে পারলেও মূল্যস্তর অনেক বেশিই থাকবে। কারণ মজুরি বৃদ্ধির হার থেকে মূল্যস্ফীতির হার বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অবনমন ঘটেছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। তবে স্বস্তির বিষয় হলো, আমাদের রিজার্ভের পরিমাণ ধীরে ধীরে হলেও বাড়ছে। এর দুটি ইতিবাচক দিক আছে। এক, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল পর্যায়ে থাকায় আমদানীকৃত পণ্যের মূল্যস্ফীতির যে প্রবণতা ছিল তা এখন আর নেই; দুই, পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে লেটার অব ক্রেডিট (এলসি) খোলা-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতাগুলো আর নেই বললেই চলে। ফলে পণ্যের সরবরাহ বেড়েছে। কিন্তু খাদ্যের জোগানের বড় অংশই আসে আমাদের নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে, যার জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ। কিন্তু আমাদের বিনিয়োগ এখনো স্তিমিত অবস্থায় আছে। বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে মূল্যস্ফীতি হয়তো কিছুটা কমে আসবে, কিন্তু ভোক্তার স্বস্তি ফিরতে আরো সময় লাগবে বলে মনে হয়। কারণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেসব অনুঘটক পণ্য আছে, সেগুলোর দাম কমছে না। আবার গ্যাস, বিদ্যুৎ প্রভৃতির দাম পুনর্মূল্যায়ন হওয়ায় উৎপাদন খরচ বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কাক্ষিত ফলাফল পাওয়ার জন্য বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, ভোক্তার আয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি—এ চারের মধ্যে সংশ্লেষ প্রয়োজন।

মার্কিন কৃষি বিভাগের সাম্প্রতিক এক প্রাক্কলন মতে, বাংলাদেশের শেষ দুটি বন্যা ও সামগ্রিক পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশকে প্রায় চলতি অর্ধবছরে ৮০ লাখ টনের বেশি চাল ও গম আমদানির প্রয়োজন পড়বে। যদিও এখন পর্যন্ত আমদানি সেভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আমদানির পরিমাণ না বাড়লে মূল্যস্ফীতির ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়বে?

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং মার্কিন কৃষি বিভাগের পরিসংখ্যান দেখেছি আমি। সাম্প্রতিক সময়ে সরকার আমদানির পরিমাণ বাড়ালেও তা স্বস্তির পর্যায়ে এখনো যায়নি। আমাদের বর্তমান মজুদ কী পরিমাণ আছে এবং এবারের আমন উৎপাদন কেমন হয়েছে আর সামনে আমাদের সবচেয়ে বড় বোরো মৌসুম আসছে—এসব বিবেচনায় নিয়ে দেখতে হবে যে আমাদের কতটা আমদানির প্রয়োজন রয়েছে। তবে এটা ঠিক আমাদের মজুদ আরো বাড়তে হবে, বিশেষ করে চাল ও গমের মজুদ বাড়তে হবে, যাতে করে এসব পণ্যের দাম বাড়লেও খোলা বাজারে বা ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে বিক্রি করে বাজারের ওপর চাপ কিছুটা কমানো যায়। আর বাজার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে, যাতে বাজার সিন্ডিকেট কোনো কারসাজি না করতে পারে। পাশাপাশি বাজার ও আমদানিকারকদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা বজায় থাকে এবং কেউ যেন কৃত্রিম সংকট তৈরি করে একচেটিয়া মুনাফা অর্জন করতে না পারে তা যথাযথভাবে তদারকি করতে হবে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি নেয়া হয়েছে। যদিও মূল্যস্ফীতির হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমেনি। বরং বেসরকারি খাতে ক্রমে ঋণপ্রবাহ কমেতেও দেখা যাচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে অন্তর্বর্তী সরকার আগামী অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করতে যাচ্ছে। কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন?

স্তিমিত বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহে যে এখন পর্যন্ত চাপ্তা আনা সম্ভব হয়নি, এটিই সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ। বিনিয়োগ না হলে সরবরাহ হবে না, সরবরাহের পরিমাণ না বাড়লে চাহিদা-জোগানের মধ্যে যে পার্থক্য সেটাও আমরা কমাতে পারব না। দেশী বা বিদেশী উভয় ক্ষেত্রেই বিনিয়োগকারীরা অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ইত্যাদি কারণে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। যে কারণে নতুন কোনো বিনিয়োগ হচ্ছে না। ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানির ক্ষেত্রেও আমরা সেটা দেখছি। রফতানি প্রবৃদ্ধি ভালো হয়েছে তবে তা অতিরিক্ত সক্ষমতা ব্যবহার করে। নতুন বিনিয়োগ করে যে গত আট মাসে রফতানি বেড়েছে তা নয়। দ্বিতীয়ত, আমরা মূল্যক্ষীতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছি তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বিনিয়োগের ওপর। এ সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি নেয়ার পেছনেও রয়েছে পুঞ্জীভূত সমস্যা।

প্রায় প্রতিটি ব্যাংকে সীমাহীন খেলাপি ঋণ রয়েছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে ঋণের উচ্চমাত্রার সুদহার নির্ধারণ ব্যতিরেকে উপায় ছিল না। ডিপোজিটর ১০০ টাকা দিলেও ব্যাংক ঋণ দিতে পারছে ৬০-৬৫ টাকা। ফলে ঋণের বাড়তি খরচ বিনিয়োগকারীদের বহন করতে হচ্ছে। আবার গ্যাসের সরবরাহ বাড়ানোর কৌশল হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস অনুসন্ধান ও উত্তোলনকে গুরুত্ব না দিয়ে এলএনজি আমদানিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অদক্ষতা-দুর্নীতির কারণে গ্যাসের দামও ব্যাপক বেড়েছে। দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনকারীদের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে খরচ বাড়ছে। বিনিয়োগ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আগামী বাজেটে এ ধরনের অনিশ্চয়তা কেটে যাবে। কেননা এর মধ্যেই আমরা একটা গণতান্ত্রিক সরকার পাব বলে আশা করছি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হলে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়বে বলে আশা করা যায়। এতে কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। আগেই বলেছি, মূল্যস্তর অনেক বেশি থাকবে আর তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হলে মানুষের আয় বাড়তে হবে। আর তা করতে হলে সম্পদ আহরণ ও তার যথাযথ ব্যবহার এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের ঘাটতি বাজেট বেড়ে যাচ্ছে, যা পূরণে সরকারের ঋণও বাড়ছে। অন্যদিকে মূল্যস্তর কমানোর জন্য শুষ্ক কমানো বা প্রত্যাহার করা হচ্ছে। তাতে রাজস্ব আয়ও প্রভাব পড়ছে। এই ঘাটতি বাজেট, সরকারের ঋণ, রাজস্ব আদায় কমে যাওয়া—সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় কী?

আমাদের কর-জিডিপি অনুপাত ৭ দশমিক ৩ শতাংশ এবং রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ৮ দশমিক ২ শতাংশ। আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা ও অবকাঠামোসহ মৌলিক

খাতগুলোয় প্রয়োজনীয় ব্যয় করতে পারছি না। রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয় আমাদের সমান। উন্নয়ন বাজেটের পুরোটাই আমাদের অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ঋণ নিতে হয়। আমাদের ঘাটতি বাজেট পূরণ করতে হয় ঋণ নিয়ে। বর্তমানে এ ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে একমাত্র উপায় হচ্ছে আয় বাড়ানো, অর্থাৎ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি। আমাদের সমগোত্রীয় সব দেশের তুলনায় আমাদের আয় অনেক কম। পৃথিবীর সব দেশেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ করের হার বাড়তে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে উল্টো চিত্র—পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে পণ্যের দাম বেড়ে যায়। এ পরোক্ষ করের বোঝা সাধারণ মানুষের ওপর পড়ে। আর প্রত্যক্ষ করের হার বেশি হলে এক, রাজস্ব আদায় বাড়ে; দুই, আমাদের যে আয়, ভোগ ও সম্পদের বৈষম্য আছে তা অনেকটা লাঘব হয়। আমাদের এ জুলাই বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি ছিল সামাজিক বৈষম্য। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ প্রয়োজন। তাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) ঢেলে সাজাতে হবে, প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে এটাকে শক্তিশালী করতে হবে। এছাড়া দেশ থেকে যেভাবে টাকা পাচার হয়েছে, আগামীতে সেই প্রবণতা কিছুটা হলেও কমে আসবে বলে আশা রয়েছে। তাই বাজেট প্রণয়নের সময় কীভাবে প্রত্যক্ষ কর বাড়ানো যায়, ই-টিনকে আরো কার্যকর করে কীভাবে কর ফাঁকি দেয়ার পরিমাণ কমিয়ে আনা যায় প্রভৃতি নির্দেশনা থাকতে হবে। তাহলে রাজস্ব আয় থেকে খরচ করেও আমাদের কিছু অতিরিক্ত অর্থ থাকবে যা আমরা উন্নয়ন বাজেটে ব্যয় করতে পারব। এতে ঋণের যে চক্রাকারে পড়ে গেছি, সেখান থেকে কিছুটা হলেও পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

দীর্ঘ সময় ধরে রাজস্ব আয় বা প্রত্যক্ষ কর বাড়ানোর মতো আলোচনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা। কেন বাস্তবায়ন হয় না, সেটি একটি প্রশ্ন। সেই সঙ্গে অর্থনীতিবিদ বা বিশেষজ্ঞ হিসেবে যাদের থেকে এ আলোচনাগুলো বেশি এসেছে, তাদের অনেকেই এখন অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বে আছেন। সে জায়গা থেকে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

এনবিআরকে অগ্রাধিকার না দেয়া বা একই কথা বছরের পর বছর বলা, কিন্তু কোনো কোনো ইতিবাচক ফলাফল না পাওয়া—এগুলোর পেছনে মূলত রাজনৈতিক অর্থনীতির দায় আছে। রাজস্ব আয় বা প্রত্যক্ষ কর বাড়াতে গেলে যাদের হাতে টাকা আছে, তাদের ওপর করারোপ করতে হবে। যারা ঋণখেলাপি হয়ে দেশের টাকা বাইরে নিয়ে গেছে, তাদের কর দেয়ার আগ্রহ নেই। পরোক্ষ কর দিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর কর বসিয়ে দেয়া সহজ। দ্বিতীয়ত, যেসব খাত থেকে ভ্যাট আহরণ হয়, তা পুরো খাতের কেবল ভগ্নাংশ মাত্র। আবার যেটা উঠে আসে তা থেকে সরকার তার চেয়েও কম পায়। এসব ক্ষেত্রে অনিয়মের পথগুলো বন্ধ করতে হবে। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই জিরো টলারেঞ্জের কথা শুনতেছি। যেহেতু এটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি খাত, তাই এখন থেকেই জিরো টলারেঞ্জ নীতি গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। এনবিআরের কর্মকর্তার সঙ্গে গ্রাহকের যোগাযোগের দরকার নেই। ডিজিটালাইজেশন হয়ে গেলে ভ্যাট বা কর পরিশোধ স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে যাবে। গত ২০ বছরে এগুলোর পেছনে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ

কিছুই হয়নি। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ভ্যাটের অটোমেশনের মাত্র ৪৩ শতাংশ কাজ হয়েছে। কিন্তু এ জায়গাগুলোয় আমাদের অনেক ধরনের সুযোগ আছে। বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থের কারণে এটি আগে করা হয়নি। এখন এদিকে নজর দিতে হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০১৫ সালে কর-জিডিপির অনুপাত ছিল ১১ শতাংশ। ২০২০ সালে এ হারকে ১৬ শতাংশে উন্নীত করার কথা ছিল। বর্তমানে এ হার ৮ দশমিক ২ শতাংশ। এ খাতে বিপুল টাকা খরচ করার পর এখন ১১ থেকে ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। কিন্তু এর জন্য কোনো জবাবদিহিতা নেই। এক্ষেত্রে কীভাবে টাকা ব্যয় হলো তার জবাবদিহি নেই। অনেক সময় বাইরে থেকে কোম্পানি নিয়ে আসা হয়েছে এবং তারা কাজ শেষ না করে চলে গেছে। সেখানে আমাদের ব্যবস্থাপনার জন্য টাকা খরচ করতে হচ্ছে।

আমাদের দেশে গত ২০-২৫ বছরে আইটি প্রফেশনালের ক্ষেত্রে বেশ উন্নতি হয়েছে। কভিডের সময় তারা অনেক সার্ভিস অনলাইনে দিয়েছেন। কিন্তু দেশীয় কোনো প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন? না। কারণ আমাদের বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগীরা ডিজিটালাইজেশনের জন্য ২০০-২৫০ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প নিয়ে আসেন এবং সেখানে শর্ত হিসেবে থাকে, ৫০ মিলিয়ন ডলারের কাজের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলে তারা সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তাই আমাদের দেশের যারা আইটি প্রফেশনাল রয়েছেন, তাদের সুযোগ দিতে হবে। এগুলোর জন্য বিভিন্ন স্বার্থবাদী গোষ্ঠী দাঁড়িয়ে গেছে। এক্ষেত্রেও নজর দিতে হবে।

কর ও ভ্যাট ফাঁকির যেসব জায়গা রয়েছে সেগুলো বন্ধ করতে হবে। ভ্যাট আহরণে স্বচ্ছতা আনতে প্রায় তিন লাখ ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ইএফডিএমএস) চালুর কথা ছিল এনবিআরের। এখন সেটি ১০ হাজারও হয়নি। মানুষ ভ্যাট দিচ্ছে কিন্তু সরকার পাচ্ছে না। এখন আমাদের বড় সুযোগ আছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে অব্যাহতভাবে তা আমাদের সামনে ইতিবাচক ফল দেবে।

বিগত সরকারের দীর্ঘ শাসনামলে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি, অনিয়ম ও অর্থ পাচারের মতো ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংক ও আর্থিক খাত। আগামী বাজেটে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি, বিশেষত ব্যাংক খাত পুনরুদ্ধারে কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যায়?

ব্যাংক খাতে ব্যাপক পরিমাণে ঋণ খেলাপি হয়েছে। লুটপাট ও অর্থ পাচার করা হয়েছে। একই কথা শেয়ারবাজারের ক্ষেত্রেও বলা যায়। লুটপাট ও অর্থপাচারের ক্ষেত্রে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাকি ছিল না। সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা—এ আঙ্গিকে বাজেটকে দেখতে হবে। এক বাজেট দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তবে কিছু কিছু সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। যারা কর ফাঁকি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে। তবে ঋণখেলাপির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে তৎপর হতে হবে। অর্থ পাচারের বিষয়ে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিটকে করতে হবে। তবে একটা বাজেট দিয়ে সব কিছু করা যাবে না। বাজেট একটি শক্তিশালী জায়গা, যেখানে একটি সিগন্যাল দিতে পারি।

বাজেটের মাধ্যমে সরকারের ব্যয় হয়। যদি সরকারের এ ব্যয় সাশ্রয়ী ও সুশাসনের সঙ্গে করা যায় এবং সময়মতো প্রকল্পগুলো শেষ করা যায়, তাহলে এ অর্থকে ভালোভাবে কাজে লাগানো যাবে। এ বাজেটে আমরা আশা করছি, অর্থ আহরণ, রাজস্ব ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়—এ তিন দিকেই পরিবর্তন দেখতে পাব। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি পরিবর্তন এসেছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশ অগ্রসর হবে এবং এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাব।

বণিকবার্তা

২৩ এপ্রিল ২০২৫

নির্বাচন দেরি করলে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন প্রতিশ্রুত সময়সীমার মধ্যে না হলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে। সেই সঙ্গে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। টেকসই বিনিয়োগের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। গতকাল রাজধানীর এফডিসিতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত বিদেশি বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আয়োজিত ছায়া সংসদে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সাম্প্রতিক বিনিয়োগ সম্মেলনে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হলেও প্রাপ্ত প্রতিশ্রুতি খুব বেশি নয়। এ সম্মেলনে আগামী ১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে সিঙ্গাপুরের পর্যায়ে উন্নীত করার আশাবাদ প্রকৃতপক্ষে সম্ভব নয়। তবে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ অব্যাহত থাকলে সে সময়ের মধ্যে আমরা থাইল্যান্ডের কাছাকাছি যেতে পারি। তিনি বলেন, বিগত সরকারের আমলে বিনিয়োগ পরিসংখ্যানে অনেক অবাস্তব চিত্র দেওয়া হয়েছিল।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমাদের দেশে বিদেশি বিনিয়োগ ৩৩ বিলিয়ন ডলার আসার কথা উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে এসেছে ১১ বিলিয়ন ডলার। ভিয়েতনামের বর্তমান এফডিআই স্থিতি ৩৬০ বিলিয়ন ডলার হলেও বাংলাদেশে মাত্র ২২ বিলিয়ন ডলার। তিনি আরও বলেন, ভারত-পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের দেশে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উদ্বেগজনক। যুদ্ধ অবস্থায় চলে গেলে ভারতের সামরিক ব্যয় বেড়ে যাবে, ফলে ভারতের সঙ্গে আমাদের শুল্ক সুবিধা ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণের সভাপতিত্বে ‘সাম্প্রতিক বিনিয়োগ সম্মেলন বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে’ শীর্ষক ছায়া সংসদে ঢাকা

কলেজের বিতর্কিকদের পরাজিত করে ইডেন মহিলা কলেজের বিতর্কিকরা বিজয়ী হয়। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন অধ্যাপক আবু মুহাম্মদ রইস, ড. এস এম মোর্শেদ, সাংবাদিক মাস্টনুল আলম, সাংবাদিক দৌলত আক্তার মালা ও সাংবাদিক জাকির হোসেন। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকারী দলকে ট্রফি, ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

কালের কণ্ঠ

২৭ এপ্রিল ২০২৫

অর্থনীতি নিয়ে রোডম্যাপ না থাকায় হতবাক হয়েছি

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার নিয়ে এত কথা বললেও অর্থনীতি নিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা আমরা দেখিনি। সরকার অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি কমিটি এবং টাস্কফোর্স গঠন করেছিল, শ্বেতপত্র কমিটি দিয়ে যার শুরু। আমরা এসবের ফলাফল এখনও দেখলাম না

অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য গবেষণা সংস্থা সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো এবং বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর অর্থনীতির ওপর শ্বেতপত্র প্রণয়নের যে কমিটি গঠন করেছিল, দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ছিলেন তার প্রধান। জাতীয় বাজেট সামনে রেখে অর্থনীতিতে সংস্কারসহ বিভিন্ন বিষয়ে সমকালের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জাকির হোসেন

সমকাল: অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েছে প্রায় ১০ মাস। এরই মধ্যে আগামী অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ঘনিষ্ঠে এসেছে। বাজেট প্রক্রিয়াকে কীভাবে দেখছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বর্তমান সরকার পতিত সরকারের বাজেট নিয়ে এগিয়েছে। সরকার চলতি বাজেটকে কী কী নীতির ভিত্তিতে সংশোধন করল, তা বুঝলাম না। পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো হলো কিনা, ভর্তুকি, সুদ পরিশোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন কোন নীতি নেওয়া হলো— এগুলো সংশোধনের সময় সরকার কিছুই বলল না। অন্যদিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ৪০ শতাংশই ভুয়া বলে আমরা শ্বেতপত্রে লিখেছি। এডিপি কোন নীতিমালার ভিত্তিতে সংশোধন হলো, মেগা প্রকল্প কোনটা বাদ দেওয়া হলো, কোনটার মূল্য সংশোধন করা হলো— সেগুলোও বুঝলাম না।

বছর বছর ধরে বিভিন্ন প্রকল্প ১ লাখ বা ২ লাখ টাকা দিয়ে রাজনৈতিক কারণে চলমান রাখা হয়েছিল, নতুন এডিপিতে সেগুলো সরকার বাদ দিল কিনা, তাও জানতে পারলাম না। যেহেতু সরকারের ব্যয় আগামী বাজেটে সংখ্যাগতভাবে এবং জিডিপির অংশ হিসেবে কমবে, সেহেতু এই কম টাকা খরচের নীতির বিষয়েও স্বচ্ছতা দেখছি না। সুতরাং এই সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়ে গেলাম। আবার জ্বালানি খাত, ব্যাংক খাত, কর ব্যবস্থাপনাসহ কিছু ক্ষেত্রে সরকার যেসব সংস্কার করার চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে বাজেটের সম্পর্ক পরিষ্কার হলো না। সরকার একবার নিত্যপণ্যসহ কিছু ক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপ করতে গিয়ে পিছু হটেছে। এগুলো অব্যাহত থাকবে কিনা এবং আগামী দিনে শুদ্ধ ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুদ্ধ আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কোন ধরনের ছাড় দিতে যাচ্ছে, তাও পরিষ্কার নয়। বাজেট প্রস্তুতির জন্য সরকারের ভেতরে যে সমন্বয় দরকার, তার অভাব দেখছি।

সমকাল: শ্বেতপত্রে আপনারা গত বছরের নভেম্বর মাসে অন্তর্বর্তী সরকারকে অর্থনীতির জন্য একটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করেছিলেন। কোনো অগ্রগতি দেখছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার নিয়ে এত কথা বললেও অর্থনীতি নিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা আমরা দেখিনি। সরকার অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি কমিটি এবং টাস্কফোর্স গঠন করেছিল, শ্বেতপত্র কমিটি দিয়ে যার শুরু। কিন্তু আমরা এসবের ফলাফল এখনও দেখলাম না। অর্থনৈতিক সংস্কারের কোনো রোডম্যাপ বা পথরেখা সরকারের কাছ থেকে এলো না। কোনো মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা সরকার করল না। এতে আমি হতবাক হয়েছি। অন্তর্বর্তী সরকার তো মধ্য মেয়াদেই রইল। সরকারের এই পরিকল্পনার অভাবটা আমি বেশি অনুভব করেছি গত মাসে বিনিয়োগ সম্মেলনের সময়। সম্মেলনে যারা এসেছিলেন, তাদের অনেকই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যেসব কথা সরকার বলছে, সেগুলোর নীতি কাঠামো কী? কর, বিনিয়োগ, অর্থ প্রত্যাশন, রপ্তানি সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের নীতি নিয়ে তারা কোনো সমন্বিত ডকুমেন্ট তো পেলেন না।

সমকাল: উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারীদের প্রতি সরকার সুস্পষ্ট বার্তা দিতে পেরেছে বলে মনে হয়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিদেশিদের মতো দেশীয় উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারীরাও নীতির দ্রুত পরিবর্তন নিয়ে শঙ্কিত থাকেন। অন্তর্বর্তী সরকার এখন যা করছে, তা আগামীতে কতটুকু টিকবে— সেই চিন্তা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছে। সেই চিন্তা তাদের মনের মধ্যে আরও জোরালো হয়েছে এ কারণে যে, সরকার তো কোনো মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা জানতে পারল না। এই সরকারের কোনো অর্থনৈতিক ‘মেনিফেস্টো’ নেই। কোনো সমন্বিত সংস্কার কর্মসূচি নেই। নীতির ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রক্রিয়াগত কোনো নিশ্চয়তা নেই। কেননা, ব্যাপক আলোচনা হয়নি। বিশেষত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতামত নেওয়া হয়নি। সরকার অন্য

সংস্কার নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করছে; কিন্তু অর্থনৈতিক সংস্কার নিয়ে করেনি। ইতোমধ্যে এর পরিণতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেমন-রাজস্ব বিষয়ে অধ্যাদেশ নিয়ে কয়েকদিন আগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বন্দরে অচলাবস্থা তৈরি হয়। শেয়ারবাজার নিয়েও বড় ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে।

সমকাল: ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পেছনে শোভন কর্মসংস্থানের অভাব অন্যতম কারণ ছিল। এখন কী পরিস্থিতি দেখছেন? নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অর্থনীতির গুরুত্ব কতটুকু?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার দায়িত্ব নিয়েছিল। সেই ছাত্র-জনতার জন্য শোভন কর্মসংস্থানের কোনো পরিকল্পনা সরকার দিল না। তাদের মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষা কিংবা যুবশ্রেণির জন্য ভর্তুকি বা কার্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। কী হতে যাচ্ছে, তাও জানতে পারলাম না। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মূল স্পৃহার প্রতি অর্থনীতির নীতিপ্রণেতারা সেভাবে সম্মান দিল না। আমাদের গবেষণায় দেখিয়েছি, নির্বাচনকেন্দ্রিক পরিস্থিতি কতখানি সহনশীল এবং কার্যকর হবে, তা অনেকখানি নির্ভর করবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। এই মুহূর্তে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংস্কার, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে যেসব উদ্যোগ আছে, সেগুলো যথাযথভাবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবণ করে কিনা, বুঝে উঠতে পারছি না। অর্থনীতি যদি স্থিতির না থাকে, তাহলে কোনো অবস্থাতেই সংস্কার, বিচার এবং নির্বাচন- কোনো পথকেই সুগম করবে না। যদি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে না থাকে, শ্রমিকদের যদি মজুরি ঠিকমতো না হয় এবং শোভন কর্মসংস্থান না হয়, তাহলে ওই পথ প্রতিকূলতার মুখে পড়তে পারে।

সমকাল: দরিদ্র মানুষের সুরক্ষায় সরকারের কতটুকু করতে পারছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সরকার শহরে স্বল্পমূল্যে পণ্য বিক্রির উদ্যোগ যেভাবে নিয়েছে, গ্রামের মানুষের জন্য কাজের বিনিময়ে কর্মসূচিতে সেভাবে মনোযোগ দেয়নি। সামাজিক সুরক্ষার ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে আগে কিছু ভুয়া লোকজন ঢুকেছিল। তাদের বাদ দেওয়ার চেষ্টা আছে। কিন্তু নতুনভাবে তালিকা করা হয়নি। মাথাপিছু টাকা বাড়ানো হবে বলে শুনছি। কিন্তু কাদের দেওয়া হবে, কীভাবে দেওয়া হবে, বিশেষ করে স্থানীয় সরকারের অনুপস্থিতিতে প্রক্রিয়া কী হবে- তা অস্পষ্ট। কোনো মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা না থাকায় পতিত সরকারের কর্মসূচি বাড়া-মোছা করে চালানো হচ্ছে।

সমকাল: শ্বেতপত্রে আপনারা একটা উন্নয়ন সম্মেলন আয়োজনের সুপারিশ করেছিলেন। বিনিয়োগ সম্মেলনের আয়োজনের মাধ্যমে কি ওই সুপারিশের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়েছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমরা সুপারিশ করেছিলাম বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী, বিনিয়োগকারী, প্রবাসী বাংলাদেশিসহ সব পক্ষকে নিয়ে একটি অর্থনৈতিক বা উন্নয়ন সম্মেলন করার।

আলগাভাবে বিনিয়োগ সম্মেলন করে সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। বিনিয়োগ সম্মেলনে আমরা বাংলাদেশকে সম্ভাবনার দেশ বলেছি; কিন্তু সম্ভাবনার পথরেখা তো বলতে পারিনি। উন্নয়ন সহযোগীদের রেখে সরকারের প্রথম দিকে একটি বড় অর্থনৈতিক সম্মেলন করতে পারলে আমরা কোথায় সহায়তা লাগবে, কোথায় ঘাটতি আছে— এগুলো জানাতে পারতাম।

সমকাল

২৭ মে ২০২৫

মানুষের প্রত্যাশা মোকাবিলা করাই বড় চ্যালেঞ্জ

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর বর্তমানে একটা উত্তরণকালীন সময় পার করেছে দেশ। রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করেছে। অর্থনীতিতেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। তবে অভ্যুত্থানের কারণে দেশের মানুষের মধ্যে নতুন প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছে। সেই প্রত্যাশার মধ্যে রয়েছে মানসম্পন্ন শিক্ষা, ন্যূনতম সরকারি স্বাস্থ্যসেবা, গরিব মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষা এবং শিক্ষিত যুবসমাজের জন্য শোভন কর্মসংস্থান। এসব প্রত্যাশাকে মোকাবিলা করাই এবারের বাজেটের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কর্মসংস্থানের জন্য বাড়তে হবে বিনিয়োগ। যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন। তার মতে, অর্থনীতিতে সরকারের মনোযোগ কম। এছাড়াও এখন পর্যন্ত যা অর্জিত হয়েছে, তাতে অভ্যুত্থানের প্রত্যাশা পূরণ করা যায়নি। এক্ষেত্রে তিনটি বড় সমস্যা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- সহযোগিতার ঘাটতি, স্বচ্ছতার অভাব এবং সমন্বয়হীনতা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) দুভাগ করা ভালো উদ্যোগ। কিন্তু এই ভালো উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বড় সমস্যা নেতৃত্বের দুর্বলতা। এছাড়াও সামষ্টিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ, সংস্কার ইস্যু, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত এবং পাচারের অর্থ ফেরানো নিয়ে খেলামেলা কথা বলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় এই অর্থনীতিবিদ। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যুগান্তরের বিশেষ প্রতিনিধি মনির হোসেন

যুগান্তর: বর্তমানে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং আইনশৃঙ্খলাসহ সবকিছুতেই এক ধরনের অনিশ্চয়তা আছে। আপনি কীভাবে দেখছেন?

ড. দেবপ্রিয়: বর্তমানে দেশ একটা উত্তরণকালীন সময় পার করেছে। আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছাতে চাচ্ছি। তবে পৌঁছানোর পথটা নিঃসন্দেহে খুব মসৃণ নয়। এখানে অনেক অনভিপ্রেত এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা আছে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা

রাজনীতি, অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতিতেও আছে। এসব বিষয় মোকাবিলা করতে একাধিক পদক্ষেপ নিতে হয়। সেই পদক্ষেপের ফলাফল সম্পর্কে যখন আমরা নিশ্চিত নই, তখনই অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। আবার এক অনিশ্চয়তা, অন্য ধরনের অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়। এর ভেতর দিয়েই আধুনিক সমাজে বসবাস করতে হয়। যেহেতু রাজনীতির বা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে একটা অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করছে। অর্থনীতিতেও দেখা যাচ্ছে তার প্রতিফলন। এর ফলে বড় যে সমস্যা হচ্ছে, একদিকে সংস্কার নিয়ে আমাদের যে প্রত্যাশা, সেখানে মনোযোগ কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে চলমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য যে ধরনের মনোযোগ দেওয়া দরকার সেটাও দিতে পারছে না সরকার। যেটুকু দিতে পারছে, তাও অনেক সময় সঠিকভাবে হচ্ছে না।

যুগান্তর: বর্তমানে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন?

ড. দেবপ্রিয়: সামষ্টিক অর্থনীতিতে একটি বিষয় বিবেচনা জরুরি। তা হলো অন্তর্বর্তী সরকার যখন শপথ নেয়, ওই সময়ে দুটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রথমত, দেশের ভেতরে আগের দেড় দশক ধরে যে লুণ্ঠন এবং অপশাসন চলেছে, সে ব্যাপারে একটা সম্মুখ ধারণা পাওয়া। তাই প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশে আমরা শ্বেতপত্র তৈরি করি। এতে এক ধরনের স্বচ্ছতা এলো। কিন্তু এই স্বচ্ছতাকে ভিত্তি করে, অনেক কর্মপরিকল্পনা নেওয়া জরুরি ছিল। আমরা শ্বেতপত্রে উল্লেখ করেছি, একদিকে দেশের আর্থিক খাতে বড় ধরনের সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাতে রাজস্ব আদায় অনেক কম। দ্বিতীয়ত, যেটুকু রাজস্ব আদায় হয়, সেটাও পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীল। তৃতীয়ত, বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর আয় করযোগ্য কিন্তু তারা কর দেন না। অর্থাৎ কর ব্যবস্থার মধ্যে এ ধরনের বেশকিছু সমস্যা রয়েছে। অপরদিকে রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে তিনটি বড় খাত হলো ভর্তুকি, ঋণের সুদ পরিশোধ এবং বেতন-ভাতা। এই তিন খাতে ব্যয়ের পর উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য একটা পয়সাও থাকে না। ফলে উন্নয়ন ব্যয়ের পুরো ব্যয়টাই দেশি-বিদেশি ঋণনির্ভর। এতে উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষাও সীমিত রাখতে হয়। যেহেতু উন্নয়ন ব্যয়ের কারণে বাজেট ঘাটতি বাড়বে, তাই ঘাটতি মোকাবিলায় টেকসই পদ্ধতি হিসাবে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করা দরকার। কিন্তু শেষ সময়ে দেখা যায়, ব্যাংক থেকে অথবা জাতীয় সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে টাকা নেয় সরকার। অর্থাৎ এই সরকার একটা দুর্বল রাজস্ব কাঠামো পেয়েছে। এটি আয়ের দিক থেকে দুর্বল, ব্যয়ের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর এবং ঘাটতি অর্থায়ন পদ্ধতি টেকসই নয়। এক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার এবারের বাজেট কীভাবে মোকাবিলা করবে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটি সমস্যা হলো, দায়দেনার চাপে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাচ্ছিল। বিদেশি ঋণ বেড়ে যাচ্ছে। আমদানির জন্য ঋণপত্র (এলসি) খোলা যাচ্ছিল না। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ কম। এই দুটি সমস্যার মধ্যে গত ৯ মাসে সরকার দ্বিতীয়টা মোকাবিলায় কিছু অগ্রগতি অর্জন করেছে। এতে টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল হয়েছে। পুরোনো দায়দেনা অনেকগুলোই পরিশোধ করা গেছে। রেমিট্যান্স (প্রবাসী আয়) বেড়েছে। এখন পর্যন্ত রপ্তানিও ভালো আছে। তবে অর্থনীতির আরেকটি জায়গায় সমস্যা রয়ে গেছে।

সেটা হলো সংকোচনমূলক অর্থনীতির কারণে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমেছে। এর বড় কারণ সরকারি-বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ নেই। আর একটু পরিস্কার করে বললে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হার খুবই কম। অপরদিকে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগও কম। এর ফলে সামাজিক সুরক্ষার দায়িত্ব আরও বেড়েছে। এই সামাজিক সুরক্ষার পাশাপাশি কর্মসংস্থান বাড়ানো জরুরি। বিশেষ করে শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি অন্যতম বড় বিষয় হিসাবে অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করছে।

যুগান্তর: এই পরিস্থিতিতে এবারের বাজেটে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকছে?

ড. দেবপ্রিয়: সুনির্দিষ্টভাবে বললে নতুন বছরের চ্যালেঞ্জ একটু ভিন্ন। ইংরেজিতে আমরা বলি ‘ম্যানেজিং এক্সপেক্টেশন’। অর্থাৎ প্রত্যাশাকে মোকাবিলা করাই এবারের বাজেটের বড় একটা চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে বাজেট কাঠামোর ভেতরে চলমান ঘটতিগুলোকে প্রথমে মোকাবিলা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছে, সেই প্রত্যাশাটাকে পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ বিকাশমান মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত শ্রেণি, গ্রামে বেড়ে ওঠা আরেক ধরনের মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রত্যাশাটা মোকাবিলা করতে হবে। এসব প্রত্যাশার মধ্যে রয়েছে মানসম্পন্ন শিক্ষা, ন্যূনতম সরকারি স্বাস্থ্যসেবা, গরিব মানুষের জন্য সুরক্ষা, শিক্ষিত যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান এবং সেই কর্মসংস্থানের বড় চালিকাশক্তি হলো ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো। ফলে সবাই মিলে লক্ষ্য রাখবে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে নতুন কি পদক্ষেপ আসছে, প্রতিবন্ধকতাগুলো কাটল কিনা, দুর্বল হয়ে পড়া ব্যক্তি খাত চাঙা করা গেল কিনা এবং তার মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কিনা সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যুগান্তর: সংস্কার শব্দটি এই মুহূর্তে ব্যাপক আলোচিত। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এগুলো বাজেট বাস্তবায়নে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে?

ড. দেবপ্রিয়: একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন, সংস্কার নিয়ে টুকটাক কাজ হচ্ছে। হয়তো শ্বেতপত্রে যা বলা হচ্ছিল, সব হচ্ছে না। কিন্তু কিছু কাজ হচ্ছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, জনপ্রশাসন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং শ্রমের মান নিয়ে কাজ হচ্ছে। কিন্তু এসব কাজে কোনো স্বচ্ছতা এবং মধ্যমেয়াদি কাঠামো নেই। ফলে কোন মানদণ্ডে এর মূল্যায়ন করা হবে, সেটি নেই। উদাহরণস্বরূপ দেশে একটা আইন আছে, ৩ মাস পরপর দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে অর্থমন্ত্রী সংসদে বিবৃতি দেবেন। বর্তমানে সংসদ নেই। কিন্তু মানুষ, দেশ এবং অর্থনীতি সবই আছে। কিন্তু ৯ মাস সরকার যে দায়িত্ব পালন করছে, এ সময়ে কোনো বিবৃতি দেখিনি। এই সরকার গত সরকারের বাজেট নিয়ে চলছে। নিজেরা কোনো বাজেট তৈরি করেনি। অর্থাৎ সরকার বদল হলেও নীতিমালা বা কাঠামো বদল হয়নি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বন্ধ করেছে, কিন্তু মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা দেয়নি। ফলে বিনিয়োগের ধারাবাহিকতায় আস্থা পাওয়ার কোনো কারণ নেই। প্রয়োজন ছিল মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার। এরপর ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী অগ্রগতি হচ্ছে, তা বলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা সৃষ্টি করা।

কিন্তু সেটি সরকার করেনি। এই সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালার বিবৃতি নেই। অবশ্য একজন দিয়েছেন। মাসখানেক আগে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব একটি বিবৃতি দিয়েছেন। এখানে কৌতূহলের বিষয় হচ্ছে, প্রেস সচিব কেন এই বিবৃতি দেবেন।

যুগান্তর : একদিকে সরকারের রাজস্ব আয় কম। অপরদিকে বর্তমানে আয়ের খাতগুলো অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। বাজেট বাস্তবায়নে এর কী প্রভাব পড়বে?

ড. দেবপ্রিয় : এবারের অর্থনীতিতে সব সূচকের অর্জন দেশজ আয়ের তুলনায় গত বছরের চেয়ে কম হবে। এটা আমাদের মনে নিতে হবে। কারণ হলো এই মুহূর্তে অর্থনীতি একটি স্থিতায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় এডজাস্টমেন্ট। এই স্থিতায়নের ধারাকে সংহত করে প্রবৃদ্ধির ধারায় উত্তরণ আমাদের লক্ষ্য। তবে এর পক্ষেও শক্তি আছে। আবার বিপক্ষেও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এই প্রতিবন্ধকতার জায়গা দুটি। একটি হলো ব্যাংকিং খাত এখনো সচল হয়নি। পাশাপাশি পুঁজিবাজারের অবস্থা খুবই খারাপ। অপরদিকে জ্বালানি খাতে সমস্যা রয়েছে। এই দুটিকে বলা হয়, অর্থনীতির দুটি ফুসফুস। এর মানে হলো দুটি ফুসফুসই রোগাক্রান্ত। ফলে বাজেটে অন্যতম চ্যালেঞ্জ ব্যক্তি খাতকে সচল করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। কিন্তু এটা করার জন্য পরিপূরক পরিস্থিতি এখনো সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টি হয়নি। পরিতাপের বিষয় হলো, অর্থনীতির এই বাস্তব পরিস্থিতি সরকার জনগণের কাছে ভালো করে ব্যাখ্যা করতে পারছে সেটা মনে হচ্ছে না। অর্থাৎ এই মুহূর্তে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জনগণকে আশ্বাস নিয়ে যে ব্যাখ্যা করবে অথবা অংশীজনদের কাছে তুলে ধরবে, সেটার ক্ষেত্রে সরকার খুবই দুর্বল। এমন কী নিজেদের কাজও ভালোভাবে বলতে পারছে না।

যুগান্তর: অর্থনীতির দুর্বলতা কাটাতে সরকার ইতোমধ্যে আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির কিছু শর্ত পরিপালন করা হচ্ছে। অর্থনীতিতে এর প্রভাব কী দেখেন?

ড. দেবপ্রিয়: আমরা খুশি আইএমএফের ঋণের শেষ দু-তিনটি কিস্তি ছাড় হবে। এজন্য মুদ্রার বিনিময় হার নমনীয় করা, ভর্তুকি কমানো এবং কর রেয়াদ বন্ধ করা অন্যতম শর্ত। এর অনেক কিছুই আমরাও চেয়েছি। এগুলো ইতিবাচক। তবে সমস্যা হলো অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকারের স্বচ্ছতা নেই। আইএমএফের শর্ত বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোনো বিবৃতি নেই। বাজেটেও সেটা থাকবে কিনা নিশ্চিত নই। অর্থাৎ স্বচ্ছতা না থাকলে বাজার এর ওপর আস্থা রাখতে পারে না।

যুগান্তর: এনবিআর দুই ভাগ করা হয়েছে। এরপর লাগাতার আন্দোলনে নেমেছেন রাজস্ব কর্মকর্তারা। আপনি কীভাবে দেখেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি এটাকে বলব, একটা ভালো নীতির অপপ্রয়োগের কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। এখানে আমি নেতৃত্বের ঘাটতি দেখি। শ্বেতপত্রে আমরা এনবিআরকে

ভাগ করার সুপারিশ করেছিলাম। নীতি প্রণয়ন ও কর আহরণকে আলাদা করতে বলেছিলাম। আইএমএফও সেটি জোর দিয়ে বলেছে। মূল উদ্দেশ্য হলো, এখান থেকে স্বার্থের সংঘাত দূর করা। কিন্তু ঠিক কাজও উলটোভাবে করলে গণ্ডগোল লেগে যায়, এটি তার আরেকটি উদাহরণ। এর মধ্য দিয়ে সরকারের কার্যক্রমের মূল তিনটি সমস্যা সামনে আসছে। একটি হলো সহযোগিতা নেই। অর্থনীতির অন্যান্য অংশীজন বা প্রাসঙ্গিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। দ্বিতীয়ত, নিজেদের ভেতর সমন্বয় নেই। একজনের কাজ সম্পর্কে আরেকজন কতটুকু অবহিত তা আমরা জানি না। তৃতীয়ত, স্বচ্ছতা নেই। যেটুকু কাজ করেন, তা মানুষকে জানানোর উদ্যোগ নেই। এনবিআরের বিভাজনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করেনি। কমিটিতে কারা আছে, সে তথ্যও প্রকাশ হয়নি। আবার কাজটি সমন্বয়ের মাধ্যমে হয়নি। ফলে নিজেদের কাজে নিজেরা আটকে গেছে। প্রথমে অত্যন্ত দাস্তিক আচরণ করেছে। শেষে পরাজয়ের ফলাফল গিলতে হলো। সবকিছু মিলে পুরো দেশটা এখনো অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়ে গেছে।

যুগান্তর: পাচারের অর্থ ফেরানোর উদ্যোগের কথা বলা হচ্ছে। আপনি এর কী সম্ভাবনা দেখছেন?

ড. দেবপ্রিয়: পাচারের অর্থ ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটা ইতিবাচক। তবে একটি বিষয় খেয়াল করতে হবে, পাচার বন্ধ হয়েছে কিনা। এক্ষেত্রে শ্বেতপত্রের বড় একটি মূল্যায়ন সঠিক হয়েছে। ফলে আমরা মনে করি, অর্থ পাচার নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অন্যান্য সংস্থা পাচারের অর্থ ফেরানোর ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে। তবে এটি সহজ নয়। কারণ এক্ষেত্রে বেশ সমস্যা রয়েছে। টাকা পাচারের পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ, এই টাকা দিয়ে কী সম্পদ কেনা হয়েছে, সেটি চিহ্নিত করা এবং এই সম্পদ বিক্রি আইনি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে নিয়ে আসা অন্যতম। কিন্তু এই সব তৎপরতার ফলে ইতোমধ্যে লন্ডনে দেশের স্বনামধন্য একটি পরিবারের বড় সম্পদ আটক হয়েছে। এছাড়াও দুবাই এবং মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে যারা বাড়িঘর বানিয়েছেন, তাদের নামসহ চিহ্নিত হচ্ছেন। রপ্তানি করে দেশে টাকা না আনার প্রবণতা কমেছে। অতিমূল্যায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে টাকা নেওয়াও কমেছে। অর্থাৎ টাকা ফেরানোর ক্ষেত্রে আমি আশাবাদী কিন্তু বাস্তবতার পক্ষে। তবে পাচারের অর্থ ফেরানোর বিষয়টি যেহেতু আমাদের নীতি প্রণয়নের ভেতরে স্থান পেয়েছে, এটাই বড় অগ্রগতি। তবে অনেকে মনে করেছিলেন, এবারের বাজেটের অর্থায়নে পাচারের টাকা নতুন একটা খাত হিসাবে যুক্ত হবে। অর্থাৎ পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ ফিরিয়ে এনে বাজেট বাস্তবায়নে খরচ করা হবে। তবে এক্ষেত্রে আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে।

যুগান্তর

৩১ মে ২০২৫

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা থাকলে বিনিয়োগ আসবে না

ড. ফাহিমদা খাতুন

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা থাকলে বিনিয়োগে স্থবিরতা কাটবে না বলে মনে করেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহিমদা খাতুন। কালের কণ্ঠকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, নতুন বাজেটের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগ বাড়ানো এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি। প্রবৃদ্ধি কম হবে, সেটা মেনে নিতে হবে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মাসুদ রুমী

প্রশ্ন: সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান সূচকগুলোর অবস্থা কী?

ড. ফাহিমদা খাতুন: সরকার পতনের পর সামষ্টিক অর্থনীতির প্রায় সব কটি সূচকই নেতিবাচক ছিল। তখন থেকে কিছু কিছু সূচকে উন্নতি হচ্ছে, যদিও সেটা ধীরগতিতে। মূল্যস্ফীতির হার এখনো বেশি। কর-জিডিপির হার কম।

দেশি-বিদেশি সব বিনিয়োগ কম। জ্বালানির দাম অনেক বেশি। নাজুক অবস্থা বিরাজ করছে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে। বিদেশি ঋণের দায়দেনা বেশি।

গত ৯ মাসে মূল্যস্ফীতির হার সামান্য হলেও কমছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পতনমুখী ধারা থামানো গেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি এ বছর এবং আগামী বছর কম হবে। আগে তথ্যের গোঁজামিল ছিল।

জুলাই-আগস্ট মাসের আগে-পরে রাজনৈতিক অস্থিরতায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ একেবারেই হচ্ছে না। উচ্চ সুদহার ও জ্বালানির উচ্চমূল্য উদ্যোক্তাদের চাপের মধ্যে রেখেছে। ব্যবসায়ীদের উৎপাদন খরচ অনেকখানি বেড়ে

গেছে। অর্থনৈতিক সূচকগুলোর পতন থামানো এবং অর্জনগুলোকে সংহত করার একটা প্রক্রিয়া চলছে।

কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কেউ বিনিয়োগ করতে চাচ্ছে না। এতে দেশি-বিদেশি সব বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মূল্যক্ষীতিতে লাগাম টানতে নীতিসূদ হার বাড়াচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর ফলে ঋণের সুদহার বেড়ে গেছে। যাঁরা ব্যবসা করছেন, উৎপাদন বাড়াচ্ছেন, তাঁদের বেশি খরচে ঋণ নিতে হচ্ছে।

প্রশ্ন: গতানুগতিক বাজেট দিয়ে এই সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যাবে কি?

ড. ফাহিমদা খাতুন: মূল্যক্ষীতি নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগ বাড়ানো এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা নতুন বাজেটের মূল লক্ষ্য। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারি ব্যয় যদি কমে যায় তাহলে আরো কর্মসংস্থান কমে যাবে। বিনিয়োগ কমে যাওয়ায় বেকারত্বের হার বাড়ছে। বিনিয়োগ না হলে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড না বাড়লে প্রবৃদ্ধিও হবে না। ব্যয়ের চাহিদা অনেকখানি আছে। সরকারের প্রশাসনিক ব্যয়ও কম নয়। মানুষের অনেক প্রত্যাশা আছে। ভৌত অবকাঠামো, জ্বালানি, কৃষি, শিল্প—সব জায়গায় চাহিদা রয়েছে। কিন্তু ব্যয়টা মেটাতে হলে রাজস্ব আয় প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের যে রাজস্ব আয় হচ্ছে, তা অনেক কম। আমাদের কর জিডিপি হার এখনো ৮ শতাংশের নিচে। কম আয় দিয়ে বিপুল ব্যয়ের চাহিদা মেটানো আমাদের বাজেটের বড় চ্যালেঞ্জ।

বাজেট বাস্তবায়নে প্রধান চ্যালেঞ্জ কী?

ড. ফাহিমদা খাতুন: আগে ভৌত অবকাঠামোয় বেশি নজর দিতে গিয়ে সামাজিক অবকাঠামো অবজ্ঞা করা হয়েছে। বরাদ্দ ব্যবস্থাপনাও বাজেটের চ্যালেঞ্জ। একদিকে টাকার অভাব, অন্যদিকে উচ্চ মূল্যক্ষীতি। এমন পরিস্থিতিতে সরকারকে ব্যালান্স করে খরচ করতে হবে। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বজায় আছে, কিন্তু সরকারের খরচ যদি বেড়ে যায় তখন এই মুদ্রানীতি কাজ করবে না। তখন আর মূল্যক্ষীতি কমানো যাবে না। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ও সংকোচনমূলক রাজস্বনীতি—এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে।

এনবিআর বিভক্ত করার কারণে রাজস্ব আদায়ে ঝুঁকি আছে কি না?

ড. ফাহিমদা খাতুন: অবশ্যই। এখন পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের যে ধারা দেখা গেছে, সেটা চলতে থাকলে একটা বিরাট ঘাটতি দেখা দেবে। গত মার্চ পর্যন্ত আমাদের যে রাজস্ব ঘাটতি দেখা দিয়েছে সেটা করোনার সময় ছাড়া গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। আর এনবিআর কর্মকর্তাদের আন্দোলন চলার কারণে রাজস্ব আদায়ের ওপরও প্রভাব পড়ছে। এটা সার্বিক রাজস্ব আদায়ে তো প্রভাব পড়বেই।

আইএমএফের শর্ত মেনে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পদক্ষেপ মানুষ ও স্থানীয় শিল্পের ওপর কী প্রভাব ফেলতে পারে?

ড. ফাহিমদা খাতুন: এরই মধ্যে দেশের ব্যবসার ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ব্যবসায়ীসমাজ তাদের সমস্যার কথাগুলো বলছে। সুদের হার বৃদ্ধি, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং দুর্নীতির কারণে ব্যবসার খরচ অনেক বেশি বেড়ে গেছে। সেটার প্রভাব পুরো অর্থনীতিকে বহন করতে হবে। উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাই আগামী বছর কিভাবে ব্যবসায়ীদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায় সে ধরনের পদক্ষেপের দিকে নজর দিতে হবে।

ব্যবসায়ীরা নতুন করে বিনিয়োগে যাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতি থেকে পরিব্রাজনের উপায় কী?

ড. ফাহিমদা খাতুন: এই মুহূর্তে সুদের হারের দিকে হাত না দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু যেটা এখন চাইলে সরকার করতে পারে, সেটা হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করা। যেমন—আন্দোলনের কারণে রাস্তাঘাট বন্ধ থাকলে ব্যবসায়ীরা মালপত্র আনা-নেওয়া করতে পারেন না। এটা ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নয়। তাই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আইন-শৃঙ্খলা উন্নত করা এখন সরকারের প্রধান কাজ হওয়া উচিত।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলেই কি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরবে?

ড. ফাহিমদা খাতুন: অনেকাংশেই। কারণ বিনিয়োগকারীরা স্বল্প সময়ের জন্য বিনিয়োগ করেন না। ব্যবসায় রিটার্ন আসতে পাঁচ থেকে সাত বছর সময় লেগে যায়। তাই তাঁরা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেখতে চান। যদিও বলা হচ্ছে যে আগামী বছরের জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে; কিন্তু মানুষের মনে অনিশ্চয়তা কাজ করছে। তারিখ ঘোষণা করলে একটা ধারণা আসে; যেটা ব্যবসা ও অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মসংস্থান বাড়াতে বাজেটে কী ধরনের পদক্ষেপ থাকা দরকার?

ড. ফাহিমদা খাতুন: গতানুগতিক বাজেট দিয়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা মোটেই সম্ভব নয়। সরকারি বিনিয়োগ দিয়ে কর্মসংস্থান করা যায় না। সে জন্য যে প্রকল্পগুলো আগে হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলো শেষ হলে আরো ভালো হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (এসএমই) কিছু প্রগোদনা দরকার। কারণ এখানে অনেক কর্মসংস্থান তৈরি হয়। এ ছাড়া কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার। গ্রামে বিনিয়োগ করলে অনেক কর্মসংস্থান হয়। আর প্রযুক্তি খাতে নতুন উদ্যোক্তাদের (স্টার্টআপ) সহযোগিতা করা দরকার।

সরকারের সংস্কার এজেন্ডা বাস্তবায়নে আপনার পরামর্শ কী?

ড. ফাহিমদা খাতুন: যেসব সংস্কার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে স্বল্পমেয়াদি সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এগুলো বাস্তবায়ন করে ফেলা উচিত। দারিদ্র্য বাড়া, কর্মসংস্থান কমা ও মূল্যস্ফীতি বাড়ার কারণে সাধারণ মানুষের যে কষ্ট হচ্ছে, তাদের জীবন স্বাভাবিক বা স্মুথ করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীটা বাড়ানো এবং খোলাবাজারে ওএমএসের কার্যক্রম বাড়ানো প্রয়োজন।

কালের কণ্ঠের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ।

ড. ফাহিমদা খাতুন: আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।

কালের কণ্ঠ

২ জুন ২০২৫



ফ্রন্টলাইন

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ সুপ্রিয় দর্শকমন্ডলী, ফ্রন্ট লাইনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শকমন্ডলী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্বাগত জানাচ্ছি দাদা। প্রায় ১৩ বছর পরে আমাদের এই অনুষ্ঠানে এলেন। আপনি জানেন যে নয় বছর এই অনুষ্ঠানটা বন্ধ ছিল। এর আগেও আপনি অনেকদিন আসেননি। যাই হোক আপনাকে বিশেষভাবে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি স্টুডিওতে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ একদম পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে নতুনভাবে আপনার সাথে আজকে এখানে মুখোমুখি হচ্ছি। একেবারে ফ্রন্ট লাইনে।

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ কেমন আছেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ এটা নির্ভর করে দিনের কোন সময় প্রশ্ন করেন আপনি। সকালে মনে হয় খুব ভালো আছি। দিনের শেষে সূর্য অস্ত যায় তখন যেন মনটা আবার একটু স্লান হয়ে আসে। স্থিমিত হয়ে আসে। সেহেতু একটা উত্থানপতনের ভিতরে তো আছি। তার ভিতরে আশা সঞ্চয় করে আগাতে চাচ্ছি।

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম তো সেই পরিবর্তন থেকে আমরা কি পেলাম?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ নির্ভর করে কোন এলাকাতে।

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ আপনার এলাকা।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমার অর্থনীতির এলাকাতে যদি আপনি বলেন তাহলে বর্তমান সরকার যখন দায়িত্ব নেয় তার তিনটি বড় বড় কাজ ছিল বলে আমি মনে করি। প্রথম ছিল যে গত ১৫-১৬ বছরের যে অর্থনীতি ছিল সেটার ভিতরে উন্নয়নের যে বয়ানটা তৈরি হয়েছিল উন্নয়নের যে আলেখ্য তৈরি হয়েছিল তার সত্যতা যাচাই করা একটা বড় বিষয় ছিল। সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টার প্রত্যক্ষ আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতিতে আমরা শ্বেতপত্র রচনা করলাম। যার মাধ্যমে দেশের ভিতরে তৎকালীন সময়ে যে অর্থনৈতিক দুরাচার হয়েছে, যে অর্থনৈতিক অনাচার হয়েছে, সেটার ভিতরে কিভাবে রাজনীতিবিদ, আমলা এবং ব্যবসায়ীরা যুক্ত হয়ে, আমি বলেছিলাম একটি চোরতন্ত্র স্থাপন করেছিল। এবং কিভাবে এটা একটা চামচা পুঁজিবাদ থেকে চোরতন্ত্রে গেল। প্রধান উপদেষ্টা অবশ্য লুটপাট তন্ত্র শব্দটা ব্যবহার করছেন ইদানিংকালে। তো এইটাকে উন্মোচন করা। তো সেইটা আমরা করতে পেরেছি। আমি মনে করি।

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ কিন্তু সেটার রেজাল্টটা কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমি এটাতে আসবো। আমি জানি যে আপনি এ প্রশ্নটা করবেন আমাকে। আর দ্বিতীয় আরেকটা ছিল বিষয় সেটা হলো যে সে সময় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুবই অস্থিতিশীল ছিল। সামষ্টিক অর্থনীতিতে টাকার মূল্যমান পড়ে যাচ্ছিল। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছিল মূল্যস্ফীতি হচ্ছিল। একই রকমভাবে সুদের হার, বিনিয়োগ, এলসি খোলা যাচ্ছে না ইত্যাদি, কর্মসংস্থান সবকিছু মিলিয়ে একটা হযবরল অবস্থার ভিতরে ছিল। রেমিটেন্সও কম ছিল, রিজার্ভ পড়ে যাচ্ছিল। সেটাকে স্থিতিশীল করাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। দ্বিতীয়টা যদি বলেন তাহলে সেটাতে আংশিক সাফল্য এখন পর্যন্ত আছে। তবে বিশ্বের নতুন পরিস্থিতি এবং এবারের বাজেট যেভাবে আসলো সেটার প্রেক্ষিতে এটা সম্বন্ধে নতুন শঙ্কা দেখা দিচ্ছে আর কি। আর তৃতীয়টা আরেকটা জায়গা ছিল সেটা হল এই সরকার তো ডাইনে বায়ে বিভিন্ন ধরনের কমিশন, টাস্কফোর্স, কমিটি ইত্যাদি ইত্যাদি বানাতে। কিন্তু এইটাকে কেন্দ্র করে যে কোন কার্ঠামোগত সংস্কার, কোন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার নেই। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ওই যে ছয় কমিশন নিয়ে যে এক ধরনের একা সংলাপ হচ্ছে তার ন্যূনতম উনারা অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে মনোযোগ দিলেন না আর কি। সেহেতু সেই অর্থে এই সরকারের মাধ্যমে আমার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন রূপান্তর, সামান্য কিছু হয়তো ব্যাংকিং খাতে, কি হয়তো জ্বালানি খাতে টুকটাক এদিক ওদিক হবে। আর বাদবাকিটাতে আমি খুব বেশি দেখছি না।

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ সেটার কারণ কী? কেন হলো না?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ এইটার একটা বড় বিষয় হলো, আমার কাছে মনে হয়েছে যে যাদের হাতে এগুলি দেওয়া হয়েছিল, প্রধান উপদেষ্টার পরে তারা এই পুরো প্রত্যাশা-আকাঙ্ক্ষার

সাথে আত্মিকভাবে এবং পেশাগতভাবে যুক্ত ছিলেন না। সেহেতু ইংরেজিতে যেটাকে বলে ওনারশিপ। ওনারা এটার মালিকানা নেন নাই। ওইটার মালিকানা না নেওয়ার ফলে ওনারা প্রকৃত অর্থে গত ১৫-১৭ বছরের যে কাঠামো, যে প্রক্রিয়া, যে পদ্ধতি, যে পরিসংখ্যান, এমনকি যে ব্যক্তির ওখানে ছিল তাদের নিয়ে উনারা সংসার করেছেন। সেহেতু ওই সংসারে, সোনার সংসারে কোন ভাঙ্গন আসে নাই।

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ সংসারে কোন পরিবর্তন আসে নাই।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ এইটাতে আমি মনে করি যে যেই ব্যক্তির প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বের ভিতরে ছিলেন, আমার বলতে কষ্ট হচ্ছে। কারণ উনারা সকলেই সম্মানীয় এবং আমার কাছে মানুষ। উনারা এটার মালিকানা নেন নাই এবং এটার জন্য যে পরিশ্রমটা করা দরকার এবং এটাকে যেভাবে ধারণ করা দরকার সেটা হয়নি। ওই যে আপনারা বলেন না যে পাঁচই আগস্টের চেতনাকে ধারণ করে কি করে না? তো পাঁচই আগস্টের চেতনাকে উনারা ধারণ করেন নাই সেই অর্থে। উনারা অনেকে তো এর ভিতরেও ছিলেন না সেহেতু এইটা একটা বড় বিষয় বলে আমার কাছে মনে হয়েছে।

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ আর এটার জন্য, এর ফলে কী দাঁড়াবে তাহলে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ এর ফলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হলো যে এরপরে যে সরকার দায়িত্ব নিবে তাদের জন্য কোন পরিস্কার ভিত্তি ভূমি উনারা রেখে যেতে পারবেন না। যে রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার জন্য লড়াই করছেন তাদের এখন বড় করে চিন্তা করতে হবে যে উনারা কি ধরনের নির্বাচনী ইশতেহার করবেন। উনারা ক্ষমতা পেলে পরে প্রথম ১০০ দিনে কি করবেন। উনারা ক্ষমতা পেলে প্রথম ছয় মাসে কী করবেন, এমনকি যেই বাজেটটা উনারা পাচ্ছেন, কারণ এই বাজেট তো এই সরকারের তৈরি। সেইটাকে উনারা কিভাবে সংশোধন করে বা পরিমার্জন করে বছরটা শেষ করবেন এটা একটা বড় বিষয়। এর সাথে যেটা দাঁড়াবে যে যেহেতু এই সরকারের কোন মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা ছিল না। আমি বলি এই সরকারের তো কোন ইকোনমিক ম্যানিফেস্টো নাই। যদিও একটা ইকোনমিক ম্যানিফেস্টো কর্মসূচি করার সুযোগ ছিল এবং সেইটা উনারা করলেন না। যার ফলে বিনিয়োগকেও বেগ পেতে হলো। কারণ বিনিয়োগ তো আপনার আজকালের পরিস্থিতি দেখে না। সে একটু মধ্যমেয়াদে বুঝতে চায়। সে বুঝতে চায় যে এই নীতি কার্ঠামোটা কি? সরকার এত কথা বলে। কিন্তু আপনি একটা ডকুমেন্ট দেখে একটা দলিল দেখিয়ে বলবেন এইটা পড়লে আপনি বুঝবেন যে এই সরকারের অর্থনীতিতে কি চায়।

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ আমরা তো শুনলাম যে একটা বিনিয়োগ সম্মেলন হলো।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ হ্যাঁ, বিনিয়োগ সম্মেলন হলো। ওখানে যারা উদ্যোক্তা ছিলেন দায়িত্ব নিয়ে ওখানে আপনি তো স্টেজ শো করতে পারেন। এবং বিনিয়োগ সম্মেলন তো আর

আমরা প্রথমবার করছি না। দেশে বিদেশে আমরা বহুবার করে এসেছি। আমাদের তো সে অভিজ্ঞতা আছে যে সম্মেলনে কি হয় আর বাস্তবে কি হয় এটার ভিতরে পার্থক্য আছে। কারণ হলো উনারা বুঝতে চায় যে নীতি ধারাবাহিকতা থাকবে কিনা। কারণ আমরা ইংরেজিতে বলি এটা কাউন্টডাউন না? রকেট ওঠার সময় কাউন্টডাউন করি না? কারণ এখন তো সরকার কাউন্টডাউনে ঢুকে গেছে অর্থাৎ আর ক’টা দিন তার বাকি আছে। এটা ফেব্রুয়ারি বলেন, মার্চ বলেন অথবা ডিসেম্বর বলেন। এখন তো হিসাব হচ্ছে যে আর কয়দিন বাকি আছে। এই কয়দিনের ভিতরে বিনিয়োগকারীরা কোন ঝুঁকির ভিতরে ঢুকবে না। কারণ আজকে আপনি এটা করবেন, কালকে নীতি বদলে যাবে বা নতুন নীতি আসবে বা সংস্কার হবে। এবং আপনাকে কে তখন বলবেন এটা আগের সরকারের লোক। কি শব্দটা ব্যবহার করেন? দোসর, না? তখন তো আরেক সমস্যার ভিতরে পড়ে যাবে। সেহেতু এখন সকলেই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সময় নিচ্ছে। আর এটার সাথে যেটা যুক্ত হয়েছে সেটা হলো যে, যে বাজেটটা আপনি দিলেন এই বাজেটটা তো কোন বিজ্ঞানসম্মত বাজেট হয় নাই। এটা আমরা পরিস্কারভাবে দেখছি। যে বিনিয়োগের কথা চিন্তা করা উচিত ততদূর করতে পারলাম না। যেটার ব্যক্তি খাতে সরকারি বিনিয়োগ হওয়ার কথা সেটা পারলাম না। যে রাজস্ব আদায় হওয়ার কথা সেটা পারলাম না। ঘাটতি পূরণের করার জন্য আবার সরকারকে এখন ঋণ নিতে হচ্ছে। হয় বিদেশ থেকে নয় ভিতর থেকে। এইবার যদিও সামান্য বাজেট কমানো হয়েছে কিন্তু আসলে প্রকৃত অর্থে সেইভাবে কমে নাই। তো একটা দুঃখ লাগে, মতি ভাই, যে আসলে যেই প্রত্যাশা নিয়ে আট নয় মাস আগে আমরা শুরু করেছিলাম গলার জোরটা আমার অতখানি নাই এই মুহূর্তে। এটাই কষ্ট লাগে। অথচ এরকম হওয়ার কথা ছিল না। কারণ একটা বড় গোষ্ঠী পেশাজীবীরা বর্তমান সরকারকে কিন্তু বিরাট সমর্থন দিয়েছিল। এবং এই যে আমাদের ১২ জনের আমাদের কমিটি বিনা পয়সায়, বিনা পারিশ্রমিকে, তিন মাস সকাল বিকাল রাত্রে পরিশ্রম করে আমরা একটা জিনিস করলাম। আপনি জিজ্ঞেস করলেন কি হলো। কিছু হলো না তো। আপনাকে আমি সাধারণভাবে একটা ব্যাখ্যা করে বলি কিরকম বিব্রতকর পরিস্থিতি। আমরা দেখালাম যে এত প্রবৃদ্ধি হয় নাই দুই থেকে আড়াই শতাংশ করে বাড়ায় বাড়ায় বলা হয়েছে। তার মানে হলো আপনার দেশজয়ের হিসাবের ভিতরে গরমিল আছে। প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় এইটা বললেন ১৬ই ডিসেম্বর তার বিজয় দিবসের বক্তৃতা শুনে। উনি প্রায় তিন মিনিট ধরে আমাদের শ্বেতপত্রের উপরে উনি বক্তৃতা করেছেন এবং ওখানে বলেছেন যে এই তথ্য উপাত্ত ঠিক না। কিন্তু এই তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতেই তো উনি বাজেট দিলেন। ওগুলি যদি মিথ্যা হয়ে থাকে তাহলে এই মিথ্যাকে পুনর্জন্ম দিলেন কিনা এইটার মাধ্যমে, এই দায়িত্ব কে নিবে? এই বিব্রতকর পরিস্থিতি তো সৃষ্টি হয়েছে যে উনার উপদেষ্টারা উনাকে এমন বাজেট দেওয়ালেন ক্যাবিনেট থেকে যেটা হলো ওই গর্হিত, স্কীত, ভুল তথ্যের ভিত্তিতে। যেকোন সরকারের প্রথমে এসে এই হিসাবের ভিতরে ঢুকতে হবে। তো এটা একটা বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এবং আমি দেখলাম গত সপ্তাহে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের দ্রুততার সাথে সংস্কার করা যায় এরকমের সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে। আটটি দেখলাম বিষয় নেওয়া হয়েছে। তার প্রথমটি হলো যে প্রত্যেকটি পেট্রোল ফিলিং স্টেশনে একটি করে টয়লেট বানানো। তো আকাক্ষার মাত্রা যদি এইটা হয় যে টয়লেট বানানো এবং তাও ব্যক্তিখাতের বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে, যেটা তাদের করার কথা, সরকারের

করার খুব বেশি এটার ভিতরে নেই, নজরদারী ছাড়া। তাহলে আকাক্ষার মাত্রাটা তো আপনি বুঝতে পারছেন। আমাদের চিন্তা ছিল যে আপনি রাজস্বতে প্রত্যক্ষ আয়তে যাবেন। কীভাবে আপনি বিদ্যুতের ঘাটতি মিটানোর ক্ষেত্রে বিদ্যুতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন? সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে কি করবেন? সরকারি ব্যয় এবং মেগা প্রকল্পের বাড়তি যে সমস্ত জিনিস আছে এগুলোকে সুশ্রম করবেন। কীভাবে আপনি আপনার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যেই সংস্কারটা দরকার সেটা দেখেন। আমরা বলেছিলাম এই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে দুই ভাগে ভাগ করার জন্য। অনেকেই বলেছে উনাদের যে কমিটি করেছিল, তারাও বলেছিল। কিন্তু ভালো কাজও বৈঠকভাবে করলে কি অবস্থায় পড়তে তার একটা উদাহরণ এটা।

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ এটা আপনি কেন মনে করেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ ঠিক কাজটা করার জন্য যে ধরনের আলাপ আলোচনা, লোকজনের সাথে মেশা এবং যারা এটার সাথে অংশীজন আছে তাদের মতামতটাকে নেওয়া, এনবিআরে যারা কাজ করে তাদের মতামত নেয়া এবং যেই কমিটি রিপোর্টটা দিয়েছে সেটাকে সৎভাবে বাস্তবায়ন করা, উনারা তো সেগুলি করেন নাই। উনারা বারবার যেটা ভুলে যান উনাদের কোন রাজনৈতিক শক্তি নাই জনগণের সমর্থন ছাড়া এবং এই জনগণের সমর্থন হলো স্বপ্রণোদিত সমর্থন এবং সেই স্বপ্রণোদিত সমর্থন না থাকলে কিন্তু উনার আর কোন নৈতিক বৈধতা থাকবে না। সামাজিক বৈধতা থাকবে না। এরকম একটা সরকার যদি দুর্বল হয়ে যায় নির্বাচনের প্রাক্কালে এটা তো সে দেশের জন্য ভালো না। সরকার তো আট নয় মাসের তুলনায় এই মুহূর্তে তার সক্ষমতার ক্ষেত্রে, তার সুনামের ক্ষেত্রে, তার প্রভাবের ক্ষেত্রে, আগের চেয়ে একটু দুর্বল হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যারা শুভাকাঙ্ক্ষী অনেকেই ছিলেন, আমিও ছিলাম, আছি এখন তারাও অনেক হতাশা এবং একটু মন খারাপ নিয়ে থাকে আজকাল।

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ কিন্তু একটা পরিবর্তন তো হওয়ার কথা ছিল। যে পরিবর্তন থেকে আপনি যেটা বলছেন যে আপনারা স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজের খরচে একটা প্রস্তাবনা উনার সামনে দিলেন। কী কারণে দিলেন? দেশটাকে ভালোবাসেন বলেই তো। কিন্তু দেশের অর্থনীতি এই অবস্থায়। উনি নিজে অর্থনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও এবং এটা যেভাবে উনি গ্রহণ করলেন এটা আবার এই যে কোল্ড স্টোরেজে চলে গেল এটা নিয়ে তো একটা হতাশা আছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আপনি যে প্রশ্নটা করছেন এই প্রশ্নটা নিয়ে দিনে রাতে আমরা চিন্তা করি এবং রাতে ঘুমও হয় না অনেক সময়। তবে অনেক সময় যেটা আমাদের কাছে মনে হয় বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ এবং বিশেষ করে বিভিন্ন পদায়নকে দেখে যে হয়তো কোন একটি গোষ্ঠী বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিচালনা করছে। সেই গোষ্ঠী হয়তো কিছু উপদেষ্টা মন্ডলীর ভিতরে আছে। কিছু উপদেষ্টা মন্ডলীর বাইরে দেশে আছে। কিছু হয়তো দেশের বাইরেও আছে। এইরকম একটি গোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকার ভিতরে থাকে।

যেটা হলে তো হয়তো সার্বিক অর্থে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে যায় কিনা। আপনি যদি লক্ষ্য করে দেখেন এই সরকার যে একটা সময়বদ্ধ সরকার। এটা তো ইংরেজিতে টাইম বাউন্ড বলে। সময়বদ্ধ। আজ হোক কাল হোক নির্বাচনে যেতে হবে। কিন্তু আচরণ দেখে মনে হয় উনারা যুগ যুগ ধরে এখানে অবস্থান করবেন এরকম একটা মানসিক ভাব নিয়ে বা বক্তব্যের কথা শুনলে পরে মনে হয়। সেহেতু বিবেচনা করার মত, ইংরেজিতে যাকে বলে ফুটপ্রিন্ট মানে এই সরকার কি পথরেখা রেখে যাবে বা পদরেখা রেখে যাবে। কী উত্তরাধিকার রেখে যাবে। যখন আজ থেকে চার কি পাঁচ বছর পরে যদি আমরা আলোচনায় বসি আপনার সাথে আপনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলবেন- না না এটা তো ওই সরকারের আমলে তৈরি হয়েছিল। মনে রাখার মত কি জিনিস আমরা পাবো এইটি নিয়ে আমি দুশ্চিন্তার ভিতরে থাকি। আর মতি ভাই একটা কথা বলে শেষ করি। আমার এই সরকার তো সঠিক বৈঠকভাবে অনেক বেশি সংস্কারের শব্দটাকে নিয়ে এসছে এবং যেটা বেশিরভাগই হলো সংসদ, স্থানীয় সরকার, সংবিধান...

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ ক্ষমতা কেন্দ্রিক।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ ক্ষমতা কেন্দ্রিক, উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয় যার সাথে মানুষ চট করে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করতে পারে না। কিন্তু এই কথাগুলো শোনার মত ধৈর্য এমনকি নির্বাচনের জন্য মানুষের যে চাহিদা এটা অনেক বেশি প্রভাবিত হবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কি থাকবে তার উপরে। দেখুন যখন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দুর্বল হয়ে যাবে তখন মানুষ আরো বেশি কিন্তু নির্বাচনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে। মাঝে ওই যে রমজানের সময় একটুখানি জিনিসপত্রের দামের ক্ষেত্রে সচ্ছলতা ছিল। তখন লোকে ওই যে পাঁচ বছরের জন্য সরকারটা থাকুক এরকম দাবি দাওয়া সেই সময় ঘটেছে। অর্থাৎ আপনাকে বুঝতে হবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কোন কারণে যদি সংকটাপন্ন হয় তাহলে কিন্তু আপনার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেক দ্রুততার সাথে ভঙ্গুর হয়ে যাবে। বিপন্ন হয়ে যাবে। এই উপলব্ধিটা আমি মাঝে মধ্যে দেখি না আর কি।

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ আপনি জানেন যে বিশ্ব পরিস্থিতি পাল্টে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির নানা চ্যালেঞ্জের মুখে ছিল এবং আছে। ভবিষ্যৎ কি? আপনি কি দেখছেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমি দেখছি যে, যে বিশ্ব আসছে এটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি ডিজরাপটিভ ডেভেলপমেন্ট। অর্থাৎ উন্নয়ন হবে। বিভিন্ন ধরনের হেচকির ভিতর দিয়ে এটা হতে থাকবে। সেহেতু আগামী দিনের উন্নয়নের জন্য এইরকম পরিস্থিতিতেই স্বাভাবিক মেনে নিয়ে আমাদের উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে হবে। মানে খুব দ্রুত ট্রান্সপ সাহেব চলে যাবে। খুব দ্রুত হরমুজ প্রণালী নিরাপদ হয়ে যাবে। গাজা শেষ হয়ে যাবে বা আফ্রিকাতে আপনার বিভিন্ন ধরনের দামী মিনারেলস যেগুলি খোঁজা হয় সেগুলি, খনিজ সম্পদ খোঁজা

হবে। এগুলি যাবে না এবং ভারত চীনের সাথে রেযারেযি থাকবে। পাকিস্তান আমাদের দেশে আসতে চাইবে। এগুলি খুবই সাধারণ। এরকম একটা বিষয়ের ভিতরে আমাদের জীবনযাপন করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার একটা সাধারণ ধারণা যেটা হলো এইগুলোতে খুব বেশি চঞ্চল না হয়ে ধীরস্থিরভাবে একটা মধ্যমেয়াদে কৌশলগত ঐক্যমত্য দেশের ভিতরে গড়ে তোলা দরকার। অর্থাৎ আপনি নির্বাচনের দিকে যখন যাবেন এবং এইটাকে সামনে নিয়ে এইরকম পরিস্থিতিকে তখন আপনাকে বলতে হবে যে আপনারা নির্বাচনে যারাই যা নিয়ে প্রতিযোগিতা করেন না কেন দেশের কতগুলি মৌলিক স্বার্থ আছে, উন্নয়ন একটা, তার এই যে ভূকৌশলগত নিরাপত্তার বিষয় একটা, অধিকার, সার্বভৌমত্ব, ইত্যাদি বিষয়, বিশ্ব শান্তির ভিতরে আমাদের সেনাবাহিনী রাখা ইত্যাদি। কতগুলো বিষয় আছে এগুলোতে আমাদের জাতীয় ঐক্যমত্য দরকার। এটা এ বি সি ডি-র উপরে নির্ভর করে হবে না। এই ঐক্যমত্যটা সৃষ্টি করতে পারতো কিন্তু এই বর্তমান সরকার। চেষ্টা করতে পারতো। এটাও আমি সেই অর্থে দেখি যে যদি আপনি ব্যর্থতা নাও বলেন এটা একটা শূন্যতা রয়ে গেল আরকি। সেহেতু এই জাতীয় ঐক্যমত্য কতগুলি বিষয়ের ভিতরে আমাদের তৈরি করা দরকার এবং সেটাকে আমরা মধ্যমেয়াদে দাঁড় করাবো এবং এইটা যদি না থাকে তাহলে বিশ্বে আপনি বাজার বলেন, বিনিয়োগ বলেন বা শান্তি শৃঙ্খলা বলেন তাতে আমরা খুব নির্ভরযোগ্য মানুষ হিসেবে তা হবে না এবং বিশেষ করে আমার প্রতিবেশীর সাথে যে সম্পর্ক এখন চীন এবং ইত্যাদি মিলিয়ে আমরা একটা জটিল পরিস্থিতির ভিতরে যাব।

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ সরকার প্রধান নিজে যেখানে একজন অর্থনীতিবিদ, নিজে যখন একজন ব্যবসায়ী, সামাজিক ব্যবসা যেখানে তিনি চালান, তারপরও নানা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। এরপরেও আজকে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে চিত্র যে হাল সেটা কেন হলো? এটা আপনার বিবেচনায় কী বলে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ এটা তো মতি ভাই একদিকে হলো পরিস্থিতির যে মূল্যায়ন করেন সে মূল্যায়নটা সঠিকভাবে হয় কিনা। আপনি যদি পুরনো সরকারের আমলে ফিরে যান তখন সেইখানে সরকার প্রধান একটা নিজস্ব জগতে বসবাস করতেন যার সাথে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক ছিল না। উনার সমস্ত তোষামোদকারীরা যেভাবে বলতো উনি সেগুলি বিশ্বাস করতে পছন্দ করতেন। আমাদের তো বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে যে বর্তমান সরকার প্রধান তো ওই ধরনের তোষামোদকারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত না। কিন্তু উনি অপরদিকে যে সমস্ত পদক্ষেপগুলো নিচ্ছেন যাদের মাধ্যমে সেটা তো আবার দেশ এবং জাতির বর্তমান প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে না। যত বাগাড়ম্বর করা হয় তার সামান্যতম বাস্তবায়নের দিকে আমরা ওভাবে দেখি না। এবং আরো দেখি না এটা যে সময়বদ্ধ একটি সরকার যেটা চলে যেতে হবে আর কয়দিন ভিতরে, তার আচরণের সাথে এই সরকারের সেই আচরণের সাথে আমি খুব বেশি মিলাতে পারি না। এবং এটার সাথে যখন অন্য ধরনের বক্তব্য আসে, বিভিন্ন ধরনের। এখন তো বিভিন্ন ধরনের প্রচার সত্য মিথ্যা মিলিয়ে চারপাশে হচ্ছে। এমনকি আপনি লক্ষ্য করে দেখেন যে আগে আমরা সরকারকে বা সরকারের আগে আমলাদের ধরে

সমালোচনা হতো। তারপরে আমলাদের ছেড়ে এখন সরকারকে দিয়ে হচ্ছে। এমনকি ব্যক্তি উপদেষ্টাদের নিয়ে হচ্ছে। তাদের বিভিন্ন রকমের আচরণ এবং রাজনৈতিক তাদের অভিপ্রায় নিয়ে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে এখন সরকার প্রধান নিয়েও অনেকে আলোচনা করেন দেখি আমি বিভিন্নভাবে। এবং খুবই দুঃখজনক আলোচনা হয়। সেটা হলো যে অভিযোগ ওঠে সরকার প্রধানের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়িক সুবিধা নিচ্ছে। এইরকম একটা অভিযোগ ওঠে এবং একাধিক বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ হিসেবে বলা হয়। এই ব্যাপারে আমার কাছে যেটা মনে হয় মনে রাখতে হবে আমরা যে নির্বাচনের দিকে যাচ্ছি সেই নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকার প্রধানের নৈতিক অবস্থান যেন দুর্বল না হয়। উনার নৈতিক অবস্থান যদি দুর্বল হয় তাহলে নির্বাচনটা সুষ্ঠুভাবে করার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। দুটো জিনিস আমি বলি। সরকার প্রধানের নৈতিক অবস্থান আর সেনাবাহিনীর ভূমিকা এই দুটোই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের দুইজনের ভিতরে সহযোগিতা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে মনে হয়। সরকার প্রধান নিয়ে এবং উনার মত একজন পূজনীয় ব্যক্তিকে নিয়ে এরকম হওয়াটা খুবই দুঃখজনক। তো আমার আকাঙ্ক্ষা হলো যে এই সমস্ত আলাপ আলোচনাকে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশে যেটা হয় সেটা হলো আপনি গ্রাহ্য করে ব্যাখ্যা দেন। এটা যে সত্য না এটাকে আপনি তখন বলতে হয় না বললে পরে লোকের মনে হবে যে এটার ভিতরে যে কোন স্বার্থের সংঘাত হচ্ছে কিনা আমার সর্বোচ্চ ব্যক্তিকে নিয়ে। সেহেতু আমার প্রত্যাশাটা হলো যে ইউনুস সেন্টারের পক্ষ থেকে, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব না, ইউনুস সেন্টারের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। যে সমস্ত এবং যার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সামাজিক ব্যবসায়গুলো আছে, তারা কোন ধরনের অন্যায় কাজ করেনি অথবা নীতির ক্ষেত্রে কোন বরখেলাপ হয়নি এবং কোন ধরনের স্বার্থের সংঘাত হয়নি। আমি এটাকে শুধুমাত্র গ্রামীণের ব্র্যান্ড নেমের ব্যাপার হিসেবে দেখছি না। আমি আমার গণতান্ত্রিক উত্তরণের সাথে মিলিয়ে দেখতে চাচ্ছি। কারণ প্রধান উপদেষ্টাকে শক্তিশালী থাকতে হবে। নৈতিক অবস্থানের উপরে থাকতে হবে। এটা নির্বাচিত সরকার না। নির্বাচিত সরকার যদি না হয় তাহলে তার নৈতিক অবস্থানটাই হলো তার বৈধতা। এবং সেই নৈতিক অবস্থানকে আমরা একটি ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে সৃষ্টি করেছি। এইজন্যই সরকার বা সরকারের সংশ্লিষ্ট মানুষদের যেকোন ধরনের অপকর্ম বা বরখেলাপ আমাদের পীড়িত করে। একটা তো আছে যে আস্থা রেখেছি আস্থার ব্যাঘাত ঘটলো কিন্তু আমার তার চেয়েও বেশি দুশ্চিন্তা হয় যে আমরা যে গণতান্ত্রিক উত্তরণটা করব এইটা করার জন্য তারা যথেষ্ট যোগ্যতা রাখে কিনা। কারণ ঘুরে ফিরে মতি ভাই দুটো প্রশ্ন ফিরে আসবে। একটা প্রশ্ন ফিরে আসবে এই সরকার কতখানি নিরপেক্ষ যদি নিরপেক্ষ না হয় তাহলে সে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করবে, অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন করবে, অন্তর্ভুক্তি বলতে যাই বুঝেন না কেন। এবং সে কারোর প্রতি পক্ষপাত করবে না কোন আঁতাতের নির্বাচন হবে না, কোন সিট ভাগাভাগির নির্বাচন হবে না। এইরকম নিরপেক্ষতা আছে কি না এটা একটা বড় বিষয়। এটা শেষদিন পর্যন্ত থাকবে। এই প্রশ্ন উঠবে বাম ডান সবসময়। তো এইটাতে সর্বদা পরিষ্কার থাকতে হবে। এইটার অংশ হিসেবেও আমার আগের প্রশ্নের উত্তরও এটার সাথে যুক্ত। আর দ্বিতীয় যেটা আসবে সেটা হলো যে যদি নিয়তও ঠিক থাকে, যদি করার ইচ্ছাও থাকে, নিরপেক্ষও যদি থাকে, কিন্তু সেটাকে কি বাস্তবে তারা প্রতিফলিত করতে

পারবে কিনা। সেটা করার মত সক্ষমতা আছে কিনা। সেটা করার জন্য, সক্ষমতার জন্য যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন এবং স্থানীয় পর্যায়ে মানুষের সমর্থন, অন্যান্য দলের ইতিবাচক মনোভাব এবং সেনা সেনাবাহিনীর ভূমিকা প্রয়োজন তা আছে কি না। কারণ সেনাবাহিনী ব্যতিরেকে মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠু নির্বাচন করা বর্তমান সরকারের বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভব না। তার আনসার, ভিডিপি, বিজিবি বা র‍্যাব ইত্যাদি আপনি যাই বলেন না কেন। এই দু'টি বিষয় সরকারের নিরপেক্ষতা এবং সরকারের সক্ষমতা ঘুরে ঘুরে আসবে। সেহেতু আজকে সন্ধ্যায় যে আমি আলোচনা করছি আমি প্রত্যেকটা বিষয়কে ওই দু'টি প্রশ্নের সাথে যুক্ত করে দেখতে চাই। আপনি যদি প্রধান উপদেষ্টার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলেন তাহলে আমি দেখি তার নিরপেক্ষতা নষ্ট হলো কিনা? তার কার্যকারিতা দুর্বল হলো কিনা? আপনি যদি বলেন যে যেই ধরনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হচ্ছে এইটার ফলে কি উনার নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে কিনা, সুবিধা দিতে হচ্ছে কিনা অথবা উনি কার্যকরভাবে থাকতে পারবেন কিনা? যদি জিনিসপত্রের দাম ঠিক না থাকে, বিনিয়োগ না থাকে, কর্মসংস্থান না থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি সামাজিক সুরক্ষার ভাতা বিতরণ যদি ঠিকমত না হয় এবং যদি বিদেশ থেকে টাকা না আসে ঠিকমতো কিন্তু আমি সবসময় আমার দৃষ্টিতে এই দুটো প্রশ্নকে লিটমাস টেস্ট হিসেবে দেখি। মানে এটি চূড়ান্ত পরীক্ষার জিনিস। যেকোন ঘটনা যখনই ঘটে ঢাকাতে আমি সকালবেলা আমি তখন চিন্তা করি যে এটা কি সরকারি নিরপেক্ষতার উপরে কোন প্রভাব ফেললো বা এটাতে কি তার নিরপেক্ষতা আরো বেশি প্রশ্নবিদ্ধ হলো কিনা? আর দ্বিতীয়ত এই কাজটার ভিতর দিয়ে সরকার কি তার ভালো নির্বাচন করার ক্ষমতা আরো বাড়াতে পারলো নাকি সে একটু দুর্বল হয়ে গেল? এই দুটো প্রশ্ন।

মতিউর রহমান চৌধুরী: এই ইমেজ নিয়ে সরকার কি একটা ভালো নির্বাচন করতে পারবে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দ্রুততার সাথে সরকারের ভাবমূর্তিতে ক্ষয় হচ্ছে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এটা অনেক ক্ষেত্রে প্রধান ব্যক্তির কাছ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। এইজন্যই বললাম ব্যাখ্যার দরকার আছে। উনাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। যদি কারোর মনে সংশয় থাকে সেগুলো দূর করা উচিত। এগুলোকে অবজ্ঞা করা উচিত না। কারণ এই সমস্ত থেকেই কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমরা সেই ৭২ সাল থেকে এই ঘটনাবলী কীভাবে হয়, মানুষের মনে গুজব কিভাবে ছড়ায়, সত্য মিথ্যা মিলিয়ে, সেগুলো তো আমরা দেখেছি। সেহেতু এগুলোকে অস্বীকার করা উচিত না। আমার অহমিকা বোধ বা আমাদের আত্মশ্লাঘা যেন এগুলোকে অবজ্ঞা না করে। তো সেই ক্ষেত্রে সরকার যদি আগামী দিনে এমন কিছু পদক্ষেপ না নেয় যেটার ফলে তার উপদেষ্টামন্ডলীর কার্যকারিতার কথা যদি বলে, নাগরিক সমাজের সাথে তাদের যুক্ততার কথা যদি বলেন, সেইটা আপনি সাধারণভাবে দেশে এবং বিদেশের যে রাজনৈতিক শক্তির আছে তাদের সাথে বোঝাপড়া, বিদেশীরা এর মধ্যে অনেক বেশি আগের চেয়ে সংশয়বাদী হয়ে গেছে সেটা দেখেছেন। জাতিসংঘ তো ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগকে বাতিল করার ক্ষেত্রে একটা মতামত দিয়েছে। তো এই শক্তিগুলো নিয়ে যদি না দাঁড়ায় তাহলে তার পক্ষে নির্বাচন একা করা জটিল হবে। সেহেতু আপনার নাগরিক সমাজের সাথে,

ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সাথে, আপনার রাজনৈতিক শক্তির সাথে, মিডিয়ার সাথে এবং সর্বশেষ সেনাবাহিনীর সাথে এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সামগ্রিকতায় একটা বোঝাপড়া লাগবে। এই বোঝাপড়াটা যদি না থাকে তাহলে একটা অরাজনৈতিক সরকার, অনির্বাচিত সরকারের পক্ষে এইরকম দুরূহ একটা জাতীয় দায়িত্ব পালন করা কষ্ট হবে। যেহেতু আমি বলছি ওই যে দুটো প্রশ্ন বারবার বলছি সরকার কি নিরপেক্ষ? সরকার কি ক্ষমতা রাখে? এই নিরপেক্ষতা এবং ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে হলে একটা নতুন উদ্যোগে জাতীয় ঐক্যমত লাগবে। এইটা ওই ঐক্যমত কমিশনের ব্যাপার না। এটা ভিন্ন জিনিস।

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ সরকার নিরপেক্ষ কি না- এই প্রশ্ন বারবার আসছে। এই আশঙ্কা আপনার মধ্যে আছে। এটা কেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তো আসবে। এটার একটা বড় কারণ হলো অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনাবলী ঘটছে তাতে সরকার প্রতিক্রিয়া একটু সময় নিয়ে করছে এবং যথাসময়ে করছে না প্রতিক্রিয়া। এক নম্বর। দুই নম্বর হলো বিভিন্ন জিনিসকে মনে হয় পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে। যেটার ভিতরে জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হয় বলে মনে হয়। এবং সবচেয়ে বড় হলো সরকারের বিভিন্ন ধরনের পদায়ন, তার উপদেষ্টামণ্ডলী থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন উচ্চ পদে যাদের করছে, বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এমন দেখতে পাচ্ছি যে সরকারের ভিতরের লোকেরা সরকারে থেকে রাজনীতি করছে। এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে তো সাধারণ মানুষের মনে সংশয় তৈরি হবে। শেক্সপিয়ারের কথা আছে না যে সিজারের স্ত্রীকে সবসময় সব ধরনের দুর্নীতির উদ্বেগ থাকতে হবে। আপনি যদি সিজারের স্ত্রী হন অর্থাৎ আপনি যদি রাজার স্ত্রী হন তাহলে আপনার সতীত্ব সম্বন্ধে যেন সমাজে কেউ প্রশ্ন তুলতে না পারে। এটা সবচেয়ে বেশি মনোযোগের ভিতরে রাখতে হবে এই কথাটাই আমি মনে করানোর জন্য এইটা বলছি। নিরপেক্ষতা আছে কিনা আছে এটা বড় কথা না। লোকে গ্রহণ করে কিনা ওইটাই বিষয়। আপনি তো জানেন রাজনীতি হলো পারসেপশন। মানুষের মনের ভিতরে যদি ওটা থাকে ওইটাই হলো আসল জিনিস। মানুষ কি মনে করে যে আট নয় মাসের আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি নিরাপদ কিনা অনেক বেশি নিরপেক্ষ কিনা। আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে প্রত্যাশা এবং আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা রক্ষা করার ব্যাপারে, আপনি ওয়াদাকে রক্ষা করছেন কিনা।

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ ঢালাও মামলা নিয়ে আপনি কয়দিন আগে কথা বলেছেন। আপনার মূল্যায়নটা কী? আসলে কেন এই মামলা হলো? আর এর পরিণতি কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ মামলার ব্যাপারে সাধারণভাবে আমি মনে করি যে যারা যারা অনাচার-দুরাচার, দুর্নীতির সাথে যুক্ত তাদের বিচার হতে হবে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘটনাক্রমে তারা তো হয়তো হত্যা করে নাই। আপনি দিলেন তো হত্যা মামলা এবং

প্রত্যেকটা মামলাই টিকবে না যদি কোন কারণে কোনদিন একটু সুবিচারের মত পরিস্থিতি হয়। সেহেতু আপনি তো আমার অপকার করলেন এগুলির মাধ্যমে এবং তারপরে দেখেন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলো যে এরকম মামলা হবে না। তারপরেও হচ্ছে। তারপরে বললেন যে এগুলোকে কাউকে ধরা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত না হওয়া যায়। সেটাও করতে পারছেন না। আপনি তো প্রথম প্রশ্নটা নিয়ে আমার সাথে কথা বললেন। নিরপেক্ষতা। আমি আপনাকে দ্বিতীয় প্রশ্নে নিয়ে যাচ্ছি। সক্ষমতা। অর্থাৎ সরকার যে সিদ্ধান্তগুলো করে সেই সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য সে সক্ষমতা দেখাতে পারছে না। সে যেই সিদ্ধান্তগুলো দিচ্ছে সেগুলো হয় দেরি করে দিচ্ছে অথবা প্রাক সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আপনি তথাকথিত মব কালচার বা ভায়োলেন্স বা মব জাস্টিস দেখেন। সেনাবাহিনীর থেকেও বলা হলো সেদিন যে এটা হবেনা তারপরেও তো হচ্ছে। অর্থাৎ দেশের ভিতরে একটা কার্যকরী সরকারের যে সমস্ত অনুষঙ্গ বা যে সমস্ত প্রকাশ থাকে তার ভিতরে নাগরিক নিরাপত্তা হলো এক নম্বরে। যদি বলেন নাগরিককে উন্নয়ন, শিক্ষা দিবেন ইত্যাদি এগুলো অনেক পরে। সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার বিষয়টি, অধিকারের বিষয়টি এক নম্বরে। সেজন্য আপনি যদি আমাকে বলেন বিচারের কথা, সংস্কারের কথা, নির্বাচনের কথা, আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিব অধিকারের কথা, নিরাপত্তার কথা, সুরক্ষার কথা। কারণ অধিকার, নিরাপত্তা, সুরক্ষা না দিলে আমি কী সংস্কার করব আর কী নির্বাচন করব। আর কী ধরনের বিচার হবে যদি নৈতিক অধিকারকে অবজ্ঞা করে বিচার করেন। সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। আমাকে সুরক্ষা না দিয়ে নির্বাচনে নিয়ে যান সেটাও হবে না। একই রকমভাবে যদি আপনি সংস্কারের কথা বলেন সেটা সর্বজনীনভাবে, সবার জন্য গ্রহণযোগ্য যদি না হয় তাহলে হবে না। সেহেতু আজকে আমি আপনাকে বলতে চাই সবাই আমরা তিনটি বিষয় নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকি। সংস্কার, বিচার, নির্বাচন। আর আমি আপনাকে বলি নিরাপত্তা, সুরক্ষা, অধিকার। একটা রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য বা প্রাথমিক কর্তব্য হলো প্রত্যেকটা নাগরিকের নিরাপত্তা এবং অধিকার দিতে হবে। ওই যে ব্যবসা বাণিজ্য যে করে তার থেকে চাঁদা নেয়। এখনো চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়। এখনো বালুমহল থেকে আরম্ভ করে ইজারা পর্যন্ত ঘটনাবলী ঘটে। এখনো চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে, পদায়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে। এইগুলো আমার অধিকারকে নষ্ট করছে। যদি বলেন যে সংস্কার করে এগুলোকে ঠিক করে ফেলবো তো আট নয় মাস তো হয়ে গেল। সেইভাবে কমাতে পেরেছেন তো হলো না। এবং সম্প্রতি যেটা হয়েছে তাতে আমাদের খুব বিব্রতকর অবস্থা হয়েছে। সুইস ব্যাংকে টাকা ৩৩ গুণ বেড়ে গেল। আরে খুবই তো একটা বিব্রতকর অবস্থা। আমাদের জিজ্ঞেস করে আপনারা বলেছেন ১৬ বিলিয়ন গেছে কিন্তু দেখেন কত বেড়ে গেছে। তাহলে এখনো কি টাকা যাচ্ছে? হিসাব-টিসাব কীভাবে করেছে। এগুলি তুলনীয় হিসাব কিনা। আবার দুবাই আর ইংল্যান্ড আমেরিকা থেকে টাকা সব এসে এখনো জমা হলো কি না? আর টাকা যাওয়াও কি অব্যাহত আছে কি না?

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ এখন কি দুর্নীতি কমেছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ এই পরিমাপ তো আপনাকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে। কিন্তু দুর্নীতির তো দু'টো মাত্রা আছে। একটা তো হলো বড় দুর্নীতি,

মেগা দুর্নীতি। মেগা প্রকল্পে মেগা দুর্নীতি। এটা হলো এক জিনিস। সেটা হয়তো কোন ক্ষেত্রে কিছুটা কম থাকতেও পারে। কারণ এখন বিনিয়োগও কম হচ্ছে। আগের চেয়ে হয়তো দেখভাল বা নজরদারী একটু ভালো করি। কিন্তু ছোট দুর্নীতি প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের সাথে স্কুল-কলেজ থেকে আরম্ভ করে, স্বাস্থ্যসেবা থেকে পুলিশের সেবা পাওয়া থেকে আরম্ভ করে, পরিবহন থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায়, বাজার ইত্যাদির ক্ষেত্রে হচ্ছে। সেইটা সাধারণ মানুষের জীবনে তারা অনুভব করছে না সেটা তো না। মাত্র এই সরকারের আমলেই তো সার্ভে করে বের হলো যে অন্তত নূনতম ৩৫ শতাংশ মানুষকে ঘুষ দিতে হচ্ছে সেবা পাওয়ার জন্য। সেহেতু ওই ক্ষেত্রে যে আমরা বিরাট বৈপ্লবিক রূপান্তর করে ফেলেছি তা তো না। কিন্তু ওই রূপান্তরটা করা আরো অসম্ভব হবে যদি আপনি মানুষকে নিরাপত্তা না দেন। সে যদি কথা বলতে ভয় পায়, আপনি যদি তার অধিকারকে ঠিকমত না দেন তাহলে তো হবে না। এইটা তার অধিকারের ভিতরে পড়ে যে সে সরকারি সেবা পাবে এবং সামাজিক সুরক্ষা পাবে। আর আপনি যদি নিরাপত্তা, অধিকার এবং সুরক্ষা না দেন, আমি বারবার বলছি যে একটা সরকারের এটা ন্যূনতম কর্তব্য। ওটা কি বলে খেতে না দেন তো চুরি সামলান। তো এই সেই জায়গাটাতে চলে আসছে। আপনি তাকে যদি অর্থিকভাবে একটা কর্মসংস্থান নাও দিতে পারেন কিন্তু তাকে যেটুকু দেন সেটুকুতে তাকে যেন ঘুষ, দুর্নীতির ভিতরে না যেতে হয়। এবং এখন ঘুষ দুর্নীতির সমস্যাটা হলো যে আগে তো একটা কাঠামো ছিল। আমি জানতাম আপনার কাছে গেলে, আপনাকে কিছু খুশি করতে পারলে আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিবেন। এখন তো অনেকে বলছে যে কাকে খুশি করবে সেটা বুঝে উঠতে পারছে না।

মতিউর রহমান চৌধুরী: পাওয়ার হাউস অনেক জায়গায়।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এখন এইটা আরেক সমস্যা হয়ে গেছে। এবং আগের যেটা সুবিধা ছিল সেটা হলো যে যারা নিতেন তারা পরিশীলিতভাবে একটা কাঠামো দাঁড় করিয়ে ফেলেছিলেন। এখন যেটা হয় কথার বাচনভঙ্গি এবং প্রকাশের ভেতরে ওটা খুবই একটু কদর্য হয়ে যায়। জিনিসটাতে তখন আবার নিজেরই একটু অস্বস্তি লাগে যে আমি এরকম একটা জিনিসের অংশ হয়ে যাচ্ছি। নাগরিকদের কাছ থেকে যেটা শুনছি সেটা বলছি আরকি। সেহেতু জনমানুষের জীবনের চলার ক্ষেত্রে তার যেই অসুবিধাগুলো হচ্ছে এইগুলোকে যদি নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তাহলে তো হবে না। আপনি দেখেন কতগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত ছিল। ঢাকা শহরে বাস পরিবহনকে ঠিক করার জন্য কত ধরনের সিদ্ধান্ত হয়েছে না? রং বদল হবে, বাতি জ্বলবে ইত্যাদি। আমরা তো কিছু পরিবর্তনশীল মানে দৃশ্যমান উন্নয়নের কতগুলো জায়গাতে আসতে পারতাম। তাহলে আমরা বলতে পারতাম ওই সরকারের আমলে কিন্তু ভাঙ্গা বাসগুলোকে সরিয়েছে, রং করেছে, রুট করেছে। লাল-নীল-সবুজ রুটগুলো চালু হয়েছে। একটা কোম্পানি হয়েছে। এটা হলো না কেন? একটা সাধারণ উদাহরণ হিসেবে আপনাকে এটা আমি বললাম। উপরন্তু যেই সমস্যা সমস্যা না তাকে আপনি সমস্যা বানালেন। আপনি এখন কি চ্যানেল বানাবেন না সুড়ঙ্গ করবেন নাকি টানেল করবেন নাকি কি বলে আর করিডোর করবেন- এই বিতর্কে ঢুকায়ে দিলেন আমাকে। মানে যেগুলি যা ছিল না তাও আপনি বানায়ে দিলেন। গত

সরকার একটাই ডিপি কোম্পানির সাথে চিটাগং পোর্ট দিবে বলেছিল তারা ওটাকে অসমাপ্ত রেখে গেছে। আপনার এটার ভিতরে ঢোকার দরকার কি? এটা একটা স্থগিত অবস্থার ভিতরে রয়েছে। নতুন সরকার আসবে। সে গত সরকারের সাথে যেই কোম্পানির যে চুক্তি হয়েছে এগুলিকে দেখবে। ভালো না মন্দ তারা দেখবে। আপনার এর ভিতরে ঢোকার দরকার কি? আমি বলতে চাচ্ছি আপনার যেটুকু গুড উইল, যেটুকু সামাজিক পুঁজি, আপনার যেটুকু সুনাম আছে সেটাকে আপনি কোথায় খরচ করবেন এটা তো একটা কৌশলগত বিষয়। আমার সমস্ত কিছু আমি দিব ওই দুইটি প্রশ্নে। সরকার নিরপেক্ষতাকে প্রদর্শন করার জন্য এবং সরকারের কার্যকারিতা দেখানোর জন্য। যে তুমি আমাকে যেই জন্য এনেছো আমি সেটাকে নিয়েছি এবং আমি তোমাকে এটা দিব। এই দু'টো জায়গায়। তো এই সুড়ঙ্গ বানাবেন না টানেল বানাবেন এগুলি করে, ওই চিটাগং পোর্ট এগুলি করে অযথা কেন সমস্যা সৃষ্টি করছেন? আপনি আসল কাজে মনোযোগ দেন। একটা গণতান্ত্রিক উত্তরণ সুষ্ঠুভাবে যাতে লোকের স্মৃতিতে থাকে। এরকম একটা সরকার ছিল যে সরকার আমরা সবাই মিলে অভ্যুত্থান করে নিয়ে এসেছিলাম এবং যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছিলাম তার অন্তত ন্যূনতম এবং মৌলিক বিষয়গুলি উনারা করে গেছেন। সেটা একটি গণতান্ত্রিক উত্তরণ, একটি নির্বাচন এবং এটাকে করার ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া। সংস্কার করতে পারলেন, বিচার করলেন, এগুলি যদি পারেন খুব ভালো কথা।

মতিউর রহমান চৌধুরী: দাদা, আপনি জানেন যে ইরান-ইজরাইল যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধের পটভূমিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কী চ্যালেঞ্জ দেখছেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আসলে চ্যালেঞ্জটা আন্তর্জাতিকভাবে বুঝতে হলে ইজরাইল-ইরান আক্রমণের আগে বুঝতে হবে যে ট্রাম্প সাহেবের যে ধরনের শুষ্ক উনি আরোপ করেছেন সেগুলি। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আবার বলি, সরকার যদি দুর্বল হয় তাহলে এই সমস্ত বিষয় তার পক্ষে ব্যবস্থা করা দেশের স্বার্থে কষ্টকর হবে। সেহেতু তেলের দাম বাড়বে। দীর্ঘমেয়াদে আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয় আছে। আমি আপনাকে একটু আগে বললাম যে কতগুলো বিষয়ে আমাদের এক্যমত্য রাখতে হবে। যেটা সরকারের বদলের সাথে যুক্ত না। জ্বালানি নিরাপত্তা তার ভিতরে একটা। আরেকটা তো রপ্তানির ক্ষেত্রে। আরেকটা এটার সাথে হবে রেমিটেন্স। কারণ এই সমস্ত দেশে থেকে আমার কর্মক্ষম লোকজনের আসা-যাওয়া ইত্যাদির বিষয় রয়েছে। সেহেতু অনেকগুলো বিষয় এটার সাথে যুক্ত এবং বাংলাদেশের এক-দেড় কোটি মানুষ বিদেশে থাকে। এইরকম একটা সময় তাদের প্রত্যেকের নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এইটার সাথে যুক্ত হয় আগামী দিনে শান্তি রক্ষাতে আমাদের ভূমিকা কী দাঁড়াবে? যেহেতু আমাদের শান্তিরক্ষা বাহিনীও আছে। এটাও একটা বিষয়। আপনি দেখেন একটা যেকোন দেশে এরকম একটা ঘটনা হলে সর্বপক্ষীয়, সর্বদলীয় বলিনি, সর্বপক্ষীয় আলোচনা হয় এরকম একটা জিনিসকে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে। দেশ হিসেবে আমরা কীভাবে মোকাবেলা করব? বিশেষ করে একটি অনির্বাচিত সরকার হিসেবে। একটা সর্বপক্ষীয়

সর্বদলীয় আলোচনা হলো না দেশের এইরকম একটি সংকটের সময়ে। আন্তর্জাতিক সংকটে আমি কীভাবে ভূমিকা রাখবো? আমি সাধারণ উদাহরণ দেই। ইজরাইলের সাথে ইরানের যুদ্ধ হলো। এখানে কি আমি বলব যে আমি এটাকে নিন্দা করি, নাকি আমি বলব আমি শঙ্কিত, নাকি আমি বলব আমি চিন্তিত। মানে শব্দের ব্যবহার তো করবেন। ওই মনোভাবটা ঠিক করার জন্য স্বল্পমেয়াদে, দীর্ঘমেয়াদে আপনি তো কোন আলাপ আলোচনা করলেন না কারোর সাথে। তো কোন আলোচনা নাই উপরন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখন একটি জটিল অবস্থার ভিতরে আছে। আমি নরম করে কথাটা বললাম। এবং তারা কোন ধরনের ভূমিকা সেই অর্থে পালন করছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যক্তি বিশেষ করছে। সেইজন্যই আমি বলছি এই সরকারের কাছ থেকে যেইভাবে জনমানুষ তাদের নিয়ে এসেছে তারা কিন্তু জনমানুষের কাছে এখন সেইভাবে আর পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা দেখায় না বা চেষ্টা সেভাবে করে না। আপনি যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তুললেন, আমি বলছি উচিত ছিল প্রধান উপদেষ্টার একটা সভা ডাকা। সমস্ত রাজনীতিবিদ এবং পেশাজীবী ইত্যাদি মিলিয়ে ব্যবসায়ীদের নিয়ে উনার একটা পরামর্শ করা উচিত ছিল যে কীসের ভিত্তিতে আমি কী করব। না হলে ব্যক্তিবিশেষের কাছে যদি উনার একমাত্র চিন্তাটা জিম্মি হয়ে যায় এটা দেশের জন্য উপকারী হবে না। সেজন্য আমি মনে করি এইরকম পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য উনার সর্বপক্ষীয় পরামর্শ সভা করা উচিত। এই পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে এবং ব্যবসায়িকভাবে কী ধরনের প্রতিক্রিয়াতে যাবো, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমাদের বন্ধুদের কথা বিবেচনা করে, এটা একটা বড় ব্যাপার বলে আমি মনে করি।

মতিউর রহমান চৌধুরী: অনেক ধন্যবাদ, দাদা। হাতে আর আড়াই মিনিট আছে। সর্বশেষ প্রশ্নটা করতে চাই। পৃথিবীর নানা দেশে যেখানেই বিপ্লব বা অভ্যুত্থান হয়েছে সেখানে কোন না কোন ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কেন বিপ্লব বা অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: একটা তো বড় কারণ হলো যে বিপ্লবের পক্ষের শক্তি যারা তারা সেই অর্থে কিন্তু ঐক্যবদ্ধ অনেক ক্ষেত্রে আর থাকে না। কারণ হলো তারা ঐক্যটা থাকে একটি নেতিবাচক বিষয়ের উপরে। ধরুন, আগের সরকারকে তাড়ানোর ক্ষেত্রে সকলে মিলে এক হয়েছে। কিন্তু আগামী দিনে আমরা কীভাবে দেখবো? এটার ক্ষেত্রে একেক জনের একেক রকমের দার্শনিক চিন্তা আছে। দর্শনগত চিন্তা আছে। মূল্যবোধগত ব্যাপার আছে। তাদের নিজস্ব স্বার্থের ব্যাপার আছে। সেই স্বার্থে আমরা এখন বিভক্তি দেখছি। আমি এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বা দায়িত্ব মনে করি সরকারের। কারণ উনারা তো সকলের পক্ষ হয়ে এসেছিলেন। সেহেতু সকলের সম্মতিতে দেশ পরিচালনা করাটা উনার কর্তব্যের ভিতরে, উনার অঙ্গীকারের মধ্যে পড়ে। অনুরাগ বা বৈরাগের বশবর্তী না হয়ে সেটা করার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক কোন আচরণগতভাবে পদক্ষেপ দেখতে পারছি না। অনেক ক্ষেত্রে যে কাজগুলো হচ্ছে এগুলো যেকোন সরকার যেকোনো সময় করে এবং এইটা নিয়ে কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকে না। বর্তমান সময়ে আমি মনে করি বর্তমান সরকার তার নিরপেক্ষতা এবং কার্যকারিতা এই দু'টো বিষয়ে যদি ফিরে যেতে চায় তাহলে তার একটি অন্য ধরনের আচরণ লাগবে। সর্বপক্ষীয়

সর্বদলীয় একটি আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে উনাকে আগামী দিনে আগাতে হবে। যেখানে আলাপ আলোচনা করছেন সেই আলাপ আলোচনাগুলো হয়তো এই কাজের জন্য এই মুহূর্তে উপকারী নাও হতে পারে। আর যেটা করা দরকার, যেটা উপকারী হতো সেটা হয়তো করা হচ্ছে না। এটি নিয়ে এখন দৃষ্টিস্তার ভিতরে থাকি। অনেক ধন্যবাদ।

মতিউর রহমান চৌধুরীঃ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

বাংলা ভিশন নিউজ
২৩ জুন ২০২৫

অন্তর্বর্তী সরকারের এক্সিট পলিসি চিন্তা করার সময় এসেছে

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য অন্তর্বর্তী সরকারকে কীভাবে পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে, তা ঠিক করার পরামর্শ দিয়েছেন। আজ বুধবার ঢাকার একটি হোটেলে ‘ডেমোফ্রেসি ডায়াস’ নামের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি এই পরামর্শ দেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ‘এই সরকার কী পদ্ধতিতে যাবে, সেটা এখন স্পষ্ট করা জরুরি। এক্সিট পলিসি চিন্তা করার সময় এসেছে। যেটুকু সময় আছে, এর ভেতর দিয়ে এই সরকার কী অর্জন করে বের হয়ে যেতে চায়, জাতির উদ্দেশে ভাষণের মধ্য দিয়ে সেটাও বলার সময় এসেছে।’

বিশিষ্ট এই অর্থনীতিবিদ মনে করেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সরকার গঠন, সংবিধান সংস্কার ও নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলো এখনো চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। আগামী নির্বাচন কীভাবে হবে, আইনসভা কীভাবে গঠিত হবে, তা নিয়ে দলগুলোর মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে।

সংস্কারকে একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, যতটুকু না করলেই নয়, ততটুকু সংস্কার (আগামী নির্বাচনের আগে) করা উচিত। বর্তমান সরকার যে কাজকর্মগুলো করছে, আগামী সরকার সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে বৈধতা দেবে কি না, এই বিষয়গুলো এখনো সামনে রয়ে গেছে।

চলমান সংস্কার হিসেবে অনেক সংস্কার পরের সরকার করবে, এটা অন্তর্বর্তী সরকারকে মেনে নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, তা না হলে ‘সংস্কার’ ‘সংস্কার’ করে অসংস্কারের কাজের ভেতরে যুক্ত হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে।

দেবপ্রিয় বলেন, ‘আমার পিসিমা একটা কথা শিখিয়েছেন, যতখানি খেতে পারবে, অতখানি কামড় দিয়ে। যতটুকু চাবাতে পারবে না, অত কিছু মুখে নিয়ো না।’

দেবপ্রিয় বলেন, ‘আগের তিনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রত্যেকের একটা নিজস্ব পথ (এক্সিট পলিসি) নির্ধারিত ছিল বলে তাদের কাজকর্মের বৈধতার ক্ষেত্রে খুব বেশি সমস্যা হয়নি। কিন্তু আগামী সরকার এই সরকারের কাজগুলোর সম্পূর্ণভাবে বৈধতা দেবে কি না, এই বিষয়ে প্রশ্ন এখনো সামনে রয়ে গেছে। কী কী করে যাচ্ছেন আর আগামী সরকারের জন্য কী কী রেখে যাচ্ছেন, সে বিষয়ে স্বচ্ছ বক্তব্য দিতে হবে।’

ডেমোক্রেন্সি ডায়ালগ চ্যায়ারম্যান আবদুল্লাহ আল মামুন সেমিনারে ২৬টি দেশে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যকাল, সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, ১০ মাসের বেশি যেসব অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ হয়, তাদের সফলতা তুলনামূলকভাবে কম।

আজকের পত্রিকা
৩০ জুলাই ২০২৫

অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার ও সামনের পথ

ড. ফাহিমদা খাতুন

৫ আগস্ট ২০২৪ গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ একটি দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা পায়। সেই সময়ে অর্থনীতির একাধিক সূচকের নেতিবাচক পারফরম্যান্সের ফলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দুর্বল ছিল। কম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, দুর্বল রাজস্ব আহরণ, নিম্নমুখী বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও প্রবাসী আয়, স্থবির বিনিয়োগে এবং দুর্বল ব্যাংক খাত নিয়ে অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা ছিল। এ বাস্তবতার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে গিয়ে বৈষম্য বেড়ে চলেছে। এসব দুর্বলতার মূল কারণ ছিল দীর্ঘদিনের কাঠামোগত সমস্যা, যা রাজনৈতিক অস্থিরতায় আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল।

৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল গণনচুসী। জনগণ আশা করেছিল নতুন অন্তর্বর্তী সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার করবে, অর্থনীতিকে গতিশীল করবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাওয়া ছিল একটি গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করে মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ করে দেয়া এবং একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরে যাওয়া।

এক বছর পর যদিও কয়েকটা অর্থনৈতিক সূচক কিছুটা উন্নতি করেছে, অধিকাংশ সূচকই এখনো আগের দুর্বল অবস্থান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। কিছু ইতিবাচক উদ্যোগের ফলে অর্থনীতি উপকৃত হয়েছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সুদের হারে বিধিনিষেধ শিথিল করে বাজারভিত্তিক করা হয়েছে। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি এবং সরকারি প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছে।

প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যে আমদানি শুদ্ধ কমিয়ে, দৈনন্দিন পণ্যের ক্ষেত্রে এলসি-বিষয়ক বাধ্যবাধকতা তুলে নিয়ে এবং খাদ্য ও সার আমদানিকারকদের জন্য ঋণের সুবিধা দিয়ে সরবরাহজনিত সমস্যা প্রশমনের চেষ্টা করা হয়েছে যাতে মূল্যস্ফীতি না বাড়ে। প্রথম দিকে তেমন ফলাফল দেখা না গেলেও মূল্যস্ফীতি এখন কমার দিকে। দীর্ঘ দুই বছরের বেশি সময় ধরে মূল্যস্ফীতি দুই অংকে থাকার পর তা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। জুলাই ২০২৪-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতি ছিল ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ, যা ২০২৫ সালের জুনে এসে ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২৫ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ। ২০২৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ছিল ৪ দশমিক ২২ শতাংশ। এই কম প্রবৃদ্ধির পেছনে রয়েছে বিনিয়োগের ঘাটতি, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সরবরাহ ব্যবস্থা-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, চাহিদার হ্রাস এবং সঠিক আর্থিক প্রণোদনার অভাবের মতো সমস্যা।

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর সবচেয়ে আলোচিত দিক ছিল বিভিন্ন খাতে সংস্কার উদ্যোগ। যদিও সরাসরি অর্থনৈতিক খাতে সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়নি, পরিকল্পনা উপদেষ্টা একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল সমতা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কৌশল তৈরি করা। এই টাস্কফোর্স রিপোর্টে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্টটি প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করা হলেও সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো স্বল্পমেয়াদে কিছু সুপারিশের বাস্তবায়নে আগ্রহ দেখায়নি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালী করতে পরিকল্পনা উপদেষ্টা আরো একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছেন যাতে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উন্নত হয়। আশা করা যায়, এখন থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।

অন্যদিকে ব্যাংক খাত সংস্কারে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনটি টাস্কফোর্স গঠন হয়েছে। মোটা দাগে এগুলোর মূল কাজ হলো ব্যাংক খাতের সম্পদের গুণগত মান পর্যালোচনা করা, বাংলাদেশ ব্যাংকের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ব্যাংক থেকে চুরি যাওয়া সম্পদ উদ্ধার ও খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। সরকার ‘ব্যাংক রেজলুশন অর্ডিন্যান্স ২০২৫’ অনুমোদন করেছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থান উন্নয়নে করণীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছে। এখন অনেক কাজ চলছে, এসব উদ্যোগের কার্যকারিতা নির্ভর করবে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সরকারের ওপর—তারা সংস্কার চালিয়ে যেতে আগ্রহী কিনা সেটাই হবে মূল বিষয়।

আলোচিত আরেকটি সংস্কার হলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর পুনর্গঠন। গত ১২ মে সরকার ‘রেভিনিউ পলিসি অ্যান্ড রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট অর্ডিন্যান্স’ জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে দুটি আলাদা বিভাগে ভাগ করার ঘোষণা দেয়—‘রেভিনিউ পলিসি বিভাগ’ এবং ‘রেভিনিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ’। এটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণ কর্মসূচির একটি শর্ত ছিল। তবে কর ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির

জন্য বহুদিন ধরেই অর্থনীতিবিদ ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা এ ধরনের বিভাজনের সুপারিশ করে আসছিলেন। তবে এটি এনবিআর সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে, কারণ অর্থ মন্ত্রণালয় এখানে কিছু সংশোধন আনার কথা বলেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের কথা অনুযায়ী ২০২৬ সালের প্রথম ভাগে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এ সময়ের মধ্যে নতুন করে সংস্কার উদ্যোগের আশা নেই। কারণ অন্তর্বর্তী সরকার গত এক বছরে সংস্কার করতে পারেনি। সংস্কারের ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা এবং অনীহা পরিলক্ষিত হয়েছে।

আগামীর নির্বাচিত সরকারকে অর্থনীতির ইতিবাচক দিকগুলোকে সুসংহত করতে হবে এবং অর্থনীতির ভেতরকার দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। এর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরি।

প্রথমত, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা জরুরি। সুদের হারের ক্ষেত্রে সতর্ক নীতি অব্যাহত রাখা দরকার যাতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকে। একই সঙ্গে উৎপাদন খাত যাতে ঋণের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। রফতানি আয়, প্রবাসী আয় ও বিনিয়োগ আকর্ষণে বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ এটি কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি। দুর্ভাগ্যবশত অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কালে বিনিয়োগকারীদের আস্থা খুব কম ছিল। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, নীতির অস্থিরতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, চাঁদাবাজি, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত প্রযুক্তি ব্যবহার এ আস্থাহীনতার অন্যতম কারণ। এসব কাঠামোগত সমস্যার সমাধান ছাড়া বিনিয়োগ হবে না।

তৃতীয়ত, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংস্কার প্রক্রিয়া কোনো অজুহাতে আটকে রাখা যাবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার করতে হবে আলোচনার মাধ্যমে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পুনর্বিন্যাস কার্যক্রম ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানিক জ্ঞানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। এ প্রক্রিয়া সফলভাবে বাস্তবায়ন হলে রাজস্ব আহরণে গতি আসবে।

চতুর্থত, দরিদ্র ও নিম্নআয়ের জনগণের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা বাড়াতে হবে। মূল্যস্ফীতি এখনো বেশি এবং আয় সে তুলনায় বাড়েনি। তাই নগদ সহায়তা ও খাদ্য সহায়তার পরিমাণ ও আওতা বাড়াতে হবে। খোলা বাজারে পণ্য বিক্রির পরিধি বাড়াতে হবে।

পঞ্চমত, রফতানি খাতের ঝুঁকি কমাতে কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্ক আরোপ এবং ২০২৬ সালের নভেম্বরে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের প্রেক্ষাপটে রফতানি পণ্যের বৈচিত্র্য এবং নতুন বাজারে প্রবেশ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে

পড়েছে। সরকারকে এক্ষেত্রে রফতানিকারকদের, বিশেষ করে ছোট ও মাঝারি আকারের ব্যবসার জন্য যথাযথ নীতিগত সহায়তা দিতে হবে এবং ব্যবসা পরিবেশ উন্নত করতে হবে যাতে তারা বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে।

ষষ্ঠত, আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বাড়াতে হবে। ব্যাংক খাতে চলমান সংস্কার কার্যক্রম, যেমন খেলাপি ঋণ হ্রাস, দুর্বল ব্যাংকগুলোর একীভূতকরণ এবং সুশাসন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির উদ্যোগগুলো আরো দ্রুত বাস্তবায়ন এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে চালিয়ে যেতে হবে। স্বাধীন অডিট ও তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে যাতে ব্যক্তি খাতের ঋণপ্রবাহ, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়ে। এতে তরুণদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

তবে এখন সবার আগে অন্তর্বর্তী সরকারকে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে এবং একটি গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হস্তান্তরের ব্যবস্থা শুরু করতে হবে। নির্বাচনের সময় ঘোষণার পরও বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনবিআর তথা অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্বাধীন অবস্থান অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোয় অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ঠেকাতে আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

সবশেষে আগস্ট ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫ সময়কালে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ব্যাংক খাতে সংস্কার উদ্যোগ নিয়ে, রেমিট্যান্স ও রফতানি আয় বৃদ্ধি করে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পতন ঠেকানোর মাধ্যমে বড় ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এড়াতে সক্ষম হয়েছে। তবে মূল্যস্ফীতি এখনো বেশি, বিনিয়োগ বাড়ছে না, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না এবং রাজস্ব আহরণ বাড়ছে না। কিন্তু সরকারের ঋণ পরিশোধ বাড়ছে।

বিগত এক বছরে অন্তর্বর্তী সরকার অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অনেক কম। অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা বজায় রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রাথমিক উৎসাহ ছিল তা ধীরে ধীরে কমে গেছে। তাদের জীবনের গুণগত পরিবর্তন হয়নি, হওয়ার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। সরকার থেকে যা বলা হয়েছিল তা বাস্তব রূপ পায়নি। অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে, যা মানুষকে আশাহত করেছে। তাই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব তুলে দেয়ার বিকল্প নেই। অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদেরই নিতে হবে।

বণিকবার্তা

৬ আগস্ট ২০২৫

ইশতেহারে অর্থনৈতিক সংস্কারের স্পষ্ট অঙ্গীকার থাকতে হবে

ড. ফাহিমদা খাতুন

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের সময় ঘোষণা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার আবহে একটি প্রয়োজনীয় অগ্রগতি। এত দিন নির্বাচন ঘিরে যে ধোঁয়াশা, গুজব ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিরাজ করছিল, এই ঘোষণার ফলে তা কিছুটা হলেও প্রশমিত হয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যেকোনো দেশের জন্যই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ পরিবেশের পূর্বশর্ত। তাই এই ঘোষণাকে আমরা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সম্ভাব্য সংকেত হিসেবে দেখতে পারি।

নির্বাচনের সুস্পষ্ট সময়সীমা ও কাঠামোর ধারণা পাওয়া গেছে, যা বিনিয়োগকারীদের পরিকল্পনায় সহায়ক হতে পারে। তবে এটি আস্থার একটি সূচনা মাত্র। পুরো আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে প্রক্রিয়াটির বিশ্বাসযোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও সহিংসতামুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। যদি সব রাজনৈতিক দলকে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করে, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ ভূমিকার মাধ্যমে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যায়, তাহলে দেশি ও বিদেশি উভয় বিনিয়োগকারীর আস্থা জোরদার হবে।

অন্যদিকে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা বাড়লে এই ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রভাব অনেকটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

নির্বাচনের পূর্ববর্তী সময়ে বিনিয়োগ ও ব্যবসার গতি সাধারণত নির্ভর করে রাজনৈতিক ঝুঁকির মাত্রার ওপর। অভিজ্ঞতা বলে, বিনিয়োগকারীরা এই সময়টাকে অপেক্ষাকৃত সতর্ক থাকেন। বিশেষত দীর্ঘমেয়াদি ও বৃহৎ বিনিয়োগগুলো নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কারণ সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতিগত ধারাবাহিকতা বিদ্যমান হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কর-নীতিতে হঠাৎ পরিবর্তন, রাজস্ব ব্যবস্থার রূপান্তর কিংবা বাণিজ্যিক বিধি-নিষেধ প্রভাব ফেলতে পারে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে। যদিও কিছু স্বল্পমেয়াদি বাণিজ্যিক কার্যক্রম নির্বাচনকে ঘিরে বাড়তে পারে, সামগ্রিক বিনিয়োগচিত্র স্থবির থাকে।

সরকার বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে, আরো কিছু নীতিগত পদক্ষেপ নিতে হবে।

রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, ব্যাংকিং দুর্বলতা, রপ্তানি সংকোচন, জলবায়ু ঝুঁকি ও নারীর প্রতি বৈষম্যের মতো বিষয়গুলোতে বাস্তবভিত্তিক অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রথমত, নির্বাচনের আগে ও পরে অর্থনৈতিক নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে—বিশেষত শিল্পাঞ্চল ও বাণিজ্যিক এলাকায়।

তৃতীয়ত, ব্যাংকিং খাতের সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ডলারসংকট নিরসন এবং রাজস্ব প্রশাসনের আধুনিকীকরণ করতে হবে।

এ ছাড়া ব্যবসা পরিচালনায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস এবং ওয়ানস্টপ সার্ভিস কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ হবে।

নির্বাচনী ইশতেহার শুধু রাজনৈতিক আদর্শের দলিল নয়; বরং এটি দেশের উন্নয়ন কৌশল এবং অর্থনৈতিক রূপরেখার দিকনির্দেশক।

রপ্তানি খাতে বহুমুখীকরণ, আইটি, কৃষি-প্রক্রিয়াজাত পণ্য ও হালকা প্রকৌশলকে উৎসাহ দেওয়া, অবকাঠামো ও জ্বালানিতে টেকসই বিনিয়োগ, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জলবায়ু অভিযোজন—এসবই বাস্তবমুখীভাবে উপস্থাপন করতে হবে। তবে ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দিলেই হবে না, তার বাস্তবায়নের সময়সীমা ও কৌশলও নির্দিষ্ট করে জানাতে হবে। বিনিয়োগকারীরা শুধু প্রতিশ্রুতি নয়; বরং এর সম্ভাব্য বাস্তবায়ন পরিমাপ করেই আস্থা গড়ে তোলে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, নির্বাচনের সময় ঘোষণা একটি শুভ সূচনা। তবে এই সূচনাকে ফলপ্রসূ করতে হলে নির্বাচনী পরিবেশে অন্তর্ভুক্তি, স্বচ্ছতা, নীতিগত ধারাবাহিকতা এবং অর্থনৈতিক

সংস্কারের স্পষ্ট অঙ্গীকার থাকতে হবে। তাহলেই এই রাজনৈতিক অগ্রগতি আমাদের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যেতে পারবে।

লেখক : নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

অনুলিখন : মাসুদ রুমী

কালের কণ্ঠ

৭ আগস্ট ২০২৫



স্থিতিশীলতা এসেছে, ঘুরে দাঁড়ায়নি

অগ্রগতির বিপরীতে সরকারের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বড় দুর্বলতা রয়ে গেছে

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থনীতিকে কোন অবস্থায় পেল, তা জানা ছিল বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম চ্যালেঞ্জ। এ কারণে প্রধান উপদেষ্টা অর্থনীতির ওপর একটি শ্বেতপত্র প্রণয়নের দায়িত্ব দেন আমাদের। বিগত সরকারের আমলে আর্থিক দুর্নীতি, তহরুপ ও অপচয় হয়েছিল। শ্বেতপত্রে আমরা তার একটি সম্যক ধারণা তুলে ধরেছি। এই দুর্নীতিগুলো কী ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশে সম্ভব হয়েছিল, তাও সেখানে উল্লেখ আছে। বিশেষভাবে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং আমলার সমন্বয়ে একটি ‘চোরতন্ত্র’ তৈরি হয়েছিল, যেটার বিশ্লেষণ শ্বেতপত্র কমিটির প্রতিবেদনে এসেছে। স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতি কীভাবে লুটপাটতন্ত্র কায়েম করেছে, তার একটি ‘রেফারেন্স ডকুমেন্ট’ তৈরি করা হয়েছে। আমি মনে করি, এটি অন্তর্বর্তী সরকারের একটি বড় সাফল্য।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ ছিল দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা। এর লক্ষ্য ছিল উচ্চ মূল্যস্ফীতি, টাকার মূল্যমান পতন এবং অর্থনীতির অন্যান্য কিছু সূচকে বিপদগ্রস্ততা থেকে স্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যাওয়া। এই জায়গায় সরকার নিঃসন্দেহে বহুলাংশে সফল হয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিম্নমুখী হয়েছে, যদিও এখনও তা উচ্চ পর্যায়ে। বিনিময় হার স্থিতিশীল। শুধু তাই নয়, টাকার মান যাতে খুব বেশি বেড়ে না যায়, তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এখন ডলার কিনছে।

আরেকটি চ্যালেঞ্জের জায়গা ছিল খাদ্য নিরাপত্তা। দেশে আমন ও বোরো ফসল ভালো হয়েছে। ফলে খাদ্য নিরাপত্তার জায়গায় মোটামুটি স্বস্তি রয়েছে। অন্যদিকে প্রবাসী আয় ও রপ্তানি আয় বেড়েছে। প্রবাসী আয়ে অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি হয়েছে। জমে থাকা বৈদেশিক ঋণ অনেকাংশেই পরিশোধ করা হয়েছে। এতে করে জ্বালানি আমদানি সহজ হয়েছে। গত এক বছরে বৈদেশিক ঋণ প্রবাহ মোটামুটি অব্যাহত ছিল। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদও বেড়েছে। আইএমএফের ঋণের

স্থগিত থাকা কিস্তি ছাড় হয়েছে। সরকার যে ধরনের অর্থনীতি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল, সেই জায়গায় যাতে ফিরে যেতে না হয় অর্থাৎ সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা টেকসই করতে কাঠামোগত সংস্কারের চ্যালেঞ্জ ছিল। কাঠামোগত সংস্কারের ক্ষেত্রে শ্বেতপত্রে আমরা দুটি জায়গায় প্রাধিকার দিয়েছি- ব্যাংকিং ও জ্বালানি খাত। ব্যাংকিং খাতে প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। ব্যাংকগুলোতে ফরেনসিক অডিট শুরু হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত পরিস্থিতি কল্পনার চেয়েও মারাত্মক। হঠাৎ করে খেলাপি ঋণ অনেক বেড়ে গেছে। এর প্রধান কারণ, আগে এসব ঋণ লুকানো ছিল। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ও মালিকানার ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু মূল জায়গায় অর্থাৎ পুঁজি পর্যাগুতা ও সম্ভবিতর ঘাটতি এবং আস্থার ঘাটতি মোকাবিলায় দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি।

ব্যাংক একীভূতকরণ এবং অধিগ্রহণের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি। ফলে ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু মূল সমস্যাগুলো রয়ে গেছে। পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার নানাবিধ উদ্দেশ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেখা গেছে যদিও এটা সময়সাপেক্ষ ও জটিল প্রক্রিয়া।

জ্বালানি খাতে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গত সরকারের আমলে প্রতিযোগিতা ছাড়া জ্বালানি কেনার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে। তবে জ্বালানি খাতে গ্যাসের প্রবাহের ঘাটতি রয়ে গেছে, যা বিনিয়োগ পরিস্থিতিকে বিপন্ন করছে। বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস আহরণের প্রস্তাবে বিদেশি কোম্পানির আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। দেশের ভেতরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও সেই অর্থে অগ্রগতি নেই। ব্যাংক ও জ্বালানির বাইরে বহিঃখাতের উন্নতি দৃশ্যমান। বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, যা আগেও উল্লেখ করেছি।

এসব অগ্রগতির বিপরীতে সরকারের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বড় দুর্বলতা রয়ে গেছে। রাজস্ব আদায়ে অগ্রগতি হয়নি। জিডিপির অনুপাতে রাজস্ব আয় গত অর্থবছরে আরও কমেছে। কর ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে। রাজস্ব ব্যয় বিশেষত বেতন-ভাতা, ভর্তুকি এবং ঋণের সুদ পরিশোধ এতটাই বেড়েছে যে, আমরা রাজস্ব আয়-ব্যয় উদ্বৃত্ত উন্নয়ন ব্যয়ে দিতে পারছি না। উন্নয়ন ব্যয়ের পুরোটা ঋণনির্ভর হয়ে গেছে। সরকারের আয় ও ব্যয়ের এই দুর্বলতার মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণ আগামীতে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠ মনোযোগ দরকার।

মোট দাগে আমার পর্যালোচনা হলো- এ সরকারের আমলে অর্থনীতির স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে স্বস্তি এসেছে, কিন্তু অর্থনীতি এখনও ঘুরে দাঁড়ায়নি। এর জন্য টেকসই সংস্কার দরকার। ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষণ তখনই দেখতে পাব- যখন মূল্যস্ফীতি এমন এক পর্যায়ে নামবে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার কমাতে পারে। এতে ব্যক্তিগত ঋণ প্রবাহ, পুঁজি পণ্যের আমদানি এবং জ্বালানির বাণিজ্যিক ব্যবহার বাড়বে। তখন আমরা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি দেখব।

গত এক বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈষম্য হ্রাসের প্রত্যাশা পূরণে কাজিক্ত অগ্রগতি হয়নি। মনে রাখতে হবে, বৈষম্যবিরোধী চেতনার মধ্য দিয়ে দেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান হয়েছে। এই অভ্যুত্থানের ফসল যদি পিছিয়ে পড়া মানুষের উপকারে না আসে, কৃষক যদি ন্যায্য মূল্য না পায় এবং শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি যদি মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম থেকে যায়, তাহলে খুবই পরিতাপের বিষয় হবে। এছাড়া বর্তমানে নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের আর্থসামাজিক বিপন্নতা বেড়েছে। মাথায় রাখতে হবে, অর্থনীতিতে যে স্থিতিশীলতার প্রশংসা আমরা করছি, তার মধ্যে একটি কালো প্রচ্ছায়া কিন্তু রয়ে গেছে। এখানে সরকারের মনোযোগ বাড়ানো খুবই জরুরি।

উপসংহারে বলব, অন্তর্বর্তী সরকার যেহেতু মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা করেনি, সেহেতু সাফল্য মূল্যায়নের রেফারেন্স মাপকাঠি নেই। এ কারণে বর্তমান সরকার তার অবশিষ্ট সময়ে আর্থসামাজিক সূচকের উন্নতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য কী কী করতে চায়, তা স্বচ্ছভাবে ঘোষণা করলে নির্বাচনী পথরেখা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। এতে সরকার তার চূড়ান্ত সময়ের মধ্যে কী কী অর্জন করতে চায়, তা চিহ্নিত করা যাবে। এতে করে অর্জনগুলো ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করতে এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সহায়ক হবে।

সমকাল

৮ আগস্ট ২০২৫

নির্বাচনী ইশতেহারে থাকতে হবে অর্থনৈতিক সংস্কারের রূপরেখা

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অর্থনৈতিক সংস্কারের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রতিশ্রুতির ওপর। নীতিমালা পরিবর্তন, আধুনিক সংস্কার বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে রাজনৈতিক নেতাদের দৃঢ় অঙ্গীকার থাকতে হবে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে স্পষ্টভাবে জানাতে হবে তারা অর্থনৈতিক সংস্কারে কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ক্ষমতায় এলে কী পদক্ষেপ নেবে। সেই সঙ্গে এটা তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে থাকতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর পূর্তিতে সংস্কার উদ্যোগ ও এর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিয়ে জাগো নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এসব কথা বলেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বিশেষ সংবাদদাতা ইব্রাহীম হুসাইন অভি।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, জনগণের কাছে তাদের পরিকল্পনা ও অঙ্গীকার পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা জরুরি। একইসঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে জনগণ সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারে। রাজনৈতিক ঐক্য এবং স্বচ্ছতা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সংস্কার সফল হওয়া কঠিন।

জাগো নিউজ: গত এক বছরে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে দেশের অর্থনীতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে এবং কোথায় আরও উন্নতির সুযোগ ছিল?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: অর্থনীতিতে অগ্রগতির চিত্র আমরা মূলত তিনভাবে দেখতে পারি। কিছু ক্ষেত্রে শুধু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনো দৃশ্যমান উন্নতি হয়নি। কিছু

ক্ষেত্রে উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে ইতিবাচক পরিবর্তনও এসেছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে এখনো কোনো উদ্যোগই নেওয়া হয়নি।

আগস্টের পর যখন নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক এবং প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সূচক নিম্নমুখী ছিল। এ পরিস্থিতিতে সরকারের প্রথম কাজ ছিল অর্থনৈতিক সূচকের অবনতির ধারা থামানো এবং দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীলতার জন্য কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার শুরু করা। সরকার সেটা শুরু করেছিল এবং কিছু ফলাফল এসেছেও।

বিশেষ করে ব্যাংকখাতে বেশ কিছু দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন, ব্যাংকের সম্পদমান মূল্যায়ন, আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে নিরীক্ষা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে তিনটি টাক্সফোর্স গঠন করা হয়েছে। এই টাক্সফোর্সগুলোর কাজ ছিল ব্যাংকের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা ও ঋণ খেলাপির চিত্র নিরূপণ, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে শক্তিশালী করা এবং ব্যাংকখাত থেকে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া।

দুর্বল ব্যাংকগুলো পুনরুজ্জীবিত করতে মার্জার বা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির মাধ্যমে পুনর্গঠনের পরিকল্পনাও রয়েছে। এর পাশাপাশি ব্যাংক রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স ২০২৫ প্রণীত হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নীতি সুদের হার বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পতন ঠেকানো, রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার মতো পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। তবে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং কর আদায়ের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অগ্রগতি এখনো আসেনি।

জাগো নিউজ: বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়তে কোন বড় প্রতিবন্ধকতাগুলো এখনো রয়ে গেছে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বিনিয়োগ বাড়তে দেশি-বিদেশি উভয় পক্ষেরই আগ্রহ সীমিত, যার পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট করেছে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বিনিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘ করেছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানির সরবরাহে সমস্যা বিনিয়োগের পরিবেশ দুর্বল করেছে, আর দুর্নীতি ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাও বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর সঙ্গে উচ্চ সুদের হার যুক্ত হওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য ঝুঁকি আরও বেড়েছে।

বিনিয়োগ না বাড়ায় কর্মসংস্থানও বাড়ছে না। ফলে ছাত্রদের আন্দোলনের অন্যতম মূল দাবি—চাকরির সুযোগ বাড়ানো, এখনো পূরণ হয়নি। এবং বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের দিকে কোনো বাস্তব অগ্রগতি দেখা যায়নি।

জাগো নিউজ: রাজস্ব আদায় ও কর সংস্কারের ক্ষেত্রে কী অবস্থা?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: কর আদায়ের জিডিপি অনুপাত এখনো খুবই কম এবং এখানে অগ্রগতি সীমিত। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের অভাব এর প্রধান কারণ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে দুই ভাগে ভাগ করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেটি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। কর ফাঁকি রোধ ও রাজস্ব সংগ্রহ বাড়াতে ডিজিটাইজেশন ও অটোমেশন অত্যন্ত জরুরি হলেও এক্ষেত্রে কার্যক্রম এখনো পূর্ণ গতি পায়নি। ফলস্বরূপ রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা কাজে লাগানো যায়নি।

জাগো নিউজ: সামনে অর্থনৈতিক সংস্কার টেকসই করতে কী কী করা জরুরি?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন সেখানে অবশ্যই আইন প্রণয়ন করতে হবে। কারণ আইন একবার হলে সেটি পরিবর্তন করা সহজ নয়, ফলে নীতির স্থায়িত্ব থাকে। ব্যাংক রেগুলেশন অর্ডিন্যান্সের মতো উদ্যোগ এজন্য গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি কর আদায়, সরকারি প্রকিউরমেন্ট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়তে হবে। ডিজিটাইজেশন ও অটোমেশন দুর্নীতি ও অদক্ষতা কমাবে। এসব প্রক্রিয়া একবার চালু হলে তা পিছিয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, অনলাইন ব্যাংকিং আজ মানুষের জীবনের অংশ হয়ে গেছে। তাই ভবিষ্যতে কোনো সরকার সহজে এটি বাতিল করতে পারবে না। অর্থনৈতিক সংস্কারে প্রযুক্তি ও আইনের সমন্বয় দীর্ঘমেয়াদি সুফল দেবে।

জাগো নিউজ: আগামী সরকার বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা কী হওয়া উচিত?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: অর্থনৈতিক সংস্কারের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রতিশ্রুতির ওপর। নীতিমালা পরিবর্তন, আধুনিক সংস্কার বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে রাজনৈতিক নেতাদের দৃঢ় অঙ্গীকার থাকতে হবে। আসন্ন নির্বাচনের আগে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে স্পষ্টভাবে জানাতে হবে তারা অর্থনৈতিক সংস্কারে কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ক্ষমতায় এলে কী পদক্ষেপ নেবে। জনগণের কাছে তাদের পরিকল্পনা ও অঙ্গীকার পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা জরুরি। একইসঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে জনগণ সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারে। রাজনৈতিক ঐক্য এবং স্বচ্ছতা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সংস্কার সফল হওয়া কঠিন।

এছাড়া জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে মানুষ প্রতিবাদ জানাতে পারে।

ভালো অর্থনীতি হলে রাজনীতিও ভালো হবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মানীয় ফেলো। তিনি সিপিডির নির্বাহী পরিচালক (২০০৭-১৭) এবং তারও আগে সিপিডির গবেষণা পরিচালক (১৯৯৮-২০০৭) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মোস্তাফিজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে শিক্ষক হিসেবে ২৫ বছর অধ্যাপনার পর ২০১২ সালে সিপিডিতে পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান নিয়ে কালবেলায় সঙ্গে কথা বলেন তিনি

অন্তর্বর্তী সরকার অর্থনীতি সংস্কারসহ একাধিক কমিশন ও কমিটি গঠন করেছে। আপনি এই উদ্যোগগুলোকে কীভাবে দেখছেন? এবং এসব সংস্কার কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যেতে বর্তমান ও পরবর্তী সরকারের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: সংস্কার, বিশেষ করে অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগগুলো খুবই ইতিবাচক ছিল। শ্বেতপত্র কমিটি যখন করা হলো তখন এর লক্ষ্যটা ছিল অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থাটা জানা। যে কমিটির আমিও একজন সদস্য ছিলাম। মোট একুশটা চ্যাপ্টার আছে সেখানে। অর্থনীতির প্রায় সব খাতের চলমান অবস্থাটা কী ছিল, কোন কোন জায়গায় প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল, তথ্য-উপাত্তের কোথায় কোথায় ঘাটতি ছিল—এগুলো উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছে। মেগা প্রজেক্টের ওপর একটা চ্যাপ্টার আছে। মেগা প্রজেক্টে অর্থ কীভাবে ব্যয় হয়েছে, অর্থ পাচার কীভাবে হয়েছে, কোন কোন রুটে হয়েছে, ট্রেড প্রাইসিং, মিস প্রাইসিং ইত্যাদি নিয়ে পরবর্তী সময়ে ফলোআপ করা হয়েছে। দুটি রিপোর্ট থেকে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি বেরিয়ে এসেছে তা হলো, তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি। এখানে শুধু যে সঠিক তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে বিচ্যুতি হয়েছে, তা নয়; নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে তথ্য-উপাত্ত ঠিকভাবে না থাকলে যে পরিকল্পনা ঠিকভাবে করা যায় না, সেটাও স্পষ্ট করা হয়েছে। আমরা দেখছি, ২০২৪

সালের জুলাই মাসেও খেলাপি ঋণ ছিল ১ লাখ ২২ হাজার কোটি টাকা। এখন এটা হয়ে গেছে ৫ লাখ কোটি টাকার ওপর। বেশিরভাগটাই ছিল আগের তথ্য-উপাত্তে হেরফের করার ফলাফল। এমন অবস্থা হলে, একটা ব্যাংক কত ঋণ দেবে, তার সুদ কত রাখবে, ঋণের ওপর সুদ কত রাখবে, তার স্বাস্থ্য কীরকম—এসব ব্যবস্থাপনা ঠিকভাবে করা যাবে না। এজন্য আর্থিক খাতে আমরা বড় ধরনের একটা সমস্যায় পড়েছি। অন্যান্য খাতেও তাই হয়েছে। সেজন্য পরিসংখ্যান নিয়ে আরও একটি কমিটি করা হয়েছে। ড. হোসেন জিল্লুর রহমান যেটার প্রধান। সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আমার মনে হয়। তার কারণ হলো, ভালো তথ্য-উপাত্ত না পেলে, ভালো নীতিমালা প্রণয়ন করা যায় না। ভালো নীতিমালা প্রণয়ন করা না গেলে, ভালো বাস্তবায়নও করা যায় না। মানুষের জীবনমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে। সেখানে তথ্য-উপাত্ত ভালো না থাকলে সেটা করা যায় না। একটা আরেকটার সম্পূরক। আরেকটা বিষয় হলো, অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাক্টর। স্যাফিশিয়েন্ট ফ্যাক্টর হলো যে, সেটার ওপর ভিত্তি করে আমি কী বাস্তবায়ন করছি এবং জনগণ সেটা থেকে কী উপকার পাচ্ছে। এ জায়গাটায় আমরা এখনো আসতে পারিনি। সেটা বিনিয়োগের পরিসংখ্যানেও দেখা যাচ্ছে, সেটা ঋণ নেওয়ার পরিসংখ্যানেও দেখা যাচ্ছে, সেটা কর্মসৃজনের পরিসংখ্যান থেকেও দেখা যাচ্ছে। নতুন উদ্ভাবন নিয়ে যারা আসতে চাচ্ছেন, তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার ওপরও দেখা যাচ্ছে। আমাদের সে জায়গাটায় পৌঁছাতে হবে যে, এগুলোর ওপর ভিত্তি করে আমার কীভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারি, কীভাবে বিনিয়োগ আনতে পারি, কর্মসৃজন করতে পারি এবং মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন করতে পারি।

অন্তর্বর্তী সরকার এ সমস্যাগুলো সমাধানে কতটা পদক্ষেপ নিতে পেরেছে?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: প্রথম প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ—এই যে ঘাটতিগুলোকে নির্ণয় করা হলো, বিভিন্ন খাতে এবং ক্ষেত্রে কী কী করা যায়, এ ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া হলো, এর পরিপ্রেক্ষিতে আসলে কী করা হয়েছে? এখানে আমার প্রতিক্রিয়া মিশ্র। আমাদের ব্যাংক খাতের সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শ্বেতপত্র ও টাক্সফোর্সের রিপোর্টেও আমরা অনেক কিছু বলেছি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা এখন স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন। তারপরও কিছু অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে যে, আর্থিক খাতের প্রকৃত অবস্থাটা কী, যা আমাদের শক্তিত ও চিন্তিত করছে। কিন্তু বাস্তবতা আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি। তারা এখন নিজেরা সেন্ট্রাল ব্যাংকের বোর্ডের আয়ুষ্কাল কত হবে, সেটা ঠিক করছেন। স্বাধীনভাবে যাতে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেটা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন দুর্বল ব্যাংকগুলোকে একীভূত করা বা অ্যাসেট রিকোভারি, বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশনকে সুশৃঙ্খল অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন ঋণখেলাপি, বিশেষ করে যারা ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি, তাদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনতে দুদক ও ইন্টেলিজেন্স ইউনিটগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করছে। সুতরাং কিছু ভালো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আমি যদি আরেকটা দুর্বল জায়গার কথা বলি—তা হলো আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা, বিশেষত বাজার ব্যবস্থাপনার দিকে আমাদের দুর্বলতা রয়ে গেছে। টুকটাক কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে, কিন্তু পুরো সাপ্লাই চেইনের মধ্যে যে একটা শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা দরকার, সেখানে অনেক সমস্যা রয়ে গেছে। এখনো মধ্যস্থত্বভোগী, সিন্ডিকেশন অনেক প্রভাব রয়ে গেছে। সামষ্টিক বাজার ব্যবস্থাপনায় অনেক দুর্বলতা রয়ে গেছে। ভালো কাজগুলোকে কীভাবে আমরা সামনের দিকে নিয়ে যাব—এটাই এখনকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই সরকার বেশি সময় পায়নি। নবনির্বাচিত সরকার কী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসবে, সেটাও একটা বড় বিষয়। আমরা আশা করছি যে, তাদের মানসে চক্ৰিশের জুলাই আন্দোলনের একটা পদচিহ্ন থেকে যাবে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, ভালো অর্থনীতি মানে ভালো রাজনীতিও—সেই শিক্ষাটা তারা নেবে বলে আমরা আশা করছি। অর্থনীতি খারাপ হলে রাজনীতিও যে খারাপ হয়ে যায়, সে ঘটনাটা আমরা নিকট অতীতে দেখলাম। আমরা আশা করব নতুন যারা আসবে, তারা সুশাসন, জবাবদিহি, স্পষ্টতা—এগুলোর ভিত্তিতে কাজ করবে। এখন যে ভালো কাজগুলো হচ্ছে, সেগুলো তারা অব্যাহত রাখবে। এটা সোজা ব্যাপার নয়, ব্যাংক খাতে আমরা দেখেছি কীভাবে দুর্বৃত্তায়ন হয়। পরে এসে আবারও সেই দুর্বৃত্তায়ন শুরু হবে কি না, সে শঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আমরা আশা করব যে, জনগণের আকাজক্ষা এবং জুলাইয়ের স্পিরিট অনুসরণ করে তারা সামনের দিকে এগোবে। দ্বিতীয় হলো, আমাদের সচেতন জনগণের চাপ সার্বক্ষণিকভাবে রাখতে পারলে ইতিবাচক বিষয়গুলো অব্যাহত থাকবে। আগামী নির্বাচনের ইশতেহারে তাদের এ বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

অর্থ পাচার হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছিল। এখন ব্যবসায়ীদের ওপর নানারকম চাপ তৈরি করা হচ্ছে, কারও কারও অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হচ্ছে, অনেকে ব্যবসা করতে পারছেন না। এসব কারণে কি অর্থ পাচার আবার বেড়ে যাবে না?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: আমি বিজনেস কমিউনিটিকে একটা হোমোজেনাস একক হিসেবে দেখি না। বিগত সরকারের সময়ে আমরা দেখেছি যে, সরকারের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী সমাজ ও সুবিধাহীন ব্যবসায়ী সমাজ—এভাবে ভাগ করা হয়েছে। একীভূত একক কোনো ব্যবসায়ী সমাজ ছিল না। যারা বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তারা অনেকে দেশ থেকে চলে গেছেন। সুতরাং আমার ধারণা যে, যারা সৎভাবে ব্যবসা করবেন, কোনো ধরনের নয়-ছয়ের মধ্যে থাকবেন না, তাদের কোনো সমস্যা বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা আজ থেকে পনেরো-বিশ বছর আগেও দেখেছি যে, ব্যবসায়ীদের অনেকে দুর্নীতি করে থাকলেও সেটা দেশেই বিনিয়োগ করেছেন। কিন্তু গত দশ বছরে বড় ধরনের অর্থ পাচার ঘটেছে। কারণ, দুর্নীতি তো করেছেই, তারপর সে টাকা দেশেই আর বিনিয়োগ করেনি। অর্থাৎ, দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে তাদের ভবিষ্যতের কোনো সম্পর্ক নেই। অনেক ভালো ব্যবসায়ীর দ্বিতীয় প্রজন্মও দেশে আসছে, ব্যবসা করছে। এটা যদি আমরা অব্যাহত রাখতে পারি, আবার যদি আমরা পুরোনো দুশ্চিন্তা না পড়ি, তাহলে বিনিয়োগও চাঙ্গা হবে, কর্মসৃজন

হবে, শ্রমিকের জন্য শোভন মজুরিও নিশ্চিত হবে। কিন্তু এটা অনেক দিনের সমস্যা। এটা এক দিনে সমাধান হবে না। কিন্তু যারা ভালো ব্যবসা করবেন, আমরা চাইব তাদের যাতে কিছু না হয়। তবে এর অনেক কিছুই নির্ভর করবে পরবর্তী সরকারের ওপর। নির্বাচিত সরকার আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগুলো বিবেচনা করবে কি না, তার ওপর এর সাফল্য নির্ভর করছে। জুলাই-আগস্টের একটা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা গেলাম। ফলে সে কথাতাই ফিরে আসি যে, ভালো অর্থনীতি হলে রাজনীতিও ভালো হবে।

গত পনেরো বছরে ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও আমাদের একটা সিস্টেম তৈরি করেছিলেন বলে অভিযোগ করেন অনেকে। এ ক্ষেত্রে ব্যবসাকে রাজনীতি থেকে আলাদা করা কতটা দরকার এবং কীভাবে করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: বিগত সময়ে এ ক্ষেত্রে খুবই নেতিবাচক একটা প্রবণতা দেখেছি। যেটা আমাদের দেশের অর্থনীতির ওপর একটা নীরব অভিঘাত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। রাজনীতিবিদরা ব্যবসায়ী হয়েছেন, ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে নেমেছেন, আমাদের দুটোর সঙ্গে মিলে নিজেরাও রাজনীতিতে ঢুকেছেন। অর্থনীতিতে এটা একটা দুষ্টচক্র সৃষ্টি করেছে। এখান থেকে আমাদের বের হতে হবে। রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করবেন, তার সঙ্গে যদি ব্যবসাকে জড়িয়ে ফেলা হয়, তাহলে নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক অনেক কিছু সৃষ্টি হবে। জাতীয় সংসদের কথা যদি বলি—সেখানে রাজনীতিবিদদের কাজ নীতিমালা বা আইন প্রণয়ন, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে যাওয়ার কথা নয়। দুটোর এ পার্থক্যটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার থাকবে। সেসব প্রতিষ্ঠানে যাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারে এবং সংসদ সদস্যরা তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারেন, তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের যাতে তাদের অভীক্ষা বাস্তবায়নের জন্য তাদের পেশাকে কাজে লাগাতে না পারেন, তারও ব্যবস্থা করা জরুরি। এগুলো সবই লিখিতভাবে আছে। কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি। এ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই রাজনীতিবিদদের বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে হবে।

কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, নতুন করে মানুষ দারিদ্র্য হচ্ছে, কর্মসংস্থান কমে যাচ্ছে, মানুষের আয়ও কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে বৈষম্যও বাড়ছে। ব্যয়ও অনেক বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় আমাদের কী ধরনের নীতি সহায়ক হতে পারে?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: অর্থনৈতিক নীতিমালায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে। সাম্প্রতিককালে যেসব তথ্য-উপাত্ত বেরিয়ে আসছে, তাতে দারিদ্র্য পরিস্থিতির ইতিবাচক চিত্র মিলছে না। বেকারত্বের সংখ্যাও বাড়ছে। যত শিক্ষিত তত বেকারত্ব। তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। খুব সহজ কাজ নয়। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটও আমাদের অনুকূলে নেই। রাজনৈতিক একটা অনিশ্চয়তা আছে, সেটাও বাস্তবতা। কিন্তু এটা ঠিক করতে না পারলে আমরা বড় ধরনের সমস্যায় পড়ে যাব। এবারের আন্দোলন কোটা সংস্কার দিয়ে শুরু হয়েছিল—যেখানে কর্মসংস্থান আর বৈষম্যই ছিল মূল। এখানে বড় ধরনের কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষিত জনসংখ্যাকে প্রকৃত অর্থেই যাতে প্রশিক্ষিত করতে পারি,

যাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে, দক্ষতা সৃষ্টি হয়, এমন পদক্ষেপ দেখছি না। এটাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২০২৫-২৬ সালের যে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে, তাতে আমি খুব আশাবাদী হতে পারিনি। গতানুগতিক একটা বাজেট দেওয়া হয়েছে। শক্ত সিদ্ধান্তে যাওয়া হয়নি। শিক্ষায় দুই শতাংশ, স্বাস্থ্যে এক শতাংশেরও নিচে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পেনশন বাদ দিলে সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়েনি। এসব জায়গায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনা জরুরি ছিল। অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস একটা বড় ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত অন্তর্বর্তী সরকার নিতে চায়নি। কিন্তু আমার মনে হয় যে, তারা যদি সাহস করে এটা করতেন, তাহলে আগামীতে নির্বাচিত সরকারের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে সেটা থেকে যেত। মানুষ চিন্তা করত যে, শিক্ষায় বরাদ্দ জিডিপির পাঁচ শতাংশ করা হয়েছিল, এই সরকার কেন এটা কমাচ্ছে! এটা একটা প্রশ্ন থাকত তখন।

সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা আরও কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কীভাবে জিরো টলারেন্স নীতি প্রয়োগ করা যায়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এরই মধ্যে অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিচ্যুতি হয়েছে। দৃষ্টিটা চলে গেছে অন্যান্য ইস্যুতে। কিছু কিছু ভালো কাজ যে হয়নি তা নয়, স্বল্পমোদে অনেক কিছু করা সম্ভবও নয়। তারপর আরও ভালো করার সুযোগ ছিল।

অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে কয়েক মাস সময় আছে। এ সময়ে তাদের কোন দিকগুলোতে বেশি দৃষ্টি দেওয়া উচিত?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: বাস্তবতা হলো, এ কয়েক মাসে নির্বাচনের দিকেই তাদের নজর বেশি চলে যাবে। এটা এমন একটা সময়, যখন কি না অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলো আবার পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এমনকি কিছু কিছু আরও ঘনীভূত হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি উচ্চহারেই রয়ে গেছে। কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ইত্যাদির সংকট রয়েছে। কিন্তু এ সময়টা মূলত নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি দিতেই চলে যাবে। দেশের পরিবেশও এ সময় বিনিয়োগের জন্য ইতিবাচক হবে না। আমরা আশা করছি যে, কোনো সংঘাত হবে না, কিন্তু মানুষের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিরাজ করছে। তবু সবকিছুর মধ্যেই অর্থনীতি চলতে হবে। বাংলাদেশের অগ্রগতি, বৈশ্বিক সম্পর্ক, রপ্তানি, রেমিট্যান্স, রিজার্ভ, বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা, বাজার ব্যবস্থাপনা—এগুলো কোনো কিছুর জন্য থেমে থাকবে না। সুতরাং আমরা আশা করব সরকারের দৃষ্টি এসব থেকে খুব বেশি বিচ্যুত না হয়। নিরপেক্ষ সুন্দর নির্বাচন আয়োজন করতে মনোযোগের অধিকাংশই চলে যাবে, কিন্তু আমার প্রত্যাশা থাকবে, জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমাদের আশু করণীয় কাজগুলো থেকে নজরটা যেন বিচ্যুত না হয়।

কালবেলা

৩০ অক্টোবর ২০২৫

বিশেষ সাক্ষাৎকার

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

হোসাইন শাহাদাতঃ এই অনুষ্ঠানে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের সাথে থাকেন। আজকে আমাদের সাথে যিনি রয়েছেন তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে এবং নীতি প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এবং তিনি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ- সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। আমরা আসলে অর্থনীতি নিয়ে কথা বলতে চাই কিন্তু অর্থনীতির চেয়ে আসলে এই মুহূর্তে রাজনীতি অনেক বেশি আলোচনায় এসেছে। মানুষের চিন্তার জায়গা দখল করছে। সেই জায়গাটাতে যেটি প্রথমেই জানতে চাইবো যে আসলে রাজনৈতিক দলগুলো এখন যে ধরনের আচার আচরণ করছে সেটা কি ঠিকঠাক আছে? আপনার কাছে মনে হয়? নাকি আসলে সংকট বাড়াচ্ছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ ধন্যবাদ কথা বলার জন্য আমার সাথে। আপনি বললেন যে অর্থনীতি না রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করবেন। আমি আপনার সাথে রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করি আর কি। তাহলে রাজনৈতিক দল তো বিভিন্ন দল আছে। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন ধরনের অভিন্ন আছে। একেকজনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একেক রকম। কেউ ক্ষমতায় যেতে চায়, কেউ বড় বিরোধী দল হতে চায়, কেউ আবার অংশগ্রহণ করতে চায়, কেউ আবার বুকে উঠতে পারছে না কি করবে। যেহেতু একেকটা রাজনৈতিক দল একেক অবস্থানের ভিতরে আছে। কিন্তু এইটুকু আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে এবং বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে আমি প্রাক-নির্বাচনী সংলাপ করছি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে। সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ইত্যাদি জায়গায় কথা বলে আমি যেটুকু বুঝেছি যে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবল এবং নির্বাচনের পক্ষের শক্তি যাতে হয় এটার জন্য সেই শক্তিটাও আমি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করছি। যেমন ধরুন প্রধান প্রধান যে রাজনৈতিক দল তারা নির্বাচনে যেতে চান এবং যারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শক্তিশালী দল তারা মুখে অনেক কিছু বললেও মনের ভিতরেও বোঝেন যে নির্বাচন এখন একটা উত্তরণকালীন সমাধান। একই রকমভাবে আপনি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর

সাথে কথা বলেন, তারা নির্বাচন চান। আপনি যদি দেখেন জনপ্রশাসনের দিকে, তাহলে যারা আমলা আছেন, যারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো, রক্ষাকারী সংস্থা আছে, পুলিশ, আনসার, বিডিআর এবং আর্মি, বিশেষ করে সেনাবাহিনী, তারা নির্বাচন চাচ্ছেন দ্রুততার সাথে। আপনি যদি এদের বাইরে নাগরিক সমাজের কথা বলেন পক্ষে বিপক্ষে যেই থাকুক না কেন কিন্তু একটা ঐক্যমত্য গড়ে উঠেছে। এই উত্তরণকালীন সমাধান, উত্তরণকালীন সময় যে সমস্ত দ্বন্দ্ব সংঘাত আছে তার সমাধান হলো নির্বাচনের ভিতর দিয়ে। নির্বাচনের আগে পরে আলোচনার ভিতর দিয়ে, এমনকি সংস্কারের প্রশ্নে আর এর উপরেই যেটা আছে যে আমাদের বৈদেশিক বন্ধু যারা আছেন, উন্নয়ন সহযোগীরা যারা আছেন, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেও যারা আছেন তারাও নির্বাচনের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছেন। এবং আমাদের প্রতিবেশীদের দিকে যদি তাকান যাদের সাথে সম্পর্ক ভালো, যাদের সাথে সম্পর্কে টানা পড়েন আছে, তারাও নির্বাচন চান। সেহেতু আমি আপনার কথার উত্তরে যেটা বলছি, বিভিন্ন ধরনের মতামত আপনি দেখতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি তার নিচেরটুকু দেখেন তাহলে সেখানে একটা বড় ধরনের ঐক্যমত্য বিরাজ করে বলে আমার মনে হয়। আপনি মেঘ হয়েছে দেখে বজ্রপাত হবে মনে করেন আর আমি মেঘ হয়েছে দেখে বৃষ্টি হবে বলে মনে করি।

হোসাইন শাহাদাতঃ অবশ্যই। এই যে সবার যে আকাঙ্ক্ষার জায়গা, নির্বাচন সবাই চাচ্ছেন এবং সেটির একটি সময়সীমা এরই মধ্যে ঘোষণা হয়েছে যে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে হয়তো নির্বাচন হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে তো শঙ্কার জায়গা তৈরি হচ্ছে। সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি আদৌ নির্বাচন হবে কি না, হলেও ঘোষিত সময় অনুযায়ী হবে কি না অথবা নির্বাচন হলে সেটি একটি গ্রহণযোগ্য ভালো নির্বাচন হবে কি না, নানান ধরনের প্রশ্ন আছে। আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমি আপনার এই প্রশ্নটাকে দুই ভাগে ভাগ করি। একটা হলো নির্বাচন হবে কি না। আরেকটা হলো নির্বাচন হলে কীরকম নির্বাচন হবে। তাই না? এটা দু'টো ভিন্ন প্রশ্ন। নির্বাচন হওয়ার ক্ষেত্রে আমি যে বলেছি যে যে মানুষগুলো, যে শক্তিগুলো এবং সর্বাপেক্ষা বড় শক্তিগুলো নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে বা মনস্থির করেছে। তারা সবাই নির্বাচন বলতে আগামী বছর ফেব্রুয়ারিই বুঝে। রমজান আসার আগে নির্বাচন হবে আগামী বছর এইটা ধরেই কিন্তু আলোচনাটা হচ্ছে। নির্বাচন পিছিয়ে গেলে, নির্বাচন ভুল হয়ে গেলে, কী হবে এটা একটু ভিন্ন বিষয়। কিন্তু নির্বাচন যখন বলি, নির্বাচন হবে তখন আমি মনে করি ঘোষিত সময় অনুযায়ী হবে। এটি বড় বিষয়। এখন আপনি অন্যদিকে যে নির্বাচনের সম্বন্ধে শঙ্কার কথা বললেন এটাতে আমি দু'টো শব্দ ব্যবহার করি। একটা হলো আস্থার বিষয়, আরেকটা হল শঙ্কার বিষয়। আস্থা আর শঙ্কাকে আমি দু'রকমভাবে দেখি। আস্থার জায়গাটা আমি দেখি যে যেই সরকার আছে, যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবে, যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছে, তাদের সক্ষমতার বিষয়। সেনাবাহিনী এবং সরকারের ভিতরের সহযোগিতার বিষয়। এগুলিতে লোকে আস্থা কম পাচ্ছে। আস্থার ঘাটতি আছে। এটা হল একটা সমস্যা। এটাকে মিটাতে হবে। আর অপরদিকে শঙ্কাটা হচ্ছে মানুষের ভিতরে নিরাপত্তা

বোধের অভাব তীব্র হয়েছে। সে নিশ্চিতভাবে ব্যবসা করতে পারে না। সে নিশ্চিতভাবে তার আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে না। সে নিশ্চিতভাবে চলাফেরা করতে পারে না। নারীরা চলাফেরা করতে পারে না নিশ্চিত। যে সমস্ত বিপন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু অথবা যারা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী আছেন তাদের কথা যদি বলেন, যারা লিঙ্গ বৈচিত্র্যের সম্প্রদায় আছেন তারা আছেন। তারা অসম্ভব রকমের নিরাপত্তার অভাব অনুভব করছেন। এটার জন্য শুধু না যে একটা মব আছে, তাদের উপর নির্যাতন অত্যাচার করছে অথবা জীবন ধারণকে খুবই খুবই কঠিন করে তুলছে। শুধু তা না। তারা মনে করেন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যেই সুরক্ষাটা তাদের পাওয়ার কথা ছিল, রাষ্ট্র হয় ইচ্ছাকৃতভাবে এটা দেয় না অথবা রাষ্ট্রের দেওয়ার কোন ক্ষমতা নাই। মানুষের মনের ভিতরে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া আছে। তারা মনে করেন এইরকম অবস্থা চলতে থাকলে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের যে পূর্ব শর্ত অর্থাৎ মানুষকে নিরাপদ বোধ করতে হবে এবং সে ভোট দিয়ে নিরাপদ বোধ করবে এবং ভোট হয়ে গেলে পরেও ভোটের ফলাফলের কারণে তার উপর অত্যাচার হবে না। সেই জায়গাটা হয়নি। ওই যে শঙ্কা আর আস্থার অভাব একটা অপরকে শক্তিশালী করছে। যত শঙ্কা বাড়ছে আস্থার অভাব তত হচ্ছে। আস্থা যত কমে যাচ্ছে সে আবার তত শঙ্কিত।

হোসাইন শাহাদাতঃ স্যার, ভালো নির্বাচন হবে কি না সেই উত্তরটা নিব। তবে তার আগে আমি জানতে চাই যে এই যে আস্থার সংকট তৈরি হচ্ছে সরকারের, আমরা শুনতে পাই, বিভিন্ন জায়গা থেকে বলে যে সরকার আরো লম্বা সময় থাকতে চায় কি না? বা সরকারের মধ্যে এক ধরনের ভয় আছে কি না? সেফ এক্সিটের কথা আসে কেন? আস্থার প্রশ্নগুলো কি সেই কারণে আসছে মানুষের কাছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ কোন সরকারের কথা বলছেন?

হোসাইন শাহাদাতঃ বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কথা।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমি তো বলি সরকারের ভিতরে সরকার আছে। এ কথা তো আমি প্রথম বলেছি যে সরকারের ভিতরে সরকার আছে। সেহেতু এক সরকার হয়তো নির্বাচন করতে চায়। আর তাদের ভিতরে অন্য শক্তি থাকতে পারে যে এই সময়কে প্রলম্বিত করতে চায়। সেহেতু আমার দৃষ্টিতে বর্তমান সরকার কোন অশুভ সত্তা না। এর ভিতরে বহুবিধ ক্ষমতার ব্যবহার আছে। এটার ভিতরে বহুবিধ রাজনৈতিক চিন্তা আছে। এবং সেই অর্থে ওই যে শঙ্কার কথা, আস্থার কথা বললাম, কারণ অনেকটা বড়। ব্যাপক জনগোষ্ঠী এই সরকারকে এখন নিরপেক্ষ মনে করে না। একটা নিরপেক্ষ সরকার, সেই অর্থে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিন্তু তত্ত্বাবধায়কের মত নিরপেক্ষ না। তাদের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন করাটা আরো কত কঠিন। এটা সাধারণ মানুষের কথা। আমি যে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি।

হোসাইন শাহাদাতঃ তারা আসলে কার পক্ষে মনে করছে? সরকার কোন পক্ষে হেলে গেছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ তারা তো দেখছেন যে সকালবেলা একটা আর বিকেলবেলা আরেকটা। নির্ভর করে সরকারের ভিতরে যে বিভিন্ন শক্তি এখন কাজ করছে অথবা সরকার বিভিন্ন শক্তির প্রতি যেই প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে কার চাপে সেটার তো কোন সুস্থির অবস্থান নেই। একটা সুস্থির নিরপেক্ষ শক্তিশালী অবস্থান যদি না থাকে তাহলে এই সরকারের পক্ষে আবার একটি সুস্থির নিরপেক্ষ শক্তিশালী ফলাফল দেওয়া তো সম্ভব না। এই শঙ্কাটা বারবারই ফিরে আসছে। এই শঙ্কাকে দূর করবে কে? এই আস্থা সৃষ্টি করবে কে? এটার মূল দায়িত্ব সরকারের। এটার মূল দায়িত্ব প্রফেসর ইউনুসের। এটা তার সহকর্মীদের, তার সাথে যে আমলা, প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সর্বোপরি নির্বাচন কমিশনের।

হোসাইন শাহাদাতঃ এখানে আসলে আপনি যেটা বলছেন প্রফেসর ইউনুসের কাছে মানুষের অনেক বেশি প্রত্যাশার জায়গা ছিল। উনি যখন প্রথম ক্ষমতায় আসলেন সবার মনে সব পক্ষের, শুধু আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি সবারই সমর্থন তিনি পেয়েছেন। তার কাছ থেকে ম্যাজিক্যাল কিছু আশা করেছিলেন মানুষ। কিন্তু সেই জায়গাটাতে আপনি বলছেন যে এই মুহূর্তে সবাই তাকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছেন বা আস্থার জায়গাটা উঠে গেছে। এটার পেছনে কী কারণ মনে করেন? উনার রাজনৈতিক অপরিপক্বতার বলবেন নাকি কী কারণে হয়েছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ প্রথম কথা হলো উনার উপরে আস্থা উঠে গেছে এটা আমি বলিনি। আমি মনে করি উনার সরকারের আস্থা সংকট হয়েছে। সে সরকারের প্রধান হিসেবে উনি দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। আর যদি কোন ম্যাজিক আমরা প্রত্যাশা করে থাকি, উনি ম্যাজিক করে দিবেন তো বলেন নাই। আমরা মনে করেছি যে ম্যাজিক হবে। সেহেতু দায়িত্ব তো আমাদের যে আমরা এরকম ধরনের অবিবেচকের মত, বালকসুলভ চিন্তা কেন করলাম? আমাদের তো আরেকটু বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত ছিল। কারণ একটা অভ্যুত্থান উত্তর সরকার এখানে এসেছে। যে সরকারের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। নতুন করে তাদের মনোবল দাঁড় করাতে হচ্ছে। সেনাবাহিনীর সাথেও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচালের ভিতরে চলতে হয়। যেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের লুটেরা, পুঁজিপতিরা এই দেশ থেকে পালিয়ে গেছে। রাজনীতির অবস্থা ভঙ্গুর। সেহেতু সেই অর্থে তো খুব ঈর্ষণীয় পরিস্থিতি ছিল না। কিন্তু তারপরেও আমরা মনে করেছি হয়তো গুছিয়ে আগাতে পারবো। সেটা সম্ভব হয়নি। এমন হতে পারে উনি যে দল নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন সেই দলটাও পরিস্থিতির কারণে তৈরি হয়েছে কিন্তু হয়তো তত উপযুক্ত হয়নি। দলকে খেলতে খেলতে মাঠে আমরা প্লেয়ার বদলাই, সেটাও আমরা বদলাইনি সেটার ভিতরে। এবং তারপরে আমরা যেইভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে দাঁড় করিয়েছি, প্রতিবেশী পুরনো-নতুন সম্পর্ক দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হয়েছে। এখনো হচ্ছে। এখন সামনে নির্বাচন। নির্বাচন কেউ বলে অংশগ্রহণমূলক, কেউ বলেন আপনারা অন্তর্ভুক্তিমূলক। দু'টো শব্দ তো এক না। ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে এগুলির

ভিতরে। একটি সংলাপের আলোচনা করা হয়েছিল জাতীয় ঐক্যমত্য সৃষ্টি করার জন্য। ওই জাতীয় ঐক্যমত্যের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর আবার ওটা কিভাবে বাস্তবায়ন করব সেটা নিয়ে অনেক দ্বিমত সৃষ্টি হয়ে গেছে। সেহেতু পরিস্থিতিটা যে খুব ঈর্ষণীয় ছিল তা না। আবার এটাকে আমরা খুব বলিষ্ঠতার সাথে মোকাবেলা করতে পেরেছি তাও না। তাই এই বাস্তবতা নিয়েই আমরা নির্বাচনের দিকে আগাছি।

হোসাইন শাহাদাতঃ আরেকটা প্রসঙ্গে আসতে চাই যে শেখ হাসিনার বিচার নিয়ে এই সরকারের আসলে বড় ধরনের ম্যান্ডেট ছিল। এই সরকার শেখ হাসিনার বিচার করবে। সেই প্রথম রায় হলো। সে রায় নিয়ে অনেক ধরনের প্রশ্ন আসছে। সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্ন আছে তাতে বিচারের যে প্রক্রিয়া সে প্রক্রিয়ার জায়গাটাতে যে সমালোচনাগুলো আসছে। সেগুলোকে আপনি কি যৌক্তিক মনে করেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমি মনে করি যে এটার বিচার এবং এটার সঠিকতা একজন আইনজ্ঞই ভালো দিতে পারবেন। এটা প্রত্যক্ষভাবে আমি আইনের ছাত্র না, সেহেতু আমি বলতে পারবো না। কিন্তু আমি এইটুকু বুঝি বিচার হওয়াটা প্রয়োজন ছিল। আমি এইটুকু বুঝি যে যেভাবে অন্যায় হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষের সাথে গত দেড় দশকে, সেই দেড় দশকের একটি সুরাহা, আত্মার শান্তি আমাদের শহীদদের জন্য বলেন, নিপীড়িত যুবসমাজের কথা বলেন, এক ধরনের ইংরেজিতে বলে ক্লোজার বা সমাপ্তি লাগবে। ইস্যুটা হলো এই বিচারটি কি সেই ক্লোজার দিতে পেরেছে। পেরেছে বলে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে না। সেহেতু এটা অনেকদিন আমাদের সাথে থাকবে। ইতিহাসের অংশ হিসেবেই থাকবে। বাংলাদেশে উচ্চ পর্যায়ের বিচার এবং হত্যা ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি এই শত্রুর সাথে বসবাস করেই বাঙালি জাতির আগামী দিনে আগাতে হবে। কিন্তু এইটার একটা রাজনৈতিক সমাধান আগামী দিনে আমাদের পেতে হবে। আমি বলতে চাচ্ছি যে এটা শুধু আইনি সমাধানের ব্যাপার না, এটার একটা রাজনৈতিক সমাধানও লাগবে।

হোসাইন শাহাদাতঃ রাজনৈতিক সমাধানটাতে আসবো। একটু যদি বিচার প্রক্রিয়াটা শেষ করা মানে তার ফাঁসি কার্যকর করা বা ফেরত আনার জায়গাটায় একটা জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভারত আমাদের সাথে যে ধরনের আচরণ করছে, এখন পর্যন্ত তাদের অবস্থান থেকে তারা সরে আসেনি। সেই জায়গাটাতে ভারতের সাথে তাহলে নেগোসিয়েশনে এই সরকার বা পরবর্তী রাজনৈতিক সরকার আসলে কীভাবে করবে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ এই আলোচনা তো আবার ওই যে আইনের আলোচনায় চলে গেলো। আইনের আলোচনায় গেলে পরে আপনি ভালো করে চিন্তা করে বলেন যে আইনি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করছেন তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যথপযুক্ত ব্যবস্থা হয়েছে কি হয়নি। সেহেতু সেই জিনিসগুলো তাদের পরিষ্কার হতে হবে। আমরা অন্য কাউকে দোষ দেওয়ার আগে আমাদের নিজেদের অবস্থানগুলো টেকসই কি না আইনের দৃষ্টিতে।

যেমন একজন বললেন যে উনি আন্তর্জাতিক আদালতে যাবেন। আমরা খুব ভালো করেই জানি আন্তর্জাতিক আদালতের কোন এখতিয়ার নাই অন্য কোন দেশে বিচারের ফলাফল দেখার জন্য। আবার কেউ বললেন যে বন্দি বিনিময় চুক্তি আছে তাকে নিয়ে আসতে হবে। তো যাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে উনি তো বন্দি না। তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন এখানে তো অনেক আইনি টেকনিক্যাল জিনিস আছে। সেহেতু এইটার সাধারণ সমাধান এটাতে নাই। আপনি আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন আমি রাজনৈতিক সমাধানকে বড় করে দেখি। যখন বঙ্গবন্ধুর হত্যা হয়েছে বা জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড হয়েছে তখন এগুলির একটা বিচার আপনি বিভিন্নভাবে করতে পারেন। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা এটা থেকে শিক্ষা নিয়ে জাতি গঠনে আমরা এটাকে শক্তি হিসেবে কীভাবে আগামী দিনে কাজের ভিতরে নিয়ে যাব। আমি এটাকে এইভাবে দেখি আর কি।

হোসাইন শাহাদাতঃ এখানে তাহলে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎটা আপনি কীভাবে দেখেন বাংলাদেশে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমি তো জ্যোতির্বিদ না যে আমি এটা বলব। তবে নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগের চিন্তাভাবনার পক্ষের প্রচুর লোক আছে। তা আপনি যে নামেই ডাকেন না কেন। সেহেতু ওই রাজনৈতিক চিন্তা তো আছে, থাকবে। এইটি বাস্তবতা। এটার ভিতর দিয়ে আমরা কী রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে বের হই সেটা আমি তো বারবারই বলছি। এটা রাজনৈতিক সমাধানের জায়গা। এটা আইনি সমাধান দিয়ে নিরঙ্কুশ আমরা করতে পারবো না।

হোসাইন শাহাদাতঃ রাজনীতি নিয়ে তো ব্যাপক আলোচনা হলো কিন্তু এই রাজনীতির প্রভাব আমরা যেভাবে অর্থনীতিতে দেখছি, আমাদের অর্থনীতি আসলে স্টাক হয়ে আছে। বিনিয়োগ একরকম স্থবির হয়ে আছে, কর্মসংস্থান হচ্ছে। আমরা দেখছি বেকারত্ব বাড়ছে, দারিদ্র্যতা বাড়ছে। এই যে অভিঘাত এটি নিয়ে আসলে সামনের দিনে আমাদের অর্থনীতিকে কোথায় দেখছেন আপনি? আগামী যদি ছয় মাস বা এক বছরে দেখি বা এটার কি দীর্ঘমেয়াদী কোন প্রভাব আছে কি না?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ অর্থনীতিবিদরা আমরা বলি দীর্ঘমেয়াদে আমরা সবাই মারা যাব। সেহেতু ওই পর্যন্ত অপেক্ষা করার সুযোগ নাই। আমাদের চলমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করাটাই বড় বিষয়। আমাদের বুঝতে হবে যে এই মুহূর্তে যে উত্তরণকালীন রাজনীতি চলছে তা চলমান অর্থনীতির উপর কী প্রভাব ফেলছে? উত্তরণকালীন রাজনীতির অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল অর্থনীতির ক্ষেত্রে। সেটা হলো অর্থনীতিতে একটা স্থিতিবস্থায় ফেরত নিয়ে আসা। যেটাকে ইংরেজিতে আমরা স্টেবিলাইজেশন বলি। সেইটাকে আনার ক্ষেত্রে বড় বিষয় ছিল মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। সেটা কিছুটা সরকার প্রান্তিকভাবে হলেও সফল হয়েছে। ৮ শতাংশ ৯ শতাংশ নেমে এসছে দুই সংখ্যার থেকে। আরেকটা বিষয় ছিল যে টাকাকে স্থিতিশীল করা। সেটাও বেশ কিছুটা অর্জিত হয়েছে টাকার মূল্যমানকে নমনীয় করার ফলে। এখন আমরা আগের চেয়ে রেমিটেন্স বেশি পাচ্ছি। রপ্তানিও চলমান আছে যার ফলে মজুদ

বেড়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার টাকা স্থিতিশীল হয়েছে আর তৃতীয় যেটা ছিল সেটা হল সুদের হার। যেহেতু সরকার মূল্যস্ফীতি কমানোটাকে তার সর্বোপরি, সর্বাপেক্ষা, সর্বোত্তম লক্ষ্য হিসেবে স্থাপন করেছেন সেহেতু মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বড় জায়গাটাই হলো সুদের হার বাড়ানো। যাতে করে সংকোচনমূলক পদক্ষেপ হয় আরকি। তো সেটা সরকার করছে। আর সরকারের অপরদিকে যেহেতু টাকা কম সেহেতু সরকার টাকা ধার করছে। ওইখানেও আবার তারল্যের সংকট দেখা দিচ্ছে। ব্যাংকের থেকে অর্থ বিনিয়োগ করা যেত। মানে বিদেশের মুদ্রা ছিল না। আমি আমদানি করতে পারতাম না। এখন উল্টো হয়েছে। এখন যেহেতু ব্যাংকের থেকে টাকা দিতে পারে না বিনিয়োগের জন্য, তারল্যের সংকট আছে সেইজন্য সে আবার বিনিয়োগ করতে পারছে না। আমদানি করারও প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে না। এর একটা বড় কারণ হলো যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাটা অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রবৃদ্ধির সংশ্লিষ্ট বিষয়কে প্রভাবিত করছে। সেহেতু রাজনীতিতে এখন একটা নিশ্চয়তা ফেরাতে হলে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দরকার করবে। যতক্ষণ না নির্বাচন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই মুহূর্তে কোন বড় ধরনের এদিক ওদিক দেখি না। শুধুমাত্র এখন যারা দায়িত্বে আছেন তারা দ্বাররক্ষী হিসেবে কাজ করবেন। কাস্টডিয়ান হিসেবে কাজ করবেন। কোন বড় ধরনের ঘটনা ঘটবে না বলে প্রত্যাশা করি। সমস্যা অন্য জায়গায়। সমস্যা হলো এই সময়কালে আমরা যে অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা ভেবেছিলাম যে অর্থনীতির ভিতরে আরো বেশি সচল দক্ষতা আসবে, দুর্নীতি কম হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়বে, সেই জায়গাতেও কিন্তু আমরা ধাক্কা খেয়েছি। সেহেতু আপনি দুটো জায়গাতে দেখবেন। একটা হলো উত্তরণকালীন অর্থনীতির রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। আরেকটা হলো দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সংস্কারের পরিকল্পনা, যে উদ্দীপনা প্রথম দিকে ছিল, এমনকি আমরা যখন শ্বেতপত্র লিখেছি বা টার্কফোর্স হয়েছে বা বিভিন্ন কমিটির কাজ করেছে, এমনকি কমিশনরা কাজ করেছে, সেটার ফলে যেটা আসবে মনে করেছিলাম সেটাও আসেনি। এবং তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার জন্য চলমান সরকারের সেই অর্থে বললে সক্ষম প্রতিক্রিয়া লাগে। সেই অর্থে যে আলোকিত প্রতিক্রিয়া লাগে সেটাও আমরা পাইনি। এই তিনটা জিনিস মিলিয়ে অনিশ্চয়তা, সংস্কারের অভাব এবং সরকারের দক্ষতার অভাব সবগুলো মিলিয়ে পরিস্থিতিটাকে জটিল করে দিয়েছে। আমাদের বহু প্রত্যাশা নির্বাচনের ভিতর দিয়ে এগুলি সমাধান হবে। প্রশ্ন হলো সমাধান হবে কি?

হোসাইন শাহাদাতঃ এটা আসলে সবারই প্রশ্ন। আপনিই যখন এই প্রশ্ন করেন তখন আসলে সেই জবাব কারো কাছে আছে কি না আমি জানি না। আমরা শেষ করব। তবে আমাদের এই মুহূর্তে আসলে একটি বড় ধরনের চিন্তার বিষয় বা দুশ্চিন্তা নতুন করে আমাদের সামনে এসেছে। সেটি হচ্ছে ভূমিকম্প। এবং এই যে ভূমিকম্পের আশঙ্কা এটি আসলে কোন ক্যালকুলেশন দিয়ে কোন হিসাব মেলানো সম্ভব না। এইটি আমাদের হাতে নেই। কিন্তু এই জায়গাটা থেকে এই যে আমরা প্রতিবেদনে দেখছি রাজউক বলছে, সরকারের বিভিন্ন জায়গা থেকে বলছে, যে আটমাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকা শহরের কী অবস্থা হবে, বাংলাদেশের কী অবস্থা হবে। এটি আমরা যুগ যুগ বছর ধরে শুনে আসছি। কিন্তু কোন ধরনের প্রস্তুতি নেই বা কোন সরকারই এই জায়গাটাতে কেন নজর দিল না?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ সরকার শুধু যে অবকাঠামো ইমারতের শক্তিশালীকরণের দিকে নজর দেয়নি তা তো না। সরকার পুরো দেশের রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে তার দুর্বলতা থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে নজর দেয়নি। সরকার নির্বাচন কমিশন, বিচার ব্যবস্থা, দুদক কোন প্রতিষ্ঠানেই নজর দেয়নি। তাহলে সে যদি প্রতিষ্ঠানে নজর না দিয়ে থাকে তো ওই প্রতিষ্ঠান যেই বাড়িতে অবস্থিত সেই বাড়ির কাঠামোকে তারা শক্তিশালী করবেন এই প্রত্যাশাটাই তো ভুল। সেহেতু আপনারা এই মুহূর্তে যে ভূমিকম্প হচ্ছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে, সেটার বিপরীতে আমাদের নিয়ন্ত্রণের ভিতরে যেটুকু করণীয় আছে সেই প্রতিষেধকগুলো কি এইবারও আমরা নিতে পারবো কি না সেটি আমার প্রশ্ন। মানুষ এমন একটা জাতি তারা মনে করে দুর্যোগ আমার উপরে হবে না প্রতিবেশীর উপরে হবে এবং আমি তো বেঁচে গেছি। এবার আমার হয়তো সেই অর্থে হয়াত মউত কিছুতেই অসুবিধার কিছু নাই। সেইটাই হলো একটা সমস্যা। আমি শেষ করার জন্য যেটা বলি, প্রকৃতি আমাদের উপর ভূমিকম্প দিচ্ছে এবং সেটা নিয়ন্ত্রণ করার আমার ক্ষমতা অত নাই। কিন্তু কাল যদি আমার রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি, নির্বাচনে ভূমিকম্প হয় তাকে কে সামাল দিবে? তখন আফসোসটা আমার বড় হবে এইখানে যে হয়তো প্রাকৃতিক ভূমিকম্প আমি রক্ষা করতে পারতাম না। আমার প্রকৃতির উপর সেই ক্ষমতা নাই। কিন্তু ক্ষমতা ছিল এই রাজনীতির ভূমিকম্পকে আটকানোর। ক্ষমতা ছিল রাষ্ট্রনীতির এ ভূমিকম্পকে আটকানোর। আমার সমাজের ভিতরে যেই বিস্ফোরণ, সহিংসতা, দ্বेष, ক্লেদ এগুলোকে আটকানোর। সেই ভূমিকম্প আমরা আটকাই নাই। এই অপরাধবোধ থেকে তো জাতি হিসেবে আমরা নিষ্কৃতি পাবো না। ওই ভূমিকম্পকে তো আমরা অন্য কারোর উপর, ঐশ্বরিক শক্তির উপর চাপিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু এই মানবিক দুর্বলতাকে নিয়ে আমরা কার কাছে দোষ দিব?

হোসাইন শাহাদাতঃ সেটাই আসলে। রাজনৈতিক ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক ভূমিকম্প কোনটাই প্রত্যাশিত না। কারণ যেকোন ভূমিকম্প আমাদের উপর আসলে বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে। আমরা আশা করব সরকারের দিক থেকে বা রাজনৈতিক দলগুলো দায়িত্বশীল আচরণ করবেন। কারণ সাধারণ মানুষের হাতে আসলে খুব বেশি কিছু করার নেই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য।

নিউজ ২৪

৬ ডিসেম্বর ২০২৫

জনগণ এবারের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

ড. মোস্তাফিজুর রহমান একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মাননীয় ফেলো। আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন খবরের কাগজের সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সিনিয়র সহসম্পাদক শেহনাজ পূর্ণা

খবরের কাগজ: ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন কেমন হতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ, বাধাবিপত্তি তো আছেই। তা সত্ত্বেও আগামী নির্বাচন একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ যারা অনেক বছর তাদের গণতান্ত্রিক যে অধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি, তারা একটি ভালো নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছে। তারাও চাচ্ছে এবং অন্তর্ভর্তী সরকারও এ ব্যাপারে আন্তরিক আছে। কাজেই একটি ভালো নির্বাচন আমাদের হবে। এটা ঠিক যে, কিছু কিছু পক্ষ আছে, যারা গণতান্ত্রিক যে উত্তরণ সে উত্তরণটা চায় না। বিভিন্নভাবে এটাকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। আমার ধারণা, বিভিন্ন বাধাবিপত্তি কাটিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। সম্প্রতি এ নির্বাচনকে ভণ্ডুল করার বিভিন্ন অপচেষ্টা দেখেছি। হাদিকে যেভাবে হত্যা করা হলো এবং পরবর্তীতে যেভাবে ভাঙচুর, আগুন দেওয়া হলো, এগুলো দেখে বোঝা যায় যে, দেশে স্থির অবস্থা অনেকে চায় না। অস্থিরতার মাধ্যমে এ নির্বাচনের পরিবেশটাও নষ্ট করতে চায়। ভালো নির্বাচনের মধ্যদিয়ে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য একটা ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে সে বিষয়ে আমি অত্যন্ত আশাবাদী।

খবরের কাগজ: নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কেমন মনে হচ্ছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে কি না?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: সেক্ষেত্রে অবশ্যই অনেক চ্যালেঞ্জ থাকবে। একেবারে হয়তো আমরা যেরকমভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনুকূল পরিবেশ চাচ্ছি, সে রকম হচ্ছে না।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিভিন্ন চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ‘আর্মি ডিপ্লয়মেন্ট’ (নির্দিষ্ট সামরিক মিশন) হবে। এটা খুব ভালো কথা। সে ডিপ্লয়মেন্টের সংখ্যা তো প্রয়োজনের তুলনায় কম। আমরা যদি ১ লাখ বলি, তাহলেও প্রতি সেন্টারে আমরা কয়জনকে দিতে পারব? স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে তাদের রাখতে হবে। পুলিশ প্রাথমিক পর্যায়ে একটা বড় বিপর্যয়ের মধ্যে ছিল, এখন তা কাটিয়ে তারা প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা কিছুটা অর্জন করেছে। তার পরও সেখানে বিভিন্ন ধরনের দুর্বলতা আছে। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা একেবারে সঠিক, যখন আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করার মতো আমাদের সক্ষমতা হবে, তখনই কেবলমাত্র আমরা নির্বাচন করব। সে প্রত্যাশা করাটা হয়তো ঠিক হবে না। যতটুকু আমাদের পক্ষে বর্তমান পারিপার্শ্বিকতায় সম্ভব আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। আমাদের এ সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করে নির্বাচনের দিকে যাওয়া উচিত। সেখানে অবশ্যই অস্ত্র উদ্ধার একটা বড় কারণ হবে। নির্বাচন কমিশনের তফসিল ঘোষণার পর যাদের হাতে মূল ক্ষমতা দেওয়া আছে, তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। সেখানে যদি দুর্বলতা থাকে সে দুর্বলতাগুলোকে কাটিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও উন্নতি করে নির্বাচনের দিকে যেতে হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো অনুকূল নয়, নির্বাচন করা ঠিক হবে না, এভাবে চিন্তা না করে আমরা যদি উল্টোভাবে চিন্তা করি অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হচ্ছেই। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে কীভাবে আমরা সে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করতে পারি, এভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে আমার মনে হয় পরিস্থিতি উন্নতির মাধ্যমে ভালো একটা নির্বাচনের দিকে যেতে পারব।

খবরের কাগজ: বিএনপির দীর্ঘদিনের মিত্র জামায়াতে ইসলামী এবার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সবারই অংশগ্রহণের সুযোগ আছে। সাংবিধানিকভাবে যারা গঠনতন্ত্র আইনে নির্বাচন করতে চান, তাদের সবাইকে সুযোগ দিতে হবে। এটাই হলো গণতন্ত্রকে ধারণ করা। এটা ঠিক যে, ইসলামী দলগুলো, যাদের অনেকদিন গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়নি। এখন তাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং সে সুবাদে তারা মানুষের কাছে যেতে পারছে। একেকজনের একেক রকম আদর্শ থাকবে। গণতান্ত্রিক সমাজে এটাই হলো নিয়ম। আমার পছন্দ না হলেও গণতান্ত্রিক অধিকার সবাই প্রয়োগ করতে পারবে। সেটাকে আমাদের সবার মেনে নিতে হবে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। এখন আওয়ামী লীগ নেই। বিএনপি-ইসলামপন্থি দল, ছাত্রদের দল এরাই নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যারা গত ১৮ বছর রাস্তায় দাঁড়াতে পারেনি। সুতরাং এটাকে আমি এভাবে দেখি যে, কারও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ তো অবশ্যই থাকবে একটা গণতান্ত্রিক সমাজে। ইসলামি দলগুলোর ওপর যদি মানুষের সমর্থন থাকে তাহলে তারাও রাজনীতিতে থাকবে। তাদের অবস্থান শক্ত করার চেষ্টা করবে। যাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি আছে তারা তাদের মতামত, তাদের যে আদর্শ সেটা জনগণের কাছে শক্তিশালীভাবে নিয়ে যাবে। দলগুলো যদি জনগণের কাছে পৌঁছাতে না পারে, তারা যদি তাদের নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করতে না পারে; দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিলে সেটা

যদি প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে ঘটনা অন্যরকম হবে। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। আমার আদর্শ যদি হয় আমি একটা প্রগতিশীল সেকুলার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করব, তাহলে জনগণকে সঙ্গে নিয়েই প্রমাণ করতে হবে। আর সেটা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে, অন্য যারা ইসলামপন্থি বলি বা অন্য পন্থি বলি তাদের দিকে জনসমর্থন চলে যেতে পারে।

খবরের কাগজ: আসন্ন নির্বাচনে কোনো চ্যালেঞ্জ আছে কি না?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: নির্বাচনের যে বিধিমালা নির্বাচন কমিশন করে দিয়েছে, সেটা মানতে হবে। যত্রতত্র পোস্টার লাগানো বা কালার পোস্টার করা, এসব বিষয়ে যেসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, দুঃখজনক সত্য যে, অনেক প্রার্থী সেগুলো পালন করছেন না। জনগণ কিন্তু এগুলো খেয়াল করছে এবং তারা সিদ্ধান্ত নেবে যে, ভোটের সময়ে করা অঙ্গীকার প্রার্থীরা কতটুকু রাখছেন। যিনি আগেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন তিনি নির্বাচিত হলে অঙ্গীকার রাখতে পারবেন কি না, তা নিয়ে জনগণের যখন সন্দেহ হবে ভোটের ওপরেও কিন্তু তার একটা প্রভাব থাকবে। এটা রাজনীতিকদের জন্য একটা সতর্কবাণী বলে আমি মনে করি। নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করবে। আমরা আশা করব, তারা পারবে। প্রশাসন তাদের কথা শুনবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের কথা শুনবে। অন্তর্বর্তী সরকার বলেছে, তারা খুব ভালো একটা নির্বাচন দিতে চায় এবং বিশ্বাসী থাকবে শেষ পর্যন্ত। কোনো ধরনের চাপের কাছে, সংঘাতের কাছে, কোনো অযোগ্য দাবির কাছে তারা মাথা নত না করে একটা ভালো নির্বাচন দিতে পারবে। এটাই হলো চ্যালেঞ্জ। প্রত্যেক পক্ষকে তার যে সাংবিধানিক দায়িত্ব এবং জনগণের কাছে অঙ্গীকার বা দায়িত্ববোধ এটা মানতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার হোক, নির্বাচন কমিশন হোক, ব্যুরোক্রেসি হোক, রাজনৈতিক দল হোক- সবাইকে এটা মানতে হবে। জনগণ এগুলো মানা হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করবে। যেখানে এটা মানা হচ্ছে না, সেখানে তারা নিশ্চয়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমি অত্যন্ত আশাবাদী- আমরা যে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বিগত সময় গিয়েছি এবং বাংলাদেশের যে সম্ভাবনার কথা আজকের তরুণ সমাজ বিশ্বাস করে, তাদের সে সক্ষমতা আছে। এসবকে ধারণ করে একটা ভালো নির্বাচন আমাদের হবে, এটাই প্রত্যাশা।

খবরের কাগজ: আপনাকে ধন্যবাদ।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: আপনাকেও ধন্যবাদ।

খবরের কাগজ

২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

অধ্যায় ২

রাজনীতি, রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র



অগণতান্ত্রিক চর্চা থেকে বের হওয়াই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ

অধ্যাপক রওনক জাহান

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে, তা নিয়ে লিখেছেন রওনক জাহান।

গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার শাসনের নাটকীয় পতন ছিল একটি বিস্ময়কর ঘটনা। তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী তরুণদের মধ্যে জেগেছে আশা। তাঁরা এখন রাষ্ট্র সংস্কারের দাবি করছেন, যেন ভবিষ্যতে আর কোনো স্বৈরাচার বাংলাদেশ শাসন করতে না পারেন।

গণ-অভ্যুত্থানের পর এসেছে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। এ সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার প্রস্তাবের জন্য বিভিন্ন কমিশন গঠন করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে আলোচিত সংস্কার প্রস্তাবগুলোর বেশির ভাগই নতুন কাঠামো তৈরি এবং নতুন আইন ও বিধি প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

তবে রাষ্ট্রকাঠামো ও আইনের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ বাস্তব রাজনৈতিক চর্চার গুরুত্বকে উপেক্ষা করে। শুধু কাঠামো ও আইন পরিবর্তন করলেই নতুন স্বৈরশাসকের প্রত্যাভর্তন রোধ করা সম্ভব নয়। আমি মনে করি, আইন ও বিধির অনুপস্থিতি নয়, বরং রাষ্ট্রের সেগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে না পারা এবং লঙ্ঘনকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে ব্যর্থ হওয়াই অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করেছে।

এখন আমাদের করণীয় হলো সেই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চর্চাগুলোকে চিহ্নিত করা, যা দেশের প্রচলিত আইন ও সর্বজনীন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। এসব অগণতান্ত্রিক অনুশীলনকে ভেঙে ফেলাই এখন আমাদের সামনের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভাঙন ও গড়ন

গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পথ হয়েছে অসম আর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় হয়েছে বেশ কিছু ভাঙন। অবশ্য ভাঙনের পর আবার নতুন করে গড়ারও প্রচেষ্টা হয়েছে বারবার।

১৯৭১-এ স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রের পথে আমাদের যাত্রার সূচনাটা হয়েছিল ভালো। জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমরা একটি বহুদলীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু চার বছরের মধ্যে বাংলাদেশ স্বৈরাচারী শাসনের দিকে এগিয়ে মৌলিক স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধসহ একটি একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

এরপর সামরিক শাসনের অধীনে পরবর্তী ১৫ বছর অতিবাহিত হয়। ১৯৯০ সালে একটি গণ-আন্দোলন সামরিক শাসনকে উৎখাত করে। বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মতো গণতান্ত্রিক যাত্রা শুরু করার সুযোগ পায়। পরবর্তী ১৬ বছর ধরে তিনটি নির্বাচনে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি, পালাক্রমে ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতার পালাবদল হয় যখন নির্বাচন হয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার অধীনে।

কিন্তু নিয়মিত নির্বাচন ও ক্ষমতার হাতবদল বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মান উন্নত করতে পারেনি। নির্বাচিত সরকারগুলো ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং পৃষ্ঠপোষকতামূলক রাজনীতি ব্যবহার শুরু করে। বিরোধী দলগুলো মুখোমুখি হয় দমন-পীড়নের। সংসদ হয়ে পড়ে অকার্যকর। নির্বাচিত সরকারগুলো বেসরকারি খাতের মালিকানাধীন নতুন স্বাধীন মিডিয়া এবং নাগরিক সমাজের সংস্থাগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।

এরপর আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধানের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিষয়ে একমত হতে না পারায় ২০০৭ সালে বাংলাদেশের ভঙ্গুর নির্বাচনী গণতন্ত্র আবারও ভেঙে পড়ে। দুই বছর বাংলাদেশ শাসন করে একটি সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তারাই ২০০৮ সালে নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের কাছে। তখন আবার আমাদের আর একটি সুযোগ সৃষ্টি হয় গণতান্ত্রিক চর্চার গুণগত মান উন্নয়ন করার।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনের আগে দিনবদলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারা বলেছিল একটি সহনশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতি তারা গড়ে তুলবে। কিন্তু সরকার ক্রমেই স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে এবং বিরোধীদের প্রতিবাদকে বারবার কঠোরভাবে দমন করে। শেষ পর্যন্ত গত ৫ আগস্ট ছাত্রদের নেতৃত্বে একটি গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটে। আরও একবার সৃষ্টি হয় গণতন্ত্রের পুনর্গঠনের সুযোগ।

নিরন্তর অগণতান্ত্রিক অনুশীলন

আমাদের জন্য চতুর্থবার যে সুযোগটি সৃষ্টি হয়েছে, তার সদ্যবহার করতে হলে আমাদের প্রথমেই পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের রাজনৈতিক চর্চার। গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের অগণতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলোর কিছু বিষয় সামরিক শাসনামল থেকে উদ্ভূত হলেও পরবর্তী নির্বাচিত রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা এই রীতিনীতিগুলোকে প্রত্যাখ্যান তো করেইনি, বরং তা বহুলাংশে গ্রহণ করেছিল। এর সঙ্গে আরও সংযুক্ত করেছিল তাদের নিজেদের অগণতান্ত্রিক রীতিনীতি।

যেসব অগণতান্ত্রিক চর্চা আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে এবং যাদের আমাদের সবার আগে পরিহার করতে হবে, তার কয়েকটি নিচে চিহ্নিত করছি।

দলীয় শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার: ‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’ ও দল গঠন

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব হলো নিরপেক্ষভাবে কাজ করা। কিন্তু বাংলাদেশে সামরিক ও বেসামরিক দুই ধরনের সরকারই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে ‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’ (নির্বাচন কারসাজি) করেছে ও দল গঠন বা দলের সমর্থন বৃদ্ধি করেছে। সামরিক শাসনামলে (১৯৭৫-১৯৯০) নির্বাচন কারসাজি, ‘কিংস পার্টি’ তৈরি এবং ভুয়া বিরোধী দল গঠনের প্রচলন শুরু হয়। দুর্ভাগ্যবশত, সামরিক শাসনের অবসানের পর নির্বাচিত বেসামরিক সরকারগুলোও একই কৌশল অবলম্বন করেছে।

‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’ এখন বাংলাদেশের একটি প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়েছে। জনসাধারণ জানে যে সরকার তার শাসনব্যবস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করে নিজের মনমতো নির্বাচনী ফলাফল তৈরি করতে পারে।

আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশের গত ১২টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো সরকার নিজের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন আয়োজন করে পরাজিত হয়নি। আবার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালিত চারটি নির্বাচনেই ক্ষমতাসীন দল পরাজিত হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে বিএনপির বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালুর দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন শেখ হাসিনা। কিন্তু তিনিই আবার ক্ষমতায় এসে ২০১১ সালে তা বাতিল করেন। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে পরপর তিনটি বিতর্কিত একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় টিকে থাকে।

সামরিক শাসকদের পথ অনুসরণ করে শেখ হাসিনা সংসদে একটি নিয়ন্ত্রিত বিরোধী দলও তৈরি করেন। দশম জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টি (জাপা) সরকার ও বিরোধী—উভয় ভূমিকায় ছিল। আর ১১তম ও ১২তম সংসদে জাপা ছিল সরকারপন্থী বিরোধী দল। বারবার প্রহসনের

নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রিত সংসদ গঠনের ফলে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচনী ব্যবস্থা ও সংসদের প্রতি আস্থা হারিয়েছে।

শুধু নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণই নয়, গত পাঁচ দশকে আমাদের দেশে বারবার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দল গঠন করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার একদলীয় বাকশালব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। তারপর সামরিক শাসকেরা রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব দল গঠন শুরু করেন। বিএনপি ও জাতীয় পার্টি—উভয়ই সামরিক শাসন আমলে কিংস পার্টি হিসেবে যাত্রা শুরু করে। পরে অবশ্য এই দুই দলই, বিশেষ করে বিএনপি, বিরোধী দল হিসেবে সরকারি নির্খাতনের মুখেও টিকে থাকতে সক্ষম হয়।

১৯৯০-পরবর্তী নির্বাচনী গণতন্ত্রের আমলে, বিশেষ করে গত ১৫ বছরে শাসক-সমর্থকেরা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়িক চুক্তির ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা দল ও নির্বাচনী ব্যয়ের তহবিল সরবরাহ করত। রাজনীতিবিদ, আমলা ও ব্যবসায়ীদের একটি দুষ্টচক্র আবর্তিত হয়েছিল, যারা রাষ্ট্রীয় সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে নির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থাকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছিল।

অগণতান্ত্রিক দলীয় রাজনীতি

আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে মূল আদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের রাজনৈতিক অনুশীলন ছিল অগণতান্ত্রিক। উভয় দলই রাজনৈতিক সমর্থন তৈরি এবং ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করেছিল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, মক্কেলতন্ত্র, অর্থ, পেশিশক্তি ও সহিংসতা। উভয় দলেই অভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্রের অভাব ছিল। সব গুরুত্বপূর্ণ দলীয় সিদ্ধান্ত শীর্ষদলীয় নেতার মাধ্যমে নেওয়া হতো। এই নেতা আবার পারিবারিক সূত্রে উত্তরসূরি। দল কর্তৃক তাঁকে দলের পদাধিকারী ও নির্বাচনের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষয়

রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা সব প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে নিজস্ব দলীয় স্বার্থ ব্যবহার করেছে। ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে যায়। বিজয়ী দলেই নিরঙ্কুশভাবে সব নেওয়ার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১৫ বছরে নির্বাহী ক্ষমতা কোনো নির্বাচনী জবাবদিহির মুখোমুখি না হয়ে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে দলীয়করণ করেছে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেছে।

সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্য ব্যবসায়ী হওয়ায় শাসনব্যবস্থার সংকট আরও গভীর হয়েছে। ফলে এই নিয়ন্ত্রিত সংসদ নীতিনির্ধারণে উদাসীন থেকে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান দুর্বল করা,

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি, ভবন ও সড়ক নিরাপত্তাবিধি লঙ্ঘন, ভূমি দখল, নদীভাঙনসহ নানা অনিয়মকে উৎসাহিত করেছে।

রাজনৈতিক সহিংসতা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিভাজনমূলক নীতি, প্রতিপক্ষকে শত্রু হিসেবে দেখার প্রবণতা আছে; দলের ভেতরে আছে গণতন্ত্রের অভাব। এসব কারণে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রায়ই সহিংসতা ব্যবহার করা হয়। এই সহিংসতার শিকার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল হলেও দলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী ও উপদলগুলোর মধ্যেই বেশি সহিংসতা দেখা যায়।

আইন ও সালিশি কেন্দ্রের তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাই, ২০০২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দলগত সংঘর্ষে ২৬৬ জন মারা গেলেও একই দলের ভেতরে সংঘর্ষে ৪৪৭ জন নিহত হয়েছেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সরকারদলীয় রাজনৈতিক দলে দলীয় সহিংসতার হার বরাবরই বেশি। এটা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ক্ষমতাসীন দলগুলোর কাছেই সুযোগ-সুবিধা বা পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ বেশি থাকে। ফলে দলীয় পদপদবি ও সুযোগ-সুবিধা দখলের প্রতিযোগিতায় নিজেদের মধ্যেই বেশি সহিংসতা হয়।

সর্বময় ক্ষমতাব্যবহারের নির্বাহী

শুরু থেকেই বাংলাদেশ এক সর্বময় ক্ষমতাব্যবহারের নির্বাহী কর্তৃক শাসিত হয়েছে। সংসদীয় সরকারে প্রধানমন্ত্রী আর রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সরকারপ্রধান, সংসদপ্রধান এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান একই ব্যক্তি হওয়ায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে এক ব্যক্তির হাতে।

আগামীর চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের সামনে এখন একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায় সেসব অগণতান্ত্রিক চর্চা বহুদিন থেকে প্রচলিত আছে তাকে নির্মূল করা। এসব চর্চা পরিহার করতে না পারলে আমরা একটি জবাবদিহিমূলক রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হতে পারব না।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা। একটি সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনব্যবস্থায় ফিরে আসতে হলে তাকে অর্থ ও পেশিশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অবাধে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

অর্থবহ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা, জনগণের মুক্ত সমাবেশের অধিকার এবং একটি সত্যিকারের স্বাধীন বিচারব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুষ্ঠু শাসন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশনসহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হবে এবং বিচার বিভাগকে স্বাধীন করতে হবে।

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে ‘বিজয়ী সবকিছু পাবে, পরাজিত সব হারাবে’— এই সংস্কৃতি পরিত্যাগ করতে হবে। এই মনোভাবই বাংলাদেশের রাজনীতিকে সংঘাতময় ও একপক্ষীয় করে তুলেছে, পরাজিত দলকে কোণঠাসা করেছে এবং যুক্তিসংগত আলোচনা ও মতবিনিময়ের জায়গা সংকুচিত করেছে।

গণতন্ত্র শুধু নির্বাচন নয়, বরং এটি একটি প্রক্রিয়া, যা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। এর জন্য টাকার প্রভাব ও পেশিশক্তির দৌরাহ্ব্য বন্ধ করতে হবে, যাতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আর কেবল এলিট শ্রেণির কবজায় না থাকে। সংসদকে দলীয় সংঘর্ষের মঞ্চ বানানোর পরিবর্তে জাতীয় সমস্যা সমাধানের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সম্ভাবনা অনেকাংশে নির্ভর করে বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতারত বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির ওপর। তারা যদি সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়, তা হলেই আমাদের গণতন্ত্রের পথের নতুন যাত্রার পথ সুগম হবে।

অধ্যাপক ড. রওনক জাহান, ডিস্টিংগুইশড ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

(৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে রাজনীতি, সমাজ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কনফারেন্সে দেওয়া বক্তৃতার সংক্ষেপিত অনুবাদ)

প্রথম আলো

৫ মার্চ ২০২৫

স্মারক বক্তৃতা রাজনীতিবিদেরা বয়ান তৈরি করেন নিজেদের স্বার্থে

অধ্যাপক রওনক জাহান

এ দেশে গবেষকদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে রাজনীতি। রাজনীতিবিদেরা নিজেরা নিজেদের স্বার্থে বয়ান তৈরি করেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রশ্নাভিত্তিক প্রসঙ্গগুলো জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে গবেষকদের জন্য। লেখা হয় না ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত স্মারক বক্তৃতায় উঠে আসে এ কথাগুলো।

শনিবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয় এ আয়োজন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর স্মারক বক্তৃতা করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক রওনক জাহান। ‘আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ: রাজনীতি ও গবেষণার চ্যালেঞ্জ’ শিরোনামে বক্তৃতা করেন তিনি।

রওনক জাহান বলেন, ‘বাংলাদেশে রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহে অনেক রকম ভয়। এ জন্যই রাজনৈতিক কোন্দল। এটা যেমন নিজের গবেষণাকাজের সময় দেখেছি। আজও তাই দেখছি।’ মূল প্রবন্ধে তিনি বলেন, রাজনীতি এ দেশের গবেষণায় তিনভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রথমত, রাজনীতির জন্য অনেক সময় গবেষণার কারণে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ জটিল হচ্ছে। ফলে রাজনীতি তথ্যের সংকট তৈরি করেছে। দ্বিতীয়ত, রাজনীতি গবেষকদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। যেকোনো গবেষকেরই নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রশ্নাভিত্তিক তথ্য বা প্রসঙ্গগুলোও (আনকনটেন্টেড ফ্যাক্টস) জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে

ওঠে গবেষকদের জন্য। তৃতীয়ত, রাজনীতিবিদেরা নিজেরা বয়ান তৈরি করছেন নিজেদের স্বার্থে। যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, তারা বিভিন্ন বয়ান পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে।

আজ অনুষ্ঠানে রওনক জাহানের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করে শোনান নাট্যজন ত্রুপা মজুমদার। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের গণহত্যা প্রসঙ্গ তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা অধ্যাপক রওনক জাহান ১৯৭২ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি সারওয়ার আলী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যা কিছু অর্জন, এর সবটাই সম্ভব হয়েছে দেশের সাধারণ জনগণের সহযোগিতায়। তিনি বলেন, ‘যে শিশুকে মুক্তিযুদ্ধের সময় পিষে মারা হয়েছিল, তার কাছেও দায় আছে। জাদুঘরের দায় হচ্ছে অতীতকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া। এই কাজটির মধ্য দিয়ে আমরা অতীতকে সক্রিয় করতে চাই।’

ট্রাস্টি ও সদস্যসচিব সারা যাকের বিগত এক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ২৯তম বর্ষে পদার্পণ করল জাদুঘর। তিনি ৫৫ হাজার প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান সংরক্ষণ থেকে শুরু করে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সুলতানার স্বপ্ন ইউনেস্কোর বিশ্বজনের স্মৃতি বা মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড অর্জন প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি জানান, চার বছর ধরে বার্ষিক ৬ কোটি টাকা করে অনুদান পাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। তবে পরিচালন ব্যয় অনেক বেশি, তাই তহবিল সংগ্রহে মনোযোগ দিতে হয়।

অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক। তিনি বলেন, ‘এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ২৯ বছর পর বলতে হয়, আমাদের এই যাবতীয় আয়োজনে আমাদের ভাবনায় গুরুত্ব পায় তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্ক তৈরি করা।’ এ সময় মফিদুল হক বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের উদাহরণ তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে তৃতীয় গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ তুলে দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের হাতে। শিল্পী শারমিন সাখী ইসলামের সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় আয়োজন।

সমকাল ও প্রথম আলো

২২ মার্চ ২০২৫

স্বাধীনতা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন

অধ্যাপক রওনক জাহান

আজ ২৬ মার্চ, স্বাধীনতার ৫৪তম বার্ষিকী। মনে পড়ছে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ভোরের দৃশ্য। আমাদের এলিফ্যান্ট রোডের বাড়ির বারান্দা থেকে দেখছি, এক গাড়ি পাকিস্তানি সৈনিক ঢাকা কলেজের সামনের একটি তেলের পাম্পের ওপর ওড়ানো বাংলাদেশের পতাকা এবং কালো পতাকা নামানোর জন্য একটি কিশোর ছেলের দিকে বন্দুক তাক করে ধমক দিচ্ছে। ভোর হওয়ার একটু আগেই আমরা মাইকে ঘোষণা শুনেছি, যেই বাড়ি পতাকা না নামাবে, সেই বাড়িই ধূলিসাৎ করে দেওয়া হবে।

২৫ মার্চের মধ্যরাত থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর পিলখানা থেকে গোলাগুলির শব্দ আসছিল।

বাবুপুরা বস্তি আর নিউমার্কেট এলাকায় আগুনের শিখা। মানুষের চিৎকার শুনছিলাম। শেষ রাতের দিকে আমাদের রাস্তা দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের ট্যাংক চলে গেল।

নিজের চোখ আর কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মাত্র দুদিন আগে, ২৩ মার্চ বাড়ির ছাদে আমরা নিজ হাতে সেলাই করে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছি। মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই মনে হচ্ছিল, স্বাধীন হয়ে গেছি। কারণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলনের ডাকের পর সারা দেশের প্রশাসন, এমনকি ব্যাংকগুলোও তাঁর নির্দেশে চলছিল। ৫ মার্চ ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার হিসেবে জেনারেল ইয়াকুব তাঁর পদত্যাগপত্রে জেনারেল ইয়াহিয়াকে লিখেছিলেন, ‘কার্যত শেখ মুজিব এখন সারা দেশের সরকারপ্রধান। এমন সময়ে নিরস্ত্র জনগণের ওপর সামরিক আক্রমণের ফল হবে বিপর্যয়কর।’ ইয়াহিয়া অবশ্য সামরিক আক্রমণের পথই বেছে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

২৬ মার্চ সকালে আমাদের বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকাটি নামালাম; কিন্তু ফেলে দিইনি, লুকিয়ে রেখেছিলাম। বুঝতে পারলাম, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আরও অনেক দিন সংগ্রাম করতে হবে। মনে পড়ল ভিয়েতনাম, কিউবা—এসব দেশ বছরের পর বছর যুদ্ধ করেছে। সেই লুকানো পতাকা যে মাত্র ৯ মাসের যুদ্ধের পর আবার বাড়ির ওপর ওড়াতে পারব, তা সেদিন কল্পনাও করতে পারিনি।

আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপনিবেশ-পরবর্তী রাষ্ট্র হিসেবে আমরাই প্রথম সংগ্রাম করে স্বাধীন হতে পেরেছি। তৃতীয় বিশ্বের আরও অনেক জাতি বছরের পর বছর সংগ্রাম করেও স্বাধীন হতে পারেনি। সশস্ত্র যুদ্ধের কোনো পূর্বপ্রস্তুতি আমাদের ছিল না। সেই জনযুদ্ধে বিজয় সম্ভব হয়েছিল। কারণ, স্বাধীনতার পক্ষে পুরো জাতি ছিল ঐক্যবদ্ধ। আর সে ঐক্য গড়ে উঠেছিল আগের দুই দশকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষা, গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন, ধর্ম, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদি প্রশ্ন ধারাবাহিকভাবে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের থেকে আমাদের ক্রমে আলাদা করেছে এবং আমাদের জাতীয় সংগ্রামের মূল এজেন্ডা তৈরি করে দিয়েছে। ১৯৬০-এর দশকের বিভিন্ন আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা ও ১৯৬৯ সালের ১১ দফা আমাদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার স্ফূরণ ঘটায়। ১৯৬৯-৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণাকালে নজিরবিহীন জনসংযোগের মাধ্যমে গোটা জাতিকে শেখ মুজিব স্বাধিকারের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করেন। পূর্ববঙ্গকে বাংলাদেশ বলে উল্লেখ করতে থাকেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর পাকিস্তানি শাসকেরা যখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর না করে আমাদের ওপর সামরিক হামলা শুরু করে, তখন সংঘবদ্ধ জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছিল। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতসহ বিশ্ববাসী আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছে। আবার অনেক দেশে; যেমন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন সরকার আমাদের সমর্থন দেয়নি; কিন্তু আমেরিকার কংগ্রেস ও গণমাধ্যম সমর্থন দিয়েছিল। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েও বাংলাদেশের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিল। আমরা এসব অভূতপূর্ব জনসমর্থন পেয়েছিলাম। কারণ, মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্ববাসী একটি ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার জন্য সংগ্রাম হিসেবে দেখেছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা কী ধরনের রাজনীতি, সরকার, সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেখতে চাই, তারও একটি ধারণা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থার বিপরীত এক ব্যবস্থা আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। পাকিস্তানে ছিল অগণতান্ত্রিক সামরিক শাসন, আমরা স্বপ্ন দেখেছি বাংলাদেশে হবে বেসামরিক গণতান্ত্রিক শাসন। পাকিস্তান ছিল ইসলামিক রিপাবলিক। সেখানে ধর্মের অপব্যবহার করে রাজনীতি করা হতো। ধর্মের নামে হয়েছে রক্তক্ষয়ী সংঘাত।

আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল—রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবে না। সব ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকবে। ধর্মের নামে সংঘাত হবে না। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছিল ২২টি অতি ধনী পরিবার। আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি শোষণ ও বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও সমাজ গড়ে তুলবে। এসব আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতেই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছিল।

গত পাঁচ দশকে আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। আবার আমাদের অনেক স্বপ্ন, অনেক আকাঙ্ক্ষা এখনো অধরা রয়ে গেছে। আমরা গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। ধর্মের রাজনৈতিক অপব্যবহার বন্ধ হয়নি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য কমেনি; বরং বেড়েছে। কিন্তু আমাদের আন্দোলন ও যুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা। সেই লক্ষ্য আমরা অর্জন করেছি অনেক রক্ত, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে।

অনেকেই মাঝেমধ্যে বলেন, আমরা স্বাধীন হয়ে কী পেলাম? এর উত্তরে আমি বলি, স্বাধীনতাই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পেরেছে বলেই আজ আমরা একটি গর্বিত জাতি হিসেবে পৃথিবীতে জায়গা করে নিতে পেরেছি। স্বাধীনতা আমাদের মনমানসিকতায় পরিবর্তন এনেছে। স্বাধীনতা আমাদের জনগণের মনে স্বাবলম্বী ও উদ্যোক্তা হওয়ার স্পৃহা গড়ে দিয়েছে। আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়েছি, প্রতিবাদী হয়েছি। আমাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোনো ব্যবস্থাই আমরা বেশি দিন সহ্য করিনি। ১৯৯০ সালে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়েছি। গত বছরের গণ-আন্দোলনেও আমরা একটি স্বৈরাচারী শাসন উৎখাত করেছি। আমরা বারবার সংগ্রাম করে অন্যায় ব্যবস্থার পরিবর্তন এনেছি। আত্মপ্রত্যাশী হয়েছি।

স্বাধীনতা আমাদের চেতনায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, সেটিই বিরাট এক প্রাপ্তি।

প্রথম আলো

২৬ মার্চ ২০২৫

গণ-অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এমন ধরনের গণতন্ত্র যাতে আবার নতুন করে স্বৈরতন্ত্র আসতে না পারে। সেজন্য অন্য অভ্যুত্থানের চেয়ে ছাত্রদের এ গণ-অভ্যুত্থানটি ভিন্ন। এবার সামগ্রিক কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভ্যুত্থানের যে চিন্তাচেতনা সেটি আমাদের মূলধারার রাজনীতিকে কীভাবে পরিবর্তন করবে এবং রাজনীতি এটিকে কীভাবে ধারণ করবে, সেটিই এখন দেখার বিষয়। সেটি দেখার অপেক্ষায় আমরা আছি এবং নির্বাচন সেটির সুযোগ করে দেবে বলে ভরসা রাখি। আমরা বৈষম্যবিরোধিতার কথা বলেছি। বৈষম্য নিরসনে যতটুকু দরকার হয়তো ততখানি করতে পারেনি। সেজন্যই আমরা বলছি মূলধারার রাজনীতিতে এটিকে ফেরত নিয়ে আসতে হবে। নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে মূলধারার রাজনীতিতে একত্র করে দেখতে হবে তারা তাতে কীভাবে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাদের সেই সুযোগ আসবে।

এ সরকারকে অনেক ক্ষেত্রেই ফায়ার ফাইটিং করতে হয়েছে। যেসব দুর্যোগকে উত্তরাধিকার সূত্রে তারা পেয়েছে, সেগুলো মোকাবেলা করতে তাদের অনেক সময় দিতে হয়েছে। এজন্য হয়তো পুরো জিনিসটা (সংস্কার) এখনো হয়নি। আর পুরো জিনিসটা তারা করতে পারবেও না। কারণ এ সরকারের সেই অর্থে রাজনৈতিক ভিত্তি নেই। রাজনৈতিক ভিত্তি নিয়ে (নির্বাচিত সরকারকে) বাকি সংস্কারগুলো শেষ করতে হবে। সেগুলোকে নির্বাচনী ইশতেহার এবং নির্বাচনী বিতর্কের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

বণিকবর্তা

৫ আগস্ট ২০২৫

‘আলংকারিক’ রাষ্ট্রপতিকে এভাবে ক্ষমতায়নের চেষ্টা নজিরবিহীন

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

ঐকমত্য কমিশনের দুই মাসব্যাপী টানা আলোচনার সর্বশেষ দিনে (৩১ জুলাই ২০২৫) বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মতামত দিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি।

ঐকমত্য কমিশন মনে করে, রাষ্ট্রপতির পদটি ‘আলংকারিক’ না থেকে তা ‘ক্ষমতাশালী’ হওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদধারীদের নিয়োগ রাষ্ট্রপতির সরাসরি সিদ্ধান্তে হওয়া প্রয়োজন।

ঐকমত্য কমিশন প্রস্তাব করে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান, এনএসআই প্রধান, ডিজিএফআই প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরসহ ১২টি পদে নিয়োগে রাষ্ট্রপতির সরাসরি এখতিয়ার থাকা দরকার।

এ বিষয়ে আলোচনাকালে বিভিন্ন দল বিভিন্নমুখী অবস্থান নেয়। সংসদীয় কাঠামোয় রাষ্ট্রপতির ‘আলংকারিক’ পদকে এভাবে ক্ষমতায়িত করার চেষ্টা নজিরবিহীন।

রাষ্ট্রপতির এ ধরনের ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা নির্বাহী বিভাগ; অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনকাঠামোয় ভারসাম্যের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। প্রকারান্তরে সংসদীয় কাঠামোয় আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে যা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা থাকা প্রয়োজন, এ ধরনের কৃত্রিম ক্ষমতায়ন এর জন্য সহায়ক না হয়ে তাকে ভারসাম্যহীন করতে পারে।

ঐকমত্য কমিশনে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায়নের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে মূলত প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে ‘চেক অ্যান্ড ব্যালান্স’-এর মধ্যে নিয়ে আসার অভিপ্রায় থেকে। এটা সত্য যে পূর্বতন সরকারগুলোর সময় নির্বাহী বিভাগের হাতে যে ক্ষমতা ছিল, তা এককভাবে কুক্ষিগত ছিল প্রধানমন্ত্রীর হাতে।

দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদটি আলংকারিক করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর হাতে নির্বাহী বিভাগের সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার একক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কমতে কমতে ঠেকেছিল শূন্যের কোঠায়, রাষ্ট্রীয় সব কার্যক্রম পরিচালিত হতো প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে।

এই অতিকেন্দ্রীভূত শাসনক্ষমতা এককভাবে হস্তগত হওয়ার কারণে নির্বাহী বিভাগের সব গুরুত্বপূর্ণ পদের মনোনয়ন ও পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্তই ছিল। বিগত দশকগুলোয় নির্বাহী বিভাগের বিভিন্ন শীর্ষ পদে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন, অন্যান্য যোগ্যতার পাশাপাশি দলীয় আনুগত্যও নিয়োগপ্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে মনোনয়ন যোগ্যতা বিচার করার কথা ছিল, তা বিচার্য হয়নি। ফলে এসব মনোনয়ন ও নির্বাচন প্রায়ই প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। তার চেয়ে বড় কথা, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সব প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের চেয়ে বিভিন্ন সময় অন্যান্য স্বার্থ অগ্রাধিকার পেয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকার এ অবস্থা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ রোধ করে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল সীমিত করা, বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সংসদীয় কমিটিগুলোর প্রধান নির্বাচন করা, প্রধান বিচারপতি নিয়োগে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি। প্রস্তাবিত এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহি বাড়বে এবং রাষ্ট্রের তিন স্তম্ভ—আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের ওপর প্রধানমন্ত্রীর অযাচিত প্রভাব কমবে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে নির্বাহী বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তার সরাসরি মনোনয়ন বা নিয়োগ প্রদান এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। রাষ্ট্রপতির এ ধরনের ক্ষমতায়ন তিন বিভাগের মধ্যে ভারসাম্যকে দুর্বল করবে। সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পদটি আলংকারিক। পদটি ক্ষমতায়িত করতে গিয়ে নির্বাহী বিভাগকে দুর্বল করা সরকার পরিচালনায় সমস্যা ও জটিলতা তৈরি করবে।

এটা সত্য যে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ এসব পদে যাঁরা নিয়োগ পাবেন, তাঁরা অবশ্যই যোগ্যতাসম্পন্ন, বিশেষায়িত জ্ঞানের অধিকারী, রাজনৈতিকভাবে প্রাজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দীর্ঘদিন কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হবেন। এসব বিশেষায়িত পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই যোগ্যতা-নির্ধারক মাপকাঠি থাকা এবং তার প্রয়োগ প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদ স্থায়ী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিদের আবেদন গ্রহণ, সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুতি, সুপারিশ কমিটির মাধ্যমে প্রস্তাব নেওয়া এবং তাঁর মাধ্যমে নিয়োগের প্রক্রিয়া বিবেচনা করে মনোনয়ন চূড়ান্ত করবেন। মনোনীত ব্যক্তিকে সংসদে তাঁর যোগ্যতা ব্যাখ্যা করার বিধান করা যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায় ভারসাম্য: কতটা কাজে আসবে সংস্কার প্রস্তাব

সরকারের শীর্ষ পদগুলোর নিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হতে পারে সংসদীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা। অনধিক ১০ সদস্যের সংসদীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নিয়োগের বিষয়ে সংসদের মতামত নেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারি দলের উপনেতা, সরকারি দলের চিফ হুইপ এবং দুজন হুইপ, বিরোধী দলের নেতা, বিরোধী দলের দুজন সংসদ সদস্য, সংরক্ষিত নারী আসনের একজন সদস্য, সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এবং স্পিকার মনোনীত একজন সদস্য নিয়ে কমিশন কমিটি গঠন হতে পারে। সরকারের শীর্ষ পদে মনোনীত ব্যক্তি এ কমিটির কাছে তাঁর যোগ্যতা-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দেবেন।

এ প্রক্রিয়ায় নিয়োগের মাধ্যমে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। ভারতে গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ নির্বাহী নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের একক ক্ষমতা থাকে। প্রয়োজনবোধে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা করেন। পাকিস্তানে কোনো কোনো পদে নিয়োগে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রয়েছে, তবে তিনি যথাযথ কমিশনের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নেন।

সর্বশেষ নির্বাহী বিভাগের গতিশীল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন পদে যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন শীর্ষ নির্বাহী থাকা প্রয়োজন, যাঁরা তাঁর মনোনয়নে নিযুক্ত হবেন। এ ক্ষমতা অন্য কারও মাধ্যমে প্রয়োগ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতা দুর্বল হয়। রাষ্ট্রপতির আলংকারিক ক্ষমতা বৃদ্ধি থেকে সরে এসে সংসদীয় কাঠামো ব্যবহার করে যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এতে প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতার পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা দূর করা যাবে।

প্রথম আলো

১০ আগস্ট ২০২৫

নেতারা বলবেন, জনতা শুনবে—এই সংস্কৃতি বদলাতে চায় মানুষ

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘দেশের মানুষ এখন রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন চায়। আগে নেতারা বলতেন আর জনতা শুনত। কিন্তু এখন জনগণ সেই পরিস্থিতির বদল চায়। তারা চায়, জনপ্রতিনিধিরা শুধু বলবেন না, জনগণের কথাও শুনবেন।’

আজ শনিবার রাজশাহীর পবা উপজেলার বায়াতে ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে ‘নাগরিক প্ল্যাটফর্ম’ আয়োজিত প্রাক-নির্বাচনী আঞ্চলিক পরামর্শ সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ কথাগুলো বলেন। আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ও দাবিগুলো তুলে ধরতে এই নাগরিক সংলাপের আয়োজন করা হয়।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ‘আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে যে বার্তাটি পরিষ্কারভাবে উঠে আসছে তা হলো, জনগণ এমন একটি নির্বাচন দেখতে চায়, যেখানে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন। মানুষ এখন নির্বাচনের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার রোধ এবং দলগুলোকে যোগ্য প্রার্থী মনোনয়নের ওপর জোর দিচ্ছে। জনগণ মনে করে, নির্বাচনের ব্যয় যদি কমানো না যায়, তাহলে দুর্নীতি কমানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।’

জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহির ওপর গুরুত্বারোপ করে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, ‘মানুষ চায়, প্রত্যেক জনপ্রতিনিধি তাঁর কাজের বার্ষিক হিসাব দেবেন। এই জবাবদিহির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।’ রাজশাহীর স্থানীয় সমস্যাগুলোর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এই অঞ্চলের

জন্য চারটি প্রধান বিষয় উঠে এসেছে। এগুলো হলো—রাজশাহীর মরফকরণ ও তিস্তাসহ পানির সংকট, জ্বালানি সংকট, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের অভাব।’ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো—নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি খুব জোরালোভাবে এসেছে। এই নিরাপত্তা কেবল অর্থনৈতিক নয়; এর সঙ্গে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক নিরাপত্তার বিষয়গুলোও জড়িত। সুশাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং প্রশাসনের দক্ষতার সঙ্গে এই নিরাপত্তার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না গেলে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করাও কঠিন হবে বলে তিনি মনে করেন।

এর আগে বেলা ১১টার দিকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। চলে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত। ‘আগামী নির্বাচনে কী প্রত্যাশায় ভোট দেবেন?’, ‘নবনির্বাচিত সরকারের কাছে কী প্রত্যাশা?’ এই শিরোনামে মুক্ত আলোচনা হয়। এতে রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, উন্নয়নকর্মী, শিক্ষক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, শিক্ষার্থী, কৃষকসহ নানা শ্রেণির মানুষ অংশ নেন। তবে স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না।

সভায় আগামী নির্বাচন, জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহি, সুশাসন এবং স্থানীয় নানা সংকট নিয়ে সাধারণ মানুষ তাঁদের ক্ষোভ ও প্রত্যাশা তুলে ধরেন। তাঁরা আগামী সরকারের কাছে নানা বিষয়ের বাস্তবায়ন চান।

সংলাপে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা ভূমি হারানোর শঙ্কা প্রকাশ করেন এবং তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা তাঁদের আশ্রয়ণ প্রকল্প দখল ও কর্মসংস্থানে বাধার অভিযোগ তোলেন। একজন রাজনৈতিক কর্মী প্রশাসনের দলীয়করণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পুলিশ কর্মকর্তারাও রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে আচরণ করেন।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) রাজশাহী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলম মাসুদ বলেন, ‘আমরা এমন প্রতিশ্রুতি চাই না, যা বাস্তবায়ন হয় না। আমরা এমন ব্যক্তিদের নির্বাচিত করতে চাই, যাঁরা একটি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবেন।’

জবাবদিহির অভাবকে দুর্নীতির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান। তিনি বলেন, একজন প্রার্থী নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেন, যা তার পাঁচ বছরের বেতনের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। এই টাকা তুলে আনার জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি দুর্নীতির আশ্রয় নেন। তিনি মনে করেন, সুষ্ঠু নির্বাচন ও প্রার্থীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা গেলে এই দুর্নীতি কমানো সম্ভব।

সভা শেষে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের অন্যতম সংগঠক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘জুলাই-আগস্টের আন্দোলন আমাদের বলে দেয়, পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থাকলে আমরা পরিবর্তন

করতে পারি। হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এই আলোচনা থেকে উঠে আসা বিষয়গুলো নিয়ে একটি “নাগরিক ইশতেহার” তৈরি করা হবে। এটি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে উপস্থাপন করে একটি চাপ সৃষ্টি করা হবে। কারণ, তাদের ছাড়া এই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।’

সমকাল ও প্রথম আলো

১৫ নভেম্বর ২০২৫

নির্বাচনী রাজনীতি এখনও অর্থ ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নয়

অধ্যাপক রওনক জাহান

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো রওনক জাহান। তিনি এদেশের প্রথম নারী যিনি সত্তর দশকে হার্ভার্ড থেকে পিএইচডি করেন। তাঁর গ্রন্থ ‘পাকিস্তান : ফেইলিয়ার ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন’ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের স্বরূপ তুলে ধরে। দারিদ্র্য, বৈষম্য, উন্নয়ন, জেভার সংবেদনশীলতা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গবেষণা রয়েছে। ক্ষাৎকার নিয়েছেন শাহেরীন আরাফাত

সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আপনি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? এই ভিন্নমতের রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ আপনি কোথায় দেখেন?

শেখ হাসিনার ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসন, যেখানে গণতান্ত্রিক সংলাপ ও ভিন্নমতের পরিসর প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছিল, তাঁর পতনের পর আলোচনা, বিতর্ক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যাশিত ছিল। চব্বিশের জুলাইয়ে ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম স্লোগানই ছিল, ‘কথা ক’। ২০২৪-এর আগস্টের পর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের জনপরিসরে উপস্থিতিতে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। প্রায় ১৫ বছর ধরে রাজনৈতিক অঙ্গনে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে রাখা আওয়ামী লীগ রাতারাতি দৃশ্যপট থেকে উধাও হয়ে যায়। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগের শাসনামলে কোণঠাসা হয়ে পড়া তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মাঠে হাজির হয়। জামায়াতে ইসলামী যারা আওয়ামী লীগ শাসনের সময় তাদের জনপরিসর প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল, তারাও অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থীরা একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে হঠাৎ করেই রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার, বিশেষ করে ১৯৭২-এর সংবিধানের বড় ধরনের কাঠামোগত সংস্কার

দাবি করে। তারা জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলে।

শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তি কর্তৃক উত্থাপিত রাষ্ট্রীয় সংস্কারের দাবিগুলো অন্তর্বর্তী সরকারকে ১১টি সংস্কার কমিশন গঠনে অনুপ্রাণিত করে। এরপর একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়, যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ এবং সব সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে একটি ঐকমত্য তৈরি করা। ভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক দলগুলোর সব সংস্কার প্রস্তাবে একমত না হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আলোচনা ও বিতর্কের পরিসর নিয়ে এই মতের ভিন্নতা এবং প্রতিযোগিতা একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই দেখা উচিত।

আসলে আমি বিশ্বাসিত যে, ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক আমন্ত্রিত সব রাজনৈতিক দল গত ছয়-সাত মাস ধরে আলোচনায় অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এতগুলো সংস্কার প্রস্তাবে তারা একমত হতে পেরেছে। আমি এটিকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে দেখি। কয়েকটি দল এখন রাজপথে আন্দোলন শুরু করার হুমকি দিলেও তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করারও প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে মনে হয়।

যদিও আমি রাজনৈতিক দলগুলোর এই দীর্ঘ আলোচনাকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছি। তবে আমার কাছে যা অনুপস্থিত মনে হচ্ছে তা হলো— সংলাপ প্রক্রিয়াটি কেবল দৃশ্যপটে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পুরো সংলাপ প্রক্রিয়াটি ছিল ঢাকাকেন্দ্রিক এবং রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকেন্দ্রিক। তৃণমূলের নাগরিকদের আসলে মতামত কী, তারা কী কী সংস্কারকে প্রাধান্য দিতে চান, তা আমরা এই আলোচনার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জানতে পারলাম না। এ ছাড়া দেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, দৃশ্যপটে অনুপস্থিত থাকায় সংলাপ প্রক্রিয়াতেও অনুপস্থিত ছিল। তাই সংস্কার প্রস্তাবগুলো নিয়ে তাদের মতামতও জানা যায়নি। যেহেতু এসব সংস্কারে তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই, তাই ভবিষ্যতে এসব সংস্কার প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে কি আপনার কোনো হতাশা বা উৎকণ্ঠা রয়েছে?

গত এক বছরে আমরা সংস্কার আলোচনার যেসব বৈশিষ্ট্য দেখেছি, তা দেখে আমি কিছু কিছু বিষয়ে হতাশা হয়েছি। প্রথমত, পুরো সংস্কার সংলাপে সংবিধান, আনুষ্ঠানিক কাঠামো, আইন এবং নিয়ম পরিবর্তনের ওপর অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। অথচ আমরা সবাই জানি, কেবল সংবিধান, আনুষ্ঠানিক কাঠামো এবং আইন পরিবর্তন করলেই মাঠ পর্যায়ে রাজনৈতিক চর্চার তেমন কোনো পরিবর্তন আসবে না। আমাদের আসল চ্যালেঞ্জ হলো, বহু বছর ধরে চলা অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন আনা। আমরা দেখেছি, আমাদের বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিগত লাভের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করেন এবং নাগরিকদের কাছে কোনো

জবাবদিহি ছাড়াই দায়মুক্তির সুযোগ পান। আশা করেছিলাম, একমত্য কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোকে এমন কিছু পদক্ষেপের বিষয়ে একমত্য করাতে চেষ্টা করবে, যা নির্বাচনে টাকা ও পেশিজন্ডির প্রভাব কমাতে সাহায্য করবে এবং কে জিতবে আর কে হারবে তা নির্ধারণে মূল ভূমিকা রাখবে। এর আগে আমরা বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাব করেছি, যা সংসদ সদস্যদের বিশেষ সুবিধা সীমিত করতে, আরও বেশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনতে এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করবে। এই প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে- ১. সংসদ সদস্যদের শুদ্ধমুক্ত গাড়ি আমদানির সুযোগ, বিশেষ উন্নয়ন তহবিল পাওয়া এবং তাদের নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বোর্ডের সভাপতিত্ব করার প্রথা বাতিল করা। ২. সংসদ সদস্যদের বার্ষিক আয় ও সম্পদের বিবরণী জনসমক্ষে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা। ৩. সংসদ সদস্যদের জন্য একটি আচরণবিধি গ্রহণ করা, যার অধীনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংসদ সদস্যদের স্বার্থের সম্ভাব্য সংঘাতের ক্ষেত্রগুলো ঘোষণা করা প্রয়োজন হবে। সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রী কিংবা উপদেষ্টাদের বার্ষিক আয় ও সম্পদের বিবরণী জনসমক্ষে প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি এর আগে কয়েকবার করা হয়েছিল। ২০০৮-এ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ এবং ২০২৪ সালে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু এর বাস্তবায়ন আমরা কখনও দেখিনি।

বিগত সরকারের আমলে পরপর তিনটি বিতর্কিত নির্বাচন হয়েছে। এবার ভিন্ন প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কেমন হতে পারে? এ ক্ষেত্রে কোনো সংকট কি দেখছেন?

যেহেতু পরপর তিনটা নির্বাচন হয়েছে, যা দেশে ও বিদেশে লোকজনের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা একচেটিয়াভাবে সরকারি দল আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং বিরোধী দলকে একদমই বাইরে রাখা হয়েছে। এখন প্রধান যেটা চ্যালেঞ্জ- কীভাবে এমন একটি নির্বাচন করা যাবে, যা দেশে-বিদেশে লোকজনের কাছে বিতর্কের উর্ধ্বে থাকবে। যদি দেশের প্রধান কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করতে পারে কিংবা অংশগ্রহণ না করে তাহলে সেই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।

এ ছাড়া আমাদের বহু বছরের অভিজ্ঞতা আছে যে ভালো নির্বাচন হলেও যারা হেরে যায়, তারা ই নানা অভিযোগ তুলে নির্বাচনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করে। এবারের নির্বাচনেও কেউ জিতবে, কেউ তো হারবে। যারা হারবে, তারা নির্বাচনকে যে বিতর্কিত করার চেষ্টা করবে না তা বলা যাবে না।

নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ভালো হতে হবে। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ এখনও কাটেনি। বহু বছর ধরে আমরা ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং দেখে অভ্যস্ত হয়েছি। যে দল হারবে তারা হয়তো বলবে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে। সরকার ও প্রশাসন নিরপেক্ষ ছিল না। মানুষের আস্থা অর্জন করাটাও হবে আরেকটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। নির্বাচনের পরও অনেক সংকট সৃষ্টি হতে পারে। এর আগে আমরা কিছু নির্বাচন-উত্তর

সহিংসতা দেখেছি। সব রাজনৈতিক দলকে, বিশেষ করে যে দল জিতবে তাদের অনেক সহিষ্ণু হতে হবে। নির্বাচনের পর একটা স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে আমাদের আগের চর্চা-‘উইনার টেক ইট অল’ বা যে জিতবে সব তার হবে- এই রীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আগের চর্চায় যেভাবে বিরোধী দল ও ভিন্নমতকে দমন-পীড়ন করেছে, মুখ বন্ধ করিয়ে দিয়েছে- এমন রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিহার করতে হবে।

বাংলাদেশে বাকস্বাধীনতার চর্চাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? মতপ্রকাশের সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কোন গোষ্ঠী?

আমাদের দেশে যারা ক্ষমতায় নেই, তারাই আর তেমন স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করতে পারে না। তখনই তাদের নানা রকম হয়রানি কিংবা নানা কিছু ট্যাগ দেওয়া হয়। এ ছাড়া আমাদের দেশে প্রান্তিক ও নাজুক গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে নারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, জাতিগত সংখ্যালঘুরা। সমাজে সবার সমান আর্থসামাজিক ক্ষমতা নেই; আর এসব মানদণ্ডে সব মানুষের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করার সক্ষমতা নেই। সামাজিক মাধ্যমও বেশ কিছু সংকট সৃষ্টি করেছে। অনেক মিথ্যা খবর ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাতে রাজনীতি ও সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষ বাড়ছে। রাজনৈতিক ভিন্নমতের কেউ কিছু বললেই তাকে অশালীন আক্রমণ, ট্যাগিং করা হচ্ছে। হয়রানি করা হচ্ছে, এমনকি হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। নানা কারণেই স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার যুক্তি দেখিয়ে অনেক সময় মতপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়?

‘রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা’ কথাটা আমাদের দেশে খুব খেলোভাবে ব্যবহার করা হয়। কেউ হয়তো সামাজিকমাধ্যমে পোস্ট করেছে কিংবা কিছু লিখেছে, তার একটা লেখার জন্য কিংবা তার মতের জন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তাহীনতা হচ্ছে- এটা কোনো যুক্তি হতে পারে না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয় এবং সেটা বলতে হলে নিশ্চিত তথ্য থাকতে হবে- আসলে কী কারণে ও কীভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকিতে পড়েছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন সরকার অত্যন্ত খেলোভাবে এসব কথা ব্যবহার করেছে এবং এর মধ্য দিয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করেছে এবং ভিন্ন মতাদর্শী কিংবা বিরোধী দলকে নির্যাতন করেছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য কি সমাজকে আরও বিভক্ত করছে? অন্তর্ভুক্তির পথে এটি কতটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়? অর্থনৈতিক বৈষম্যের রাজনৈতিক প্রতিফলন কোথায় দেখতে পান?

অর্থনৈতিক বৈষম্য নিশ্চয়ই সমাজকে আরও বিভক্ত করছে এবং সেখানে এর রাজনৈতিক প্রতিফলন স্পষ্ট। আমরা দেখছি, যে কোনো নির্বাচন করতে হলে অনেক টাকার দরকার হয়। তার মানে একমাত্র যাদের হাতে টাকা আছে, তারাই নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে। ইউনিয়ন, উপজেলা থেকে জাতীয় সংসদে ক্রমাগত ধনী ব্যবসায়ীরা নির্বাচিত হয়ে আসতে পারছে। নির্বাচিত হয়ে আবার সেসব ধনী ব্যক্তি ক্ষমতার অপব্যবহার করে আরও ধনী হয়েছেন।

অর্থনৈতিক বৈষম্য, নির্বাচন, রাজনীতির অপব্যবহারে আর্থিক দুর্নীতি- এগুলো একটা দুঃসচক্র সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশে ক্রমাগত এ প্রবণতা বেড়েই চলেছে। রাষ্ট্রের সংস্কার নিয়ে কথা বলার পাশাপাশি আমাদের ভাবতে হবে কীভাবে আমরা আমাদের রাজনীতিকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে পারব, কীভাবে রাজনীতির সঙ্গে টাকা-পয়সা বানানোর সংযোগ ছিন্ন করতে পারব।

গণতন্ত্র ও অন্তর্ভুক্তির প্রক্ষেপে বৈশ্বিক ও ভূরাজনৈতিক প্রবণতা বাংলাদেশের ওপর কী প্রভাব ফেলছে?

জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে আমরা গণতন্ত্রের গুণগত উত্তরণ চাইছি। আমরা চাইছি একটা স্বচ্ছ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, স্বচ্ছ সামাজিক ব্যবস্থা। এগুলো আসলে মানুষের একটা আকাঙ্ক্ষা। তরুণ প্রজন্মের ছাত্রদের কাছেও এটা একটা আকাঙ্ক্ষা হয়ে আছে। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে তরুণ প্রজন্মের এই আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পেয়েছি সম্প্রতি নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মাদাগাস্কার এবং আমেরিকায়।

আমরা দেখেছি গত কয়েক দশক ধরে পৃথিবীর বহু প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের গুণগত অবনতি হচ্ছে। সেখানকার প্রতিষ্ঠানগুলো আগের অবস্থায় থাকছে না। আমেরিকা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। সেখানে এমন এক প্রেসিডেন্ট বর্তমানে আছেন, যিনি এখন যা তা করছেন। তিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী, যে কোনো লোককে হায়ার অ্যান্ড ফায়ার করছেন, ইনস্টিটিউশনগুলো দখল করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কিছুই তিনি রাখছেন না। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও আমরা সেটা দেখছি। সেখানে রাজনীতিতে হিন্দুত্ব নিয়ে তারা দেশটির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে প্রান্তিক করে তুলছে। আসলে এখন পুরো পৃথিবীতেই উদার গণতন্ত্র সংকটে পড়েছে। এই সংকটের ফলে নাগরিক অধিকার, সমতা, ব্যক্তিস্বাধীনতার মতো বিষয়গুলো খর্ব হচ্ছে। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বদলে ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরিব আরও বেশি গরিব হয়ে যাচ্ছে। একদিকে বৈষম্য বেড়ে চলেছে এবং অন্যদিকে শুধু উচ্চবিত্তের হাতে ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। গোটা পৃথিবীতে গণতন্ত্র যে সংকটে পড়েছে, বাংলাদেশেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সেই সংকট রয়েছে। আমরা একদিকে গণতন্ত্র ও ন্যায়তার কথা বলছি, অন্যদিকে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েই চলেছে। নির্বাচনী রাজনীতি এখনও অর্থ এবং পেশিজ্ঞতির প্রভাবমুক্ত নয়।

নতুন প্রজন্মের ভূমিকা আপনি কেমন দেখছেন?

পুরোনো প্রজন্ম পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাবে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের আকাঙ্ক্ষা আছে। তা বাস্তবায়ন করতে কী ধরনের নীতি ও কৌশল দরকার, সেখানে তাদের নিজেদের ভূমিকা কী রকম হবে, এটা নিয়ে তাদের ভাবতে হবে। সবার আগে নিজেদের জবাবদিহিতার ভেতরে আনতে হবে। আমরা বা আমি যে কার্যকারণ করছি, সেই কাজ আমরা কতটা ন্যায়সংগতভাবে করছি? প্রত্যেকে যার যার জবাবদিহি নিশ্চিত করলে, গণপরিসর

এমনিতেই গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। আমরা অন্যের দায়বদ্ধতা চাইছি, কিন্তু আমি নিজেও যে দায়বদ্ধ সেই বোধ বেশি জরুরি। আমার মনে হয়, নিজের কাজ স্বচ্ছ রাখতে পারাই আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

সমকাল

১৬ নভেম্বর ২০২৫

মতামত পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধনে বাংলাদেশের জন্য যে শিক্ষা

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি (মাঝে) ও প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ (ডানে) বিশেষ সমাবেশে সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনিরের হাতে ফিল্ড মার্শাল ব্যাটন তুলে দেন। ইসলামাবাদ, মে ২০২৫ছবি: পাকিস্তানের সরকারি তথ্যবিবরণী/আল-জাজিরার সৌজন্যে

গত ১৩ নভেম্বর পাকিস্তানের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ সংবিধানের ২৭তম সংশোধন অনুমোদন করেছে। পাঁচ দিনের উত্তপ্ত বিতর্ক, বিরোধী দলের বিরোধিতা এবং শেষ মুহূর্তের কিছু সংশোধনীর পর এটি নিম্ন ও উচ্চ উভয় কক্ষেই পাস হয়।

এর মাধ্যমে ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা পৃথক্করণ (যার মাধ্যমে স্বাধীন বিচারব্যবস্থার অধীন সশস্ত্র বাহিনী দায়বদ্ধ ছিল) রহিত হলো। একই সঙ্গে পাকিস্তানের বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের অধীন বিভাগে পরিণত করা হলো।

এ ঘটনাকে পাকিস্তানের গণমাধ্যমে ‘কালো অধ্যায়’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিস্তারিতভাবে বললে, সাংবিধানিক এই সংশোধনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলো সূচিত হলো—(ক) একটি ফেডারেল সাংবিধানিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হবে।

অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত একটি অ্যাপিলেট কোর্ট বা আপিল আদালতের আকার ধারণ করবে, যা শুধু দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিষয়াদি বিচারের জন্য কাজ করবে। এর ফলে সংবিধানসংক্রান্ত, জনস্বার্থ এবং মানবাধিকার-সম্পর্কিত বিষয়গুলো সুপ্রিম কোর্টের আওতাধীন থাকবে না। (খ) এ সংশোধনীর আওতায় ফিল্ড মার্শাল হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি সব

ধরনের গ্রেপ্তার, অপরাধ ও সিভিল দায় থেকে সারা জীবনের জন্য মুক্তি পাবেন। তিনি সারা জীবন ফিল্ড মার্শাল পদবিসংক্রান্ত দায়িত্ব ও সুবিধা পাবেন।

পাকিস্তানের এই সংবিধান সংশোধন বুঝিয়ে দেয়, একটি উচ্চকক্ষ ক্ষমতার ভারসাম্য বা কোনো ব্যক্তির একক ক্ষমতা কুক্ষিগত করাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একক কার্যকর সংসদীয় কাঠামো নয়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ক্ষমতার কাঠামোকে দায়বদ্ধতায় আনার উপাদানগুলো নিয়ে কাজ না করে শুধু উচ্চকক্ষ সৃষ্টি কখনই ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। এ ঘটনা থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা নেওয়ার আছে।

গত ২৫ নভেম্বর বাংলাদেশে আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় গণভোট-সংক্রান্ত একটি অধ্যাদেশ জারি করেছে। অধ্যাদেশ মোতাবেক আগামী জাতীয় সংসদে নির্বাচনের ভোট গ্রহণকালে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়যুক্ত হলে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকরের গণরায় প্রতিপালনের চাপ থাকবে পরবর্তী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের কাছে। তবে যে প্রক্রিয়ায় একাধিক বিষয়কে একসঙ্গে করে গণভোট নেওয়া হচ্ছে, তা ত্রুটিপূর্ণ।

এর চেয়েও বড় বিষয় হলো বাংলাদেশের বাস্তবতায় উচ্চকক্ষের প্রয়োজন রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সাম্প্রতিক গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে—বাংলাদেশের বাস্তবতায় উচ্চকক্ষ কোনোভাবেই প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারবে না।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য শক্তিশালী সংসদীয় ব্যবস্থা প্রয়োজন। সেটা বর্তমানের এক কক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং শক্তিশালী করে এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সম্ভব।

২০২৪-এর আন্দোলন-পরবর্তী সময় দাবি উঠেছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ও দলীয় প্রধানের ক্ষমতা সীমিতকরণ এবং সংবিধান সংশোধনের একচ্ছত্র ক্ষমতা ক্ষমতাসীন দল/দলীয় প্রধানের হাতে কুক্ষিগত না রাখার জন্য উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করা প্রয়োজন, কারণ, এটি ভারসাম্য সৃষ্টি করবে। সিপিডি মনে করে বর্তমান বাস্তবতায় উচ্চকক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল/দলীয় প্রধান বা বিশেষ গোষ্ঠীর ক্ষমতা সীমিতকরণে খুব কমই ভূমিকা রাখতে পারবে।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী উচ্চকক্ষ গঠিত হলে তার সদস্যসংখ্যা হবে ১০০। নিম্নকক্ষের সংসদীয় আসনের ভোটের আনুপাতিক হারে উচ্চকক্ষের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবে। বিগত নির্বাচনগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মূল চারটি দলই অধিকাংশ আসন ও ভোট পেয়েছে। এ প্রবণতা দেখা গেছে, অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য নির্বাচনগুলোর ক্ষেত্রে (যেমন ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে)।

এবারের নির্বাচনে বড় দলগুলোর বিপরীতে অন্য দলগুলোর ত্রিযমাণ উপস্থিতি উচ্চকক্ষে ছোট ছোট রাজনৈতিক দলের খুব কম সদস্যই নিশ্চিত করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে। বরং প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের কাঠামো নিম্নকক্ষের একটি প্রতিরূপ হতে যাচ্ছে বলেই প্রতীয়মান হয়। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রভাব-দাপট নিম্নকক্ষের মতো উচ্চকক্ষেও প্রতিফলিত হবে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

প্রশ্ন হলো উচ্চকক্ষে কারা প্রতিনিধি হয়ে আসছেন। ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয়ের ব্যক্তিদের থেকে ৪০ শতাংশ এবং বাকি ৬০ শতাংশ তারা পছন্দ করবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধি থেকে। এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও নারী প্রতিনিধি যুক্ত করার বাধ্যবাধকতা থাকছে। ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উচ্চকক্ষে যাঁরা আসবেন, তাঁরা সবাই রাজনৈতিক দলের নেতা, রাজনৈতিক দলের অনুগ্রাহী অরাজনৈতিক ব্যক্তি, সিভিল সোসাইটির লোক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির ইত্যাদি।

সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, যাঁরা উচ্চকক্ষে আসবেন, তাঁরা বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি, তাঁরা সরাসরি নির্বাচিত নন। যত দূর জানা যায়, রাজনৈতিক দলগুলোর অনুগ্রহভাজন, যাঁদের অন্য কোথাও দায়িত্ব দেওয়া যাচ্ছে না, বয়স্ক রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী, একাডেমিয়া ও সিভিল সোসাইটির ব্যক্তির সদস্য হবেন।

উচ্চকক্ষের এ সদস্যরা জাতীয় স্বার্থে কতটা নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখতে পারবেন, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি না হওয়ার কারণে স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে তাঁদের খুব কমই দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা যাবে। বিদেশি গোষ্ঠীর প্রভাবও উপেক্ষা করা উচ্চকক্ষের সদস্যদের জন্য কষ্টকর হবে। উচ্চকক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপদেষ্টামূলক দায়িত্ব পালন করবে, যেখানে নিম্নকক্ষের উত্থাপিত বিলের ওপর উচ্চকক্ষ তার মতামত দিতে পারবে। উচ্চকক্ষের সদস্যদের বিল অনুমোদনের ক্ষমতা থাকবে না। তবে উচ্চকক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে, সাংবিধানিক সংস্কারের ওপর বিল উত্থাপিত হলে সে বিলের অনুমোদনের জন্য ভোট দেওয়া।

উপরিউক্ত দুর্বলতা বিবেচনায় নিলে এবং পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সংবিধান সংশোধনে উচ্চকক্ষের ভূমিকা বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশের প্রস্তাবকে উচ্চকক্ষের জন্য নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজতর হবে না। পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধনে উচ্চকক্ষের প্রশ্নবোধক ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেয় ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধনে বাংলাদেশের উচ্চকক্ষ এমনতর ভূমিকা নিলে তা হিতে বিপরীত হবে—এ ধরনের আশঙ্কা অমূলক নয়।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী, আগামী ত্রয়োদশ সংসদে মাত্র ১৮০ দিন সময়ের মধ্যে গণভোটে গৃহীত বিষয়াদি-সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দেখা গেছে, ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলোর সবচেয়ে বেশি মতপার্থক্য ছিল উচ্চকক্ষ-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে। এ

ক্ষেত্রে সংবিধান ও অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি উচ্চকক্ষের মতো জটিল বিষয়ে ১৮০ দিনের মধ্যে আলোচনা করে ভোট গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এককথায় অসম্ভব। আশঙ্কা হয়, তাড়াহুড়ার কারণে এমন কোনো উচ্চকক্ষের কাঠামো যেন না দাঁড়ায়, যা তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে, বাংলাদেশের বাস্তবতায় শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য শক্তিশালী সংসদীয় ব্যবস্থা প্রয়োজন। সেটা বর্তমানের এক কক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং শক্তিশালী করে এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সম্ভব।

সিপিডি মনে করে এক কক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থায় সংসদীয় কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে এবং সংসদীয় সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারলে, প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের প্রয়োজন হবে না। আশঙ্কা হয়, একটি দুর্বল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রস্তাবিত এক কক্ষবিশিষ্ট সংসদের চেয়েও দুর্বলতর সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারে।

প্রথম আলো

১০ ডিসেম্বর ২০২৫

বিশেষ সাক্ষাৎকার গণতান্ত্রিক ব্যর্থতার সুযোগ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি

অধ্যাপক রেহমান সোবহান

রেহমান সোবহান জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ, জনবুদ্ধিজীবী এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম ১৯৩৫ সালে। ১৯৬০-এর দশকের স্বাধিকার আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য। ১৯৯০ সালে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধসম্পন্ন রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণে আমাদের ব্যর্থতা, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট ও রাজনীতিতে গোত্রচর্চা, শেখ হাসিনার পতন, চব্বিশের অভ্যুত্থানের পর ডানপন্থার উত্থান, ছাত্রদের তৃতীয় রাজনৈতিক ধারা হয়ে উঠতে না পারা, মুক্তিযুদ্ধের অবিরাম লড়াই ইত্যাদি বিষয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এ কে এম জাকারিয়া ও মনোজ দে।

প্রথম আলো: নানা রাজনৈতিক চড়াই-উতরাই ও ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে জাতি একান্তরে মুক্তিযুদ্ধে পৌঁছেছিল। সেই ধারাবাহিক সংগ্রামের আপনিও একজন অংশীজন। পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও বৈষম্যমূলক শাসনের বিরুদ্ধে যে সমতাভিত্তিক, শোষণ-বঞ্চনাহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, ৫৪ বছর পর সেই স্বপ্ন থেকে বাস্তবতা কতটা দূরে?

রেহমান সোবহান: ১৯৭১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ বহু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ও পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। ১৯৭১-পূর্ব সময়ে প্রায় সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকেই পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান পিছিয়ে ছিল। বর্তমানে জিডিপি থেকে শুরু করে মানব উন্নয়ন—কার্যত সব উন্নয়ন সূচকেই পাকিস্তানের চেয়ে আমরা এগিয়ে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে শোষণমুক্ত একটি সমাজ গঠনের লক্ষ্য থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি। সে কারণে অর্থনৈতিক অসমতা ও সামাজিক বৈষম্য আরও গভীর হয়েছে।

প্রথম আলো: মুক্তিযুদ্ধের পরের দুই দশকে একের পর এক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, সামরিক অভ্যুত্থান ও সামরিক শাসন দেখেছে জাতি। অথচ মুক্তিযুদ্ধের বড় একটি চালিকা শক্তি ছিল পাকিস্তানি সামরিকতন্ত্রের জোয়াল থেকে মুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু হলেও গণতন্ত্র বারবার হোঁচট খেয়েছে, স্বৈরতন্ত্র ও কর্তৃত্ববাদী শাসনও ক্রমে শক্তিশালী হয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক মনন, সংস্কৃতি ও চর্চায় গলদটা আসলে কোথায়?

রেহমান সোবহান: দুঃখজনকভাবে, গত ৫৪ বছরেরও বেশি সময়ে আমরা একটা কার্যকর ও টেকসই গণতন্ত্র গড়ে তুলতে পারিনি। পাকিস্তানের অভিজাত শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম ছিল তাদের গণতন্ত্র অস্বীকারের কারণে, বাঙালিদের অর্থনৈতিক বঞ্চনার মূল কারণ ছিল সেটি।

১৯৯১ থেকে ২০০৮—এই সময়কালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু চারটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, বিরোধী দলের কাছে ক্ষমতাও হস্তান্তর করা হয়েছে। এমনকি এই ‘গণতান্ত্রিক’ আমলেও সংসদ ও বিচার বিভাগের মতো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্যকর হতে পারেনি। সে কারণে একধরনের ‘অনুদার গণতন্ত্রই’ এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে পঞ্চদশ সংশোধনী প্রবর্তনের পর আমরা স্বৈরশাসনের উত্থান হতে দেখছি, যার চূড়ান্ত পরিণতিতে একচ্ছত্র রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সমস্যার মূল উৎস নিহিত রয়েছে রাষ্ট্রপতি হোক আর নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হোক, সব ক্ষমতা একজন সর্বক্ষমতাধর নেতার হাতে কেন্দ্রীভূত থাকা এবং আমাদের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ‘গোত্রীকরণের’ মধ্যে, যা শেষ পর্যন্ত ‘সবকিছু বিজয়ীর দখলে’ এমন একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দেয়।

আনোয়ার হোসেনের তোলা এই ছবিটি হয়ে উঠেছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়ের প্রতীক। ১৯৭১-এ এটি তোলা হয়েছিল ঢাকার দোহারের একটি গ্রাম থেকে

প্রথম আলো: মুক্তিযুদ্ধের যে স্বপ্ন ছিল তা পূরণ না হওয়ার ব্যর্থতা, বৈষম্য অব্যাহত থাকা বা গণতন্ত্রের উল্টো যাত্রা—এসব কারণে কি ২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান অনিবার্য হয়ে পড়েছিল? নাকি আপনার কোনো ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে?

রেহমান সোবহান: ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছিল সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত থেকে। স্বাধীনতার পর অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেলেও মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারদের জন্য কোটা চালু রাখাটা ছিল উদ্ভট ধরনের ভুল। শেখ হাসিনা প্রথমে কোটা বাতিল করেছিলেন এবং পরে হাইকোর্ট কোটা পুনঃপ্রবর্তনের রায় দিলে তার বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে গিয়েছিলেন।

স্বৈরতান্ত্রিক, নিপীড়নমূলক, অন্যায় ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনই চব্বিশের অভ্যুত্থানের মূল উৎস ছিল। রাজাকার নিয়ে শেখ হাসিনার অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক মন্তব্য গণ-অভ্যুত্থানকে উসকে দিয়েছিল, নাগরিকদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত হতাশা ও ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছিল।

জুলাই অভ্যুত্থান হয়েছিল গণতান্ত্রিক ব্যর্থতা এবং অন্যায় শাসনের ফলে। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি, যারা আমাদের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই উপস্থিত রয়েছে, তারা এই অভ্যুত্থানে সুযোগ নিয়েছে, এর ভেতরে ঢুকে পড়েছে এবং সম্ভবত অভ্যুত্থানের গতিমুখ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের সময় এমনটা ঘটে। যেসব নিপীড়িত শক্তি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল শক্তি হিসেবে থাকে, তাদের দমিয়ে রাখা হলেও সুযোগ পেলে তারা সামনে চলে আসে।

প্রথম আলো: অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে অনেকে চব্বিশের অভ্যুত্থানকে মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন। এই চেষ্টা কেন? মুক্তিযুদ্ধকে অপ্রাসঙ্গিক করার এই চেষ্টা কি সাময়িক বা বিচ্ছিন্ন কোনো চেষ্টা, নাকি যে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, তার বিরোধী শক্তি ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী হয়েছে এবং পরিকল্পিতভাবেই ২৪-পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধকে আঘাত করার কৌশল নিয়েছে?

রেহমান সোবহান: আমি আগেই বলেছি যে জুলাই অভ্যুত্থান হয়েছিল গণতান্ত্রিক ব্যর্থতা এবং অন্যায় শাসনের ফলে। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি, যারা আমাদের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই উপস্থিত রয়েছে, তারা এই অভ্যুত্থানে সুযোগ নিয়েছে, এর ভেতরে ঢুকে পড়েছে এবং সম্ভবত অভ্যুত্থানের গতিমুখ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের সময় এমনটা ঘটে। যেসব নিপীড়িত শক্তি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল শক্তি হিসেবে থাকে, তাদের দমিয়ে রাখা হলেও সুযোগ পেলে তারা সামনে চলে আসে।

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে তারা জোরালো নির্বাচনী সম্ভাবনাসহ আরও দৃশ্যমান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তারা এই সুযোগকে ব্যবহার করে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের যে ঐতিহাসিক সহযোগিতার ভূমিকা, সেটাকে নতুন ভাষ্য দিতে চাইছে। রাজনৈতিকভাবে কৌশলী নেতাদের নেতৃত্বে তারা এই পর্যায়ে তাদের মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত অবস্থান কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে প্রকাশ করবে। ১৯৭১ সালে তাদের ভূমিকা সাফসুতরো করার ক্ষেত্রে এটা তাদের একটা রাজনৈতিক কৌশল।

প্রথম আলো: চলতি বছরের এপ্রিল মাসে প্রথম আলোয় একটি নিবন্ধে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে আপনি লিখেছেন, ‘বক্তৃতা-বক্তব্যে সংঘম প্রদর্শন করলেও তাদের অন্যতম প্রধান একটি উদ্দেশ্য হলো ঐতিহাসিক বয়ান পুনরায় লেখা, যেন তাদের ১৯৭১ সালের বীর না

হলেও অন্তত ভুক্তভোগী হিসেবে দেখানো হয়, যেখানে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভুল শত্রুর বিরুদ্ধে ভুল যুদ্ধে জড়িয়েছিল।’

আমরা দেখছি শুধু জামায়াতে ইসলামী নয়, অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রনেতৃত্বের একটি অংশসহ আরও কিছু গোষ্ঠী ইতিহাসকে নিজেদের মতো লেখার ও বয়ান তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদের দিক থেকে মুক্তিযুদ্ধকে উপেক্ষা করার চেষ্টাও দৃশ্যমান। এই প্রবণতাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

রেহমান সোবহান: মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছাত্রনেতৃত্বের একটি অংশের প্রতিক্রিয়া অনেককে বিস্মিত করেছে। এই অবস্থান ইঙ্গিত দেয় যে আন্দোলনের মধ্যে এমন কিছু গোষ্ঠী ছিল, যারা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে উঠেছিল এবং চব্বিশের ৫ আগস্টের পর তারা তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে নিয়ে এসেছে। আবার একটি অংশের মধ্যে শেখ হাসিনা ও তাঁর দলের প্রতি প্রবল বিরূপ মনোভাব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিরূপ মনোভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই দুই অবস্থানই ছাত্র আন্দোলনের যে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, তার উল্টো ফল বয়ে এনেছে।

ছাত্রদের ও তাঁদের গঠিত যেকোনো রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে আমরা সবাই যে ভূমিকা প্রত্যাশা করেছিলাম, তা হলো, সেই সব ঐতিহাসিক ও দলীয় বিতর্ক থেকে তারা নিজেদের আলাদা রাখবে, যা আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে বিভক্ত করে রেখেছে। ছাত্রদের উচিত ছিল একবিংশ শতাব্দীর সামনে তাকানো অগ্রসরমাণ শক্তি হিসেবে নিজেদের তুলে ধরা এবং আধুনিকমনস্ক তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়া। গোত্রভিত্তিক রাজনীতি থেকে বাংলাদেশকে বের করে আনার জন্য তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তির যে জরুরি প্রয়োজন রয়েছে, সেই শূন্যতা পূরণ করা।

অনভিজাত সামাজিক পটভূমি থেকে উঠে আসার কারণে সাধারণ মানুষের বাস্তব উদ্বেগগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে একটি সত্যিকারের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার মতো বিশ্বাসযোগ্যতা তাদের ছিল।

প্রথম আলো: শেখ হাসিনার সাড়ে পনেরো বছরের অগণতান্ত্রিক শাসনের সময় বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে দমন-পীড়ন ও নির্যাতনের অস্ত্র হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ব্যবহার করা হয়েছে। তা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চার একমুখী ও আওয়ামী ভাষ্যের বাইরে আলোচনার পরিসরকে রুদ্ধ করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতি নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরিতে সহায়তা করেছে বলে মনে করেন কি?

রেহমান সোবহান: শেখ হাসিনার এই প্রতিক্রিয়া দেখানোর পেছনে একটি ঐতিহাসিক কারণ আছে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত যেসব সরকার ক্ষমতায় ছিল, তারা রাষ্ট্রীয় পরিসর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের ভূমিকা প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলেছিল।

এই ইতিহাস মুছে দেওয়ার প্রবণতার প্রতিক্রিয়াতেই শেখ হাসিনার অবস্থান কঠোর হয়ে ওঠে। তবে ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর, বিশেষ করে ২০০৮ সালের পর, হাসিনা তাঁর পিতার ভাবমূর্তিকে মাত্রাতিরিক্তভাবে মহিমাম্বিত করে সামনে আনেন এবং মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের ভূমিকা ও গুরুত্ব অতিরঞ্জিতভাবে তুলে ধরেন।

বাস্তব সত্য হলো, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাপ্ত গণতান্ত্রিক ম্যাডেটের ভিত্তিতে এবং বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে একটি অগ্রণী শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। তবে এটাও সত্য, এই সংগ্রামে অন্য রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। একই সঙ্গে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী এবং সাধারণ মানুষও মুক্তিযুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালেই যেমন এসব ভূমিকার পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ছিল, তেমনি পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনার শাসনামলেও তা আরও স্পষ্টভাবে স্বীকার করা দরকার ছিল। মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগকে একচ্ছত্র ও একমাত্র প্রধান শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা রাজনৈতিক দিক থেকে যেমন ভুল ছিল, তেমনি নৈতিক দিক থেকেও তা ভুল ছিল। এর ফল শুধু আওয়ামী লীগের জন্যই ক্ষতিকর হয়নি; এতে সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও মর্যাদাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রথম আলো: আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সমাজে যে ভেদ ও বিভক্তি তৈরি করেছে, সেই ফাটল দূর করতে এবং বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ, এর ইতিহাস ও ইতিহাসচর্চার বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কীভাবে এগোতে পারি?

রেহমান সোবহান: রাজনৈতিক পর্যায়ে এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও যুক্তিনির্ভর সংলাপের একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের ইতিহাসভিত্তিক সমঝোতার প্রক্রিয়া শুরু করা প্রয়োজন। এই সংলাপে বিদ্যমান সব ঐতিহাসিক প্রমাণ জনসমক্ষে আনতে হবে, যাতে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান, গালাগাল বা এমনকি শারীরিকভাবে আঘাতের হুমকির ওপর প্রতিষ্ঠা করা বাগাড়ম্বর নয়, বরং তথ্য ও বাস্তবতার ভিত্তিতে ইতিহাসের একটি তুলনামূলকভাবে একমতাপূর্ণ ব্যাখ্যা পৌঁছানো সম্ভব হয়।

রাজনৈতিক স্বার্থে ভুল তথ্যের বিস্তার এবং সেই ভুল তথ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের মাত্রা এতটাই বেড়েছে যে আমাদের ইতিহাসের এই গঠনমূলক ও নির্ণায়ক পর্ব সম্পর্কে পুরো একটি প্রজন্মের উপলব্ধি গুরুতরভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিটি শাসনামলেই সংস্কারের প্রতিশ্রুতির দীর্ঘ ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে, সরকার জনগণের সামনে যে সংস্কার বা নীতির কথা বলে, সেগুলোর বাস্তবায়নই হলো আসল চ্যালেঞ্জ। আমার মতে, ভুল নীতির চেয়ে বাস্তবায়নের ব্যর্থতাই গণতান্ত্রিক অচলাবস্থা ও দুঃশাসনের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথম আলো: চব্বিশের অভ্যুত্থান বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস নিয়ে বহু নতুন প্রশ্ন সামনে এনেছে। মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল বড় একটা পরিবর্তন আসবে, সেই সুযোগও তৈরি হয়েছে। সংস্কার, অন্তর্ভুক্তিমূলক, বহুত্ববাদ, নতুন বন্দোবস্ত—এসব শব্দ ও ধারণা চারপাশে জোঁরালোভাবে উচ্চারিত হয়েছে। অভ্যুত্থান ও অন্তর্বর্তী সরকারের ১৫ মাস পেরিয়েছে। জনপ্রত্যাশার কতটা বাস্তবায়ন হলো?

রেহমান সোবহান: অধ্যাপক ইউনুস এবং অন্তর্বর্তী সরকার সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের একটি মূল বার্তা হলো—আমরা যেন আবার ‘আগের মতো সবকিছু চলবে’ ধারায় ফিরে না যাই। বিভিন্ন কমিশন ও টাস্কফোর্সের মাধ্যমে যে সংস্কার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে জুলাই সনদে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো বাংলাদেশের জন্য উন্নত শাসনব্যবস্থা ও আরও ন্যায্য ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি ইতিবাচক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

তবে স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিটি শাসনামলেই সংস্কারের প্রতিশ্রুতির দীর্ঘ ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে, সরকার জনগণের সামনে যে সংস্কার বা নীতির কথা বলে, সেগুলোর বাস্তবায়নই হলো আসল চ্যালেঞ্জ। আমার মতে, ভুল নীতির চেয়ে বাস্তবায়নের ব্যর্থতাই গণতান্ত্রিক অচলাবস্থা ও দুঃশাসনের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা থেকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা—কোনো ক্ষেত্রেই কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা উন্নত করার বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। এটি জনগণের জন্য হতাশাজনক এবং বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সরকার উন্নতি আনতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু তা জনগণের প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আমার মতে, বাস্তবায়ন ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করাকে অন্তর্বর্তী সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ছিল। পাশাপাশি আইন ও বিধিতে যে নীতি ও প্রকল্পগুলো বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলো কীভাবে আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে, তা তাদের স্বল্প মেয়াদের মধ্যেই দেখিয়ে দেওয়া দরকার ছিল।

বাস্তবে জুলাই সনদের আওতায় প্রস্তাবিত সংস্কারগুলোর ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন কেবল এমন একটি নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমেই সম্ভব। তারা চার-পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকবে। তাতে সংস্কারের ফলাফল মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। গণভোটের মাধ্যমে প্রণয়ন করা কোনো সনদ দিয়ে একটি নির্বাচিত সরকারকে বাধ্য করে রাখা যাবে—এমন ধারণা রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক, উভয় দিক থেকেই ভুল।

এসব সংস্কারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে নির্বাচিত সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং সংসদে নির্বাচিত সংস্কার বাস্তবায়নে সরকারের ওপর চাপ দিতে সক্ষম বিরোধী দলের শক্ত অবস্থানের

ওপর। এ ছাড়া এসব সংস্কারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে সেই নাগরিক সমাজের সক্রিয় ভূমিকার ওপর, যারা কেবল সংস্কার নয় বরং নির্বাচিত সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের বাস্তবায়ন নিয়েও পাহারাদারের ভূমিকা পালন করবে।

বহুত্ববাদ ও অন্তর্ভুক্তি—জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকা এই দুটি বিষয় দুঃখজনকভাবে এখনো প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পায়নি। অন্তর্বর্তী সরকার বর্তমানে অগ্রিয় হয়ে পড়া রাজনৈতিক গোষ্ঠী, নারী এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় নিজেদের সীমাবদ্ধতাই তুলে ধরেছে।

অর্থনৈতিক টাস্কফোর্সসহ কোনো কমিশনই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশলের বিষয়ে কোনো স্পষ্ট রূপরেখা দিতে পারেনি। একইভাবে জুলাই সনদের মাধ্যমেও অন্তর্বর্তী সরকার বহুত্ববাদের প্রশ্নটির সন্তোষজনক সমাধান করতে পারেনি। নারী কমিশনের সুপারিশগুলো উপেক্ষিত থাকার বিষয়টি এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ।

প্রথম আলো: মব সহিংসতা বন্ধে অন্তর্বর্তী সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও অক্ষমতা উগ্র ডানপন্থী অংশকে শক্তিশালী করেছে। নারী, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বাউল ও মাজারপন্থীরা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের পরিসরগুলো সংকুচিত হয়েছে। নাগরিক হিসেবে তাঁদের অধিকার রক্ষায় বড় রাজনৈতিক দলগুলোকেও আমরা জোরালো ভূমিকা নিতে দেখিনি। উদারপন্থী গোষ্ঠীগুলোও কোণঠাসা ও নীরব। এর প্রভাব আমাদের সমাজে কী হতে যাচ্ছে বলে মনে করেন?

রেহমান সোবহান: মব সহিংসতা ঠেকাতে এবং এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে অন্তর্বর্তী সরকার যে ব্যর্থ হয়েছে, তা খুবই স্পষ্ট। এই ব্যর্থতা একদিকে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়, অন্যদিকে শাসনক্ষমতার দুর্বলতাও প্রকাশ করে। রাজনৈতিক দলগুলো সহিংসতার বিষয়ে কথার ফুলঝুরি ছড়ালেও বাস্তবে এর বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে ছড়িয়ে পড়া মৌখিক গালাগাল ও সহিংসতায় উসকানি দেওয়ার বিষয়গুলো প্রায় উপেক্ষিতই থেকে গেছে। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় কীভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে, সে বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারেরই মানদণ্ড স্থির করে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্বাচিত রাজনৈতিক দলগুলো ভবিষ্যতে এসব সহিংস শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে আগ্রহী হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। কারণ, এই মবের একটি অংশ এমন রাজনৈতিক গোষ্ঠী থেকে আসছে, যারা এখন ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে নির্বাচিত হওয়ার আশা করছে।

সহিংসতা মোকাবিলায় অন্তর্বর্তী সরকারের এই ব্যর্থতার কারণেই আজকের নির্বাচন-পূর্ব পরিস্থিতি অধিকতর বিপজ্জনক এমন এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, যেখানে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রার্থীদের নিশানা করে আল্লেখ্যাস্ত্রের সহিংসতা দেখা দিচ্ছে।

প্রথম আলো: তিন দশকের বেশি সময় ধরে দ্বিদলীয় বৃত্তের মধ্যেই বাংলাদেশের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে। আপনি বলেছেন, দ্বিদলীয় বিভাজন জাতীয় রাজনীতিতে একধরনের গোত্রীয় বিভাজন তৈরি করেছে। তৃতীয় কোনো রাজনৈতিক শক্তি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা কতটা দেখেন?

রেহমান সোবহান: আমি আগেই উল্লেখ করেছি, শিক্ষার্থীরা একটি তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠে আসতে পারে, এমন আশা আমরা অনেকেই করেছিলাম। কিন্তু তাদের বক্তব্য, কার্যক্রম ও রাজনৈতিক দল গঠনের প্রচেষ্টা দেখে সেই আশা খুব একটা জোরালো বলে মনে হয় না।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী স্পষ্টভাবেই একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতির কারণে নির্বাচনের সময় এবং নির্বাচনের পর জামায়াত রাজনীতির মাঠ ও সংসদে বিএনপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে।

তবে যে প্রশ্নটি নিয়ে কেউই প্রকাশ্যে আলোচনা করতে চান না, তা হলো, দেশের দ্বিদলীয় রাজনীতির দুটি স্তরের একটি হিসেবে থাকা আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ কী হবে। দলটি ৭৭ বছরের ইতিহাস ধারণ করা একটি রাজনৈতিক শক্তি এবং তাদের উল্লেখযোগ্য ভোটব্যাংক রয়েছে। তাদের যত ভুল ও অন্যায়ই থাকুক না কেন, আমাদের এই গোত্রভিত্তিক রাজনীতি থেকে আওয়ামী শক্তি হঠাৎ করে বিলীন হয়ে যাবে—এমনটি ভাবার সুযোগ নেই।

এই বিষয়টির সুরাহা নির্বাচিত সরকারকেই করতে হবে। আর সেটি করতে ব্যর্থ হলে আমাদের ‘সংস্কারকৃত’ রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে।

প্রথম আলো: আপনি আপনার লেখায়, বক্তৃতায় ‘অব্যাহত মুক্তিযুদ্ধ’ কথাটি বারবার করেছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কোথায় অসমাপ্ত? আমরা কীভাবে এর ভবিষ্যৎযাত্রা অব্যাহত রাখব?

রেহমান সোবহান: মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি ছিল গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ। এর মধ্যে প্রথম তিনটি নীতি কখনোই পুরোপুরি বাস্তবে রূপ পায়নি। নিকট ভবিষ্যতেও এগুলো বাস্তবে রূপ পাবে, তার বাস্তব কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। আমাদের জাতিসত্তা গঠনের এই তিন মূল ভিত্তিকে জুলাই সনদ থেকে প্রকৃতপক্ষে বাদ দেওয়া হয়েছে। ৫৪ বছর পর এসেও জাতীয়তাবাদ ধারণাটি অমীমাংসিত রয়ে গেছে। নব্বই বছর বয়সে দাঁড়িয়ে আমার ভয় হয় যে আমার নিজের রাজনৈতিক অভিযাত্রা হয়তো অসমাপ্তই থেকে যাবে।

প্রথম আলো

১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি দুর্বল করবে বাংলাদেশকে

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতির যে প্রবণতা দৃশ্যমান হচ্ছে, বাংলাদেশের এগিয়ে চলার পথে যে কতটা অন্তরায় তৈরি করবে, তা তুলে ধরলেন নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের আহ্বায়ক ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

তিনি বলেছেন, ধর্মভিত্তিক যে বিভাজনের রাজনীতি হচ্ছে, এটা শেষ বিচারে দেশের সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করবে। এটা শেষ বিচারে বাংলাদেশের সমাজকে দুর্বল করবে। ধর্মভিত্তিক বা জাতিগত পরিচয়ের রাজনীতি আগামী দিনে দেশের অর্থনীতিকে কিন্তু দুর্বল করবে। বৈশ্বিক অবস্থানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও দুর্বল করবে।

আজ শনিবার সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আয়োজনে ‘সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার: বর্তমান বাস্তবতা ও প্রত্যাশা’ শীর্ষক গোলটেবিল সংলাপে এ কথা বলেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তাঁর মতে, দেশে এখন নিরাপত্তাবোধের অভাব শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা জাতিগত সংখ্যালঘুর মধ্যে সীমিত নেই। এটি সার্বিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

নিরাপত্তার বিষয়টি এখন বড় হয়ে দেখা দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এই নিরাপত্তাবোধের অভাবটা শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা জাতিগত সংখ্যালঘুর মধ্যে সীমিত নয়। নিরাপত্তাবোধের অভাব নারী, মাজার ও সুফির মতো বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক চিন্তাভাবনার মানুষ, ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি, আহমদিয়া সম্প্রদায় ইত্যাদি অনেকের জন্য সত্য। এটা একটা সার্বিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের জীবনে বিপত্তি সৃষ্টি করছে বলে উল্লেখ করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, খ্রিষ্টানদের বড়দিনের উৎসবে

ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অত্যাচার হয়েছে। এগুলো বাংলাদেশের যারা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী আছে, তাদেরকে একই ধরনের আচরণ করার ক্ষেত্রে উৎসাহ জোগায়। ভারতবর্ষে কী হচ্ছে—এ দায়দায়িত্ব বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দেওয়া উচিত নয়।

তবে সার্বিক বিষয়গুলোতে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা, সম্প্রীতি ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে মানুষ দেখছে, তা তুলে ধরে তিনি বলেন, এই নতুন একতাবোধকে যদি ধারণা করা না যায়, তাহলে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, দেশপ্রেম অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফেরার পর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে কথা বলেছেন, তা তুলে ধরে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে সামনে আনার উপলব্ধিটা সঠিক। নিরাপদ বাংলাদেশ করার ক্ষেত্রে নির্বাচনপূর্ব এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে পদক্ষেপ কী হবে, এটা এখন বোঝার বিষয়। তিনি মার্টিন লুথার কিংয়ের শব্দকে নিজের মতো করে বলেছেন। ওই প্ল্যানের (উই হ্যাভ অ্যা প্ল্যান) ভেতরে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অবস্থান কী হবে? মানবাধিকারের ভিত্তিতে দেশে একটি নাগরিক সমাজ গড়ে উঠবে—এ কথা কি থাকবে?

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আন্দোলনকারীদের একটি স্লোগান তাঁর মনে নাড়া দিয়েছে। সেটি হলো সুশীলতার দিন শেষ, জবাব চায় বাংলাদেশ।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সেই সঙ্গে বলেন, বাংলাদেশ শুধু জবাব চায় না যে হাদির হত্যাকারীদের বিচার হোক। বাংলাদেশ এই জবাব চায়, তার নিজস্ব নাগরিকদের অধিকার কীভাবে রক্ষিত হবে, সেই জবাবটাও একই সঙ্গে দিতে হবে। যে নারীকে অত্যাচার করা হয় শুধু তাঁর পোশাকের জন্য, তার বিচারটা কী হবে? যে বাউলগান গাইতে পারে না, তাঁর অধিকারটা কী হবে? এসবের জবাব দিতে হবে।

আবার বাংলাদেশে চলমান নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের কেউ যাতে যুক্ত না হয়, সেই সতর্কবার্তাও দেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

এই সংলাপে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ। পরিষদের অন্যতম সভাপতি নির্মল রোজারীওর সভাপতিত্বে এই সংলাপে আরও বক্তব্য দেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী সারা হোসেন, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান তপন চন্দ্র মজুমদার, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের

অন্যতম সভাপতি নিমচন্দ্র ভৌমিক, আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এম এ আজিজ, বাংলাদেশ সনাতন পার্টির সাধারণ সম্পাদক সুমন কুমার রায়, বাংলাদেশ খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়া, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ভিন্সু সুনন্দপ্রিয়, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত কুমার দেব প্রমুখ। অনুষ্ঠান সম্বলনা পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য রঞ্জন কর্মকার।

প্রথম আলো

২৭ ডিসেম্বর ২০২৫



অধ্যায় ৩

শাসন, সংস্কার ও প্রতিষ্ঠান



ব্যাংকিং সেক্টরকে পুনর্গঠন করা, সংস্কার করা সহজ কাজ নয়

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ। তিনি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সম্মানীয় ফেলো। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের বিখ্যাত বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। একই সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায়।

রিয়াজ সুমন: আপনি ঈদ কিভাবে উদযাপন করেন?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: সারা বছরই তো ব্যস্ততার মধ্যে থাকতে হয়, ঈদের সময় বেশ কয়েকদিন একসাথে ছুটি পাওয়া যায়। তখন আত্মীয়স্বজন যারা আছেন তাদের সাথে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয়, তাদের সাথে কিছুটা সময় কাটানো যায়। বিশেষত পরিবারের সাথে তো অবশ্যই কিছুটা সময় ব্যয় করতে পারি। আমার তিন বোন আছেন ঢাকা শহরে, আমার আব্বা আছেন, তাঁর বয়স ৯৬ বছর; ঢাকায় যাঁরা থাকেন আমার আব্বা আমার বোনেরা তাদের সাথে কিছুটা সময় আমি দিতে পারি।

আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা সেটা হল, এই সময়টা তো সবার সাথে আনন্দ ভাগ করার সময়- সেই চেষ্টা করি, যাতে করে শুধু নিজেদের আনন্দ নয়; আশপাশে যারা আছেন তাদের সাথেও আনন্দটা ভাগ করতে পারি।

রিয়াজ সুমন: এখনকার ঈদ এবং আপনার ছোটবেলার ঈদের মধ্যে পার্থক্য কী?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: আমার জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর কেটেছে নানার বাড়িতে। সেটা ফেনীতে। মাঝে মাঝে দাদার বাড়ি যেতাম যেটা ছাগলনাইয়ায়।

নানাবাড়িতে বড় হয়ে ওঠা আমার। তখন নানা ছিলেন, আমার মামারা ছিলেন, তাদের সাথে এবং গ্রামীণ পরিবেশে সবার সাথে মিলিয়ে ঈদের সময় এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যাওয়া, সেমাই খাওয়া, আনন্দ করা, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আনন্দ করা; সেটা ছিল অন্য ধরনের সময়।

রিয়াজ সুমন: আপনাকে আমরা সব সময় দেশের অর্থনীতি, গবেষণা এবং সার্বিক অর্থনীতি নিয়ে কথা বলতে শুনি। আমরা আজ আপনার আপনার স্কুল জীবন ও বাল্যকাল সম্পর্কে জানতে চাই।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: ছোটবেলায় আমি আমার নানার বাড়িতে থেকে সোনাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি ক্লাস ফোর পর্যন্ত।

আমার বাবা তৎকালীন ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের কর্মচারী ছিলেন এবং পরবর্তীতে তার কর্মস্থল হয় চাঁদপুরের মতলবে, সেই মতলবে তখন ক্লাস ফাইভে ভর্তি হই। সেখানে ক্লাস ফাইভ-সিক্স পড়ি এবং সেই স্কুল থেকে পরবর্তীতে পরীক্ষা দিয়ে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হই। মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিলাম এবং ইন্টারমিডিয়েটে ইনফ্যান্ট ঢাকা বোর্ডে আর্টসে ফার্স্ট হয়েছিলাম। তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইকোনমিক্সে ভর্তি হই। ইকোনমিক্সে কিছুদিন ক্লাস করার পরে সরকারি বৃত্তি নিয়ে রাশিয়ায় গেলাম। সেখানে আমি প্রথমে আমি আমার আন্ডারগ্রেড করলাম। ল্যান্ডুয়েজ কোর্স করার পরে মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উন্নয়ন অর্থনীতিতে পিএইচডি করলাম। এই পিএইচডি করার পরে দেশে চলে আসলাম।

রিয়াজ সুমন: আপনার কর্মজীবন কোথা থেকে শুরু হলো?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: দেশে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করলাম শিক্ষকতার জন্য। মাঝখানে আমি বিআইবিএমে কয়েক মাস কাজ করেছি। তারপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিস ফ্যাকাল্টিতে একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস ডিপার্টমেন্টে অর্থনীতি পড়ানোর নির্বাচিত হলাম। এসিস্টেন্ট প্রফেসর হিসেবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার জীবন শুরু করে। তারপর তো ২৫ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি। একই সাথে ১৯৯৩ সালে যখন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ করলেন প্রফেসর রেহমান সোবহান তখন তার সাথে সমান্তরালভাবে সেখানে কাজ করেছি।

রিয়াজ সুমন: এই শিক্ষকতার মতো একটি মহান পেশা ছেড়ে আপনি গবেষণায় চলে আসেন এবং এই সংস্থায় কাজ করার পেছনের গল্পটা যদি একটু বলতেন, কেন এলেন আপনি?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: শিক্ষকতাটা আমার খুবই ভাল লাগতো এবং আমার সবসময় মনে হত যে আমার বোধহয় ন্যাচারাল প্রবণতাই হল শিক্ষকতার দিকে। ২৫ বছর পড়লাম

কিন্তু তারপরে আমাকে খুব কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হল। ১৯৯৩ সালে যখন অধ্যাপক রেহমান সোবহান স্যার সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ করলেন তখন আমি আমার সময়ের বড় অংশ শিক্ষকতার বাইরে তার সাথে থাকতাম, গবেষণা করতাম। সিপিডি গড়ে তোলার ব্যাপারে ডক্টর দেবপ্রিয় ও আমি স্যারের সাথে সবসময় ছিলাম। পরবর্তীতে যখন ডক্টর দেবপ্রিয় দেশের বাইরে চলে গেলেন, তিনি ছিলেন স্যারের পরে প্রথম নির্বাহী। তখন আমার একটা দায়িত্ব চলে আসলো বলা যায়। আমি চার বছরের জন্য এক্সট্রা অর্ডিনারি লিভ উইদাউট পে নিলাম। কিন্তু তারপর প্রশ্ন আসলো যে, এখন কি করা হয়, ছুটির পরে ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যাওয়া অথবা সিপিডিতে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসাবে এটা কন্টিনিউ করা। তো তখন সিপিডি গড়ে উঠছে, খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়; তখন আমি এই সিদ্ধান্তটা নিলাম।

রিয়াজ সুমন: আপনার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে জানতে চাই।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: ১৯৮৯ সালে আমাদের বিয়ে হয়। আমার একজন পরিচিত বড় ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তার মাধ্যমে আসলে আমাদের এই বিয়েটা অনেকটা বলা যায় ঘটকালির মাধ্যমেই হয়। খুব পূর্ব পরিচিত যে ছিল সেটা না। আমার স্ত্রী তখন একটা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষকতা করলেন। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। আমাদের দু'জন সন্তান। আমার ছেলে এখানে পড়াশোনা করে তারপরে আন্ডারগ্রেড এবং মাস্টার্স বাইরে করেছে। দেশে ফেরত এসে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছে। আইএফসিতে ছিল, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে ছিল, তারপর ইউএনডিপিতে তারপর আবার ব্যাংকে। সম্প্রতিকালে আমার মেয়েও আন্ডারগ্রেড এবং মাস্টার্স বাইরে করেছে। এখনও কানাডাতে পিএইচডি করছে মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কারদের উপরে। আমার স্ত্রী এক পর্যায়ে বাচ্চাদের পড়াশোনার দেখভাল ইত্যাদি করার জন্য স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেন।

রিয়াজ সুমন: শিক্ষকতা তারপরে সিপিডির পাশাপাশি আপনি আন্তর্জাতিক অনেক সংস্থার সাথে কাজ করেছেন, সেই অভিজ্ঞতা যদি বলতেন।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: আমি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছি, কুইন এলিজাবেথ হাউসে ছিলাম, তারপরে যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র ফুলব্রাইট ফেলো হিসেবে ছিলাম। যুক্তরাজ্যের ওয়ারউইক ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট ডক ফেলো হিসেবে ছিলাম। তারপর সিঙ্গাপুরে, দিল্লিতে ও ইসলামাবাদসহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ফেলো হিসেবে কাজ করেছি।

রিয়াজ সুমন: স্যার, আমরা একটু অর্থনীতি নিয়ে জানতে চাই, আমাদের অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: দেখুন মূল্যস্ফীতির একটা চাপ গত কয়েক বছরে শুধুমাত্র প্রান্তিক মানুষ না, এখানে নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত যারা আছেন, তারাও এই চাপের মধ্যে

আছেন। আমাদের কর্মসংস্থান-বিনিয়োগ এগুলোও একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। আবার অন্যদিক থেকে অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে। বৈদেশিক খাতটা একটা ইতিবাচক অবস্থার মধ্যে আছে, আমাদের এক্সচেঞ্জটা স্ট্যাবল আছে, রিজার্ভ যেভাবে অবনমন হচ্ছিল সেটা রোধ করা গেছে। আমদানি আরো একটু উদার করা সম্ভব হচ্ছে, যেটা নিয়ন্ত্রিত করতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। ব্যাংকিং সেক্টরকে কিছুটা পুনর্গঠন করা, সংস্কার করা; এগুলো সহজ না এবং এগুলো এই সরকারও পারবে বলে মনে হয় না। সেইজন্য সংস্কার কর্মসূচিগুলোকে শুরু করা, সেগুলোতে রাজনৈতিক নেতৃত্বদ যাতে তাদের অঙ্গীকার করেন, ইশতেহারে যাতে তাদের প্রতিফলন করেন। যাতে জনগণের কাছে তাঁরা বলেন এবং জনগণ যাতে সেটাকে মনিটর করতে পারে, একবার ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পরে সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রিয়াজ সুমন: আপনারা তো শ্বেতপত্র করলেন এবং সেখানে আপনি সদস্য ছিলেন। তার মূল্যায়ন বর্তমান সরকার কিভাবে করেছে বা করছে।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: আমাদের ম্যানডেট ছিল ‘স্টেট অব দ্য ইকোনোমি’টা কি? প্রকৃত অবস্থা কি- আমরা সেটা বের করার চেষ্টা করেছি। কোন জায়গাগুলোতে সমস্যা আছে সেটা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হোক, টাকা পাচারের ক্ষেত্রে হোক, ব্যাংকিং সেক্টরের ক্ষেত্রে হোক, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হোক আমরা ‘স্টেট অব দ্য ইকোনোমি’টা কি- আমরা একটা স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার কারণ তথ্য উপাত্তের অনেক বড় ধরনের ঘাটতি ছিল। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখার প্রবণতা ছিল। তো সেটাকে আমরা চেষ্টা করছি যে প্রকৃত কী অবস্থা সেটা তুলে ধরার। আমরা ঘেরকম আশা করেছিলাম আশানুরূপভাবে হয়নি। এখন প্রত্যেক মন্ত্রণালয়কে বলা হচ্ছে, একটা হলেও সংস্কার যাতে তারা বাস্তবায়ন করেন। কিন্তু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু আরো অনেক ব্যাপক এবং এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তো একটা সাময়িক সময়ের জন্য আসছে; তাঁরা যে সবটা করতে পারবেন তা না, তবে একটা ভালো শুরু তাঁরা করে দিতে পারেন এবং রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে তারা যে অঙ্গীকারটা নিতে চাচ্ছেন, আমার মনে হয় যেটা ভালো। আমরা দেখব যে, তারা অঙ্গীকার পরবর্তীতে বাস্তবায়ন কতটুকু করতে পারেন।

রিয়াজ সুমন: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: আপনাকেও ধন্যবাদ।

কালের কণ্ঠ

১ এপ্রিল ২০২৫

প্রথম আলোর গোলটেবিল অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতরেও আরেকটা সরকার আছে

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতরেও আরেকটা সরকার আছে বলে মন্তব্য করেছেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘এখন সরকারের নিরপেক্ষতার প্রশ্নটা, বিশেষ করে দলীয় নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। কারণ, এখন মোটামুটি পরিষ্কার হয়েছে যে আমরা সরকার বলতে যাদের দেখি আনুষ্ঠানিকভাবে, আসলে তার ভেতরেও আরেকটা সরকার আছে। এটা এখন আর কোনো গোপন বিষয় নয়। এটা সবার কাছেই প্রকাশ্য। এখন সরকারের নিরপেক্ষতা পুনঃপ্রমাণ করা...কাদম্বরীকেই করিতে হইবে।’

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে এক গোলটেবিল বৈঠকে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ কথা বলেন। ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: এক বছরের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎশীর্ষক এই গোলটেবিলের আয়োজন করেছে প্রথম আলো। গোলটেবিল বৈঠকের শুরুতে রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভবনে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তে হতাহতের ঘটনায় শোক জানানো হয়। সবাই এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন।

গোলটেবিল বৈঠকের শুরুতে রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভবনে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তে হতাহতের ঘটনায় শোক জানানো হয়। সবাই দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন

গোলটেবিল বৈঠকে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ‘বৈষম্যবিরোধী চেতনায় আমরা নতুন সরকার আনলাম। কিন্তু বৈষম্যবিরোধী চেতনাকে তারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ও সংস্কারপ্রক্রিয়ায়

প্রতিফলন করতে পারল না। সরকারের কোনো নৈতিক অবস্থান পরিষ্কার করা নেই। সর্বজনীন মানবাধিকারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিকাশকে চিন্তা করছে এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর পক্ষে দাঁড়াবে, সেই দুর্বল জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তার পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য পদক্ষেপের ভেতরে গেল না এখন পর্যন্ত। সেহেতু সংস্কারের যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, সেই সংস্কারের সেই সম্ভাবনাটুকু গরিব মানুষ তো পরের কথা, এমনকি উৎপাদনশীল উদ্যোক্তা শ্রেণিও তার ভেতর এল না।’

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ‘দুটি মৌলিক প্রশ্ন এখন সামনে এসেছে। একটি হলো অন্তর্বর্তী সরকার। অর্থাৎ তার শুরুও আছে এবং একটা সুনির্দিষ্ট সীমিত সময়ের পরে তার শেষ আছে। এই জিনিসটাকে সামনে নিয়ে আসার এখন সময় হয়েছে যে এটা একটা অনন্তকালীন সরকার নয়, এটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি হয়, তাহলে প্রথমে এখন যে দুটি প্রশ্ন সবাইকে বিচলিত করছে, অন্তত আমাকে করে—এক নম্বর প্রশ্ন হলো, সরকারের নিরপেক্ষতা। অন্তর্বর্তী সরকারের নিরপেক্ষতা এখন একটি বড় বিষয় হিসেবে সামনে এসেছে। একটা সরকারের নিরপেক্ষতা বললে তার মৌল আদর্শগত নিরপেক্ষতার কথা বলা হয় না। কারণ, সে পিছিয়ে পড়া মানুষের পক্ষে থাকবে এবং এটার একটা সংকট সৃষ্টি হয়েছে, যেহেতু দুর্বল জনগোষ্ঠীরা আরও বেশি দুর্বল বোধ করছে, অনেক বেশি বিপন্ন বোধ করছে। একটা স্বৈরাচারী সরকারের আমলে যে রকমভাবে তাদের প্রতি অত্যাচার বা তাদের প্রান্তিকীকরণ হয়েছে, ঠিক একই রকমভাবে নারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, জাতিগত সংখ্যালঘু...। লিঙ্গ বৈচিত্র্যের কথা তো বলাই যাচ্ছে না। এটা আরেক সমস্যা হয়ে গেছে।’

দেবপ্রিয় আরও বলেন, ‘কিন্তু এখন সরকারের নিরপেক্ষতার প্রশ্নটা, বিশেষ করে দলীয় নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে কারণ, এখন মোটামুটি পরিষ্কার হয়েছে যে আমরা সরকার বলতে যাদের দেখি আনুষ্ঠানিকভাবে, আসলে তার ভেতরেও আরেকটা সরকার আছে। সরকারের ভেতরে যে সরকার আছে, এটা এখন আর কোনো গোপন বিষয় নয়। এটা সবার কাছেই প্রকাশ্য। অন্তর্নিহিতভাবে যে ক্ষমতার চক্রটি আছে, সেটাকেই সরকারকে তারা চাইলেও তার প্রার্থিত এলাকাতে পৌঁছাতে পারছে কি না, এটা একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সরকারের নিরপেক্ষতা পুনঃপ্রমাণ করা...কাদম্বরীকে করিতে হইবে।’

অন্তর্বর্তী সরকার চাইলেও এখন একটা ভালো নির্বাচন করতে পারবে কি না, বৈঠকে সেই প্রশ্ন রেখে অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ‘আপস, আঁতাত বা সিট-ভাগাভাগির নির্বাচন নয়, একটা প্রকৃত নির্বাচন। যেখানে মানুষ ভোট দেওয়ার পর শান্তিতে থাকবে। শুধু ভোটের দিন নয়, ভোটের পরের দিনও সে থাকবে। সেহেতু দ্বিতীয় প্রশ্নটা দাঁড়িয়েছে এটা এবং এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই নির্বাচন করতে হলে অবশ্যই শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা খুব ভালো বুঝছি যে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও প্রচলিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে এটা করা সম্ভব নয়। সেনাবাহিনীর বৃহত্তর অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে এটা

করা সম্ভব নয়। আমি সাধারণভাবে বুঝি যে তিন-চার মাসের জন্য তাদের মাঠে থাকতে হবে এবং তারা আসার পরেই প্রথমে অস্ত্র উদ্ধারের কাজটা করতে হবে। একই রকমভাবে হয়তো স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্তভাবে তারা কী করবে...।’

সে ক্ষেত্রে ইন এইড টু সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অথবা স্ট্রাইকিং ফোর্সের বাইরে গিয়ে কিছু একটা হতে হবে এবং সেনাবাহিনীর আরেকটু প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ লাগবে উল্লেখ করে দেবপ্রিয় বলেন, ‘কিন্তু সরকারের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সম্পর্ক মানুষের দুশ্চিন্তার কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ফলে সরকারের নিরপেক্ষতা ও সরকারের সক্ষমতা—এই দুটো বিষয় এখন দুটো বড় প্রশ্ন। যেহেতু এটা অন্তর্বর্তী সরকার, আমি মনে করি সরকারের সময় হয়েছে একটা ডেস্ক ক্রিয়ারিং লিস্ট করার। এখন যদি জাতির উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বক্তৃতা দেন, আমি প্রত্যাশা করব যে তিনি কী দিয়ে সমাণ্ড করতে চাইছেন, সেটাকে তিনি পরিষ্কার করবেন। যেসব সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সেগুলো কোথায় কোথায় তিনি শেষ করবেন, কোথায় কোথায় অংশগ্রহণ করবেন...।’

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেছেন, ‘সংস্কার একটা অব্যাহত প্রক্রিয়া। রাজনৈতিক নেতাদের এখন নির্বাচনের ইশতেহার দিতে হবে। ওই ইশতেহারে আমাদের নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আলোচনা বা আন্দোলন দরকার হলে, তা করা দরকার। দেশ থাকবে, জনগণ থাকবে, সরকার আসবে-যাবে। এই চিন্তাটা মাথায় রেখে জাতি গঠনের এই অবস্থান থেকে ওই উত্তরণের জায়গাটাতে পৌঁছাতে হবে। এখন গত বছরের মূল্যায়নের চেয়ে আমি আগামী এক বছরের এই নিষ্ক্রমণ পদ্ধতিটা কী হবে বা এক্সিট পলিসিটা কী হবে, সেটার জন্য কী কী প্রয়োজন পড়বে, সেগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়ার আমি প্রয়োজন বোধ করেছি।’

গোলটেবিল বৈঠকটি সম্বলনা করেন প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ। এতে অংশ নিয়েছেন, লেখক ও চিন্তক ফরহাদ মজহার, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান, গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সারা হোসেন, লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ, অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস, নির্মাতা কামার আহমাদ সাইমন, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদ উর রহমান, লেখক ও গবেষক মাহা মীর্জা, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের গবেষণা বিশেষজ্ঞ সল্ল আহমদ প্রমুখ।

প্রথম আলো

২৩ জুলাই ২০২৫

জবাবদিহি নিশ্চিত করতে উচ্চকক্ষের ভূমিকা কতটুকু

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বর্তমানে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষ সমস্যার সমাধান করবে, নাকি নতুন ধরনের সমস্যার কারণ হবে, তা নিয়ে লিখেছেন খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অন্তর্বর্তী সরকারের অধীন একমত্য কমিশনের চলমান রাজনৈতিক সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, দলপ্রধান, অধীন সরকার ও সরকারপ্রধানকে অধিকতর জবাবদিহির মধ্যে নিয়ে আসা। বিগত সংসদগুলোতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, দলপ্রধান ও সরকারপ্রধানের মাধ্যমে সরকার পরিচালনায় বিরোধী মতকে নিষ্পেষিত করে অকার্যকর সংসদ চালু রাখা হয়েছিল।

একটা কার্যকর সংসদের প্রত্যাশা দেশের রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ, জনগণ—সবার। এই লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বিভিন্ন সংস্কার পদক্ষেপের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হলো বর্তমান সংসদকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করে একটি উচ্চকক্ষ তৈরি করা। এ ক্ষেত্রে যুক্তি হলো দ্বিকক্ষীয় সংসদের উচ্চকক্ষের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্যের মধ্যে রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অপব্যবহার বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া।

এ ধরনের একটি দাবি স্বাধীনতা-উত্তর কালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) উত্থাপন করেছিল, যা ১৯৮০ বা ১৯৯০-এর দশকেও দলটি তুলে ধরেছিল। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ৩১ দফার মধ্যে দ্বিকক্ষীয় সংসদের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সিপিডির (সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ) পক্ষ থেকে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, জাতীয় সংসদ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গবেষকেরা বিভিন্ন সময়ে তাঁদের পরিচালিত গবেষণায়

সংসদীয় ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অধীন সংসদের কার্যকারিতা হারানোর কারণ অনুসন্ধান করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কারের সুপারিশ দিয়েছেন। কিন্তু সেসব সুপারিশে কখনোই দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠনের সুপারিশ ছিল না।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের ধারণাটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। এটা ঠিক, একটি পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে নতুন বাস্তবতায় নতুন ব্যবস্থার প্রত্যাশা থাকতে পারে। তবে প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষ সমস্যার সমাধান করবে, নাকি নতুন ধরনের সমস্যার কারণ হবে, তা সম্যক উপলব্ধি করে সংসদীয় ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।

২.

বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলো সংসদে একক দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থায় জনগণের মতামত অগ্রাহ্য করার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করলেও এ সমস্যার উৎপত্তি বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই।

এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সংসদ অধিবেশনে কার্যকর আলোচনা না হওয়া, গুরুত্বপূর্ণ বিল পাসে সংসদ সদস্যদের ফ্লোর ক্রসিংয়ের সুযোগ না থাকা (৭০ ধারা), সংসদীয় কমিটিগুলোতে বিরোধী দলের সদস্যদের কমিটির প্রধান হওয়ার সীমিত সুযোগ রাখা, আর্থিক তদারকি কমিটিগুলোকে প্রায় অক্ষম করে রাখা, স্থায়ী কমিটিগুলোতে দায়সারা সভা আয়োজন করা ইত্যাদি বিষয় সংসদকে প্রায় অকার্যকর করে রেখেছে দশকের পর দশক।

- উচ্চকক্ষ সৃষ্টি কোনো নতুন ফলাফল দেবে না, বরং এটা এক নতুন স্বার্থগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটাতে পারে, যা প্রচলিত কাঠামোকে আরও দুর্বল করবে।
- দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের যে কথা বলা হচ্ছে, তা অতিকেন্দ্রীভূত একটি রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রের এই অতিকেন্দ্রীকরণের সুরাহা হওয়া দরকার।
- রাজনৈতিক দলগুলো যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপদের কথা অনুভব করেছেন, সেটার সমাধান প্রয়োজন। তবে এ সমস্যার সমাধান এককক্ষীয় সংসদীয় ব্যবস্থায়ও করা সম্ভব।

এ ছাড়া গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর অনীহা, দীর্ঘসূত্রতা ও সংসদে তা রিপোর্ট না করা, সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যের সুযোগ না থাকা, সংসদ পরিচালনায় কার্যবিধি সঠিকভাবে না মানা, দীর্ঘ সময় বিরোধী দলের সংসদ বর্জন করা, সংসদে প্রশ্নোত্তর/আলোচনা পর্বের গুরুত্ব না থাকা, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলোআপ না হওয়া ইত্যাদি বিষয় অনেকেংশে দায়ী।

সংসদীয় ব্যবস্থার সংস্কারে প্রথমে এসব বিষয়কে প্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। আশার কথা, উল্লিখিত অনেক বিষয়েই একমত কমিশনের আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলো ইতিমধ্যে একমত পোষণ করেছে।

৩.

কাঠামোগতভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারি দল হয়ে ওঠার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের ভোটাধিকারের অবমাননার উৎপত্তি সংসদে নয়। এর উৎপত্তি সংসদ ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর গণতন্ত্রায়ণের পথে অনাগ্রহ।

দলগুলো অনেকটাই অগণতান্ত্রিক পন্থায় জাতীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত নেতা নির্বাচন, নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিবার, গোষ্ঠী, ধর্ম ইত্যাদির প্রাধান্য দেওয়া, দল পরিচালনায় অর্থায়নের সঠিক তথ্য গোপন রাখা, দলের পরিচালনায় অর্থ ব্যবহারের অস্বচ্ছতা, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর কাছে থেকে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার বিপরীতে অনৈতিক বা অবৈধ সরকারি সুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার করা এবং সরকার পরিচালনায় বিভিন্ন লবিং গ্রুপের অনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভিত্তি কখনোই শক্তিশালী হতে দেয়নি।

দুর্ভাগ্যবশত, চলমান সংস্কার আলোচনায় এসব বিষয় নিয়ে তেমন কথা নেই। এমনকি রাজনৈতিক দলগুলোরও এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার আগ্রহ নেই। মনে রাখা দরকার, বিদ্যমান কাঠামোতে রাজনৈতিক দল গঠন, দলনেতা নির্বাচন, দল পরিচালনা এবং দলের অর্থায়ন অপরিবর্তিত রেখে সংসদীয় ব্যবস্থায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বা দলপ্রধানের প্রভাব হ্রাস বা ক্ষমতার ভারসাম্য আনা সম্ভব নয়।

এ ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সৃষ্টি কোনো নতুন ফলাফল দেবে না, বরং এটা এক নতুন স্বার্থগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটাতে পারে, যা প্রচলিত কাঠামোকে আরও দুর্বল করবে। পাকিস্তানের উচ্চকক্ষ ‘সিনেট’ এ রকম একটি উদাহরণ।

৪.

সংসদের উচ্চকক্ষের জন্য প্রস্তাবিত আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি নিম্নকক্ষের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি থেকে তত্ত্বীয়ভাবে ভালো মনে হতে পারে। উভয় কক্ষের মধ্যে ‘নিয়ন্ত্রণ-ভারসাম্য’ বাড়ানোর জন্য তত্ত্বীয়ভাবে পিআর পদ্ধতি উপযুক্ত মনে হলেও বাংলাদেশের বাস্তবতা ভিন্ন।

সিপিডির বর্তমান গবেষণায় বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে, উচ্চকক্ষের ক্ষেত্রে, বিশেষত পিআর পদ্ধতির ক্ষেত্রে ছোট দলগুলোর আগ্রহ বেশি, যারা জনগণের ভোটে নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা কম দেখে। অন্যদিকে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক নেতাদের জন্য উচ্চকক্ষে নতুন সুযোগের অংশ হিসেবে দেখছে। কারণ, এই নেতাদের জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি থাকলেও মাঠপর্যায়ে নতুন বাস্তবতায় গ্রহণযোগ্যতা কম।

একই বিষয় সিভিল সোসাইটির কারও কারও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এরা জাতীয়ভাবে পরিচিত, অথচ নির্বাচনের মাধ্যমে জিতে আসার সম্ভাবনা দেখেন না। তাঁদেরও দলীয় টিকিটে ‘বিশেষজ্ঞ’ ক্যাটাগরিতে উচ্চকক্ষে আসীন হতে আগ্রহ আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

দুর্ভাগ্যবশত উল্লিখিত ব্যক্তিদের কারও কারও পেশাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চকক্ষের জন্য তাঁরা যথেষ্ট উপযুক্ত বলে বিবেচিত হওয়ার কথা নয়। তাঁরা বিশেষজ্ঞ ক্যাটাগরিতে দায়িত্ব নিলেও মূলত দলীয় স্বার্থের বাইরে তেমন ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে মনে হয় না।

৫.

উচ্চকক্ষের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো নিম্নকক্ষে উত্থাপিত বিলের ওপর বিশেষজ্ঞ মতামত দেওয়া। পূর্বের সংসদগুলোয় দেখা গেছে, সংসদে উত্থাপিত প্রায় সব বিলই সরকারি দলের উত্থাপিত সরকারি বিল। বিগত সংসদগুলোতে বেসরকারি সদস্য বিল উত্থাপন খুব কম বা একেবারে অনুপস্থিত ছিল।

এর মূল কারণ, সরকারি দলের পক্ষ থেকে এ ধরনের বিল তুলতে নিজ দলের সদস্যদের নিরুৎসাহিত করা। এ ছাড়া বিরোধীদলীয় সদস্যদের জন্য বেসরকারি বিল প্রস্তুতের জন্য যে ধরনের কারিগরি সহায়তা থাকা দরকার, সংসদ সচিবালয়ে তার অনুপস্থিতিও একটি কারণ।

এ ক্ষেত্রে তল্লাবাহক বিরোধী দলগুলোও সরকারি দলের অনাকাঙ্ক্ষিত চাপ এড়াতে বেসরকারি বিল প্রস্তুত করতে ইচ্ছুক ছিল না। আগামী সংসদেও সরকারি বিলের ওপরেই আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে, এমনটা প্রতীয়মান হচ্ছে।

দুর্ভাগ্যবশত এসব বিলের ওপর তথ্য-উপাত্তভিত্তিক আলোচনা সংসদ সদস্যদের মধ্যে দু-একজন বাদে অধিকাংশের তেমন একটা করতে দেখা যায় না। বিলের ওপর ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে ৭০ ধারার খড়া থাকার কারণে সরকারি দলের সদস্যদের নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়া অসম্ভব।

এসব বিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো প্রস্তুত করে থাকে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে। এসব বিল কদাচিৎ সংসদীয় কমিটিতে আলোচনার জন্য পাঠানো হয়। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আসা সুপারিশের ভিত্তিতে খুব কম পরিবর্তনই করা হয়। সংসদে বিল পাসের ওপর আলোচনায় এসব সুপারিশ কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। অনেক সময় সরকারি এসব বিলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাহিদার প্রতিফলন থাকে।

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, দলীয় মনোনয়নে নির্বাচিত উচ্চকক্ষের সদস্যরা তথাকথিত বিশেষজ্ঞ জ্ঞান বা দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে এসব বিলে খুব বড় ধরনের সংশোধনের সুপারিশের সাহস দেখাবেন না, অথবা সেসব সুপারিশ নিয়ে নিম্নকক্ষে খুব বেশি আলোচনা হবে বলে মনে হয় না।

এ ক্ষেত্রে বেসরকারি সদস্য বিল প্রণয়নের প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা দরকার। জাতীয় সংসদের ‘বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পার্লামেন্টারি স্টাডিস’কে সংসদ সদস্যদের জন্য শক্তিশালী জ্ঞানভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন। এই ইনস্টিটিউট সংসদ

সদস্যদের বিলসংক্রান্ত প্রস্তুতি, তথ্য-উপাত্ত প্রদান এবং খসড়া বিলের ওপর আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারবে।

৬.

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের যে কথা বলা হচ্ছে, তা অতিকেন্দ্রীভূত একটা রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রের এই অতিকেন্দ্রীকরণের সুরাহা হওয়া দরকার। স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার ভাগাভাগি করা দরকার।

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন এ ধরনের কিছু সুপারিশ করেছে। সেটা হলে সংসদ সদস্যদের কিছুটা হলেও সংবিধান প্রস্তাবিত কাজের দিকে (আইন প্রণয়ন) অধিক মনোযোগী করা সম্ভব হবে।

৭.

একটি দ্বিকক্ষীয় সংসদ গঠন করার জন্য যে ন্যূনতম বৈচিত্র্য প্রয়োজন, বাংলাদেশ কোনো বিচারেই সেটার জন্য উপযুক্ত নয়। সাধারণত দ্বিকক্ষীয় সংসদ গঠনের ক্ষেত্রে ফেডারেল সরকারকাঠামো, বৃহদায়তনের দেশ, ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, ভাষাগত বৈচিত্র্য, ধর্ম বা গোষ্ঠীগত বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য নয়।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান, পূর্ব বাংলা বা বঙ্গ নামের অঞ্চলটি) একটি সমজাতীয়, সমপ্রকৃতির অঞ্চল হিসেবে আইনগতভাবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে—সুদীর্ঘ ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে, ব্রিটিশ ভারত ও পাকিস্তানি উপনিবেশকাল পর্যন্ত। এর ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনকালে এককক্ষীয় পার্লামেন্ট প্রচলনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ঐতিহাসিক বিচারেও দ্বিকক্ষীয় সংসদের দাবিটি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ধোপে টেকে না। বেশ কিছু ছোট দেশে দ্বিকক্ষীয় ব্যবস্থা চালু রয়েছে (নেপাল, ভুটান), তার মানে এই নয় যে বাংলাদেশে এ রকম কাঠামোর চাহিদা রয়েছে।

৮.

এটা সত্যি, রাজনৈতিক দলগুলো যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপদের কথা অনুভব করেছে, সেটার সমাধান প্রয়োজন। তবে এ সমস্যার সমাধান এককক্ষীয় সংসদীয় ব্যবস্থায়ও করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সংসদ-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ, সংসদীয় প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ এবং রাজনৈতিক দলগুলোতে অধিক গণতন্ত্রায়ণের অঙ্গীকার ও উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

বর্তমান সংসদীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আধিপত্য হ্রাসে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলো কিছু একমত্যে পৌঁছেছে। এর মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় বাদে

সংসদ সদস্যদের ফ্লোর ক্রসিং অনুমোদন দেওয়া, নারী সংসদ সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্তকরণ, প্রধানমন্ত্রীর সময়কাল সীমিত করা, প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান একই ব্যক্তি না হওয়া ইত্যাদি।

তবে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে জবাবদিহির মধ্যে রাখার ক্ষেত্রে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে আর্থিক তদারকি-সংক্রান্ত কমিটিগুলোকে শক্তিশালী করা, সংসদ পরিচালনায় কর্মপ্রণালি কঠোরভাবে মেনে চলা, সংসদীয় কমিটিগুলোর কার্যক্রমের নিয়মিত মূল্যায়ন করা, স্পিকারের সভাপতিত্বে পরিচালিত কমিটিগুলোকে শক্তিশালী করা এবং সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া।

সিপিডি'র গবেষণায় দেখা গেছে, সংসদীয় কার্যক্রমের নিয়মিত মূল্যায়নের জন্য একটি স্বাধীন ‘ওয়াচ ডগ’ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এ কমিশন সংসদীয় কার্যক্রম, সাংবিধানিক কার্যক্রম ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় আইনি কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক কমিশন যা ‘ভেনিস কমিশন’ নামে পরিচিত, সে রকম একটি কমিশনের আলোকে বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত পার্লামেন্টের অধীন স্বাধীন কমিশন গঠন করা যেতে পারে। সিপিডি বর্তমানে এ কমিশনের কাঠামো ও কার্যক্রমের আওতা নিয়ে কাজ করছে।

বণিকবর্তা

২৩ এপ্রিল ২০২৫

শুধু দলিলে স্বাক্ষর করলেই সংস্কার হয় না

অধ্যাপক রেহমান সোবহান

অর্থনীতিবিদ ও গবেষণা সংস্থা সিপিডির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেছেন, নির্বাচনের আগে আগামী ৬ মাসে কোন কোন সংস্কারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে- তা স্পষ্ট নয়। শুধু একটি দলিলে রাজনৈতিক দলগুলো স্বাক্ষর করল, আর সংস্কার হয়ে গেল- বিষয়টি এমন নয়।

সোমবার রাজধানীর হোটেল লেকশোরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগে ‘বাংলাদেশ রিফর্ম ওয়াচ’ নামে নতুন উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক সূচনা উপলক্ষে ওই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

রেহমান সোবহান বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গত ৫৪ বছরে কোনো গ্রহণযোগ্য সংস্কার প্রক্রিয়া দেখা যায়নি। সংস্কার নিয়ে অনেক আলোচনা হয়, দলিল লিপিবদ্ধ হয় এবং বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা হয়। কিন্তু একটি গ্রহণযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয় না।

অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কাজের প্রক্রিয়া নিয়ে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, সরকার সংস্কারের বড় তালিকা করেছে। সংস্কার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেছে। এগুলোর মধ্যে কোনটি নির্বাহী আদেশ জারি করে বাস্তবায়ন শুরু হবে এবং কোনটি আগামী সংসদে আইনের মাধ্যমে পাস হবে, তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। ঘোষণা মানেই সংস্কার নয়।

অংশীজন ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে আলোচনা, মানুষের চাহিদা অনুধাবন, রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকারে থাকা, সংসদীয় কমিটির বিস্তারিত আলোচনা, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই পুরো প্রক্রিয়া হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এ ধরনের চর্চা দেখা যাচ্ছে না বলেও মন্তব্য করেন সিপিডির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান।

রেহমান সোবহান বলেন, ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা থাকার সময় তিনি দেশের ২৫০ জন মেধাবী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে ২৯টি টাস্কফোর্স গঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমান সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসও একটি টাস্কফোর্সের প্রধান ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সরকারগুলো এসব টাস্কফোর্সের প্রস্তাব আমলে নেয়নি।

‘বাংলাদেশ রিফর্ম ওয়াচ’ উদ্যোগ প্রসঙ্গে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ শুধু প্রতিবেদন তৈরি ও মনিটরিংয়ে সম্পৃক্ত থাকলে হবে না। রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজ যদি যৌথভাবে কাজ করে তাহলে ভালো ফলাফল আসতে হবে।

অনুষ্ঠানটি সম্বলনা করেন নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

সমকাল

১ সেপ্টেম্বর ২০২৫



ব্যাংক একীভূতকরণ উদ্যোগকে ‘টেস্ট কেস’ হিসেবে দেখা যেতে পারে

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, গবেষণা পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব এরিয়া স্টাডিজ ডিগ্রি লাভ করেছেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সাউথ ইস্ট এশিয়ান স্টাডিজের রিসার্চ ফেলো ছিলেন। তার গবেষণায় প্রাধান্য পেয়েছে অর্থনীতির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত, বিশেষত শিল্পনীতি, আর্থিক খাত, টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি। সম্প্রতি ব্যাংক একীভূতকরণ, ব্যাংক খাতের সামগ্রিক চিত্র, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সরকারের করণীয় প্রসঙ্গে কথা বলেছেন বণিক বার্তায়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাবরিনা স্বর্ণা

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর ব্যাংক খাতের পুনরুদ্ধারে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। সেসব উদ্যোগের আলোকে বর্তমানে এ খাতের পরিস্থিতি কেমন দেখছেন?

বিগত সরকারের আমলে ব্যাংক খাতের বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সুশাসনের অভাব। সেই পরিস্থিতি থেকে ব্যাংক খাতের আশু পুনরুদ্ধার খুব জরুরি ছিল। সেটির আলোকে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে ড. আহসান এইচ মনসুরকে নিয়োগ দিয়েছে। নিয়োগের এ সিদ্ধান্ত সঠিক ও সময়োপযোগী ছিল। কেননা ড. মনসুরের ব্যাংক এবং আর্থিক খাত নিয়ে দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবেও কাজ করেছেন। সব মিলিয়ে অভ্যুত্থান-পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্যাংক খাতের জন্য তাকে নিয়োগ দেয়াটা যথাযথ হয়েছে। তিনি গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর ব্যাংক খাত সংস্কারের জন্য বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছেন।

দেশের অর্থনীতির আকার বিবেচনায় ৬২টি কোনোভাবেই প্রয়োজন নেই। একটি ছোট কিন্তু বিকাশমান অর্থনীতি স্বল্পসংখ্যক ব্যাংক দিয়েই সেবা দিতে পারে—শাখা বাড়িয়ে ও ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে। কিন্তু আগের সরকার রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক নতুন ব্যাংক অনুমোদন দিয়েছিল। অবশ্য, এ অভিযোগ কেবল ওই সরকারের বিরুদ্ধে নয়; অতীতের অন্যান্য সরকারও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনেক ব্যাংক অনুমোদন দিয়েছে। ফলে ব্যাংক খাত একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে বিশেষায়িত পুঁজি ও দক্ষতা নয়, বরং গোষ্ঠীস্বার্থই প্রাধান্য পেয়েছে। যখন রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাংক অনুমোদন দেয়া হয়, তখন দেখা যায়—ব্যাংকের পরিচালকরা নিজেদের নামে-বেনামে বিভিন্ন ব্যাংক ঋণ নেন। যে কারণে দেশের ব্যাংক খাতে বড় ধরনের ধস নেমেছে। কাগজে-কলমে বলা হচ্ছে, বর্তমানে ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ ২-৩ লাখ কোটি টাকা। কিন্তু বারবার রিশিডিউল করা ঋণগুলোসহ হিসাব করলে প্রকৃত খেলাপি ঋণ প্রায় ৫ লাখ কোটি টাকার বেশি। অর্থাৎ ব্যাংক খাতের মূল পুঁজির বড় অংশই আসলে দূষিত বা ফেরতযোগ্য নয়। এমন জায়গা থেকে পুনরুদ্ধার কোনোভাবেই সহজ কাজ নয়।

সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছে, ড. মনসুর বেশকিছু সাহসী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছেন। বিশেষ করে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর বোর্ড পুনর্গঠন, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত ব্যাংক পরিচালকদের অপসারণ, স্বাধীন পরিচালক নিয়োগ—এসব পদক্ষেপের কারণে ব্যাংক খাতের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরছে। আগে দেখা যাচ্ছিল মানুষ ব্যাংকের ওপর আস্থা হারিয়ে নগদ টাকা হাতে রাখতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে সেই প্রবণতা বদলাচ্ছে। যদিও বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ রয়ে গেছে, তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত থাকলে ব্যাংক খাতের পুরোপুরি পুনরুদ্ধার সম্ভব।

সম্প্রতি পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণের উদ্যোগ নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

ব্যাংক একীভূতকরণ উদ্যোগকে ‘টেস্ট কেস’ হিসেবে দেখা যেতে পারে। আমার মতে, বাংলাদেশে কিছু ব্যাংক বন্ধ করে দেয়াই বাস্তবসম্মত হতো। কারণ অনেক ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি ও মূলধন কাঠামো এত দুর্বল যে পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। তবে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে সরকার আপাতত সরাসরি বন্ধ না করে ব্যাংক একীভূতকরণের পথে হেঁটেছে। এ প্রক্রিয়ার জন্য সরকার ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এটি পরীক্ষামূলক উদ্যোগ হিসেবে দেখা উচিত। যদি আগামী এক বছরের মধ্যে এসব ব্যাংক ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ায়, তাহলে ভবিষ্যতে অন্যান্য ব্যাংক একীভূতকরণের পথ তৈরি হবে।

দুর্বল ব্যাংকের সঙ্গে দুর্বল ব্যাংক একীভূত করলে কি কাক্ষিত ফল পাওয়া সম্ভব?

এটা অনেকটা নির্ভর করবে দুর্বলতার কারণের ওপর। যদি কোনো ব্যাংক অর্থনৈতিক কারণে দুর্বল হয়, তাহলে মার্জারের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার সম্ভব। কিন্তু যদি সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম

বা পরিচালনা পর্যদের দুর্নীতি এর মূল কারণ হয়, তাহলে কোনো শক্তিশালী ব্যাংকই সেটিকে পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। আগের সরকারের সময় যেমন এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে দুর্বল ব্যাংক মার্জের উদ্যোগ ছিল—সেটি রাজনৈতিক চাপের ফল ছিল। এখনকার উদ্যোগ ভিন্ন। এখানে আইএমএফের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কাঠামোগত ও সুশাসনগত সংস্কার আনার চেষ্টা হচ্ছে। যদি সেগুলো সফল হয়, তাহলে এটিই ব্যাংক খাত পুনরুদ্ধারের প্রথম ধাপ হতে পারে।

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে। কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কাঠামোগত সংস্কার অব্যাহত থাকলে পুনরুদ্ধারের পথ খুলে যাবে। মার্জার প্রক্রিয়া সফল হলে আগামীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরো কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ তৈরি হবে, যা এ খাতকে টেকসই উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু আমাদের দেশে নীতি ধারাবাহিকতার অভাব একটি বড় সমস্যা। এক সরকারের সময়ে কোনো চুক্তি বা সংস্কার উদ্যোগ নেয়া হলে, পরবর্তী সরকার এসে সেটি স্থগিত করে দেয়। সেক্ষেত্রে আগামী নির্বাচন সামনে রেখে আপনি সরকারকে কী পরামর্শ দেবেন?

নীতি ধারাবাহিকতার অভাব নিঃসন্দেহে আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। নির্বাচনের পর যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, তাদের ওপর অনেক পপুলিস্ট সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রেসার থাকবে। সেই চাপে অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় বা অনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রবণতা তৈরি হয়। আমরা এরই মধ্যে দেখেছি, ব্যাংক খাতে এ ধরনের কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যেমন ঋণ পুনঃতফসিলের সুযোগ। আমাদের ধারণা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক সুবিধা দেয়ার জন্য এ সুযোগ দেয়া হয়েছে।

এমন প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রস্তাব থাকবে—অন্তর্বর্তী সরকার যেন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে নীতি সিদ্ধান্তগুলোর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে। পাশাপাশি, রাজনৈতিক দলগুলোও যেন তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ব্যাংক খাতের সংস্কার সম্পর্কে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয় ও এটি গুরুত্বপূর্ণ ও।

আরেকটি বিষয় হলো—আগামী সংসদে বিরোধী দলের এমপিদের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করার যে পরিকল্পনা আছে, তা ব্যাংক খাতে জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তারা যেন এসব নীতিগত সিদ্ধান্ত মনিটর করেন ও প্রয়োজে সরকারকে দায়বদ্ধ রাখেন। সবশেষে, আমি আশা করব—নির্বাচনের পর সরকার পরিবর্তন হলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর যেন তার পূর্ণ মেয়াদ শেষ করতে পারেন। এটি আমরা নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে অন্তত ন্যূনতমভাবে প্রত্যাশা করব। এটি নীতি ধারাবাহিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হবে।

সরকার বেসরকারি ব্যাংকগুলোর ফরেনসিক অডিটের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে তেমন উদ্যোগ দেখা যায়নি। অথচ রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোয়ও ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের কী করণীয় হতে পারত?

এটা ঠিক যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোয়ও অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে। তবে যদি ঋণের কাঠামো দেখি, বেসরকারি ব্যাংকগুলোই মোট বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৬০ শতাংশের বেশি দিয়েছে। তাই প্রাধান্য দিয়ে তাদের দিয়েই ফরেনসিক অডিট শুরু করাটা যৌক্তিক। তবে এর অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর অডিট প্রয়োজন নেই। আমি বলব—সাম্পল ভিত্তিতে অন্তত কিছু রাষ্ট্রীয় ব্যাংকেও এমন অডিট শুরু করা উচিত, বিশেষ করে যেখানে বড় ঋণ বা বড় গ্রুপের সঙ্গে জটিলতা রয়েছে।

দেখা গেছে অনেকে ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে যে জমি রাখা হয়, তার কাগজপত্র ভুয়া বা বিতর্কিত। অনেক জমিই খাসজমি বা মামলাঘটিত। পৃথিবীর অনেক দেশ এ ধরনের জামানতনির্ভর ব্যবস্থার বাইরে চলে এসেছে। আমাদের ক্ষেত্রেও কি এ বিষয়ে নতুন উদ্যোগ নেয়া দরকার?

বন্ধকি জমিসংক্রান্ত অনিয়ম ব্যাংক খাতের বড় সমস্যা। তবে এটি তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা কঠিন, কারণ এতে আইনি প্রক্রিয়া জড়িত। আমাদের দেশে বন্ধকি সম্পদের মূল্যের ক্ষেত্রে বাজারমূল্যের স্বচ্ছ ধারণা নেই; ফলে অনেক সময় তিন গুণ পর্যন্ত মূল্য দেখিয়ে ঋণ নেয়া হয়। এর সঙ্গে ব্যাংক কর্মকর্তা ও বড় ঋণগ্রহীতাদের যোগসাজশও থাকে।

তাই এখানে আইনি সংস্কার দরকার—যাতে ঘোষিত মূল্য ও বাজারমূল্যের পার্থক্য কমানো যায় এবং অতিমূল্যায়িত জামানত দেখিয়ে কেউ যেন সুবিধা নিতে না পারে। তবে সবচেয়ে আগে দরকার ব্যাংক খাতে আস্থা ফিরিয়ে আনা—ডিপোজিটর ও ঋণগ্রহীতা উভয়ের মধ্যে। তারপর ধীরে ধীরে কাঠামোগত সংস্কারে যাওয়া উচিত। এসব কাজ শুরু করা যেতে পারে এখনই, কিন্তু সম্পূর্ণ ফলাফল পেতে সময় লাগবে পাঁচ থেকে ১০ বছর।

বলা হয়, বর্তমানে ব্যাংক খাতের দুটি বড় সমস্যা—খেলাপি ঋণ ও সুশাসনের ঘাটতি। আগামী সরকারের রোডম্যাপে কোন বিষয়গুলো অগ্রাধিকারে আসা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

প্রথমত, আমরা চাই না নতুন কোনো ব্যাংক নতুন সরকার এসে অনুমোদন দিক। বরং বিদ্যমান ব্যাংকগুলোকে একীভূত করার উদ্যোগ অব্যাহত রাখা উচিত। দ্বিতীয়ত, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সময় যে জায়গাগুলোয় সুশাসন ফিরে আসার সুযোগ তৈরি হয়েছে, যেমন বোর্ডের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে, সেগুলো পরিবর্তন করে আবার যাতে রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিচালক নিযুক্ত না করা হয়। এছাড়া ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অবশ্যই ঋণের শর্তগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে, সেটি আমরা দেখতে চাই। একই

সঙ্গে আর্থিক বা ব্যাংক খাতে নতুন সরকার যাদেরকে নিযুক্ত করবেন তারা যেন আসলেই এ খাত সম্পর্কে অভিজ্ঞ, দক্ষ হন। নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে আমলা বা রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেয়া না হয়—সেই প্রত্যাশা থাকবে। ব্যাংক খাতে সুশাসন ফেরানোর এটিই হবে প্রধান পূর্বশর্ত।

বণিক বার্তা

১১ অক্টোবর ২০২৫

মৌলিক সংস্কার ছাড়া টেকসই পরিবর্তন সম্ভব নয়

ড. ফাহিমদা খাতুন

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক। ব্র্যাকের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান আটলান্টিক কাউন্সিলের নন-রেসিডেন্ট সিনিয়র ফেলো। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির গ্রাজুয়েট ফাহিমদা যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল) থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টরাল সম্পন্ন করেন। পরিচালক পদে কাজ করেছেন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব জনতা ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনে। বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণে টাস্কফোর্স এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালীকরণে গঠিত বিশেষজ্ঞ টাস্কফোর্স সদস্য। সাম্প্রতিক অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে কালবেলার সঙ্গে কথা বলেন তিনি

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এই সময়ে কেমন চলছে অর্থনীতি?

ড. ফাহিমদা খাতুন: অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় অর্থনীতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। অর্থনীতির প্রায় সব সূচকই অবনমনের দিকে ছিল। সেটা উচ্চ মূল্যস্ফীতি কিংবা বৈদেশিক রিজার্ভ কিংবা বিনিময় হার—সব দিকেই এক ধরনের

অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। ব্যাংকিং খাতে বিশৃঙ্খলা, খেলাপি ঋণের স্ফীতি, বিদ্যুৎ-জ্বালানির উচ্চ ব্যয়, সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতাসহ সামগ্রিকভাবেই ছিল সুশাসনের অভাব। অর্থাৎ যেসব ধারা বা সূচক অর্থনীতির সামষ্টিক স্থিতিশীলতাকে নির্ধারণ করে, সেগুলো খুব দুর্বল অবস্থায় ছিল। ফলে সেখান থেকে কাজ করা যে কোনো সরকারের জন্যই ছিল কঠিন। স্বাভাবিকই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। এ ক্ষেত্রে বেশকিছু ভালো উদ্যোগ তারা খুব দ্রুত নিয়েছে। এর মধ্যে প্রথমই ব্যাংকিং খাতে

শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কথা বলব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উচ্চ ঋণখেলাপি এবং ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণ। খেলাপি ঋণ কমাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি খাতের কয়েকটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নতুন করে গঠন করা হয়েছে। কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা বুঝতে ব্যাংকের অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউ করা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিয়ে ব্যাংকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার মতো কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঋণখেলাপি রাতারাতি কমানো যাবে না। তবে এটা যেন আর না বাড়ে, সেসব উদ্যোগ আবশ্যিক। দুর্বল কয়েকটি ব্যাংককে একীভূত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে করে এগুলো ভালোভাবে সচল হতে পারে।

এর বাইরে যেমন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখেছি আমদানি সংকোচন করে ব্যাল্যান্স অব পেমেণ্টসটা ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে। এটার অন্যতম কারণ একদিকে রপ্তানি আয় শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে; অন্যদিকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ছে। আগে ছন্ডির মাধ্যমে অবৈধ চ্যানেলে যে পরিমাণ টাকা পাঠানো হতো, সেটা কমেছে। তার ফল ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থাৎ বৈধপথে প্রবাসীদের টাকা পাঠানোর প্রবণতা বেড়েছে। এই দুইয়ের সম্মিলনেই রিজার্ভে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এর বাইরে টাকা ও ডলারের বিনিময় হারে একটি স্থিতিশীলতা এসেছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাজারভিত্তিক বিনিময় হারের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, সেটাও ঠিকঠাক কাজ করেছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, এসব উদ্যোগের কারণে এ খাতে একটি ভালো অবস্থা বিরাজ করছে।

তিন বছর ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ডাবল ডিজিটে চলে গিয়েছিল, সেটাও হ্রাসের ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। যদিও তা ধীরে ধীরে কমছে, যেটি স্বাভাবিক। কেননা উচ্চ মূল্যস্ফীতি রাতারাতি কমানো সম্ভব নয়। এর আগের সরকারের সময় আমরা দেখেছি যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ছিল, অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি বাড়লে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, যেমন—সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু সুদের হারের ওপর ক্যাপ দিয়ে রাখা হয়েছিল। এসব কারণে উচ্চ মূল্যস্ফীতি কমানো যায়নি। কারণ মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের ওপর, আর সুদের হার ৯ শতাংশ। টাকা হয়েছিল সস্তা, এটা একটা বিষয়। আবার শুধু সংকোচনমূলক নীতি দিয়েই মূল্যস্ফীতি কমানো সম্ভব নয়। একদিকে সংকোচনমূলক নীতি গ্রহণ এবং অন্যদিকে সরকার যদি প্রচুর ব্যয় করতে থাকে, তাহলে কাজ করবে না। আর্থিক নীতি যদি সম্প্রসারণমূলক হয়, সরকারের প্রকল্প ব্যয়, প্রশাসন ব্যয়, পরিচালন ব্যয় যদি বাড়তে থাকে, তাহলে আবারও বাজারে অর্থের ছড়াছড়ি হবে। বিরূপ প্রভাব পড়বে।

কালবেলা: সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তার ফলও দৃশ্যমান। ২০২৬ সালে এলডিসি গ্র্যাডুয়েশন করবে বাংলাদেশ। চ্যালেঞ্জগুলো যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে কি?

ড. ফাহিমদা খাতুন: ভালো পদক্ষেপের বাইরে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে রয়েছে। সেগুলো অনেকদিন থেকেই আসছে। বাংলাদেশ ২০২৬ সালের নভেম্বরে স্বপ্নোন্নত থেকে

উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে। এটা তো আমরা আগেই জানতাম। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, বিগত সরকারের আমলে এ বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যদিও বিগত সরকারকে সর্বদাই বলতে শোনা যেত—স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বের হয়ে যাব, উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবো, এতে দেশের ভাবমূর্তি উন্নত হবে। মূলত এসব ছিল তাদের কথার ফুলঝুরি। তারা মূলত এটা রাজনৈতিক অর্জন বলেই মনে করতেন। কিন্তু এই রাজনৈতিক অর্জনের বিপরীতে যে ধরনের প্রস্তুতির দরকার ছিল, তা তারা নেয়নি। প্রস্তুতিটা কেন নিতে হবে? কারণ, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন মানেই স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে একটা দেশ যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে, সেগুলো আর পাওয়া যাবে না। এর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি সুবিধা রয়েছে। একটি হচ্ছে—বাংলাদেশের পণ্য শুল্কমুক্ত বা কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার পায় উন্নত দেশে, আবার কিছু উন্নয়নশীল দেশেও এটা পায়। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে শুধু অল্প ছাড়া আমাদের সব পণ্যেই প্রবেশাধিকার পায়। এটা প্রতিযোগিতার বাজারে আমাদের সক্ষমতায় বিরাট সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটলে এ সুযোগ আর থাকবে না। এ ছাড়া চীন, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিলের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশেও এ সুযোগ-সুবিধা আমাদের দিয়ে থাকে। ভারতও দিয়েছে এক সময়। এসব সুবিধা আর আমাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবেই থাকবে না। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ নিয়ে থাকি। বিভিন্ন অনুদান আসে। এলডিসিতে থাকায় বাংলাদেশ সুলভ সুদে ঋণ পেয়ে থাকে। অনুদানের পরিমাণ অনেক আগে থেকেই বেশ কমে গেছে। এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটলে সুলভ মূল্যের ঋণ পাওয়া কমে যাবে, ঋণ পরিশোধের সময়সীমাটাও লম্বা থাকবে না। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বাণিজ্যিক হারে সুদ দিয়ে অন্যান্য দেশের মতোই একই শর্ত মেনে ঋণ নিতে হবে। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে।

এ ছাড়া ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি TRIPS-এর অধীনে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালস যে সুযোগগুলো পায়, যেমন—আমাদের ওষুধের পেটেন্ট করাতে হয় না, যার ফলে ওষুধের দাম কম রাখতে সক্ষম হয়েছি ইত্যাদি বন্ধ বা কমে যাবে। এসব সুযোগ যখন আমরা হারাব, তখন বিরাট ধাক্কা আসবে। এর জন্য আমরা প্রস্তুত কি না? আমাদের দেশে যখন অন্যান্য দেশের পণ্য প্রবেশ করে, তখন বড় আমদানি কর দিতে হয়। আমদানি কর ধীরে ধীরে যৌক্তিক পর্যায়ে আনতে হবে, কমাতে হবে এবং ক্রমেই তা শূন্য করে ফেলতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তুতি আছে কি? আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন অর্থাৎ করের জন্য আমরা পরীক্ষা করের ওপর নির্ভর করি। আমাদের রাজস্বের ৬৫ শতাংশ আসে পরীক্ষা কর থেকে। সেখানে প্রত্যক্ষ কর ৪৫ শতাংশ। এর মধ্যে আমদানি কর ও বিভিন্ন ধরনের প্যারা ট্যারিফ রয়েছে। এগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা রয়েছে আমাদের। এসব উদ্যোগে এক ধরনের অনীহা রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয় কমে যাওয়ার শঙ্কা থেকে এদিকে দৃষ্টি দেয়নি। বিভিন্ন দিকে যে প্রস্তুতি থাকা দরকার, সেটা অনুপস্থিত। একদিকে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার উঠে যায়, আবার তাদের প্রণোদনা ও অর্থ সহায়তা উঠে যায়, তাহলে দুদিক থেকেই তারা চাপের মুখে পড়বেন। এর জন্য ধীরে ধীরে এটাকে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।

কালবেলা: বেশ কয়েকটি সংস্কার কমিশন হয়েছে। কিন্তু ব্যবসা সংস্কার কমিশন হয়নি। আপনার কি মনে হয় না এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল?

ড. ফাহিমদা খাতুন: যেহেতু ২০২৬ সাল বেশি দূরে নয়, সেহেতু প্রস্তুতি নেওয়া দরকার ছিল অনেক আগে থেকেই। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই এ বিষয়ে খুব বেশি প্রস্তুতি আমরা দেখিনি। ইদানীং সরকার বলছে যে, এলডিসি থেকে উত্তরণ আর পেছানো যাবে না। কিন্তু শুরুর দিকে সরকারও কিছুটা কনফিউজড ছিল। তারা এক সময় বলেছিল, এটা তারা পেছাবে। এজন্য তারা আবেদন করবে। তারপর আবার সেখান থেকে সরে এলো সরকার। এটা একটা ভুল বার্তা। এটার একটা কারণ হতে পারে, সরকার হয়তো রপ্তানিকারকদের সঙ্গে শুরু থেকেই আলাপ-আলোচনা করেনি। কিংবা সরকারের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে যে রকমের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার, সেটি নেওয়া হয়নি। কিছু কিছু হয়তো নেওয়া যাবে। যতটুকু সময় আছে, ততটুকু সর্বোচ্চ কাজে লাগানো দরকার। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, একবারেই ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা বন্ধ করে দিতে পারবে না সরকার। কোথায় কোথায় বন্ধ করা যাবে এবং কোথায় কোথায় বিকল্প অন্যকিছু দেওয়া যাবে, তা ভাবা যেতে পারে। কেননা প্রত্যক্ষভাবে প্রণোদনা কিংবা অর্থ সহায়তা আর দেওয়া যাবে না। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আমরা আগামী বছর গ্র্যাজুয়েশন করলেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে আরও তিন বছর একটা গ্রেস পিরিয়ড পাব। তিন বছর একটা মসৃণ ট্রানজিশন হওয়ার জন্য তারা আমাদের সময় দেবে। এ সময়ে স্বল্পোন্নত দেশের সুবিধাগুলো পেতে থাকব। এটা চীনও দিয়েছে ২০২৮ সাল পর্যন্ত। ইউকে দিয়েছে। কাজেই এই এক বছরের সঙ্গে তিন বছর ভালোভাবে কাজে লাগতে হবে।

কালবেলা: জুলাই অভ্যুত্থানে তরুণদের প্রধান দাবি ছিল কর্মসংস্থান—চাকরির অভাব, চাকরিতে বৈষম্য। এখনো কর্মসংস্থান বাড়ছে না, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ নেই। এক বছরে কি সেই পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে পেরেছি?

ড. ফাহিমদা খাতুন: সত্যি কথা বলতে, আমরা এখনো কোনো কাজের সন্ধান দেখছি না। কোনো কর্মসংস্থান গত এক বছরে হয়নি। বরং কমে যাচ্ছে। গত এক বছরে নতুন কোনো বিনিয়োগ হয়নি। অর্থনীতি কি প্রসারিত হয়েছে? উৎপাদন-উৎপাদনশীলতা কি বেড়েছে? না। বরং আমরা রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখলাম। এত বড় রকমের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর সাধারণত কিছুদিন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দুর্বল থাকে। এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি দুর্বল থেকে দুর্বলতরই হচ্ছে। আর এ পরিবেশে বিদেশি বিনিয়োগকারী বটেই, দেশি বিনিয়োগকারীদের জন্যও অনুকূল নয়। একটা ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন কলকারখানা হামলা-আক্রমণের শিকার হয়েছে। বাড়িঘর, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিমানুষও আক্রমণের শিকার হয়েছে। শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা, এমনকি জীবননাশের মতো ঘটনা ঘটেছে।

এরকম একটি ভীতিকর পরিস্থিতিতে কেউ বিনিয়োগ করবে না। এমনিতেও যখন স্বল্প সময়ের জন্য কোনো সরকার থাকে, তখন বিনিয়োগ প্রবণতা কম থাকে। তার ওপর এমন শঙ্কাময়

পরিস্থিতি কখনোই বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নয়। কারণ, বিনিয়োগকারীরা একটা স্থিতিশীল পরিবেশ চায়, একটা নিশ্চয়তার পরিবেশ চায়। ফলে পরিস্থিতি ভালো না হলে বিনিয়োগ হবে না। বর্তমান পরিস্থিতি সেই অস্থিতিশীলতারই প্রতিফলন। কিছু বিদেশি বিনিয়োগকারী বলেই দিয়েছেন যে, তারা আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন না। বিনিয়োগকারীরা এখানে এসেছেন। সামিট করেছেন। তারা মূলত দেখতে এসেছেন, বুঝতে এসেছেন। এটা ভবিষ্যতের জন্য। ফলে এরকম পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির আসলেই কোনো সুযোগ নেই।

কালবেলা: কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই উদ্যোগকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

ড. ফাহিমদা খাতুন: এটা বড় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ। এ সংস্থাগুলো অনেকদিন ধরেই আলাদাভাবে কাজ করছে। তাদের কিছু নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। কিছু কিছু কাজ হয়তো ওভারল্যাপিং আছে। কিন্তু তার বাইরে আরও কিছু কাজ আছে। যদি এগুলোকে একীভূত করতেই হয়, সেটা আরও বিচার-বিবেচনার দরকার ছিল। কিংবা নির্বাচিত সরকার এসে যদি করত, তাহলে হয়তো ভালো হতো। আপনি হয়তো বলবেন, রাজনৈতিক সরকার সাধারণত এসব কাজ করে না। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রেই আমরা শুনেছি, অনেকের মধ্যেই একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে যে, আসলেই কি এই কাজগুলো আগের মতো করা যাবে কি না। এটা কি দক্ষতা বৃদ্ধি করবে নাকি আরও কিছু সমস্যার সৃষ্টি করবে? এটা আসলে আরও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কালবেলা: ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ উন্নয়নের কথা বলে আসছেন। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তারা একাধিকার উদ্বোধন প্রকাশ করেছেন। আপনার অভিমত কী?

ড. ফাহিমদা খাতুন: যারা ব্যবসা করছেন, তারা প্রচণ্ড মানসিক শঙ্কা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। একদিকে উৎপাদন খরচ বেড়েছে, অনেকদিন থেকেই বাড়ছিল; কিন্তু এখন সেটা আরও বাড়ছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বাড়তি জ্বালানির দাম, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ত্রুটি, অবকাঠামোগত দুর্বলতার পাশাপাশি ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম কমেনি। সুতরাং ব্যবসার ব্যয় বাড়ছে। অন্যদিকে, রয়েছে এক ধরনের ফিজিক্যাল শ্রেট। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে কারখানা ভেঙে ফেলা হচ্ছে, জানমালের ক্ষতি হচ্ছে। এমন অবস্থায় কতটা স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবসা করা সম্ভব, সেটা সবারই বোধগম্য হওয়া দরকার। ব্যবসায়ীরা হয়তো আর কোনো উপায় না দেখে শঙ্কার কথা বলছেন। তারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করছেন। এটাই তাদের পেশা। তারা হঠাৎ করে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করবেন না। কারণ, এর সঙ্গে জড়িত বহু মানুষের জীবন-জীবিকা। ফলে ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে এ কথা তাদের অসহায়ত্বের প্রতিফলন। এটা ভালো কোনো বার্তা নয়।

কালবেলা: সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো এ সরকারের মেয়াদেই বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অস্বর্ভাব্যকালীন সরকারের এ উদ্যোগকে কীভাবে দেখছেন?

ড. ফাহিমদা খাতুন: বেতন বাড়ানো সবার জন্যই প্রয়োজন। সরকার হয়তো সরকারি চাকরি যারা করেন, তাদের প্রতি দায়িত্বের কথা ভেবেছেন। কিন্তু অন্য খাতগুলো একই সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। কিছু জায়গায় সর্বনিম্ন পারিশ্রমিক এমন পর্যায়ে নেমেছে যে, তা দিয়ে ন্যূনতম মান বজায় রেখে জীবনযাত্রা চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু সেসব খাতে মজুরি বাড়ছে না। সরকারকে সেদিকেও নজর দিতে হবে। সরকারি চাকরিজীবীদের সরকার বেতন বাড়াবে; কিন্তু যারা সরকারি চাকরি করেন না, তাদের কী হবে? এ ক্ষেত্রে সরকারের যে ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব, সেই ভূমিকা পালন করা উচিত। সবার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা উচিত, যেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোয় কর্মরতদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে দায়িত্বশীল হন।

কালবেলা: নির্বাচিত হলে কোন রাজনৈতিক দল কী করবে, তা আলোচনা হচ্ছে বহরজুড়েই। কিন্তু অর্থনীতির বিষয়টি রাজনীতিকদের আলোচনায় তেমনভাবে আসেনি। অর্থনীতি বা বাণিজ্যের গুরুত্ব রাজনীতিকদের কাছে কমে গেছে?

ড. ফাহিমদা খাতুন: গত এক বছর সংস্কার কমিশনগুলোয় রাজনৈতিক বিষয়গুলো বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থনীতির জন্য একটা টাস্কফোর্স হয়েছে। সেখানে কিছু সুপারিশ আছে। এগুলোর বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তবে গত এক বছরে মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল রাজনীতি। রাজনীতির বিষয়গুলো ছিল অত্যন্ত জটিল। সংবিধান, নির্বাচনের মতো বিষয়গুলোতে সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। এখনো এসব বিষয়, বিশেষ করে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে পরিষ্কার কোনো সমাধানে পৌঁছানো যায়নি। এসব বিষয়ে রাজনীতিকরা এতটা বেশি মনোযোগী ছিলেন যে, অর্থনীতির ব্যাপারটি তাদের কাছে উপেক্ষিত রয়ে গেছে। তারা এর মধ্যে মনোযোগ দিতে পারেননি। অর্থনীতি একটি নাজুক অবস্থার মধ্যে ছিল, যাকে কিছুটা টেনে তোলা গেছে। পরিপূর্ণভাবে বের করে আনতে সময় লাগবে। যদি এ জায়গাটাকে অ্যাড্রেস না করি, তাহলে আবার পতনের দিকে যাবে।

যে কারণে আন্দোলন হলো, তা ছিল মূলত কর্মসংস্থানের সংকট। একমাত্র সরকারি চাকরি পাওয়া যেত, সেটা পর্যাপ্ত নয়। আবার সেখানে ছিল কোটার প্রতিবন্ধকতা। কথা হচ্ছে, গত এক বছরেই বা কী হলো? নতুন করে কর্মসংস্থান তৈরি করা গেল না কেন? তরুণদের আন্দোলন যে কর্মসংস্থান সংকটের কারণে হলো, সরকারের মূল কর্তব্যের মধ্যে বিষয়টি প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল। তা দেখা গেল না। তবে আসন্ন নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর মেনিফেস্টোতে অর্থনীতির বিষয়টি গুরুত্বের জায়গায় আনতে হবে। নির্বাচিত হয়ে দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে স্বস্তি আসবে, তার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকা জরুরি।

রাজনীতিকদের হয়তো সব পরিকল্পনা আছে যে, তারা কীভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবেন, কীভাবে প্রবৃদ্ধি বাড়াবেন। তবে কিছু বড় বড় ইস্যু রয়েছে, সেগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে। বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় সুশাসন ফেরাতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানে কীভাবে সুশাসন ফেরানো যাবে এবং এগুলোকে কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা যাবে, তা ভাবতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের সংস্কার বা প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের মধ্য দিয়েই ফলটা দৃশ্যমান হবে। এসব সংস্কার ছাড়া একটা ইতিবাচক ও টেকসই ফল পাওয়া যাবে না।

কালবেলা

১৯ অক্টোবর ২০২৫



দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার জরুরি

ড. ফাহমিদা খাতুন

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা সম্প্রতি দেশের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে কথা বলেন। তিনি ব্র্যাকের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান আটলান্টিক কাউন্সিলের নন-রেসিডেন্ট সিনিয়র ফেলো।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে গ্র্যাজুয়েশন করা ফাহমিদা যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল) থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি সম্পন্ন করেন। পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করেন। তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব জনতা ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া, বৈষম্যহীন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণে গঠিত বিশেষজ্ঞ টাস্কফোর্সের সদস্য ছিলেন। একই সঙ্গে পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালী করার উদ্যোগেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

ড. ফাহমিদা বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের অর্থনীতির গতি কিছুটা ধীর হয়েছে। তিনি জানান, “অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযথ কৌশল এবং কার্যকর নীতি প্রয়োজন। সমন্বিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়া আমরা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারব না।” তিনি আরও যোগ করেন, “সরকার ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে।

ড. ফাহমিদার মতে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বৈষম্য কমানো ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সতর্ক করে বলেন, “শুধু বৃদ্ধি নয়, সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়ন ধারাবাহিক হবে না।”

প্রশ্ন: অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এই সময়ে কেমন চলছে অর্থনীতি?

ড. ফাহিমদা খাতুন: অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় অর্থনীতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। অর্থনীতির প্রায় সব সূচকই অবনমনের দিকে ছিল। সেটা উচ্চ মূল্যস্ফীতি কিংবা বৈদেশিক রিজার্ভ কিংবা বিনিময় হার—সব দিকেই এক ধরনের অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। ব্যাংকিং খাতে বিশৃঙ্খলা, খেলাপি ঋণের স্ফীতি, বিদ্যুৎ-জ্বালানির উচ্চ ব্যয়, সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতাসহ সামগ্রিকভাবেই ছিল সুশাসনের অভাব অর্থাৎ যেসব ধারা বা সূচক অর্থনীতির সামষ্টিক স্থিতিশীলতাকে নির্ধারণ করে, সেগুলো খুব দুর্বল অবস্থায় ছিল। ফলে সেখান থেকে কাজ করা যে কোনো সরকারের জন্যই ছিল কঠিন। স্বভাবতই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল।

এ ক্ষেত্রে বেশকিছু ভালো উদ্যোগ তারা খুব দ্রুত নিয়েছে। এর মধ্যে প্রথমেরই ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কথা বলব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উচ্চ ঋণখেলাপি এবং ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণ। খেলাপি ঋণ কমাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি খাতের কয়েকটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নতুন করে গঠন করা হয়েছে। কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা বুঝতে ব্যাংকের অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউ করা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিয়ে ব্যাংকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার মতো কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঋণখেলাপি রাতারাতি কমানো যাবে না। তবে এটা যেন আর না বাড়ে, সেসব উদ্যোগ আবশ্যিক। দুর্বল কয়েকটি ব্যাংককে একীভূত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে করে এগুলো ভালোভাবে সচল হতে পারে।

এর বাইরে যেমন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখেছি আমদানি সংকোচন করে ব্যাল্যান্স অব পেমেণ্টটা ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে। এটার অন্যতম কারণ একদিকে রপ্তানি আয় শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে; অন্যদিকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ছে। আগে হুন্ডির মাধ্যমে অবৈধ চ্যানেলে যে পরিমাণ টাকা পাঠানো হতো, সেটা কমেছে। তার ফল ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থাৎ বৈধপথে প্রবাসীদের টাকা পাঠানোর প্রবণতা বেড়েছে। এই দুইয়ের সম্মিলনেই রিজার্ভে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এর বাইরে টাকা ও ডলারের বিনিময় হারে একটি স্থিতিশীলতা এসেছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাজারভিত্তিক বিনিময় হারের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, সেটাও ঠিকঠাক কাজ করেছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, এসব উদ্যোগের কারণে এ খাতে একটি ভালো অবস্থা বিরাজ করছে।

তিন বছর ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ডাবল ডিজিটে চলে গিয়েছিল, সেটাও হ্রাসের ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। যদিও তা ধীরে ধীরে কমছে, যেটি স্বাভাবিক। কেননা উচ্চ মূল্যস্ফীতি রাতারাতি কমানো সম্ভব নয়। এর আগের সরকারের সময় আমরা দেখেছি যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ছিল, অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি বাড়লে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, যেমন সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু সুদের হারের

ওপর ক্যাপ দিয়ে রাখা হয়েছিল। এসব কারণে উচ্চ মূল্যস্ফীতি কমানো যায়নি। কারণ মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের ওপর, আর সুদের হার ৯ শতাংশ। টাকা হয়েছিল সস্তা, এটা একটা বিষয়। আবার শুধু সংকোচনমূলক নীতি দিয়েই মূল্যস্ফীতি কমানো সম্ভব নয়। একদিকে সংকোচনমূলক নীতি গ্রহণ এবং অন্যদিকে সরকার যদি প্রচুর ব্যয় করতে থাকে, তাহলে কাজ করবে না। আর্থিক নীতি যদি সম্প্রসারণমূলক হয়, সরকারের প্রকল্প ব্যয়, প্রশাসন ব্যয়, পরিচালন ব্যয় যদি বাড়তে থাকে, তাহলে আবারও বাজারে অর্থের ছড়াছড়ি হবে। বিরূপ প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন: সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তার ফলও দৃশ্যমান। ২০২৬ সালে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন করবে বাংলাদেশ। চ্যালেঞ্জগুলো যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে কি?

ড. ফাহিমদা খাতুন: ভালো পদক্ষেপের বাইরে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে রয়েছে। সেগুলো অনেকদিন থেকেই আসছে। বাংলাদেশ ২০২৬ সালের নভেম্বরে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে। এটা তো আমরা আগেই জানতাম কিন্তু আমরা দেখেছি যে, বিগত সরকারের আমলে এ বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যদিও বিগত সরকারকে সর্বদাই বলতে শোনা যেত—স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বের হয়ে যাব, উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবো, এতে দেশের ভাবমূর্তি উন্নত হবে। মূলত এসব ছিল তাদের কথার ফুলঝুরি। তারা মূলত এটা রাজনৈতিক অর্জন বলেই মনে করতেন কিন্তু এই রাজনৈতিক অর্জনের বিপরীতে যে ধরনের প্রস্তুতির দরকার ছিল, তা তারা নেয়নি।

প্রস্তুতিটা কেন নিতে হবে? কারণ, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন মানেই স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে একটা দেশ যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে, সেগুলো আর পাওয়া যাবে না। এর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি সুবিধা রয়েছে। একটি হচ্ছে—বাংলাদেশের পণ্য শুদ্ধমুক্ত বা কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার পায় উন্নত দেশে, আবার কিছু উন্নয়নশীল দেশেও এটা পায়। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে শুধু অস্ত্র ছাড়া আমাদের সব পণ্যই প্রবেশাধিকার পায়। এটা প্রতিযোগিতার বাজারে আমাদের সক্ষমতায় বিরাট সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটলে এ সুযোগ আর থাকবে না।

এ ছাড়া চীন, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিলের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশও এ সুযোগ-সুবিধা আমাদের দিয়ে থাকে। ভারতও দিয়েছে এক সময়। এসব সুবিধা আর আমাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবেই থাকবে না। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ নিয়ে থাকি। বিভিন্ন অনুদান আসে। এলডিসিতে থাকায় বাংলাদেশ সুলভ সুদে ঋণ পেয়ে থাকে। অনুদানের পরিমাণ অনেক আগে থেকেই বেশ কমে গেছে। এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটলে সুলভ মূল্যের ঋণ পাওয়া কমে যাবে, ঋণ পরিশোধের সময়সীমাটাও লম্বা থাকবে না। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বাণিজ্যিক হারে সুদ দিয়ে অন্যান্য দেশের মতোই একই শর্ত মেনে ঋণ নিতে হবে। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে।

এ ছাড়া ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)-এর অধীনে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালস যে সুযোগগুলো পায়, যেমন— আমাদের ওষুধের পেটেন্ট করাতে হয় না, যার ফলে ওষুধের দাম কম রাখতে সক্ষম হয়েছি ইত্যাদি বন্ধ বা কমে যাবে। এসব সুযোগ যখন আমরা হারাব, তখন বিরাট ধাক্কা আসবে। এর জন্য আমরা প্রস্তুত কি না? আমাদের দেশে যখন অন্যান্য দেশের পণ্য প্রবেশ করে, তখন বড় আমদানি কর দিতে হয়। আমদানি কর ধীরে ধীরে যৌক্তিক পর্যায়ে আনতে হবে, কমাতে হবে এবং ক্রমেই তা শূন্য করে ফেলতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তুতি আছে কি? আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন অর্থাৎ করের জন্য আমরা পরোক্ষ করের ওপর নির্ভর করি। আমাদের রাজস্বের ৬৫ শতাংশ আসে পরোক্ষ কর থেকে।

সেখানে প্রত্যক্ষ কর ৪৫ শতাংশ। এর মধ্যে আমদানি কর ও বিভিন্ন ধরনের প্যারা ট্যারিফ রয়েছে। এগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা রয়েছে আমাদের। এসব উদ্যোগে এক ধরনের অনীহা রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয় কমে যাওয়ার শঙ্কা থেকে এদিকে দৃষ্টি দেয়নি। বিভিন্ন দিকে যে প্রস্তুতি থাকা দরকার, সেটা অনুপস্থিত। একদিকে শুষ্কমুক্ত প্রবেশাধিকার উঠে যায়, আবার তাদের প্রণোদনা ও অর্থ সহায়তা উঠে যায়, তাহলে দুদিক থেকেই তারা চাপের মুখে পড়বেন। এর জন্য ধীরে ধীরে এটাকে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন: বেশ কয়েকটি সংস্কার কমিশন হয়েছে। কিন্তু ব্যবসা সংস্কার কমিশন হয়নি। আপনার কি মনে হয় না এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল?

ড. ফাহিমদা খাতুন: যেহেতু ২০২৬ সাল বেশি দূরে নয়, সেহেতু প্রস্তুতি নেওয়া দরকার ছিল অনেক আগে থেকেই। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই এ বিষয়ে খুব বেশি প্রস্তুতি আমরা দেখিনি। ইদানীং সরকার বলছে যে, এলডিসি থেকে উত্তরণ আর পেছানো যাবে না কিন্তু গুরুত্ব দিকে সরকারও কিছুটা কনফিউজড ছিল। তারা এক সময় বলেছিল, এটা তারা পেছাবে। এজন্য তারা আবেদন করবে। তারপর আবার সেখান থেকে সরে এলো সরকার। এটা একটা ভুল বার্তা। এটার একটা কারণ হতে পারে, সরকার হয়তো রপ্তানিকারকদের সঙ্গে শুরু থেকেই আলাপ-আলোচনা করেনি। কিংবা সরকারের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে যে রকমের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার, সেটি নেওয়া হয়নি।

কিছু কিছু হয়তো নেওয়া যাবে। যতটুকু সময় আছে, ততটুকু সর্বোচ্চ কাজে লাগানো দরকার। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, একবারেই ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা বন্ধ করে দিতে পারবে না সরকার। কোথায় কোথায় বন্ধ করা যাবে এবং কোথায় কোথায় বিকল্প অন্যকিছু দেওয়া যাবে, তা ভাবা যেতে পারে। কেননা প্রত্যক্ষভাবে প্রণোদনা কিংবা অর্থ সহায়তা আর দেওয়া যাবে না। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আমরা আগামী বছর গ্র্যাজুয়েশন করলেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে আরও তিন বছর একটা থ্রেস পিরিয়ড পাব। তিন বছর একটা মসৃণ ট্রানজিশন হওয়ার জন্য তারা আমাদের সময় দেবে। এ সময়ে স্বল্পোন্নত দেশের সুবিধাগুলো পেতে

থাকব। এটা চীনও দিয়েছে ২০২৮ সাল পর্যন্ত। ইউকে দিয়েছে। কাজেই এই এক বছরের সঙ্গে তিন বছর ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে।

প্রশ্ন: জুলাই অভ্যুত্থানে তরুণদের প্রধান দাবি ছিল কর্মসংস্থান—চাকরির অভাব, চাকরিতে বৈষম্য। এখনো কর্মসংস্থান বাড়ছে না, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ নেই। এক বছরে কি সেই পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটতে পেরেছি?

ড. ফাহিমদা খাতুন: সত্যি কথা বলতে, আমরা এখনো কোনো কাজের সন্ধান দেখছি না। কোনো কর্মসংস্থান গত এক বছরে হয়নি। বরং কমে যাচ্ছে। গত এক বছরে নতুন কোনো বিনিয়োগ হয়নি। অর্থনীতি কি প্রসারিত হয়েছে? উৎপাদন-উৎপাদনশীলতা কি বেড়েছে? না। বরং আমরা রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখলাম। এত বড় রকমের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর সাধারণত কিছুদিন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দুর্বল থাকে। এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি দুর্বল থেকে দুর্বলতরই হচ্ছে। আর এ পরিবেশে বিদেশি বিনিয়োগকারী বটেই, দেশি বিনিয়োগকারীদের জন্যও অনুকূল নয়। একটা ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন কলকারখানা হামলা-আক্রমণের শিকার হয়েছে। বাড়িঘর, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিমানুষও আক্রমণের শিকার হয়েছে। শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা, এমনকি জীবননাশের মতো ঘটনা ঘটেছে।

এরকম একটি ভীতিকর পরিস্থিতিতে কেউ বিনিয়োগ করবে না। এমনিতেও যখন স্বল্প সময়ের জন্য কোনো সরকার থাকে, তখন বিনিয়োগ প্রবণতা কম থাকে। তার ওপর এমন শঙ্কাময় পরিস্থিতি কখনোই বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নয়। কারণ, বিনিয়োগকারীরা একটা স্থিতিশীল পরিবেশ চায়, একটা নিশ্চয়তার পরিবেশ চায়। ফলে পরিস্থিতি ভালো না হলে বিনিয়োগ হবে না। বর্তমান পরিস্থিতি সেই অস্থিতিশীলতারই প্রতিফলন। লক্ষ করবেন, কিছু বিদেশি বিনিয়োগকারী বলেই দিয়েছেন যে, তারা আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন না। বিনিয়োগকারীরা এখানে এসেছেন। সামিট করেছেন। তারা মূলত দেখতে এসেছেন, বুঝতে এসেছেন। এটা ভবিষ্যতের জন্য। ফলে এরকম পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির আসলেই কোনো সুযোগ নেই।

প্রশ্ন : কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই উদ্যোগকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

ড. ফাহিমদা খাতুন: এটা বড় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ। এ সংস্থাগুলো অনেকদিন ধরেই আলাদাভাবে কাজ করছে। তাদের কিছু নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। কিছু কিছু কাজ হয়তো ওভারল্যাপিং আছে কিন্তু তার বাইরে আরও কিছু কাজ আছে। যদি এগুলোকে একীভূত করতেই হয়, সেটা আরও বিচার-বিবেচনার দরকার ছিল। কিংবা নির্বাচিত সরকার এসে যদি করত, তাহলে হয়তো ভালো হতো। আপনি হয়তো বলবেন, রাজনৈতিক সরকার সাধারণত এসব কাজ করে না। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রেই আমরা শুনেছি, অনেকের মধ্যেই একটা স্ফোভের

সৃষ্টি হয়েছে যে, আসলেই কি এই কাজগুলো আগের মতো করা যাবে কি না। এটা কি দক্ষতা বৃদ্ধি করবে নাকি আরও কিছু সমস্যার সৃষ্টি করবে? এটা আসলে আরও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন: ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ উন্নয়নের কথা বলে আসছেন। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তারা একাধিকার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আপনার অভিমত কী?

ড. ফাহিমদা খাতুন: যারা ব্যবসা করছেন, তারা প্রচণ্ড মানসিক শঙ্কা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। একদিকে উৎপাদন খরচ বেড়েছে, অনেকদিন থেকেই বাড়ছিল; কিন্তু এখন সেটা আরও বাড়ছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বাড়তি জ্বালানির দাম, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ত্রুটি, অবকাঠামোগত দুর্বলতার পাশাপাশি ঘৃষ, দুর্নীতি, অনিয়ম কমেনি। সুতরাং ব্যবসার ব্যয় বাড়ছে। অন্যদিকে, রয়েছে এক ধরনের ফিজিক্যাল থ্রেট। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে কারখানা ভেঙে ফেলা হচ্ছে, জানমালের ক্ষতি হচ্ছে। এমন অবস্থায় কতটা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসা করা সম্ভব, সেটা সবারই বোধগম্য হওয়া দরকার। ব্যবসায়ীরা হয়তো আর কোনো উপায় না দেখে শঙ্কার কথা বলছেন। তারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করছেন। এটা ই তাদের পেশা। তারা হঠাৎ করে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করবেন না। কারণ, এর সঙ্গে জড়িত বহু মানুষের জীবন-জীবিকা। ফলে ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে এ কথা তাদের অসহায়ত্বের প্রতিফলন। এটা ভালো কোনো বার্তা নয়।

প্রশ্ন: সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো এ সরকারের মেয়াদেই বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ উদ্যোগকে কীভাবে দেখছেন?

ড. ফাহিমদা খাতুন: বেতন বাড়ানো সবার জন্যই প্রয়োজন। সরকার হয়তো সরকারি চাকরি যারা করেন, তাদের প্রতি দায়িত্বের কথা ভেবেছেন। কিন্তু অন্য খাতগুলো একই সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। কিছু জায়গায় সর্বনিম্ন পারিশ্রমিক এমন পর্যায়ে নেমেছে যে, তা দিয়ে ন্যূনতম মান বজায় রেখে জীবনযাত্রা চালানো সম্ভব নয় কিন্তু সেসব খাতে মজুরি বাড়ছে না। সরকারকে সেদিকেও নজর দিতে হবে। সরকারি চাকরিজীবীদের সরকার বেতন বাড়াবে; কিন্তু যারা সরকারি চাকরি করেন না, তাদের কী হবে? এ ক্ষেত্রে সরকারের যে ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব, সেই ভূমিকা পালন করা উচিত। সবার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা উচিত, যেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোয় কর্মরতদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বাড়তে দায়িত্বশীল হন।

প্রশ্ন: নির্বাচিত হলে কোন রাজনৈতিক দল কী করবে, তা আলোচনা হচ্ছে বহরজুড়েই। কিন্তু অর্থনীতির বিষয়টি রাজনীতিকদের আলোচনায় তেমনভাবে আসেনি। অর্থনীতি বা বাণিজ্যের গুরুত্ব রাজনীতিকদের কাছে কমে গেছে?

ড. ফাহিমদা খাতুন: গত এক বছর সংস্কার কমিশনগুলোয় রাজনৈতিক বিষয়গুলো বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থনীতির জন্য একটা টাঙ্কফোর্স হয়েছে। সেখানে কিছু সুপারিশ আছে। এগুলোর বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তবে গত এক বছরে মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল রাজনীতি। রাজনীতির বিষয়গুলো ছিল অত্যন্ত জটিল। সংবিধান, নির্বাচনের মতো বিষয়গুলোতে সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। এখনো এসব বিষয়, বিশেষ করে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে পরিষ্কার কোনো সমাধানে পৌঁছানো যায়নি। এসব বিষয়ে রাজনীতিকরা এতটা বেশি মনোযোগী ছিলেন যে, অর্থনীতির ব্যাপারটি তাদের কাছে উপেক্ষিত হয়ে গেছে। তারা এর মধ্যে মনোযোগ দিতে পারেননি। অর্থনীতি একটি নাজুক অবস্থার মধ্যে ছিল, যাকে কিছুটা টেনে তোলা গেছে। পরিপূর্ণভাবে বের করে আনতে সময় লাগবে। যদি এ জায়গাটাকে অ্যাড্রেস না করি, তাহলে আবার পতনের দিকে যাবে।

যে কারণে আন্দোলন হলো, তা ছিল মূলত কর্মসংস্থানের সংকট। একমাত্র সরকারি চাকরি পাওয়া যেত, সেটা পর্যাপ্ত নয়। আবার সেখানে ছিল কোটার প্রতিবন্ধকতা। কথা হচ্ছে, গত এক বছরেই বা কী হলো? নতুন করে কর্মসংস্থান তৈরি করা গেল না কেন? তরুণদের আন্দোলন যে কর্মসংস্থান সংকটের কারণে হলো, সরকারের মূল কর্তব্যের মধ্যে বিষয়টি প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল। তা দেখা গেল না। তবে আসন্ন নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর মেনিফেস্টোতে অর্থনীতির বিষয়টি গুরুত্বের জায়গায় আনতে হবে। নির্বাচিত হয়ে দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে স্বস্তি আসবে, তার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকা জরুরি।

রাজনীতিকদের হয়তো সব পরিকল্পনা আছে যে, তারা কীভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবেন, কীভাবে প্রবৃদ্ধি বাড়াবেন। তবে কিছু বড় বড় ইস্যু রয়েছে, সেগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে। বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় সুশাসন ফেরাতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানে কীভাবে সুশাসন ফেরানো যাবে এবং এগুলোকে কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা যাবে, তা ভাবতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের সংস্কার বা প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের মধ্য দিয়েই ফলটা দৃশ্যমান হবে। এসব সংস্কার ছাড়া একটা ইতিবাচক ও টেকসই ফল পাওয়া যাবে না।

সিটিজেনস ভয়েজ

২০ অক্টোবর ২০২৫

শ্রম সংস্কার সরকারি উদ্যোগে স্বাধীন পর্যালোচনা

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বৃহত্তর সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকার অনেকগুলো সংস্কার কমিশন করেছিল। এগুলো ছিল ইতিবাচক পদক্ষেপ। তার মধ্যে শ্রম সংস্কার কমিশনকে অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকার যেসব বিষয়ে শুরু থেকে গুরুত্ব দিয়ে আসছিল, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শ্রমিকদের অধিকার, কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও যুগোপযোগী শ্রম আইন প্রণয়ন। সরকারের নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এসব বিষয় দৃশ্যমান হয়েছে। এ ছাড়া যেসব দেশের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তাদের তরফ থেকেও শ্রম সংস্কার ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যবিষয়ক যে দরকষাকষি হয়েছে, সেখানে ট্যারিফের বাইরে অন্যান্য যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে শ্রম সংস্কারের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সেই বিবেচনায় শ্রম সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠন এবং সেই কমিশনের প্রতিবেদন একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে। এরই মধ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন তাদের প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। প্রতিবেদনে শ্রমসংক্রান্ত প্রায় সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কী ধরনের সংস্কার দরকার, সে বিষয়ে সিপিডি'র পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে পর্যালোচনা ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়। সিপিডি ৮টি বিষয়ের ওপর সুপারিশ দিয়েছিল। এগুলোর প্রতিটির ক্ষেত্রে কী ধরনের আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও কার্যক্রমগত সংস্কার দরকার হবে সে বিষয়ে সিপিডি সুপারিশ দিয়েছে। শ্রম সংস্কার কমিশন সেখান থেকে বেশ কিছু সুপারিশ গ্রহণ করেছে।

অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য প্রথমে ৬টি কমিশন গঠন করে। পরবর্তী সময়ে আরও ৮টি কমিশন গঠন করা হয়। এর বাইরে কিছু কমিটি গঠন করা হয়েছে। যার সবগুলোর ভবিষ্যৎ মোটামুটি একই রকম। বর্তমানে সরকারের মূল যে গুরুত্বের বিষয়গুলো

রয়েছে, এসব কমিশন তার বাইরে অবস্থান করছে। সরকার যে ঐকমত্য কমিশন গঠন করেছে সেখানে সরকারের প্রথম দিকে উত্থাপিত সংবিধান সংস্কার, সংসদীয় সংস্কার, নির্বাচন সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কার্যপরিধি সাজানো হয়েছে। এসব সংস্কারের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য যেসব কমিশন গঠন করা হয়েছিল, সেগুলোর অগ্রগতি এক ধরনের পর্যালোচনামূলক কার্যক্রমের মধ্যে আটকে গেছে। অর্থাৎ কমিশনের প্রতিবেদনের আলোকে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা সে বিষয়ে পর্যালোচনামূলক কার্যক্রমের মধ্যে আটকে আছে। অর্থাৎ কমিশনের সুপারিশের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের বিষয়ে উদ্যোগ থমকে যায়। অতীতেও তা লক্ষ্য করা গেছে। নাগরিক সমাজ বা কোনো কমিশনের সুপারিশমালা প্রায়োগিকভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে, মন্ত্রণালয়গুলোর পক্ষ থেকে যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার সে বিষয়ে ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, কমিশন তাদের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলো কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং এসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কী ধরনের করণীয়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়।

সুপারিশের আলোকে যেসব সংস্কার হওয়া দরকার তার দু-একটি বিষয়ে কিছু অগ্রগতি হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্রগতি দৃশ্যমান নয়। শ্রম সংস্কারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশকে শ্রমক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কিছু শর্ত শিথিল করতে বলা হয়েছিল। এক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনে কিছু পরিবর্তন আনা দরকার। এর পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান আইনে কোনো কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করতে হলে, ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি থাকার যে বিধান রয়েছে, সেখানে পরিবর্তন আনার সুপারিশ করা হয়। এক্ষেত্রে শ্রমিকের শতাংশের হিসাবের পরিবর্তে, কারখানার আকার নির্বিশেষে কমপক্ষে ২০ জন শ্রমিক সম্মতি দিলেই সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। শ্রম সংস্কার কমিশন এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সুপারিশ দিয়েছে। প্রতিবেদনটি আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে (আইএলসি) উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে বিষয়টি আলোচনার টেবিলে আসার পর, মালিকপক্ষের তরফ থেকে কিছু ভিন্নতম তুলে ধরা হয়। তাদের বক্তব্য ছিল, এত অল্পসংখ্যক শ্রমিকের সম্মতিতেই যদি ট্রেড ইউনিয়নের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে যে কোনো ধরনের কারখানাতে ট্রেড ইউনিয়ন করতে হবে। সেক্ষেত্রে কোনো কারখানার সক্ষমতা বিবেচনায় নেওয়া হবে না। এতে ছোট কারখানাগুলো সমস্যায় পড়তে পারে। এ বিষয়ে কিছুটা পরিমার্জন করে সুপারিশ চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। আইএলওর তিনটি কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের বিষয়ে সরকার, নীতিগতভাবে একমত হয়েছে বলে গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। স্বভাবতই শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে, এর একটি সামঞ্জস্য আছে। সিপিডির পক্ষ থেকে যে সুপারিশ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তার বিষয়ে একজন স্থায়ী কর্মকর্তাকে কারখানায় নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এর বাইরে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করার সুপারিশ করা হয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে অস্পষ্টতা

আছে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি কারখানার বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিতের বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। আর এসব কমপ্লায়েন্স সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে ভিজুয়াল প্রামাণিক তৈরি করতে হবে শুধু টিক চিহ্ন দিলে হবে না। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য তদারকির বিষয়টি ইপিজেডের কারখানাগুলোতে অনুমোদন করতে হবে। দেশে ইপিজেডের জন্য একটি পৃথক আইন রয়েছে। আইনটি প্রণীত হয় ১৯৮০ সালে। সে সময়ের বাস্তবতায় এ ধরনের একটি আইন দরকার ছিল। আশির দশকে যেসব বিদেশি বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন, তারা শ্রমসংক্রান্ত শর্তাবলিকে কিছুটা নমনীয় করার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে বর্তমানে একক শ্রম আইনের অধীনে দেশের সব কারখানা পরিচালিত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে ইপিজেডের কারখানা মালিকদের কিছুটা অনাগ্রহ থাকতে পারে। তা ছাড়া ইপিজেডের যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে, তাদের দিক থেকে স্বাধীনভাবে চলার একটা প্রবণতা আছে। এসব কারণে ইপিজেড এখনো পৃথকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে প্রচলিত শ্রম আইনের বাইরে গিয়ে। এসব কারণে ইপিজেড আইন ও প্রচলিত শ্রম আইনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি এগোয়নি। কিন্তু আশি দশকের বাস্তবতা দেশে বিদ্যমান নেই। কাজেই দেশে এখন কোনো নির্দিষ্ট খাতের জন্য পৃথক শ্রম আইন অপ্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে দেশে ভিন্ন আইন হওয়া উচিত। কেননা তৈরি পোশাকসহ প্রধান প্রধান শিল্প খাতে ইপিজেড ও ইপিজেডের বাইরের কমপ্লায়েন্স বর্তমানে কাছাকাছি পর্যায়ে চলে এসেছে। আইএলও কনভেনশন অনুশাস্করের বিষয়ে সিপিডি সুপারিশ দিয়েছে। এ ছাড়া শ্রম আইনে ডিজিটাল রিপোর্টিংয়ের যে প্রবিধান রয়েছে, সেটি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি শ্রম আইনে কর্মক্ষেত্রে জখমের যে তফসিল দেওয়া আছে, তাতে সব ধরনের জখম অন্তর্ভুক্ত হয় না। ফলে শ্রমিকরা নির্দিষ্ট জখমের বিপরীতে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন না। তাই সিপিডির পক্ষ থেকে এই তফসিল পর্যালোচনার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া আইএলওর কনভেনশন অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে সৃষ্ট রোগের তালিকা হালনাগাদ করতে বলা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে আইনি সংস্কারের প্রস্তাব। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- বেসরকারি খাতের উদ্যোগে কারখানার পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা। কারণ শিল্প খাতে সরকারি উদ্যোগে পরিদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রেডিটেশন দিয়ে এই পরিদর্শন সম্পন্ন করা সম্ভব। এমন একটি উদ্যোগ শুরুও হয়েছিল। পরে সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টি পুনরায় চালু হওয়া দরকার। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে র‍্যাটিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

এ ছাড়া লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনকে (লিমা) মূলধারার কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। শ্রমসংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য-উপাত্ত এই প্ল্যাটফর্মে আনতে হবে। কর্মক্ষেত্রে জখম, কারখানার ডিআরএস কার্যক্রম, কারখানার নিবন্ধন ইত্যাদি বিষয়ে সার্বিক তথ্য এই প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। লিমার মাধ্যমে নিবন্ধন প্রাপ্তি, নিবন্ধন বাতিল অথবা নিবন্ধন অনুমোদন সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এই প্ল্যাটফর্মে

একটি কারখানার সামগ্রিক তথ্য-উপাত্ত থাকবে এবং সেই তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে যেকোনো কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কারখানার তথ্য সংগ্রহ করে তাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে। এ ছাড়া কারখানাগুলোও তাদের উপাত্ত নিয়মিত হালনাগাদ করতে পারবে। পাশাপাশি কারখানাগুলোতে মেডিকেল সেবা নিশ্চিত করতে হবে। যে সেবা সবসময় কারখানায় প্রস্তুত থাকে না। পাশাপাশি পরিদর্শন কার্যক্রমের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডাইফি) বাজেট বাড়াতে হবে। এখন যে বাজেট রয়েছে, তা খুব অপরিপূর্ণ। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তারা সঠিকভাবে মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন ও তদারকি করতে পারে না। এ ছাড়া পরিদর্শনের জন্য পর্যাপ্ত গাড়ি নেই সংস্থাটির। ফলে যেসব কারখানা পরিদর্শন করা হবে, ওইসব কারখানা থেকে গাড়ি পাঠানো হয়। এতে স্বভাবতই পরিদর্শন কার্যক্রম পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হতে পারে। কাজেই কার্যকর পরিদর্শন নিশ্চিত করতে ডাইফিকে ডিজিটাল উপকরণ ও অবকাঠামোগত দিক থেকে আরও বেশি সুসজ্জিত করতে হবে। এ ছাড়া পরিচালনগত বিষয়ে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে একাডেমিক কারিকুলামে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা। আর কারখানার বিপজ্জনক উপকরণ প্রস্তুত, পরিবহন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে যা নেই। পাশাপাশি আবাসিক এলাকা থেকে রাসায়নিক ও প্লাস্টিক কারখানাগুলোকে স্থানান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। সিপিডির পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা পরিসংখ্যানের জন্য একটি জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে কারখানায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো ডেটাবেজ পাওয়া যায় না। সবাই নিজেদের মতো করে ডেটাবেজ তৈরি করছে। এক্ষেত্রে পরীক্ষা পরিসংখ্যান তৈরি হচ্ছে। যেমন কোনো কারখানায় একটি দুর্ঘটনা ঘটল। তার ভিত্তিতে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হলো। সেই খবরের ভিত্তিতে পরিসংখ্যান তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু কারখানায় জখমের ঘটনা ঘটলেই যাতে নির্দিষ্ট কোনো সংস্থা বিষয়টিকে গণনায় রাখতে পারে, সে ধরনের কোনো ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

জখমের সব ঘটনা গণমাধ্যমে নাও আসতে পারে। কিন্তু তার পরিসংখ্যান অবশ্যই থাকতে হবে। এ ছাড়া ডাইফি, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিএসটিআই, ফায়ার সার্ভিস, রাজউক প্রভৃতি সংস্থা বছরব্যাপী যে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে, তার আওতায় কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। বর্তমানে এ বিষয়ে শুধু একটি সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়। যেখানে কারখানায় জখমের ঘটনার প্রকৃত চিত্র উঠে আসে না। কাজেই এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হতে হবে। এর পাশাপাশি কারখানার যেসব নিরাপত্তা সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, সেগুলোর শুল্ক কমাতে হবে। যাতে সহজেই কারখানা কর্তৃপক্ষ সেগুলো আনতে পারে। আর ছোট আকারের কারখানাগুলো যাতে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে পারে, সে জন্য স্বল্প খরচে তহবিল জোগান দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ এ ধরনের বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক ঋণ দিতে চায় না। কারখানা কর্মীদের মাসিক ডেটা হালনাগাদ ও তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। বর্তমানে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয় না। সাধারণত সব কারখানার

নিজস্ব একটি ডেটাবেজ আছে। সেটিকেই মাসিকভিত্তিতে ডিআইএফই এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ে অবহিত করতে হবে। এভাবে একটি জাতীয় ডেটাবেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ কারখানা সম্পর্কিত সামগ্রিক উপাত্ত (দুর্ঘটনা, জখম, শ্রমিক সংখ্যা, উৎপাদন, রপ্তানি ইত্যাদি) একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্মের অধীনে আনতে হবে। যার মাধ্যমে কারখানাগুলো পরিবীক্ষণ ও ট্রাক করার পাশাপাশি, প্রয়োজন মতো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।

দেশ রূপান্তর

২৬ অক্টোবর ২০২৫



দেড় দশকের উন্নয়ন বয়ানে লাভবান রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও আমলা

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, দেড় দশকে উন্নয়নের যে বয়ান তৈরি করা হয়েছিল, তাতে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও আমলা—এই তিনটি গোষ্ঠী লাভবান হয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলো প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলেছে। পরিণামে দেশে শুধু স্বজনতোষী পুঁজিবাদ সৃষ্টি হয়নি, হয়েছিল চৌর্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

আজ শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ‘বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন ২০২৫’ সম্মেলনের প্রথম দিন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ কথাগুলো বলেন। তিনি ওই অধিবেশনে একক বক্তৃতা দেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ।

বিভিন্ন দেশের চিন্তাবিদ, রাজনীতিক, কূটনীতিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের নিয়ে চতুর্থবারের মতো ঢাকায় এ অনুষ্ঠান হচ্ছে। এ সম্মেলনে ৮৫টি দেশের ২০০ বক্তা, ৩০০ প্রতিনিধি ও এক হাজারের বেশি অংশগ্রহণকারী যোগ দেবেন বলে গতকাল সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছিল সিজিএস।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ব্যবসায়ী, আমলা ও রাজনীতিকদের একটি বলয় গড়ে উঠেছিল। ব্যাংক, বিদ্যুৎসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাতের নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়েছিল তাঁদের হাতেই।

সংস্কারের পরিকল্পনা করা সবচেয়ে সহজ কাজ; কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা সবচেয়ে কঠিন—এমন মন্তব্য করে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সংস্কার সরকারের হাত দিয়ে শুরু হয় না, তেমনি সরকারের হাত দিয়ে শেষও হয় না। দেশ, মানুষ, অংশীজন—সবার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মধ্য

দিয়ে সংস্কারের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে গতি বজায় রেখে আলস্য দূরে রাখাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এখন ঠিক এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে।

সংস্কারের সঙ্গে রোমান্স

সাম্প্রতিক কাজের ওপর ভিত্তি করে বিষয়টিকে ‘সংস্কারের সঙ্গে রোমান্স’ হিসেবে আখ্যা দেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। প্রায় ৪০ বছর আগের একটি জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের কথা স্মরণ করেন তিনি। চলচ্চিত্রটির নাম ছিল ‘রোমান্সিং দ্য স্টোন’। প্রধান চরিত্রে ছিলেন মাইকেল ডগলাস, ক্যাথলিন টার্নার ও ড্যানি ডেভিটো। সেই গল্পে অ্যাডভেঞ্চার বা রোমাঞ্চের দায়িত্ব ছিল মাইকেল ডগলাসের, রোমান্সের বা প্রেমের দায়িত্ব ছিল ক্যাথলিন টার্নারের আর কমেডি বা হাস্যরসের দায়িত্ব ছিল ড্যানি ডেভিটোর। এ তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গল্পটি আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে বলে জানান দেবপ্রিয়।

দেবপ্রিয় বলেন, বাংলাদেশের সংস্কারের অভিজ্ঞতাকেও একইভাবে এ তিন উপাদানের সমন্বয় হিসেবে দেখা যায়। আজ আমরা তিনটি মূল লক্ষ্য সামনে রেখেছি। এগুলো হচ্ছে ন্যায্যবিচার, সংস্কার ও নির্বাচন। এ তিন বিষয়ের কেন্দ্রে আছে সংস্কার। অন্য দুটি লক্ষ্যকে সংযুক্ত করছে এ সংস্কার। ফলে জাতি গঠনে আমাদের অগ্রগতির বিকল্প নেই এবং পেছনে ফিরে তাকানোর অবকাশ নেই।

অন্তর্ভুক্তি সরকারের স্বেতপত্র প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সেই প্রতিবেদনে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা দেখেছি, গত দেড় দশকে দেশে উন্নয়ন বলতে কেবল কৌশল ও কর্ম সম্পাদন বোঝানো হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে উন্নয়ন ধারণাটি সংকীর্ণ করা হয়েছে।’

সংস্কারই উত্তর

এখন যখন দেশ নতুন রাজনৈতিক সমাধানের খোঁজে, তখন চ্যালেঞ্জ হলো: কীভাবে সেই প্রতিযোগিতা-বিরোধী জোট ভেঙে দেওয়া যায়। রাজনৈতিক হোক বা অর্থনৈতিক হোক—কোনো ক্ষেত্রেই তারা প্রতিযোগিতা চায় না। এর উত্তর হলো সংস্কার। সংস্কারের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হতে পারে, নতুন চাহিদা পূরণ করতে পারে, কার্যকারিতা বাড়াতে পারে, সঠিকভাবে সম্পদ বরাদ্দ করতে পারে বা অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হতে পারে। কিন্তু মূল সত্য হলো, এটি রাজনীতিবিদ ও নীতিপ্রণেতাদের জন্য সবচেয়ে বড় ধাঁধা। সংস্কার বাস্তবায়নের গাইড বই নেই। প্রায়োগিক অর্থনৈতিক নীতি জটিল বিষয়। সে কারণে সংস্কার প্রক্রিয়া শক্তিশালী, সুসংগত ও বাস্তবসম্মত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশকে নিজস্ব পথ খুঁজে নিতে হবে।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি শিক্ষা পেয়েছেন মন্তব্য করে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী বা দুর্বল রাষ্ট্র থাকা আবশ্যিক নয়। পরিবর্তনের সময়ও সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দূরদৃষ্টি, পরিকল্পনা, সমন্বয় ও ফলাফলের স্বচ্ছতা। তা সে স্বল্পমেয়াদি হোক বা মধ্যমেয়াদি। তবে এতে থাকতে হবে রাজনৈতিক সংযোগ এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ।

প্রথম আলো

২২ নভেম্বর ২০২৫

বাজার নিয়ন্ত্রণে তথ্য উপাত্তের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা দরকার

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

ভোজ্যতেলের দাম হঠাৎ বেড়েছে। রোববার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সভা করে সরকার প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দাম ছয় টাকা বাড়িয়েছে। ভোজ্যতেল মানুষের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। গ্রাহকের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোজ্যতেলের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে সয়াবিন তেল উৎপাদন হয় না বলে এটি পুরোপুরি আমদানিনির্ভর। এর বিপরীতে আমাদের অভ্যন্তরীণ যে তেল রয়েছে, যেমন সরিষা, সূর্যমুখী কিংবা নারিকেল তেল ভোজ্যতেলের চাহিদা পূরণের মতো পর্যাপ্ত নয়। সমস্যা হলো, আমদানিনির্ভর তেলের বাজার প্রতিযোগিতামূলক নয়।

অল্পসংখ্যক আমদানিকারকের হাতে সিংহভাগ ভোজ্যতেলের শেয়ার। সিপিডি ২০০৬ সালে একটি গবেষণা করেছিল, সেখানে প্রায় একশ তেল কোম্পানির নাম পাওয়া গেছে। কিন্তু গবেষণায় বের হয়েছিল, মাত্র ছয় থেকে ১০টি কোম্পানি মূলত সব নিয়ন্ত্রণ করে। হয়তো দেখা যাবে আমদানিকারক হিসেবে অনেক কোম্পানির নাম আছে। কিন্তু ওই কয়েকটি কোম্পানিই কলকাঠি নাড়ছে। বস্তুত তারাই ভোজ্যতেলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে।

এসব কোম্পানি তাদের অবস্থান ব্যবহার করে মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। বাজারে তেলের সরবরাহ ও সরবরাহ চ্যানেলের নিয়ন্ত্রণও যখন তাদের হাতে তখন সংগত কারণেই প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ভোজ্যতেল কিনতে পারছেন না গ্রাহক।

সরকার ভোজ্যতেলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ঘোষণা করে। আলোচনার মাধ্যমে এটি নির্ধারণ করা হয়, যার মাধ্যমে অনুমান করা হয় নির্ধারিত মূল্যে ভোজ্যতেল বিক্রয় হবে। কিন্তু পূর্ববর্তী সরকারের ক্ষেত্রে যেমনটা দেখেছি, বর্তমান সরকারের সময়ও তা দেখছি— বাজারে যারা প্রভাবশালী তারাই কর্তৃত্ব ধরে রেখেছেন। তারা সরকারের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে

প্রভাবিত করেন। এমনকি কখনও কখনও সরকার মূল্য নির্ধারণ না করলেও তারা মূল্য বাড়িয়ে দিচ্ছেন, তার যৌক্তিক কারণ থাকুক বা না থাকুক। সাম্প্রতিক সময়ে এটাই দেখা গেছে।

এটি পরিষ্কার হচ্ছে, বেসরকারি খাতের সদস্যরা বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এমনকি সরকারের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠছেন। সরকারের ক্ষমতা এভাবে ক্রমশ সীমিত হওয়া ভোক্তার স্বার্থের দিক থেকে আশঙ্কাজনক। এমন মার্কেট এজেন্ট বাজারের জন্য ক্ষতিকর। এ ক্ষেত্রে সরকার তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

পূর্ববর্তী শাসনামলে আমরা দেখেছি, ভোজ্যতেল আমদানিকারকদের সঙ্গে সরকারের এক ধরনের সখ্য থাকে। সরকারও রাজনৈতিক বিবেচনায় তাদের পরিপোষণ করে। তারা পণ্য সরবরাহে সরকারের আনুকূল্য পেয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে সেটি কমে এলেও এখনও সে ধরনের ‘ডমিনেন্ট মার্কেট প্লেয়ার’ বাজারে বিদ্যমান। আগের সরকারের আমলে কয়েকবার চেষ্টা হয়েছিল ভোজ্য অধিদপ্তরকে ব্যবহার করার। প্রতিযোগিতা কমিশনকেও কিছুটা ব্যবহার করা হয়েছিল। আমরা দেখেছি, প্রতিযোগিতা কমিশন বাজার পর্যবেক্ষণ করে ঘাটতির জন্য দায়ী বিষয়গুলো বের করে এনে প্রতিবেদন দিয়েছিল। তবে সেই প্রতিবেদনের আলোকে কতটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, আমরা জানি না। কারও কারও বিরুদ্ধে অর্থদণ্ড হয়েছিল বটে, সামগ্রিক ক্ষতির বিপরীতে সেই অর্থদণ্ড ছিল খুবই নগণ্য। সেই অর্থদণ্ড বাস্তবায়ন হয়েছিল কিনা, তাও আমরা জানি না। মোট কথা, বাজারে প্রতিযোগিতামূলক কাঠামো নিশ্চিত করতে যেসব প্রতিষ্ঠান দেশে রয়েছে, সেগুলো বৃহৎ আকারের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রায় অসহায়।

বাজার মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের তথ্যউপাত্তে ঘাটতি আছে। ফলে আইনগত জটিলতায় দেখা যায়, এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারে না। আবার বেসরকারি খাতের সঙ্গেও তাদের এক ধরনের অলিখিত বোঝাপড়া আছে। বিশেষ করে প্রতিযোগিতা কমিশনের সে ধরনে আভ্যন্তরীণ আছে বলেই আমরা জানি। সে কারণে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত কোনো অবস্থান নেওয়া যায় না।

আমরা মনে করি, বাজার ব্যবস্থায় সুশাসন আনা অতি জরুরি। যেহেতু বাংলাদেশের বাজার দিন দিন বড় হচ্ছে, যেখানে এভাবে অল্প কয়েকজন ‘মার্কেট এজেন্ট’ যদি বাজারকে প্রভাবিত করেন এবং সরকার যদি অসহায়ত্ব বোধ করে সেখানে ভোজ্য আগামী দিনগুলোতে আরও সংকটে পড়বে।

বাজারে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের আরও শক্ত অবস্থান নেওয়া প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড এবং আরও অপরাধমূলক হলে তার আলোকে শাস্তি নিশ্চিত করা দরকার। তবে এ ধরনের উদ্যোগ মোটেই দীর্ঘমেয়াদি নয়।

দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগের জন্য বাজার-সংক্রান্ত তথ্যউপাত্তের স্বচ্ছতা দরকার। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি, বাজারে কী পরিমাণ পণ্যের চাহিদা আছে। ভোজ্যতেলের মাস, এলাকা কিংবা ঋতুভিত্তিক চাহিদা আমাদের এবং সরকারেরও জানা থাকা দরকার। এ ধরনের তথ্য কিন্তু বেসরকারি আমদানিকারকদের কাছে আছে। এসব তথ্য যাতে তারা সরকারকে দিতে বাধ্য থাকে, সে জন্য আইনি সংস্কার দরকার। একই সঙ্গে কত মূল্যে এলসি খোলা হচ্ছে, কত মূল্যে তা পরে বিক্রি করা হচ্ছে, সেই তথ্যউপাত্তও যাতে নিয়মিত সরকার পায়, সে জন্য একটি ডিজিটাল সিস্টেম থাকা দরকার।

ডিজিটাল এই মার্কেটিং সিস্টেমে আমদানি বা উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যায়ে যত এজেন্ট রয়েছেন, তাদের কার কাছে কেমন স্টক থাকে, কে কী মূল্যে কিনছেন এবং কত বিক্রি করছেন, তার সবই সরকারের কাছে থাকতে হবে এবং সরকার যাতে সেভাবে ট্র্যাক করতে পারে। এ ধরনের সিস্টেম গড়া সহজসাধ্য নয়। সে জন্য আমরা বলেছি, নিত্যপ্রয়োজনীয় যে ১৭টি পণ্য রয়েছে, তার সব না হলেও পাঁচ থেকে সাতটি পণ্যে তা যেন করা হয়। তিন বছরের টার্গেট নিয়ে এভাবে পুরো সাপ্লাই চেইনকে ডিজিটাল করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

সাপ্লাই চেইনের ক্ষেত্রে আমদানিকারকদের পরে যারা আছেন, যেমন আড়তদার বা ডিস্ট্রিবিউটর, তারা আমদানিকারকদের কারণে এক ধরনের ছমকির মুখে থাকেন। যে মূল্য আমদানিকারকরা নির্ধারণ করে দেন তারা এর বাইরে গিয়ে বিক্রি করতে অসহায় হয়ে পড়েন। এমনকি ক্রয় রসিদেও অনেক সময় পরিপূর্ণ কিংবা সত্য তথ্য থাকে না। কারণ এতে তার এজেন্সি হারানোর ভয় থাকে। সে জন্য আইনের সংস্কারে তাদেরও ঢুকাতে হবে এবং প্রতিযোগিতামূলক করতে হবে, যাতে সাপ্লাই চেইনে একজন ডিলার কেবল একটি কোম্পানির পণ্যই সাপ্লাইয়ে বাধ্য না থাকেন। বাজার মনিটরে ক্লোজ অপারেশন দরকার। কেবল একবার বসে কিছু ডিউটি কমিয়ে দিলে ভোক্তা লাভবান হন না।

সমকাল

৮ ডিসেম্বর ২০২৫

অধ্যায় ৪

সামষ্টিক অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা



শুধু মুদ্রানীতি দিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশের মতো দেশে শুধু মুদ্রানীতি দিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এ জন্য রাজস্ব নীতির পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থাপনার তদারকিও প্রয়োজন। সরকারের নেওয়া সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির কারণে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও সরবরাহে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকে। পণ্য ও সেবার চাহিদা ও জোগানের পুরোটা প্রতিফলিত হয় না।

তবে স্বস্তির দিক হলো রিজার্ভের পতন ঠেকানো গেছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বর্তমানে স্থিতিশীল আছে। ফলে আমদানির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

ঘোষিত মুদ্রানীতিতে নীতি সুদহারে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। সরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কিছুটা কমানো হয়েছে। আর বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কিছুটা বাড়ানো হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের পণ্য রপ্তানি আয় যে বেড়েছে, তার পেছনে প্রধান কারণ অতিরিক্ত সক্ষমতা ব্যবহার। কিন্তু নতুন বিনিয়োগ হচ্ছে না। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ব্যাংকঋণের একটি বড় অংশ ব্যবহার হচ্ছে চলতি মূলধন হিসেবে।

ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদের কারণে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ কমে গেছে। এতে নতুন কর্মসংস্থানও বাড়ছে না। তাই উচ্চ মূল্যস্ফীতির এই সময়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প কিছু সুবিধার ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ, আমরা দেখছি, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। মজুরিহার বৃদ্ধির সঙ্গে মূল্যস্ফীতির সামঞ্জস্য নেই।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আগেও সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু মূল্যস্ফীতি কাক্ষিত মাত্রায় কমেনি। তবে এটাও ঠিক, উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কিছুটা সময় লাগে। আমাদের মতো দেশে শুধু মুদ্রানীতি দিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। রাজস্ব নীতি, বাজার তদারকিসহ অন্যান্য ব্যবস্থাও সমন্বিতভাবে গ্রহণ করতে হবে।

আমি মনে করি, মূল্যস্ফীতি এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে (পিক) আছে। ধীরে ধীরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে। তবে সরকার চলতি অর্থবছরের জুন মাসের মধ্যে মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য ঠিক করেছে। এই মূল্যস্ফীতিও মানুষকে কষ্ট দেবে।

প্রথম আলো

১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৫

কেমন চলছে বাংলাদেশ?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

রোকসানা আনজুমান নিকোলঃ দর্শক আজকের রাজনীতিতে আমাদের সঙ্গে খুব বিশেষ একজন অতিথি আছেন। সঙ্গে আছেন অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো এবং অর্থনীতির শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান। কেমন আছেন আপনি?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ ধন্যবাদ। আপনি কেমন?

রোকসানা আনজুমান নিকোলঃ আমি ভালো আছি। কিন্তু বাংলাদেশ কেমন আছে সেটা বুঝতে চাই আপনার কাছ থেকে। বাংলাদেশের অর্থনীতি রাজনীতি সব মিলে এখন আজকের এই দিনে বাংলাদেশ কেমন আছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ জীবন এমন যে সেখানে অবিমিশ্র ভালো আর অবিমিশ্র খারাপ হয় না। সেহেতু ভালোমন্দ মিশিয়েই থাকে। অবশ্য কোনো কোনো সময় ভালোটা একটু বেশি থাকে। কোনো কোনো সময় মন্দটা একটু বেশি থাকে। এটা একটা মৌসুমী ব্যাপার অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দেশে। তবে আপনি যদি সামগ্রিকভাবে বলেন, জাতি একটা উত্তেজনাধীন অতীতপূর্ব সময়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এবং অতীতপূর্ব নিঃসন্দেহে। কারণ হলো এরকম গণতান্ত্রিক এবং একই সাথে বিভিন্ন প্রশাসনিক এবং শাসনতান্ত্রিক উত্তরণকালীন সময় আমরা অতিবাহিত খুব একটা করিনি। যেগুলি এর আগে করেছি সেগুলো ভিন্ন মাত্রার ছিল। অপরদিকে বাংলাদেশের এই উত্তরণকালীন পরিস্থিতিটা সদা পরিবর্তনশীল। যেহেতু সদা পরিবর্তনশীল সেহেতু সকলের মনের ভিতরেই আস্থা বা সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রত্যয় বা বিশ্বাসের সেই জায়গাটা একটু নড়বড়ে হয়ে আছে। একটা উত্তরণের ভিতরে আছি কিন্তু ওই উত্তরণের ভিতরে বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে আমরা অনেক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। তো এই দুটোর মধ্যেখানে জনগণ অনেক সময় খেই হারিয়ে ফেলে বলে আমার ভয় হয়।

ఏనాటి

সৃষ্ট নির্বাচনের পক্ষে। পাতানো নির্বাচন না। সিট ভাগাভাগির নির্বাচন না। এবং মানুষ ভোট দিয়ে পরের দিন সুস্থিরভাবে থাকতে পারবে। সে কোন নির্বাচন-উত্তর সন্ত্রাসের শিকার হবে না। সেটার জন্য সেনাবাহিনীর ভূমিকাটা প্রয়োজন হবে এবং সেখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে যে সেনাবাহিনী কতদিন আগে মাঠে এসে দায়িত্ব নেবে। কারণ সেনাবাহিনী মাঠে এসে দায়িত্ব নেওয়ার পর সর্বোপরি প্রথম কাজটা যেটা হবে আমরা সবসময় যেটা দেখি সেটা হলো অস্ত্র উদ্ধার। অস্ত্র উদ্ধার যদি না হয় তাহলে শান্তি শৃঙ্খলা সেই অর্থে নিশ্চিত করা যাবে না। এটা এক অর্থে কিন্তু আমি তথাকথিত ডেভিল হান্টের ফলাফল সম্বন্ধে একটা তির্যক মূল্যায়ন করলাম। অস্ত্র উদ্ধারের মাধ্যমে বিশেষ করে অভ্যুত্থান-উত্তর পর্বে যে সমস্ত লুটপাট হয়েছে, পুলিশফাড়া লুট হয়েছে, সেই অস্ত্রগুলো আমরা ফেরত পাইনি। সেহেতু এইটা একটা বড় কাজ। এটা দরকার করবে এবং তখন প্রশাসনের সাথে আমাদের সেনাবাহিনীর যৌথ সম্পর্ক কিভাবে মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে বা কার্যকর হবে সেটাও দেখার বিষয় এবং যেই অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা এসেছে, কেউ মনে করছেন যে আগের প্রাক্তন শাসকদলের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আবার কেউ আমরা মনে করছি যে সব ধরনের মানুষ, যারা দুর্বল জনগোষ্ঠী আছে- আদিবাসী বলেন, দলিত শ্রেণী বলেন বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু বলেন বা অন্য দলের সমর্থকরা বলেন তারা কি সকলে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে কিনা সেটাও অন্তর্ভুক্তিমূলকের একটা ব্যাপার। সেহেতু নিকোল আপনার কথার জবাবে আমি বলি যে ডরচেস্টার হোটেলের ওই দুই ঘন্টা বৈঠক নিঃসন্দেহে একটা বড় অগ্রগতি। এটা বৈঠকটা কি হয়েছে তার চেয়ে বড় কথা বৈঠকে যেই দুজন মিলিত হয়েছেন এটি একটা অগ্রগতি। এটা একটা শোভন রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশের সোপান হিসেবে আমি দেখতে পারি। কিন্তু একইরকমভাবে ওইটার মাধ্যমে আরো যে ১০ রকমের বিষয় রয়ে গেছে একটা সৃষ্ট নির্বাচন করার ব্যাপারে তার থেকে কিন্তু মনোযোগ নিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। তার চেয়েও বড় কথা লক্ষ্য করে দেখবেন প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় বলেছেন, সংস্কার এবং বিচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাপেক্ষে। তাহলে দু'ভাবে আমি দেখতে পারি। একভাবে দেখতে পারি যে নির্বাচনটি ফেব্রুয়ারি মাসে করার জন্য আমার সংস্কার এবং বিচারকে ত্বরান্বিত করতে হবে। আরেকভাবে দেখতে পারি সংস্কার এবং বিচার যদি আমার মনঃপূতভাবে না এগোয় তাহলে আমরা নির্বাচনকে পিছাতে পারি। তো এইটার ভিতরে আপনি বিজ্ঞানের মানুষ বলবেন সেটা হল যে নন নেগোশিয়েবল অবসলিউট ক্রাইটেরিয়ার কোনটা কোনটা আমার চরম প্রতিবন্ধক।

রোকসানা আনজুমান নিকোলঃ নানানভাবে পারমুটেশন কন্সট্রিকশন করার সুযোগ আছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ কিন্তু আমাকে তো ধরতে হবে আমার কোনটা প্রতিবন্ধক। এইটা আমি নাড়াতে পারবো না। কোনটা আমি নাড়াতে পারবো না সেটা তো আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। এবং কে কোনটা করার ক্ষমতা রেখে সেটাও পরিষ্কার না এখন এই ক্ষেত্রে। সেহেতু আমি এক কথায় আপনাকে যেটা বলতে চাচ্ছি, একটা উত্তরণকালীন অবস্থায় আছি। আমি অনেক সময় বলি আমি দিন আনি দিন খাইতো। তো সেরকম প্রতিদিন প্রেক্ষিত বদল হচ্ছে। তার সাথে মানুষ এটার খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। আজকে সকালে আশান্বিত

হয়, সন্ধ্যার সময় একটু ব্যথিত থাকে, দুঃখিত থাকে, অবদমিত থাকে, কিন্তু চলমান আছে। বাংলাদেশের শক্তিতাই হলো যে এটা চলমান আছে। আরেকটা বিষয় আপনাকে শুধু ছোট করে বলি, সেটা হলো অর্থনীতির বিষয়টাও এইরকম। যখন অস্থির এবং অনিশ্চয়তার ভিতরে থাকে তখন অর্থনীতির প্রকৃত বিনিয়োগকারীদের মনের ভিতরে শান্তি থাকে না। কারণ তারা বুঝতে চায়। ধরুন এই যে বাজেট হয়েছে। এর আগের বাজেটটি করেছিল আগের সরকার। সেটা নিয়ে এই সরকার চলেছে। আমাদের সমালোচনা আছে এটা নিয়ে। আবার এই সরকার একটা বাজেট করলো কিন্তু সেরকমভাবে রাজনৈতিকদের সাথে আলোচনা করলো না। কিন্তু বাস্তবায়ন হয়তো করবে বা বাকিটা শেষ করবে আরেক সরকার। একটা রাজনৈতিক সরকার। দেখেন এটা তো এরকম পালাবদল। এরকম সময় রাজনৈতিক নীতিমালা নিয়ে যারা তার নিজের গ্যাটের পয়সা বিনিয়োগ করে, সে চিন্তার ভিতরে থাকে যে, যেই নীতিকাঠামোর ভিতরে, যদিও নীতিকাঠামো খুব পরিষ্কার না, আমি বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত করছি তা কি অব্যাহত থাকবে এবং গত সরকারের আমলে বিনিয়োগ করেছিলাম বলে আমাকে কি এই সরকার আবার কোন শান্তি দিবে? আমাকে কি দূরে ঠেলে দিবে? আর এটার সাথে আছে পরিবর্তনশীল বিশ্ব। আমরা দেখছি ট্রাম্প সাহেব কি করছেন? গাজাতে কি হচ্ছে? ইরানের সাথে ইজরাইলের কি চলছে। এছাড়া ছুটি চলছে। অন্যান্য দেশের কথা আমি বাদই দিলাম। সেন্ট্রাল আমেরিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার কথা বা সাউথ ইস্ট এশিয়ার কথা যদি বাদও দেই একটা অভূতপূর্ব অস্থির পরিস্থিতির ভিতরে বিশ্ব অবস্থান করছে। এরকম একটা অবস্থানের ভিতরে যখন আপনার ভূরাজনৈতিক সম্পর্ক সব বদলে যাচ্ছে, কালকে যে বন্ধু ছিল আজকে সে শত্রু হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আমি বলছি এর সাথে বসবো। কালকে ইউক্রেন সমাধান করে দিব। এইরকম একটা পরিস্থিতির ভিতরে বাংলাদেশ একটি চলক হিসেবে এই সমীকরণগুলোর ভিতরে কীভাবে খাপ খাওয়াবে? ওই বিনিয়োগকারী ওটাও বুঝতে চায়। কারণ তার বাজার সুবিধা কি দাঁড়াবে, তার উপর কিরকমভাবে শুল্ক আরোপ হবে, সে এখানে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ করবে কি না, তার জন্য কী প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করবে, তার রাজস্ব ইত্যাদি। সেহেতু এইখানেও একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনীতিকে স্থিতিশীল না করা যায় এবং নির্বাচন তার একটা অন্যতম উপাদান ততক্ষণ পর্যন্ত এটা হচ্ছে না। এইটা বাংলাদেশের জন্য একটা খুবই এক্সট্রাইটিং টাইম। আপনারা যারা এটার উপরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন, প্রচুর উপাদান এই মুহূর্তে প্রতি সন্ধ্যায় আসছে।

রোকসানা আনজুমান নিকোলঃ কিন্তু আপনি বলেছিলেন যে একটা নির্বাচন দরকার বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরানোর জন্য।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ শুধু তাই না। নাগরিকদের অধিকার ফেরানোর জন্যও।

রোকসানা আনজুমান নিকোলঃ অবশ্য এটা নিয়ে দ্বিমত আছে। কেউ বলছেন নাগরিকদের এই সরকারেই আস্থা। কেউ বলছেন না একটা নির্বাচন দরকার। অর্থনীতির কথাই যদি বলি যে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরানোর জন্য একটা নির্বাচন দরকার। কিন্তু এই যে লন্ডনে

একটা বৈঠক হলো, এতে করে কি মনে হয় না যে এই সরকার যে পলিসিগুলো করবে, হয়তো পরবর্তীতে যদি বিএনপি আসে, বিএনপি আসার সম্ভাবনাই বা আশঙ্কা সম্ভাবনা যেটাই বলি সেটাই বেশি। বিএনপি এসেও এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে এবং তাতে করে বিনিয়োগকারীদের কি কিছুটা হলেও এখন আস্থা ফিরেছে কিনা এই একটি উইন উইন বৈঠকের পর? এটা একটা প্রশ্ন। আপনার কথা থেকে আমার আরো কিছু প্রশ্ন মাথায় এসেছে। সেটা হচ্ছে আপনি বলেছেন যে, সিট ভাগাভাগির নির্বাচন যদি হয় সেটা একটা আশঙ্কার কথা। আপনি বলেছেন আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ হবে কিনা মানে অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের জন্য এবং ফেব্রুয়ারিতেই আদৌ নির্বাচন হবে কিনা? তার মানে অনেকগুলো যদি বা টেনশন এখনো আছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ টেনশন না থাকলে তো জীবনে বেঁচে থাকারই সেই অর্থে মাহাত্ম্য থাকতো না। আনন্দ থাকতো না। সেহেতু টেনশন নিয়ে বাঙালি আছে। তবে জিনিসটা হলো যে এই টেনশনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা। এই টেনশনগুলোকে আমার বাঞ্ছিত অভিপ্রায় পরিচালিত করার মত ক্ষমতা এবং আমার সেই সমস্ত চিন্তা আছে কিনা। আমি মনে করি সেগুলি আছে। তো আমি আপনাকে ওই নীতি কাঠামো এবং তার ধারাবাহিকতার প্রশ্নে ফিরে যাই। সেটা হলো যে এই সভা হওয়া মানে এই না যে আগামী দিনে যে সরকার আসবে তারা এই চলমান সরকারের সব নীতিকে গ্রহণ করলো। আমি মনে করি না। এইজন্যই তো আপনাকে আগেই আমি বললাম যে, শুধু তারিখ তো তারিখ না। তারিখের সাথে আরো ১০ রকমের জিনিস যুক্ত থাকে। এবং ওই তারিখটাতে পৌঁছানোর পথরেখাটাও একটা বড় জিনিস। যেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা পাইনি। কারণ যদি ফেব্রুয়ারি মাসের নির্বাচনের জন্য ডিসেম্বর পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হয় তাহলে এর ভিতরে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। এটা একটা ঘটমান বর্তমানের দেশ এই মুহূর্তে। যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তার তো ঘোষিত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থাকবে। সেহেতু বিএনপির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে আগে ২৬ টি ছিল তারপরে সব মিলিয়ে তারা ৩১ দফা করেছে। আগামীতে হয়তো নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোও তৈরি করবে তারা। তো সেইটা হবে তাদের ধারাবাহিকতার ধারক-বাহক। এই সরকারের কত অংশ তারা নিবে সেটা আমরা জানি না। এটা সম্বন্ধে কারো কারো সংশয় আছে। কারণ হলো বর্তমান সরকার যখন সংস্কারের কথা বলেন উনারা কিন্তু পুরো সময়টাই বেশিরভাগই উপরি কাঠামো নিয়ে সংস্কারের কথা বলেছেন। উনারা সংসদ নিয়ে বলেন, স্থানীয় সরকার বলেন, নির্বাচনী কাঠামো নিয়ে বলেন অথবা প্রশাসনের ভিতরে অথবা পুলিশ ইত্যাদির বিষয়ে কথা বলেন। উনারা কিন্তু একবারও বলেন নাই কৃষক ন্যায্যমূল্য কিভাবে পাবে। এত বড় বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে আমরা এই সরকারকে এনেছি। উনারা একবারও বলেননি যে ছাত্র সমাজের কর্মসংস্থান কিভাবে হবে। উনারা একবারও বলেননি যে কিভাবে নারীদের প্রতি যে আচরণ হচ্ছে সেইটার বৈষম্য কিভাবে দূর হবে অথবা দূরাঞ্চলে যারা বসবাস করে তাদের প্রতি কি আচরণ আমরা করব, এখন আদিবাসী জনগণের প্রতি যে অন্যায় আচরণ আমরা করি অনেক সময় সেটা কিভাবে দূর করব। সেহেতু অর্থনীতির ক্ষেত্রে কিন্তু এই সরকারের সেই

অর্থে কোন ম্যানিফেস্টো নাই। সেহেতু এটা একটা বড় ধরনের ঘাটতি এবং এই ঘাটতির কারণে আগামীতে যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার কথা আপনি বলছেন এইটা আনার জন্য সরকারের কোন মধ্যমেয়াদী কাঠামো নাই। সরকার গত সরকারের বাজেট নিয়ে চলেছে। বিগত সরকারের মধ্যমেয়াদী কাঠামো, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছে। ঠিকভাবেই করেছে। কিন্তু তারা দুই বছরের ভিতরে কী নীতি কাঠামোর ভিতরে থাকবে সেটা কিন্তু বলেনি। আপনি আমাকে আজকে সন্ধ্যায় যদি প্রশ্ন করেন আমি সরকারকে যেটুকু কাছের থেকে দেখছি সেটা হলো সরকার সমন্বিতভাবে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা কাঠামো দেয়নি। এবং এইটা তার ভিতরের সমন্বয়, সহযোগিতা, স্বচ্ছতার অভাব। এইবারের বাজেটের ভিতর দিয়ে পরিষ্কার হয়েছে অর্থাৎ আমরা যারা সরকারের অনেক কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের কমিশন, কমিটি টাস্কফোর্স ইত্যাদিতে কাজ করেছি তারা সকলে একমত হয়েছে যে এই সরকারের বাজেট গতানুগতিকভাবে হয়েছে। নতুন কাঠামোর ভিতরে হয়নি। সেহেতু আমরা প্রত্যাশা করব, আপনি যে বললেন ধারাবাহিকতা, নতুন সরকার যদি আসে তো অবশ্যই নতুনভাবে একটা কাঠামোর চিন্তা সেখানে আসবে।

রোকসানা আনজুমান নিকোলঃ আপনি দেখলাম বাজেটের আগে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেছেন এবং বিশ্বব্যাংকের হিসেবে অন্তর্বর্তী সময়কালে আরো ২৭ লাখ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে নেমে গেছে সেটা বলেছেন। যার বড় অংশ নারী সেটাও বলেছেন। জাতীয় বাজেট প্রণয়ন, কর ব্যবস্থা সংস্কার, পুঁজিবাজার পুনরুদ্ধার সহ নানা ক্ষেত্রে যথাযথ আলাপ আলোচনার ঘাটতি এবং স্বচ্ছতার অভাব নিয়েও স্ফোভ প্রকাশ করেছেন। এই স্ফোভ কেন? কোনো কোনো জায়গায় আপনি বলেছেন একটা মধ্য মানে দুই বছর মেয়াদী একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার কথা। যেটা বলেছেন সেটা করা হয়নি এই কথা বলেছেন। আর কি কোন কারণ আছে এই স্ফোভের?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমি মনে করি, এই সরকার প্রথমত যতখানি মনোযোগ দিয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের দিকে, যতখানি মনোযোগ দিয়েছে বিগত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বিচারের ব্যাপারে, তাদের ধরপাকড় ইত্যাদির বিষয়ে, অর্থনীতির যে সমস্ত দুর্বলতা আছে সেগুলি উন্মোচনের জন্য যতখানি তারা উদগ্রীব ছিলেন, এগুলোকে নিরসন করার জন্য একটি সংঘবদ্ধ, চিন্তাশীল, প্রতিশ্রুতিশীল প্রয়াসের ব্যাপারে তারা অতখানি মনোযোগী ছিলেন না। এটিই হল আমার বক্তব্য। অর্থাৎ দেখুন, যেই দলিলটি আমি এবং আমার সহকর্মীরা রচনা করেছি এটা একমাত্র দলিল যেটা হলো প্রধান উপদেষ্টার অধীনে হয়েছে। এটা আমরা যখন করি এবং এটা দিয়ে আমরা আগের সরকারের যে ধরনের তহররূপ এবং অন্যান্য, অর্থনৈতিক যে অত্যাচার হয়েছে সেটাকে তুলে ধরলাম। কিন্তু সেগুলোকে ধরে নিরসন করার জন্য যে কাঠামোগত পদক্ষেপ নেওয়া, সেটা কিন্তু নিল না।

রোকসানা আনজুমান নিকোলঃ কিন্তু এটা যেদিন আপনারা হাতে তুলে দিলেন সেদিন, আমার যতদূর মনে আছে প্রধান উপদেষ্টা বলেছিলেন না যে চূড়ান্ত হওয়ার পর এটি জনসাধারণের

জন্য প্রকাশ করা উচিত এবং স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের পড়ানো উচিত। তাহলে সরকার গুরুত্ব দিয়েছে অথবা দেয়নি কোনটা বলছেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা তো প্রধান উপদেষ্টা বলছেন। তো প্রধান উপদেষ্টা নিঃসন্দেহে এটার, ইংরেজিতে যাকে বলে ওনারশিপ বা মালিকানা নিয়েছেন। আমরা এটাকে প্রকাশ করেছি। এটা থাকবে ইতিহাসের একটি অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে এটাকে আমরা ইংরেজিতে যাকে বলি রেফারেন্স পয়েন্ট বা এটা এক ধরনের স্মারক হিসেবে থেকে যাবে। কিন্তু এটাকে নিয়ে দৌড়াতে হবে তো। তো দৌড়ানোর জন্য যাদের দায়িত্ব এবং সেখানে তো প্রচুর মানুষ আছেন এবং বিজ্ঞ মানুষরা আছেন। তারা কি কেন পারলেন না এইটা একটা বড় বিষয়। এবং যেখানে উনারা চেষ্টা করলেন কিছুটা, যেমন হলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ভাগ করার ক্ষেত্রে। এটা আমাদেরও মতামত ছিল। উনারা যথেষ্ট নিষ্ঠার সাথে এগুলিকে পরিপালন করেননি। যথেষ্ট উন্মুক্ততার সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অংশীজনদের যুক্ত করেননি। সেজন্য জিতে গিয়েও হেরে গেলেন। এখন পর্যন্ত যেটা বুলে রয়েছে। সঠিক কাজও বৈঠকভাবে করলে হয় না। দুটোই হলো। এক হলো সঠিক কাজ করলেন না। আর যেটুকু করতে গেলেন সেটুকু বৈঠকভাবে করলেন। যার ফলে এই অর্থে এই সরকারের উত্তরাধিকারটা কি হবে? অর্থনৈতিক উত্তরাধিকারটা কি হবে? একটা অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার হলো যে তারা লুটপাটতন্ত্রের চরিত্র উন্মোচন করতে পেরেছেন কিনা। হ্যাঁ, এটা স্বৈতপত্র করেছে এবং অন্যান্যরা মিলে এটা করেছে। দু' নম্বর হলো যে এইখান থেকে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরোবে। একটা নিম্ন মধ্য আয়ের থেকে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে যাবে এবং বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি এসডিজি বাস্তবায়ন করবে ভালো করে। এবং পৃথিবীর বুকে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে সে দাঁড়াবে তার জন্য কি কি সংস্কার দরকার করে সেই সংস্কারগুলো সে শুরু করল কিনা। এটা হলো তার দুই নম্বর একটা ব্যাপার ছিল। সেইটার শুরু করার জন্য অনেকগুলো কমিটি হয়েছে কিন্তু সেগুলোকে যথাযথভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সক্ষমতা দেখাতে পারেনি। আর তৃতীয় যেটা ছিল সেটা হলো অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ফিরিয়ে আনা। সেইখানে সরকারের কিছু সাফল্য আছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, টাকার মূল্যমান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, সুদের হারের ক্ষেত্রে ইত্যাদি। সেহেতু সে পিছনটা দেখতে পেরেছে। বর্তমানকে কিছুটা হলেও সে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য বড় ধরনের কোন পরিবর্তনের সূচনা সে এখনো করতে পারেনি।

রোকসানা আনজুমান নিকোল: আপনি বলছেন যে দেশে গত ১৫ বছরে চামচা পুঁজিবাদ থেকেই চোরতন্ত্র তৈরি হয়েছিল যাতে রাজনীতিক, সামরিক ও বেসামরিক আমলা, বিচার বিভাগসহ সবাই অংশ নিয়েছে। ২৮ উপায়ে দুর্নীতির মাধ্যমে ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অবৈধভাবে পাচার হয়েছে। চোরতন্ত্র কি ৫ই আগস্টের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে গেছে না এখনো আছে? যদি থাকে এখন কারা চুরি করছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: চোরতন্ত্র শব্দটার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। ইংরেজিতে ক্লেপটোফ্রেসি বলে। পরে আবার এটাকে দেখলাম প্রধান উপদেষ্টা লুটপাটতন্ত্র বলছেন। এইটার অর্থ হল যেখানে যে কোন নীতি, যে কোন সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্রীয় অর্থের ব্যয়, বরাদ্দের পরিমাণ এবং তার ব্যবহার ইত্যাদি খুবই সংকীর্ণ একটি গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটাকে কম্প্রাডর বুর্জোয়াজি বা সেই অর্থে যাকে আমি চামচা পুঁজিবাদ বলছি আর কি। ওই জায়গা থেকে চূড়ান্ত একদিকে ঘনিভবন এক জায়গাতে কনসেন্সট্রেশন সেইটা হতে হলে আপনার কতগুলো উপাদানের দরকার করে। একটা উপাদান হলো রাজনীতিবিদদের একটা অংশ যারা সব ধরনের জবাবদিহিতার বাইরে গিয়ে শুধুমাত্র অর্থবিশ্ব ব্যয় ক্ষমতার প্রতি নিষ্ঠবান থাকে। আরেকটা থাকে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যারাও প্রতিযোগিতার বাইরে থেকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক শক্তির সংশ্লেষে থেকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সুবিধা নিয়ে থাকে। আর থাকে হলো একটি আমলাগোষ্ঠী। ক্ষমতার খুব কাছাকাছি থেকে তাদের ভিতরে এক ধরনের উচ্চাশা গড়ে ওঠে। যে উচ্চাশা রাজনৈতিক উচ্চাশাতেও যায় এবং তারাও রাজনৈতিক পরিণত হয় এবং এই লুটপাটের অংশ নিতে চায়। এই যে ব্রহ্মস্পর্শ, তিনদিক থেকে একসাথে, তিন গ্রহ এক হওয়া সেইরকম পরিস্থিতি এই মুহূর্তে হয়তো নেই।

কিন্তু যে সমস্ত বিচ্ছিন্ন উপাদান আছে, ধরুন যারা আগে রাজনীতির সাথে যোগ সাজোসে ব্যবসা করেছে ইত্যাদি তাদের তো পূর্ণ বিচার আমরা করিনি।

রোকসানা আনজুমান নিকোল: আমি একটু মাঝখানে বলি। যদিও আপনার কথার মাঝখানে কথা বলতে চাচ্ছিলাম না। ধরুন আমরা আগে কি দেখেছি যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছেন আমার পয়নের ৪০০ কোটি টাকা। আবার এখনো আমরা দেখছি যারা উপদেষ্টা তাদের এপিএসদের মানে অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও মোটামুটি এক ধরনের...

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তফাৎ তো আপনি একটাই দেখলেন, প্রধান উপদেষ্টার এপিএস না। এটা হলো উপদেষ্টার এপিএস। এই যে আমি আপনাকে এটিই বলতে চাচ্ছিলাম যে লুটপাটতন্ত্র যখন হয় অর্থাৎ কাঠামোটাই তখন হয় একজন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং তার জবাবদিহিতার পুরোটা বাইরে থাকা মানে দলীয় জবাবদিহিতারও বাইরের জনগণের তো একেবারে বাইরেই। এরকম একটা জিনিস হয়। ওইটা হয়ে গেছিল রাজনীতির সবচেয়ে প্রধান, রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তির কাছে। আপনি এখন সেটা দেখেন না। আপনি সেহেতু এটাই সিস্টেম এটাই কাঠামো, এইটা আমি চট করে বলতে পারছি না। আমি যেটা বলতে পারছি যে আমার এই কাঠামোর ভিতরে অনেক সমস্যা রয়ে গেছে। এই সমস্যা এখনো দূর হয়নি। এইজন্যই সংস্কার দরকার। এজন্যই নির্বাচন দরকার। এজন্যই জবাবদিহিতা দরকার। নাগরিকের কণ্ঠস্বর দরকার। নির্বাচন হলেও শেষ হবে না। কারণ তারপরেও নাগরিকদের কণ্ঠস্বর দিয়ে অব্যাহতভাবে তাদের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতার ভিতরে রাখতে হবে। সেহেতু অনেকগুলো কাজ একসাথে হবে। বাঙালি যদি মনে করে যে চটজলদি সলিউশন আছে, সময়সীমায় আছে। এই নির্বাচনের বটিকা খেলে পরেই বাদবাকি কালকে থেকে এখানে

দুধের নহর বয়ে যাবে। তাহলে বাঙালি জাতি কিন্তু হতাশার দিকে এগিয়ে যাবে। আমাদের আরেকটু বাস্তববাদী হতে হবে এই পরিস্থিতিতে। এবং কিভাবে আমরা প্রত্যেকের দায়কে আটকাতে পারবো সেটা চিন্তা করতে হবে। চোরতন্ত্র নেই চোররা আছে। লুটপাটতন্ত্র নেই কিন্তু লুটপাট হচ্ছে। লুটপাট হচ্ছে, চুরি হচ্ছে, এইটাকে আটকানোর জন্য শুধু নির্বাচনই যে একমাত্র সমাধান এটাও আমি মনে করি না। সংস্কার একমাত্র সমাধান এটাও আমি মনে করি না। কিন্তু এর সাথে সাথে যদি নাগরিক কণ্ঠঃস্বর, আপনাদের মত মিডিয়া ইত্যাদির সাথে যুক্ত না হয়, সম্মিলিতভাবে না করলে এটার কোন আশ্চর্য বটিকা নাই।

রোকসানা আনজুম নািকোলঃ কোন আশ্চর্য বটিকা নাই। কোন ট্যাবলেট নাই। নির্বাচন সংস্কার কোনটাই আসলে একক ট্যাবলেট হিসেবে কাজ করবে না। নাগরিক কণ্ঠঃস্বর বজায় রাখতে হবে। লন্ডন বৈঠকটা নানান দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সবার চোখ ছিল। এখনো চোখ আছে ওই বৈঠকের দিকে। যৌথ বিবৃতিতে বুঝতে পেরেছি কি আলোচনা হয়েছে। কিন্তু দেড় ঘন্টার বৈঠকে তো আর ওই এক পৃষ্ঠার আলোচনা হয়নি। বিশদ আলোচনা নানান বিষয়ে নিশ্চয় হয়েছে। কেউ কেউ বলেছে ওই বৈঠকে এক্সিট প্ল্যান নিয়ে কথা হয়েছে। এক্সিট প্ল্যানটা কিরকম যে বিএনপি যদি আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে তাহলে এখনকার উপদেষ্টা মন্ডলী ইনক্লুডিং প্রধান উপদেষ্টা, তারা যেন একটা সেফ এক্সিট প্ল্যান। সেটার ব্যবস্থাও লন্ডন বৈঠকে হয়েছে। এটার কোন প্রমাণ আমি দিতে পারবো না। এটা একদমই শোনা কথা। আমরা সাংবাদিক মানুষ নানান জায়গা থেকে তথ্য আসে। এমন কিছু আপনার কানে গিয়েছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ না। আপনার কাছ থেকেই তো কানে এখনই আসছে। আমি আপনাদের বলছিলাম যে শুরুর দিকে যে বৈঠক তো শুধু বৈঠক না। বৈঠকের সাথে শুধু নির্বাচনের তারিখের ব্যাপার নাই। এটা আরো অনেক গভীর জিনিস। এটা এবং এই প্রক্রিয়ার আরো অংশ আছে। এবং আপনাকে আগে আমি বলেছিলাম যে নির্বাচনের তারিখে পৌঁছাতে হলে আমাদের কত কিছু পার হয়ে এসে ওখানে পৌঁছাতে হবে। নির্বাচনটা হয়ে গেলেই কি সব শেষ হয়ে যাবে? নির্বাচন পরবর্তী কি পরিস্থিতি হবে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো না? এটি তো স্বাভাবিক। আমার কাছে তো আশ্চর্য লাগে লাগবে যদি কেউ বলে যে নির্বাচনের তারিখ নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু নির্বাচন হলে পরে কি হবে সেটা নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। তাহলেই তো আমি আশ্চর্য হব। আলোচনা হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। এবং সেইটার পরবর্তীতে কিভাবে সূষ্ঠাভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে এবং তারপরে শান্তি শৃঙ্খলা কিভাবে রক্ষিত হবে, নতুন সরকারকে গঠন করা, সংসদ ইত্যাদির বিষয় রয়েছে। সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে কেউ আছে কেউ আবার ওখানে গণভোটের কথা বলেছে। বা এটাকে জাতীয় সংসদ ইত্যাদি কি কি সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। এটিই তো স্বাভাবিক। সেহেতু এটা নিয়ে এত গবেষণা বা এটার ভিতরে এত ষড়যন্ত্র খোঁজার কি আছে? আমি তো এটাই স্বাভাবিক মনে করি। আবার কেন আরো বেশি স্বাভাবিক মনে করি দেখুন আপনি। যারা ক্ষমতায় আছেন তারা যদি এ ব্যাপারে কোনো ধরনের নিশ্চয়তা চান এটা তো অস্বাভাবিক না। পৃথিবীর বা বাংলাদেশের ইতিহাসে আপনি ফিরে যেয়ে দেখেন যখন জিয়াউর রহমান সাহেব ক্ষমতা দখল

করলেন এবং তারপরে ক্ষমতা পেলেন যেভাবেই আপনি বলেন, তারপরে যে সংসদটা হলো সেখানে উনার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। সেহেতু উনার যে সময়কাল ছিল তার বৈধতার উনার কোন সমস্যা হয়নি। পঞ্চম সংশোধনী ইত্যাদি ইত্যাদি গেছে। আপনি জাতীয় পার্টির এরশাদ সাহেবের কথা দেখেন। উনিও যখন সংসদ বানালেন উনি যে সাংসদ হলেন উনার পরের সেই সংসদেও উনার দলেরই প্রাধান্য ছিল সেহেতু উনার কিন্তু কোন সমস্যা হয়নি বৈধতা ইত্যাদির বিষয়ে। এরপর আপনি যদি ২০০৯ সালের নির্বাচনের কথা বলেন, তখন যে সংসদ এলো সেই সংসদও তার পূর্ববর্তী যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার অনুগমনেই গেছে। তাহলে ইতিহাস কি বলে? যে এই সমস্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যে সরকার থাকে তার পরবর্তীতে যে পরিস্থিতি হয় সেইগুলি সাধারণত তাদের সাথে একটি পারস্পরিক সমঝোতা বা বোঝাপড়ার ভিতরেই হয়। এবং সেহেতু এই সরকারও যদি সেটা চিন্তা করে এটা তো অস্বাভাবিক বিষয় কিছু বলে আমি মনে করি না। এটার ভিতরে তো আমি অস্বাভাবিকতার কিছু দেখি না। না হলেই আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হবে। কারণ আমি শান্তি শৃঙ্খলার ভিতরে উত্তরণ চাই এবং আমি ওই যে উত্তরণটা হবে সেটাও ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে, সংসদের আইনের ভিতরে হবে।

রোকসানা আনজুমান নিকোলঃ আরেকটা বিষয়, খুব পপুলার কোয়েশেন। এটা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেন যে জুলাই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের যে সরকার গঠিত হলো, তিনি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেন এবং এরপর থেকে গ্রামীণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুমোদন ও সুবিধা নিতে শুরু করেন, এটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা আছে। এটা নিয়ে আপনার কোন বক্তব্য আছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ হ্যাঁ। আমিও শুনেছি। আপনার মত আমিও শুনেছি এবং আমি শুনে নিঃসন্দেহে মর্মাহত হয়েছি। কষ্ট পেয়েছি দুই তিনটা কারণে। এক নম্বর কারণ বা প্রথম বিষয় হলো যে আপনারা জানেন যে সেই অর্থে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যক্তিগত সম্পত্তি আহরণ, ব্যক্তিগত আয় এবং সম্পদ বা সুবিধা বা বৈভব সৃষ্টি করার কোন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা আছে বলে আমি কাছে থেকে দেখে এটা দেখি নাই। এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা হয় সেই প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু ব্যক্তি মালিকানার ভিতরে নাই। সামাজিক মালিকানা, সামাজিক ব্যবসা ইত্যাদি হিসেবে বিভিন্ন জিনিস রয়েছে। কিন্তু তারপরেও গ্রামীণ নামটা উনার নামের সাথে সমার্থক হয়ে গেছে। প্রফেসর ইউনূস এবং গ্রামীণ শব্দটি সমার্থক হয়ে গেছে। সেহেতু গ্রামীণের যা কিছু ভালোমন্দ তার উপরে এসে বর্তায় সঠিকভাবে হোক বৈঠকভাবে হোক। সেহেতু যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের আলোচনা হচ্ছে সাত আটটি বিভিন্ন ঘটনা উত্থাপন করা হয়। তার কিছু কিন্তু উনি পূর্বে হয়তো চেয়েছিলেন পাননি, এখন হচ্ছে। নতুন আবার কিছু হচ্ছে। আপনি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেন তাহলে সেটা আগে চেষ্টা হয়েছে। আবার যদি স্টারলিংক এর কথা বলেন তাহলে এখন হয়েছে। ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। আমার এখানে বক্তব্যটা খুব সহজ। সেটা হলো যে এরকম একটি বিষয়ে আলোচনাকে যেকোন সমাজে অগ্রাহ্য করাটা ভালো না। যতই আপনি অগ্রাহ্য করবেন, এই আলোচনাগুলি ততই কিন্তু

ডালপালা মেলবে এবং এটার ভিতরে যা সত্য না তাও একদিন সত্য বলে মানুষ বিশ্বাস করা শুরু করবে। সেহেতু এই ক্ষেত্রে গ্রামীণ যেই ফাউন্ডেশন আছে, গ্রামীণ যেই প্রতিষ্ঠানটি আছে, যে প্রফেসর ইউনুসের সোসাইটি আছে এগুলির পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। এই ব্যাখ্যাটা প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের কাছ থেকে আসা উচিত না। এই ব্যাখ্যাটা উনার প্রেস সচিবের না। কারণ এটা কোন রাষ্ট্রীয় ব্যাপার না। এটা একটি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপার। সেহেতু উনার সেই সক্ষমতা, যোগ্যতা এবং সজাগতা আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। মানুষের মনে যেন এইরকম ধারণা না হয় যে আমার প্রধান উপদেষ্টা তার স্বার্থের সংঘাত হয় এরকম কোন ব্যবসায়িক লেনদেনের ভিতরে ঢুকেছে। আমার স্বার্থটা হলো প্রধান উপদেষ্টা কোনভাবেই যেন দুর্বল না হন। যাতে করে একটি সুস্থির উত্তরণের সময়কালে উনি পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। সেজন্য আমি এই ধরনের আলাপ আলোচনাকে এখনই শেষ করার পক্ষপাতী এবং এটাকে শেষ করার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হলো ব্যাখ্যা দেওয়া উনার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। যে এইটার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি করা উচিত না। ন্যায়-নীতির কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। এইটা যদি না দেন তাহলে আবার আমার দৃষ্টিভঙ্গি হবে।

রোকসানা আনজুমান নিকোলঃ ছোট করে কিছু বিষয় আপনার কাছে পরিষ্কার হতে চাই। তারপরে আরো কিছু বিষয় আছে আমার, যেমন- শেয়ার বাজার আইসিইউ এর ভিতরে আপনি বলেছেন। কেমন করে আইসিইউতে ঢুকলো এবং এটা থেকে আসলে আপনি যদি এখন দায়িত্বে থাকতেন তাহলে কী করতেন? আপনি বলেছেন যে বিদেশ প্রীতি আছে এই সরকারের। নানান দিক থেকে বিদেশী লোকজন এসেছে। তাহলে দেশে কি লোকের অভাব কিনা দেশ থেকে কাকে নিতে পারতো? কি হতে পারতো? কারণ বিনিয়োগকারীদের আন্দোলন, পথে তাদের দাঁড়িয়ে থাকা, এগুলো আসলে খুব সুখকর দৃশ্য না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ পুঁজিবাজারের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আমরা সবাই মিলেই দায়ী। সবাই মিলে কেমন দায়ী আমি এটা দায়িত্ব এড়ানোর জন্য বলছি না। সেটা হল বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি আমরা সমাজের ভিতর তৈরি করেছিলাম, এই যে নির্বাচনহীনতার যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল, এই যে চোরতন্ত্রের যে সংস্কৃতি, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো পুঁজিবাজার। যখন প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার আসলো, মানে প্রথম না দ্বিতীয় ধাপে। প্রথম ৯৬-৯৭ সালেই তো সবচেয়ে বড় পুঁজিবাজারের কেলেঙ্কারি হলো। সেই হিসাব আমরা দিয়েছি কত লক্ষ কোটি টাকা দেশের বাইরে নিয়ে গেছে। আমরা জানতাম কে এই কাজটা করেছে। একই রকমভাবে ২০১০-১১-১২ তে আমরা কাজ করলাম। কারোর কোন শাস্তি হয় নাই। আমি কিছুদিন আগে পুঁজিবাজারের সংগঠকদের কাছে বক্তৃতা করে এসেছি যে ভারতে কিভাবে একটা ওই হর্ষ মেহতার কেসে ৬৯ টা কেস দিয়ে লোকটা শেষ পর্যন্ত জেলে মারা গেছে। আর এখানে এই লোকগুলোর বিন্দুমাত্র কোনো শাস্তি হয়নি। তারা প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে বড় প্রভাবশালী সহায়ক হয়েছে। সেহেতু বিচারহীনতা একটা বড় জিনিস। এবং সকলকে দায়-দায়িত্ব নিতে হবে। এখানে কেউই ধোয়া তুলসি পাতা না। সেহেতু সেইটা করতে গেলেই এটার এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা আসে। পুশব্যাক আসে। এবং এখন এই মুহূর্তে সিকিউরিটি

এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের যে কথা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভিতরের লোকজনও এটার সাথে যুক্ত ছিল। ওটার একজন প্রধান ইতিমধ্যে জেলখানায় আছে। সেহেতু এক ধরনের চেষ্টা চলছে এবং এবারের বাজেটে যে সমস্ত অল্প কিছু চিন্তা ভাবনা আছে সেই অল্প কিছুর একটা হলো পুঁজিবাজার সম্পর্কিত। যেমন একটা হলো যে আপনি যদি নিবন্ধিত হন তাহলে আর যদি নিবন্ধিত না হন তাহলে আপনি করের ক্ষেত্রে কত ধরনের সুবিধা পাবেন। যেমন আছে ব্যাংকের পক্ষ থেকে কিভাবে টাকা ওখানে দেওয়া যাবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। তো আমি মনে করি একটা চিন্তা আছে। একটু ধৈর্য ধরতে হবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় জিনিস আমাদের বুঝতে হবে সেটা হলো পুঁজিবাজার দিন আনি দিন খাই জায়গা না। দিন আনি মানে আজকে কিনলাম কালকে বিক্রি করলাম এই ফাটকাবাজির জায়গা এটা না। এটা দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের জায়গা। এই যে এটা যে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের জায়গা এই কথাটাই আমাদের আচরণে বোঝা যায় আমরা ভুলে গেছি। সেহেতু শান্তি দিতে হবে। সংস্কার করতে হবে। আমাদেরও বোধদয় হতে হবে এটার ভিতর দিয়ে। আমি এটার কোন চটজলদি সমাধান দেখি না। এবং আপনার সবচেয়ে কাছের যোগ্য মানুষকে বসিয়ে দিলেও সে ধন্বন্তরীর মত একটা কিছু করতে পারবে না। এখানে অনেক রকম স্বার্থ আছে। তারাও এটার পিছনে লেগে থাকবে। আমাদের এই ব্যাপারে সাবধান থাকার ব্যাপার আছে। কিন্তু জায়গাটাকে আমাদের ঠিক করতে হবে।

রোকসানা আনজুমান নিকোলঃ মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-ইজরাইল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যেকোনো সময় তার সর্বাঙ্গিক যুদ্ধে রূপ নিতে পারে এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে। এবং ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধের হুশিয়ারি দিয়েছে। এমনটা হলে প্রভাব কি হতে পারে? আমরা এফেক্টেড হব কিনা এটাও তো একটা টেনশনের জায়গা।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ এইটা তো আছেই। আমি আপনাকে বলছিলাম অনুষ্ঠান শুরুর আগে। এটাকে ইংরেজিতে আমরা বলি এখন ডিজরাপটিভ ডেভেলপমেন্ট। অর্থাৎ এক ধরনের অস্বস্তির ভিতরে উন্নয়নের প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। এগুলির সাথে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে। কিছুদিন আগে ট্রাম্প সাহেব আমাদের উপর যে শঙ্ক আরোপ করলো তখনও আমি এ কথা বলেছি। বিচলিত না হয়ে এগুলি নিয়ে জীবন ধারণ করা আমাদের শিখতে হবে। সেহেতু আমরা যদি গাজাতে এই শিশুগুলোর মৃত্যুকে নিয়ে নির্বিকার থাকতে পারি তাহলে হরমুজ প্রণালী নিয়েও আপনারা নির্বিকার থাকতে পারবেন। আমি মনে করি মানবিক অপরাধ যদি করে থাকি আমরা গাজার ক্ষেত্রে করেছি। পুরা দেশ, জাতি এবং বিশ্ব এটার প্রতি অন্যায় আচরণ করেছে। সেহেতু আমরা অন্যায়ের পৃথিবীর ভিতরে চলছি। যে অন্যায়ের পৃথিবীতে কোন বহুপাক্ষিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাঠামো বিকল হয়ে গেছে। আমার জাতিসংঘ বিকল হয়ে গেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও কিছু করতে পারে না। দেখুন আরব বিশ্ব সেই অর্থে গাজার জন্য কিছু করতে পারলো না। তো এইরকম একটা জায়গাতে তৈরি থাকার জন্য মূল জায়গাটা যেটা হলো যে যেই সমস্ত এলাকাতে ভঙ্গুরতা আছে, যেমন দীর্ঘমেয়াদে তেলের ব্যাপারে চুক্তি করার বিষয় রয়েছে, এটা এলএনজির জন্যও যেমন সত্য, তরল তেল আনার ক্ষেত্রেও একই রকমভাবে সত্য। এই ব্যাপারগুলো দীর্ঘমেয়াদে চিন্তা

করার ব্যাপার রয়েছে। এটা এমন না কালকে হরমুজ বন্ধ হয়েছে, আগামীকাল চিন্তা করব, পরশুদিন নিয়ে আসবো। এটা এরকমভাবে হয় না। অর্থাৎ আমাদের কৌশলগত চিন্তার জায়গাটা বড় করতে হবে। আমাদের এখনকার সমস্যাটা হয়ে গেছে কি এবং এটা আমার অনুষ্ঠানে আপনার সাথে আমার প্রতিও সমালোচনা। আমরা খুব চটজলদি এবং তাৎক্ষণিকতার ভিতরে বসবাস করি। আরেকটু যে দীর্ঘমেয়াদে-মধ্যমেয়াদে চিন্তা করব তা হয় না। কারণ হলো অস্থির সমাজ, অস্থির অর্থনীতি, অস্থির রাজনীতি। আমাকে মধ্যমেয়াদে কৌশলগত চিন্তাগুলো করার জন্য সুযোগও দেয় না। আমাদের যেটা বুঝতে হবে, এই ৫০ বছরেরও বেশি স্বাধীন জীবনে যে আমাদের কৌশলগত চিন্তাতে একটু মধ্যমেয়াদী থাকতে হবে। সেই মধ্যমেয়াদী দেশের স্বার্থে আমার জাতীয় ঐক্য লাগবে। এই যে আজকে কে ক্ষমতায়, কালকে কে ক্ষমতায়, এই দ্বন্দের কারণে জাতীয় ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গিগুণি, নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিগুণি, উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিগুণি এবং ভূকৌশলগত অবস্থানগত বিষয় এগুলি যেন সকাল-বিকাল পরিবর্তন না হয়। যদি সকাল-বিকাল পরিবর্তন হয় তাহলে পৃথিবীর বুকে আমরা নির্ভরশীল সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত হবো না। এখন যে অস্থিরতা চলছে এটা আমার জন্য একেবারেই গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। এই নির্বাচনের ভিত্তিতে ওই অস্থিরতা থেকে উত্তরণের জন্য আমার মনে হয় এক ধরনের সংকল্প লাগবে। আমাদের রাজনীতিবিদদের কাছে এই দাবিটা করতে হবে। তোমরা যে যার সাথে প্রতিযোগিতা করো কিন্তু জাতীয় কতগুলো মৌলিক বিষয়ে আমাদের নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং আমাদের অধিকারের প্রশ্নে আমাদের ঐক্যমত্য লাগবে। এই হরমুজ প্রণালীর আপনার এই ছোট প্রশ্নটির আমি একটা বড় উত্তর দিলাম।

রোকসানা আনজুমান নিকোলঃ নির্বাচনের কথাই যেহেতু বললেন, গত তিনটি নির্বাচন নিয়ে নানান ধরনের সমালোচনা। আপনি নিজেও করেছেন। আগামী যে নির্বাচনটি হবে যদিও তারিখ বা সময়সীমা নিয়ে আপনার মধ্যেও আমি কিছুটা দ্বিধা দেখলাম বা এখনো আশ্বস্ত হতে পারছেন না। আগামী যে নির্বাচনটি হবে, মানে গত তিনটি নির্বাচনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে সেটা অন্তর্ভুক্তি মূলক ছিল না। সকলে অংশগ্রহণ করতে পারেনি বা অংশগ্রহণ করলেও সেটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ছিল না। আগামী নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে নির্বাচনটা হয়, ভবিষ্যতে কখনো সেই নির্বাচনের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে, মানে অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হয়েছে কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে কিনা?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমার ইচ্ছে করছে এই প্রশ্নটা আপনাকে ফিরিয়ে দেই। আপনি কি মনে করেন? এটার উত্তর আপনার কাছ থেকে হলে কি হতো? আমি আপনাকে এভাবে বলি। আওয়ামী লীগ নির্বাচনের শেষ বিচারে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি পারবে না এটা অনেকখানি নির্ভর করবে যে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেই বিচার প্রক্রিয়াটা কিভাবে শেষ হয়। অর্থাৎ এখন যে সাময়িক উনাদের উপরে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে সেই নিয়ন্ত্রণটা কি পরবর্তী দলীয় হিসেবে ওই নিয়ন্ত্রণটি তুলে নেওয়া হবে নাকি থাকবে। যদি দলীয়

হিসেবে থাকে তাহলে একরকমের পরিস্থিতি আর যদি দলীয় হিসেবে না থাকে তাহলে দল হিসেবে তাদের আরেক রকমের পরিস্থিতি। এবং সেটা আলোচনা হতেই পারে। ধরুন যদি দলীয় হিসেবে থেকে যায় এবং একই রকমভাবে ব্যক্তিবিশেষদের, যারা অপরাধ করেছেন, গণহত্যা বা নির্বিচারে নির্যাতনে অংশ নিয়েছিলেন তাদের উপরে যদি বিচার হয় তারা যদি না পারেন তাহলে বাদবাকি যে ওই দলের সদস্যরা ছিলেন তারা কি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন? এইখানেই হলো চ্যালেঞ্জ। সেটা হলো যে যদি আওয়ামী লীগের ব্যক্তিবিশেষরা, দল যদি না থাকে ব্যক্তি হিসেবে যদি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান বা অন্য কোন গোষ্ঠী হিসেবে দাঁড়ান বা যদি কোন কারণে ওনারা একক মার্ক নিয়ে দাঁড়াতে চান? আমরা তো সো কলড ডাম নির্বাচন দেখে এসেছি। তো ডামি নির্বাচন কি জিনিস আমরা তো বুঝি। উনারা যদি ডামি নির্বাচন করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন এবং সরকার তাদের নিরাপত্তা দিবে কিনা বা তারা অন্য আর প্রতিযোগীর মত সমভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিনা সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকবে। সেহেতু আমার এইটার উত্তরটা হলো যে বিচারিক প্রক্রিয়ার কি ফলাফল আসে সেটার উপর নির্ভর করবে এবং বিচারিক প্রক্রিয়ার ফলাফলে যদি দল হিসেবে থাকে তাহলে তারা কি করবে না করবে এটা তাদের ব্যাপার। আর যদি দল হিসেবে থাকতে না পারে তাহলে ব্যক্তি হিসেবে তারা নির্বাচন করবেন কি করবেন না সেটার ব্যাপার আসে। যদি হয় তাহলে তাদের পরিবেশ দিতে হয় কিন্তু আমি আপনাকে রাজনৈতিক উত্তর দেই একটা। এটা তো টেকনিক্যাল উত্তর। সেটা হলো আপনি যদি পিছনে ফিরে দেখেন উনি যে- নাম নিলাম না, তিনটি এরকম সবচেয়ে পঁচা নির্বাচন করলেন সেই তিনটি নির্বাচনের ফলে শেষে এসে ওনার যে পরিণতি হলো, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর এটাকে আপনার বুঝতে হলে এই অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের প্রত্যয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অর্থাৎ উনাদের যদি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতো, যদি বিএনপিকে আশ্বস্ত করে অংশগ্রহণ করে উনারা সংসদে রাখতে পারতেন এবং তারা বিরোধী দলের প্রকৃত ভূমিকা পালন করতে পারতেন, এমনকি হয়তো ক্ষমতাসীন দলও হতে পারতেন এবং একই রকমভাবে জাতীয় পার্টিকে এরকমভাবে যে ভূমিকায় উনারা রাখলেন সেই ভূমিকার চেয়ে আরো বেশি প্রত্যাশিত জোরদার ভূমিকা উনারা যদি রাখতেন অথবা জামাতে ইসলামের মত দলকে যদি উনারা মূলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতেন তাহলে হয়তো উনার এই পরিণতি হতো না। কারণ হলো তখন আমরা রাজনীতির সমস্ত আলোচনাকে সংসদ কেন্দ্রিক করে মূলধারাতে নিয়মের ভিতরে নিয়ে আসার সুযোগ পেতাম। সেহেতু কেউ যদি মনে করেন যে আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে বাইরে রেখে উপকৃত হবো, তাদের মত গর্দব আর কেউ নাই। কারণ হলো শেষ বিচারে নির্বাচনের একটা প্রক্রিয়ার ভিতরে যদি যুক্ত না থাকেন তাহলে সে প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ফেলে দেওয়ার জন্য অন্য কোন পদ্ধতি খোঁজার চেষ্টা করবে। যেটা আপনার জন্য কোন সময় উপকারী হবে না। হয় সে অভ্যুত্থান করবে। উর্দি পরাদের দিয়ে না হলে এই যুবশ্রেণী যেভাবে জেগে উঠে অভ্যুত্থান করেছে সেটার ভিতরে করবে। সেহেতু সাধারণভাবে আমার বুদ্ধিতে বলে যে রাজনৈতিক যত দ্বন্দ্ব সবগুলোকে আপনি ভিতরে নেন। আপনি যত বেশি নীলকণ্ঠ হতে পারবেন, এই বিষয় পান করার মাধ্যমে সংসদ তত বেশি কার্যকরী হবে, তত বেশি টেকসই হবে এবং তত বেশি জনগণের সম্পৃক্ত হবে। আমি কিন্তু বড়ভাবে দেখি

রাজনৈতিক পরিসরে যে কীভাবে আমি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের ভিতরে যাব। যেই ভুলগুলো আমরা ২০০৮-২০-২৪ এ করেছি সেই ভুলগুলো যেন আমরা আবার না করি।

রোকসানা আনজুমান নিকোলঃ অনুষ্ঠান শেষের দিকে। আপনার দিক থেকে যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমার দিক থেকে যেটা বলার ব্যাপার আছে নিকোল, সেটা হলো যে এটা তো ইংরেজিতে যাকে বলে এটা একটা এক্সাইটিং টাইম। বাংলাদেশের জন্য এটা একটা জাতি গঠনের প্রক্রিয়ার অত্যন্ত মহেন্দ্রক্ষেণে আমরা বসবাস করছি। আমাদের যে যার দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। আমাদের এখন এই মুহূর্তে নির্বাচনের কথা হচ্ছে। তিনটি বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে লোকজনের মনের ভিতরে। নির্বাচন, বিচার আর সংস্কার। কিন্তু আমি আজকে আপনাদের কাছে বলতে চাই আমার মনের ভিতরে চতুর্থ একটি বিষয় সাম্প্রতিককালে খুব বড়ভাবে ভর করেছে। সেটা হলো অধিকার এবং নিরাপত্তা। কিছু কিছু লোক যেভাবে নৈতিক খবরদারী করছে, কিছু কিছু লোক যেভাবে নারী জাতির উপর তাদের এক ধরনের মূল্যবোধ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিছু কিছু লোক কিভাবে আমাদের যে আদিবাসী সংখ্যালঘু-ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা অন্যদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও সমস্যা করছে। আমাদের বাংলাদেশের ঐতিহ্য এবং সংগ্রামের সাথে যুক্ত বিভিন্ন প্রতীক এবং বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত স্থাপনা আছে তার উপর আক্রমণ করছে। সেইগুলোকে রক্ষা করার সুরক্ষা করার ক্ষেত্রে আমি আমার সরকারের যথেষ্ট আগ্রহ, উদ্যোগ বা কার্যকারিতা দেখি না। সেজন্য আমি সংস্কার চাই। আমি বিচার চাই। আমি নির্বাচন চাই। এই তিনটে চাইতে গিয়ে আমি যেন আমার অধিকার এবং আমার নিরাপত্তা যেন সংশয় না ফেলি এইটা কম বিষয় না। আমি সেটাই আজকে সন্ধ্যায় আপনার মাধ্যমে পৌঁছাতে চাচ্ছিলাম।

যমুনা টিভি

১৬ জুন ২০২৫

স্থিতিশীলতা নিশ্চিত না হলে অর্থপাচার বন্ধ হবে না

ড. ফাহিমদা খাতুন

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং রিপোর্টগুলো দেখে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচারের প্রবণতা বাড়ছে। এর পেছনে প্রধানত দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থপাচারের প্রবণতা। যারা অবৈধভাবে টাকা উপার্জন করে, তারা সেটি দেশের ভেতরে রাখলে জবাবদিহির ভয় থাকে এবং অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা, দুদক বা গণমাধ্যমের নজরে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

অথচ বিদেশে, বিশেষ করে কিছু নির্দিষ্ট দেশে, ব্যাংকিংব্যবস্থায় গোপনীয়তা এতটাই বেশি যে তারা সেই টাকা সহজে সেখানে পাঠিয়ে নিরাপদে রাখে এবং ভোগ করে। সেখানে আয়ের উৎস সম্পর্কে বিশেষ প্রশ্ন না থাকায় তারা জবাবদিহির বাইরে থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, অনেক নাগরিক বৈধভাবে অর্থ উপার্জন করলেও দেশে নিরাপদ বোধ করেন না। রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্বল আইনের শাসন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং নীতিনির্ধারকদের প্রতি আস্থার অভাব এসব মিলিয়ে একটি অনিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে।

ফলে মানুষ বিদেশে সম্পদ স্থানান্তর করে নিজেদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখতে চায়।

২০২৪ সালে সুইস ব্যাংকে অর্থপাচার বাড়ার কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতার অন্যতম বড় কারণ হতে পারে। ২০২৪ সালের একতরফা নির্বাচনের আগে ও পরে তৎকালীন সরকারের এবং দলের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকে হয়তো দেশ থেকে অর্থ সরিয়ে নিয়েছে।

বিশেষ করে ২০২৪ সালের একতরফা নির্বাচন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দমন-পীড়ন এবং পরবর্তী সময়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শঙ্কা অনেকের মধ্যে অর্থ দেশ থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রবণতা হয়তো বাড়িয়ে দিয়েছে।

অর্থপাচার দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। প্রথমত, যেহেতু এই টাকার অনেকটাই দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত, তা দেশের উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অবকাঠামোর মতো খাতে ব্যয় না হয়ে ব্যক্তিগত ভোগে চলে যায়। ফলে রাষ্ট্রের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ কমে যায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়।

দ্বিতীয়ত, এটি সামাজিক ও নৈতিক ক্ষয় ঘটায়। একজন ব্যক্তির অর্থ পাচার করে পার পাওয়া দেখে অন্যান্যও একই পথ অনুসরণে উৎসাহিত হয়।

ফলে আইনের শাসনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমে যায়।

এই সমস্যা মোকাবেলায় সরকারের সদিচ্ছাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কেবল বক্তৃতায় সদিচ্ছা প্রকাশ করলেই হবে না। এর সঙ্গে থাকতে হবে কঠোর, নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগ। দুর্নীতিতে জড়িত রাজনীতিবিদ, আমলা বা ব্যবসায়ী যেই হোক, তাকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। বেছে বেছে কাউকে রেহাই দিয়ে কাউকে দোষী করার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত না করা পর্যন্ত অর্থপাচার পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়। নিরাপত্তা, আস্থা ও ন্যায়বিচার ফিরলেই মানুষ দেশের ভেতরেই অর্থ রাখতে উৎসাহিত হবে।

কালের কণ্ঠ

২১ জুন ২০২৫

যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচা শুক্ক অনিশ্চয়তা কেটেছে, কিন্তু কী ছাড় দিলাম জানা দরকার

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশের পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র পাঁচা শুক্ক ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। তাতে কয়েক মাস ধরে দেশজুড়ে ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদসহ সচেতন মহলে যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, সেটি কমেছে। বাংলাদেশি পণ্যে নতুন করে যে পাঁচা শুক্ক নির্ধারণ করা হয়েছে, তা আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলোর সমান বা কাছাকাছি। যদিও চীনের পাঁচা শুক্কহার এখনো চূড়ান্ত করেনি ট্রাম্প প্রশাসন।

তারপরও বাংলাদেশের পণ্যে পাঁচা শুক্ক কমানোর ঘোষণা অনিশ্চয়তা কাটিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনে কিছুটা স্বস্তি এনেছে। এতে মার্কিন বাজারে আমাদের রপ্তানি পণ্যের তুলনামূলক প্রতিযোগিতাসক্ষমতা বজায় রাখার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। একদিকে পাঁচা শুক্ক ১৫ শতাংশীয় পয়েন্ট কমেছে, অন্যদিকে আমরা এই শুক্ক কমানোর জন্য কী কী ছাড় দিয়েছি অর্থাৎ কোন কোন জায়গায় ছাড় দেওয়া হয়েছে, তা-ও বিবেচনায় নিতে হবে। আমরা দেশটিকে যা যা দিয়েছি, তা অর্থনৈতিক মূল্যমান ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার নিরিখে বিচার করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নন ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট বা এনডিএ থাকায় আমরা এখনো অনেক বিষয়ে পরিষ্কার জানি না। তবে এখন গোপনীয়তা বজায় রাখার আর কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। এটাও মনে রাখতে হবে যে আমরা যা দিতে স্বীকৃত হয়েছি, তার অধিকাংশই পরবর্তী নির্বাচিত সরকারকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

আমরা যেসব বিষয়ে ছাড় দিয়েছি, তাতে প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা আছে, কিছু কিছু বিষয়ে অন্য দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ব্যাপার আছে, যেগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও

ভূরাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। যুক্তরাষ্ট্রকে শুদ্ধছাড় দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের বেশ বড় আকারে শুদ্ধ আদায় হ্রাসের বিষয়ও যুক্ত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরকারি কেনাকাটার শর্ত পূরণের জন্য বাড়তি খরচও বহন করতে হবে। এই সবকিছুই অর্থনৈতিক অভিঘাত আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুদ্ধ আরোপ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বহুপক্ষীয় বাণিজ্যনীতির বিরোধী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এ ধরনের উচ্চশুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতি ও বিশ্ববাণিজ্যে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের সামগ্রিক রপ্তানির ওপরও তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। বাড়তি শুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় বাজারেরও সংকোচনের আশঙ্কা রয়েছে। আর সেটি হলে তা বাংলাদেশের রপ্তানির জন্য ইতিবাচক হবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত পাল্টা শুদ্ধে ভিয়েতনামসহ বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলো সমপর্যায়ে রয়েছে। এখন প্রতিযোগী দেশগুলোর সবাই উৎপাদনের খরচ কমিয়ে প্রতিযোগিতাসক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করবে। পাল্টা শুদ্ধের ফলে মার্কিন আমদানিকারকদের সঙ্গে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের দর-কষাকষির গুরুত্ব বেড়ে যাবে। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, মেধাস্বত্ব আইনের প্রয়োগ, শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অন্য অশুদ্ধ বিষয়গুলোর গুরুত্বও বেড়ে যাবে।

ভবিষ্যতে মার্কিন বাজারে প্রতিযোগিতাসক্ষমতা বজায় রাখতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন, ব্যবসার খরচ কমানো, বাণিজ্য সহজীকরণের ওপর নজর দেওয়া আরও জরুরি হয়ে পড়বে।

প্রথম আলো

০২ আগস্ট ২০২৫

আমরা কিছুটা স্বস্তির জায়গায় এসেছি

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

অনেক আলাপ-আলোচনার পর যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুদ্ধ কমে ২০ শতাংশ নির্ধারিত হলো। এর মাধ্যমে আমাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান হয়েছে। বলা চলে, কিছুটা স্বস্তির জায়গায় আমরা এসেছি। কারণ, ৩৫ শতাংশ শুদ্ধ নির্ধারণ হলে চলমান যে ১৫ শতাংশ শুদ্ধ আছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এটি ৫০ শতাংশে দাঁড়াত। এখন তা মোট ৩৫ শতাংশ হলো। যদিও এটা অনেক উচ্চহার। তার পরও আমাদের যারা প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ আছে, তাদের সাপেক্ষে এটি আমাদের কিছুটা প্রতিযোগিতা সক্ষমতা দেবে। কারণ, ভিয়েতনামের ওপরও ২০ শতাংশ নির্ধারিত হয়েছে। পাকিস্তান, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার ওপর ১৯ শতাংশ। ভারতের ওপর আবার ২৫ শতাংশ। তার মানে, ভারত বাদ দিলে মোটামুটি সবাই সমপর্যায়ে আছে।

অতিরিক্ত শুদ্ধ আরোপ হওয়ার কারণে মার্কিন বাজারে চাহিদার অবনমন হতে পারে। এটার জন্য বাংলাদেশকে ছাড়ও দিতে হয়েছে। যদিও সব শর্ত জানা আমাদের সম্ভব হয়নি, তার পরও আমরা জেনেছি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৫টি বোয়িং বিমান কেনা, গম কিংবা এলএনজি আমদানি ইত্যাদি করতে হবে। অর্থাৎ, এখানেও ট্রেড-অফের (এক জিনিস পাওয়ার জন্য অন্য কিছু ছেড়ে দেওয়া) বিষয় আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে আরও কিছু দাবি ছিল। যেমন, মেধাস্বত্ব আইন, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ইত্যাদি সব কিছু বিবেচনায় নিয়েই আমাদের দেখতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে ২০ শতাংশ অতিরিক্ত শুদ্ধ আরোপ বা নতুন করে সেখান থেকে অতিরিক্ত আমদানি আমাদের অর্থনীতিতে বাড়তি চাপ তৈরি করবে। বস্তুত ট্রান্সপের এই উদ্যোগে বিশ্ব বাণিজ্যের ওপরই একটা বিরূপ প্রভাব পড়বে। এতে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির ওপরও প্রভাব পড়বে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বহুপক্ষীয় যে বাণিজ্যিক ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল, সেখানেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এবারের অতিরিক্ত শুদ্ধ আরোপ বহুপক্ষীয় কিংবা দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে সংকট তৈরি করবে। এটি বৈশ্বিক বাণিজ্যকে দুর্বল করে দেবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই নানাবিধ বিষয় লক্ষ্য রেখেই আলোচনা করে ২০ শতাংশ ঠিক করেছে। এটা ডব্লিউটিওর সঙ্গে আলোচনা নয়, যেখানে এক দেশের এক ভোট। বরং যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের আলোচনা করতে হয়েছে। আমাদের যেসব বিষয়ে ছাড় দিতে হয়েছে, নিশ্চয়ই তার একটা অর্থনৈতিক মূল্য আছে। তবে ৩৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে নামার ফলে আমরা আমাদের মূল প্রতিযোগীদের সাপেক্ষে একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে যেতে পেরেছি।

এর জন্য যে আমরা ছাড় দেব তাও লক্ষণীয়। যেমন, ইউক্রেন থেকে গম আনলে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে খরচ কম পড়ত। এলএনজি মধ্যপ্রাচ্য থেকে আনলে খরচ কম পড়ত। আবার এত বিমান কেনার পরিস্থিতি আমাদের হয়তো এখন নেই, তার পরও সে পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। গমের কথা যদি বলি, সরকার আনলে হয়তো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ব্যবহার করবে, তার মানে ভর্তুকি দিয়ে সরকারকে আনতে হবে। আবার ব্যক্তি খাত যদি এই গম আমদানি করতে চায়, তবে সরকারকে সেভাবে তাদের সহযোগিতা করতে হতে পারে, যাতে অন্য দেশের বদলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনা হয়।

আরেকটা বিষয়, চীনের সঙ্গে শুষ্কের যে পার্থক্য আগে ছিল, সে কারণে আমাদের পোশাকশিল্প কিছুটা লাভবান হচ্ছিল। জুতাসহ অন্যান্য শিল্পও সেভাবে লাভবান হয়েছে। আগে চীনের ওপর অতিরিক্ত ২০ শতাংশ শুল্ক ছিল। এখন আমরা দেখছি, সেখানে ৩০ শতাংশ আরোপ করা হয়েছে। যদি আগের ২০ শতাংশের সঙ্গে এটি যোগ হয়, তবে আমাদের জন্য ইতিবাচক। কিন্তু যদি মোট ৩০ শতাংশ হয়, তবে আমাদের জন্য নেতিবাচক। ফলে এসব বিবেচনা রাখতে হবে।

এরপরও বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কিছুটা লাভবান হতে পারি, যদি ক্রেতাদের সঙ্গে সেভাবে দরকষাকষি করতে পারি। যেমন, ভিয়েতনামের সঙ্গে একই পণ্যে আমরা প্রতিযোগিতা করছি, উভয়ের শুল্কও সমান। এ ক্ষেত্রে লাভবান হতে গেলে যে মূল্যে আমরা বিক্রি করতে পারব, তা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, আগে একটা পণ্যের দাম ছিল ১০ ডলার। এখন ব্যবসায়ীরা চাইলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতার সঙ্গে দরকষাকষি করে দাম কিছুটা বাড়তে পারে। এমনও হতে পারে, উভয়ের সম্মতিতে শুষ্কের পরিমাণ কিছুটা ক্রেতার ঘাড়ে এবং কিছুটা নিজে নিতে পারে। এতে একই শুল্ক সত্ত্বেও আমরা প্রতিযোগীদের তুলনায় এগিয়ে থাকতে পারি।

সমকাল

০২ আগস্ট ২০২৫

অর্থনীতি যে জায়গায় ছিল সেখান থেকে বেশকিছু সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ২৫ বছর শিক্ষকতা করেছেন। গবেষণাকর্মের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টির মর্যাদাপূর্ণ ইব্রাহিম স্মৃতি স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের বছরপূর্তিতে অর্থনৈতিক সংস্কার, বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও সামষ্টিক অর্থনীতির চালচিত্র নিয়ে কথা বলেছেন বণিক বার্তায়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাবরিনা স্বর্ণা

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এ সরকার দায়িত্ব নেয়ার সময় দেশের অর্থনীতি একপ্রকার খাদের কিনারে ছিল। সে জায়গা থেকে গত এক বছরে অর্থনীতিকে কতটা নিরাপদ জায়গায় আনতে পেরেছে বর্তমান সরকার?

যে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছিল, সেটি মোকাবেলার একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু এ সরকারকে একই সঙ্গে রাজনৈতিক, ভূরাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন আকস্মিক সমস্যার সমাধানে কাজ করতে হয়েছে। ফলে অর্থনীতির জন্য যে ধরনের মনোযোগ এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন সংস্কারের জন্য যে ধরনের গুরুত্ব দেয়া দরকার ছিল, সরকার সেই সুযোগ-সময় পুরোটা পায়নি। কিন্তু তার পরও সরকার চেষ্টা করেছে। কারণ জুলাই আন্দোলনের পেছনে বড় একটা যৌক্তিকতা ছিল অর্থনীতির তৎকালীন পরিস্থিতি—চাকরিপ্রত্যাশীদের কাজের প্রাপ্তিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হচ্ছিল, শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেশি, আয়বৈষম্য, ভোগবৈষম্য, সম্পদবৈষম্য ছিল। অর্থনৈতিক কার্যকারণের ভিত্তিতে অসন্তোষ ছিল এবং এর সঙ্গে রাজনৈতিক-গণতান্ত্রিক অধিকারহীনতা সংযুক্ত হয়েই একটা গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে আমি বলব যে অর্থনীতি যে জায়গায় ছিল সেখানে থেকে এখন বেশকিছু সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।

অবশ্য বেশকিছু সূচক ঘিরে যে ধরনের প্রত্যাশা ছিল সে প্রত্যাশার প্রতিফলন আমরা পাইনি। বিশেষত মূল্যস্ফীতির হারে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি।

গত বছরের জুলাইয়ে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার সর্বোচ্চ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। সেটি বর্তমানে ৮ শতাংশের ঘরে নেমে এসেছে। ধারাবাহিক মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের মধ্যে বেশ অসন্তোষ রয়েছে। জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বড় অবনমন ঘটেছে। গত তিন বছরে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জীবনমানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে মূল্যস্ফীতি কিছুটা সামাল দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু মূল্যস্ফীতির হার সামান্য কমলেও মূল্যস্তর ওপরেই রয়ে গেছে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে যে ডিসেম্বরের মধ্যে ৬ শতাংশে এ হার নিয়ে আসবে। কিন্তু এ হার ৬ শতাংশে নেমে এলেও মূল্যস্তর উর্ধ্বমুখী থাকায় এরই মধ্যে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অবনমন হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার অন্যতম উপায় ছিল ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ চাঙ্গা করে কর্মসংস্থান তৈরি এবং শোভন আয়ের সৃষ্টি করা। কিন্তু সেটা হয়নি। মূল্যস্ফীতির হার বাগে আনতে গিয়ে আমরা সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রচলন করলাম। আমাদের ব্যাংকের সুদের হার বর্তমানে অনেক বেশি। আমাদের অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক যেসব জায়গায় হাত দিয়ে কস্ট অব ডুইং বিজনেস (ব্যবসা ব্যয়) কমাতে পারতাম, সে জায়গাগুলোয় তেমন বড় পরিবর্তন হয়নি। ফলে আমরা দেখছি যে বিনিয়োগে চাঙ্গাভাব আসেনি।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যদি ডিসেম্বর পর্যন্ত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বজায় রাখা হয়, তাহলে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে যাচ্ছে?

আমরা অতীত গবেষণায়ও দেখেছি বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির হার যখন ৪-৫ শতাংশ ছিল, তখনো বিনিয়োগে স্থবিরতা ছিল। সুতরাং মূল্যস্ফীতির হার নিচে নামিয়ে আনার জন্য আমাদের চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে। ব্যাংক সুদের হার উচ্চস্তরে রয়ে গেছে। নীতি সুদহার আমরা কমাচ্ছি না। কিন্তু কেবল মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে আমরা বিনিয়োগে চাঙ্গাভাব আনব সেটাও কিন্তু না। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তারও এটার ওপর একটা অভিঘাত থাকে। তবে সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ঘোষণা করেছেন। এ কারণে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেই মনে করছি। কারণ অনেক বিনিয়োগকারী অপেক্ষা করছিলেন গণতান্ত্রিক উত্তরণের একটা নিশ্চয়তা পাওয়ার। উদাহরণ দিয়ে যদি বলি, কোন ধরনের সরকার আসবে, বর্তমান সরকারের সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা থাকবে কিনা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা কী রকম হবে, সুশাসনের অভাব যেটা একটা বড় কারণ ছিল দেশে বিনিয়োগবিমুখ হওয়ার সেক্ষেত্রে কোনো বড় পরিবর্তন আসবে কিনা।

এসবই নির্ভর করবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ওপর। কারণ এর হার কমলে নীতি সুদহার কমানো যাবে। তখন হয়তো ঋণের সুদের ওপর এটার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। কিন্তু আরো অনেক

অনুঘটকের ওপর বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের বিষয়টি নির্ভর করবে। এরই মধ্যে আমরা দেখছি যে মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানি কমেছে ২৫ শতাংশ। উপরন্তু মূল্যস্ফীতির কারণে ব্যবসা ব্যয় বেড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাণিজ্য-বিনিয়োগ সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, দক্ষতা এগুলোর ওপরও নির্ভর করবে।

যেমনটি আপনি বলছিলেন, সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সরকার অর্থনীতির অনেক বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেনি। সম্প্রতি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়ও ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচিত সরকার আসার আগ পর্যন্ত বর্তমান সরকারের মনোযোগের বিষয়ে কী পরামর্শ দেবেন?

এখনো অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে বেশকিছু সময় আছে এবং সরকার যেসব পদচিহ্ন রেখে যাবে তা যদি ইতিবাচক হয় তাহলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকারকে সেগুলো অব্যাহত রাখতে হবে। নয়তো জনগণের একটা চাপ নির্বাচিত সরকারের ওপর থাকবে। সুতরাং পার করে আসা সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার যে ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো নিয়েছে এবং সামনে যেগুলো তারা করতে পারবে সেটার একটা বড় ধরনের ইতিবাচক প্রভাব থাকবে বলে আমি আশা করি।

দেশের অর্থনীতির সংস্কারের বেশ ভালো কিছু উদ্যোগ আমরা এরই মধ্যে দেখেছি। বিশেষত বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ ভালো কয়েকটা উদ্যোগ নিয়েছে, যার মধ্যে একটি দুর্বল ব্যাংকগুলোকে একীভূতকরণ করার উদ্যোগ। এছাড়া যে ব্যাংকগুলোয় বিপুল অংকের ঋণখেলাপি হয়েছে, সেসব ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সেজন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। খেলাপি ঋণের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা আনা হয়েছে। অন্তত আমরা এখন জানতে পারছি যে ব্যাংকগুলোর প্রকৃত অবস্থা কী এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আরো ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। আশা করি, এ বিষয়গুলো সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক আগামীতেও অব্যাহত রাখবে। তারা এমন একটা জায়গায় এগুলো রেখে যাবে যেন নির্বাচিত সরকারও সেগুলো অব্যাহত রাখতে পারে। সেই সঙ্গে সেটাকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। জনগণের মধ্য থেকেও যাতে এসব কাজের জন্য চাপ থাকে।

পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার বিষয়ে কতটা অগ্রগতি হয়েছে?

দেশ থেকে পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনতে এখন পর্যন্ত আমরা বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। কিন্তু টাকা তো এখনো ফেরত আনা যায়নি। এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু যেসব প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেগুলোও চলমান রাখতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সম্মিলিতভাবে কাজ করে মামলা করা, মামলার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আবেদন ইত্যাদি করেছে। তারপর আবার উচ্চ আদালতে অভিযোগ প্রমাণও করতে হবে। এসব প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয়নি। তাই এগুলো চলমান রাখা জরুরি।

বিনিয়োগ চাঙ্গা করতে করণীয় কী হতে পারে?

কেবল বিনিয়োগ নয়, পাশাপাশি বাণিজ্য, বাজার ব্যবস্থাপনাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো চাঙ্গা করা জরুরি। আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিস দেয়ার কথা বলছি। কিন্তু সেটি আমরা পারছি না। এক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যা আছে। অবকাঠামোগত সমস্যার পাশাপাশি আমাদের দক্ষ শ্রমিকের অভাব আছে। আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের কথা বলছি, কিন্তু যদি গ্যাসের সরবরাহ না থাকলে কীভাবে ব্যবসায়ীকে গ্যাস দেব? সরবরাহ সক্ষমতা থাকলে হয়তো বলা যায় যে দ্রুত আপনাকে গ্যাসের জোগান দেব। এগুলো রাতারাতি সমাধান করা যায় না। কিন্তু অন্তত সমাধানের উদ্যোগ নেয়া যায়। যেমন আমাদের অফশোর-অনশোরে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য উদ্যোগ নেয়া দরকার। আমাদের জ্বালানি খাতে বেশকিছু ভালো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সেগুলোও অব্যাহত রাখতে হবে।

এছাড়া বিনিয়োগ পরিস্থিতি উন্নয়নে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল চালুর জন্য বেশকিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন শৃঙ্খলা বজায় থাকে। প্রয়োজনে প্রকল্পগুলো কাটছাঁটও করতে হবে। কারণ আমরা জানি, বিগত সময়ে প্রকল্পই ছিল দুর্নীতির বড় ক্ষেত্র। বর্তমানে এসব ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করে বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। সেই পদক্ষেপগুলো আগামীতে এমনভাবে নীতি-নিয়মের মধ্যে স্থিত করতে হবে, যাতে পরবর্তী সময়ে যারাই দেশের দায়িত্ব নেবেন তারা একটা শৃঙ্খলার মধ্যে পড়তে বাধ্য হন।

কিন্তু হতাশার একটি জায়গা হলো, চলতি বছরের জন্য যে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে, সেটি খুবই গতানুগতিক হয়েছে। আগের বাজেটের গতানুগতিকতা থেকে বের হয়ে এসে আমরা যে নতুনভাবে চিন্তা করব, বাজেট বিন্যাস করব, সেটি হয়নি। সেটা করতে হলে আমাদের বেশকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ জিডিপি অনুপাতে বাড়তে হলে কোন খাতগুলোয় কাটছাঁট করতে হবে সেটা মূলত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং অত সহজ সিদ্ধান্ত নয়। কিছু ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ানো হলেও মূল্যস্ফীতির নিরিখে তা খুবই নগণ্য। কারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। এ বিষয়গুলোয় বড় ধরনের কোনো সংস্কার বা ধাক্কা যেটা আগামী বাজেটগুলোর জন্য একটা রেফারেন্স পয়েন্ট হয়ে থাকতে পারত, সেটা অন্তর্বর্তী সরকার করতে পারেনি।

এর বাইরে বাংলাদেশের জন্য আগামীতে একটা সমস্যা হয়ে থাকবে ঋণের বোঝা। আমাদের পুরো উন্নয়ন ব্যয় হয় অভ্যন্তরীণ ঋণ থেকে বা বৈদেশিক ঋণ দিয়ে। ফলে ঋণ পরিষেবার চাপ এখন আমাদের ক্রমাগতই বাড়বে। তাই বাজেটের অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। ঋণ যাতে কম নিতে হয় সেজন্য রাজস্ব বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকতে হবে। তাই রাজস্ব খাতের সংস্কারে আরো জোর দেয়া আবশ্যিক।

গ্যাস খাতের উন্নয়নের জন্য গঠিত তহবিলের অর্থ গ্যাস অনুসন্ধানের চেয়ে ঋণ হিসেবে ও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বেশি দেয়া হয়েছে। সেই টাকা ক্ষেত্রত আনা নিয়ে কিছু দ্বন্দ্বিক পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে গ্যাস অনুসন্ধান বা এ খাতের উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন সংকটের শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এটি সমাধানের উপায় কী?

এখানে পুরো বিষয়টাই হলো সরকারেরই একটা অংশের সঙ্গে আরেকটা অংশের বিবাদ। জ্বালানি খাতে আমাদের বড় ধরনের ব্যত্যয়ের জায়গা হলো, গ্যাস অনুসন্ধান না করে বিদেশ থেকে আমদানির জন্য আমরা এলএনজি ব্লকের কাছে আমরা জিম্মি হয়ে গেলাম। অফশোর-অনশোর কোথাও অনুসন্ধান করলাম না। আমরা সমুদ্র বিজয় করলাম কিন্তু যাদের বিপরীতে জয়ী হলাম, তারা সেখানে অনুসন্ধান করে গ্যাস উত্তোলন করছে। আর আমরা বিডিংই করতে পারিনি। এ জায়গাগুলোয় অগ্রাধিকার দেয়া হয় না। এখন চেষ্টা করা হচ্ছে এটা করার জন্য।

আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যে বিবাদ এখন হয়েছে সেটা সরকারকেই নিরসন করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় দরকার হবে। তবে আমি যেটা বুঝি সেটা হলো, আমাদের অর্থায়ন লাগবে। পেট্রোবাংলা, বাপেক্সের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। গ্যাস অনুসন্ধানকে আমাদের অবশ্যই অগ্রাধিকার তালিকার প্রথম তিনটির মধ্যে রাখতে হবে।

বণিকবার্তা

৮ আগস্ট ২০২৫

অধ্যায় ৫

বাজেট, রাজস্ব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা



সংস্কার পরিকল্পনা নির্ভর বাজেট চাই

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

আমাদের অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় হাত দিতে হবে। বর্তমানে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। সবার আগে এখন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এর পরই বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের যে পরিকল্পনা আছে, সেখানে অগ্রাধিকার পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।



ব্যাংকিং খাতের সংস্কারে যে কাজ চলছে সেটা শক্তিশালী করতে হবে। রপ্তানি বাড়াতে সংস্কারের প্রয়োজন। এই খাতের বাজার ও পণ্য বৈচিত্র্যকরণের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে।

সংস্কার পরিকল্পনা নির্ভর বাজেট চাইসামনে সরকারের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট আসছে।

আর এই বাজেট সামনে রেখে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার আছে। সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নির্ভর করবে বাজেটে নেওয়া পদক্ষেপের ওপর। অনেক বিষয়ে সংস্কার করতে আগামী অর্থবছরের বাজেটে পদক্ষেপ নিতে হবে। কিছু কিছু পদক্ষেপ হবে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে।

এর মধ্যে বেশ কিছু সংস্কার পদক্ষেপ নিয়ে পরিকল্পনা আসতে হবে। এই পরিকল্পনাগুলো হবে মধ্য মেয়াদের। আমাদের এখন সবচেয়ে বড় যা দরকার হবে তা হলো বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নজর দিতে হবে। আবার সরবরাহব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে সরবরাহ চেইনটা আরো শক্তিশালী হয়।

এর মাধ্যমে সরবরাহ ও চাহিদার যে পার্থক্য আছে, সেটা কমিয়ে আনতে হবে। সামনের দিনগুলোতে সময়মতো আমদানি করতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

সামনে রমজান আসছে। এই সময়ে অনেক পণ্যের চাহিদা বাড়বে। এটি বিবেচনা করে রমজানে বাড়তি চাহিদা থাকা পণ্য ও সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আগে থেকে পদক্ষেপ নিতে হবে। এর জন্য সরকারের আগাম পরিকল্পনাগুলো থাকতে হবে। দেশের চাহিদানির্ভর পণ্যের আমদানি ও মজুদ ঠিক করতে হবে। আমাদের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মধ্যে আরো সংস্কার দরকার। সংস্কার করে এগুলোর আরো একটু দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন। এ জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি পুনর্গঠন করতে হবে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি থেকে ধীরে ধীরে আমাদের সামাজিক নিরাপত্তায় যাওয়ার পরিকল্পনা নিতে হবে। এই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে টেকসই সামাজিক নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যেতে হবে। এ জন্য সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। এটা এমন হতে পারে, সর্বজনীন পেনশন স্কিম ও সর্বজনীন ন্যূনতম মজুরি—এমন সব কার্যক্রমের দিকে যেতে হবে। যদিও এগুলো মধ্যমেয়াদি কাজ, তার পরও এসব সংস্কারের দিকে আমাদের যেতে হবে।

অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা চিন্তা করলে এখন দুই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাজেট সামনে রেখে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য যেসব পরিকল্পনা নেওয়া হবে সেসবের মধ্যে স্বল্পমেয়াদি সংস্কার কার্যক্রম নিতে হবে। আরো কিছু নিতে হবে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে। তিন বছর মেয়াদি এই বাজেট কাঠামোতে বেশ কিছু সংস্কারের প্রয়োজন হবে। এসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

এখন বিশেষায়িত মূল্যাক্ষীতির চাপ অর্থনীতিতে অব্যাহত আছে। ফলে স্থির আয়ের মানুষের ওপর যে চাপ ক্রমান্বয়ে পুঞ্জীভূত হচ্ছে, সেটা যায়নি। চাপ থেকে গেছে। এই চাপ কমাতে নজর দিতে হবে। এই চাপ কমাতে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যমানের স্থিতিশীলতা আনার মাধ্যমে করতে হবে। এই মুহূর্তে বেশি করা দরকার সরবরাহ সক্ষমতা বাড়ানো; বিশেষ করে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে।

ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের সংস্কারে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজস্ব সংস্কারে কাজ হচ্ছে। এই দুটি সংস্কার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকিং ও রাজস্ব সংস্কারের জন্য কমিশনও গঠন করা হয়েছে। এই সংস্কার কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে পারি তত মঙ্গল। ব্যাংকিং খাত বড় চ্যালেঞ্জিং। এটা করতে না পারলে মূলধন ব্যয় ও সুদহার নিয়ন্ত্রণ কঠিন হবে, যেহেতু এর সঙ্গে বিনিয়োগ সম্পৃক্ত। আর বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করবে কর্মসংস্থান। আবার বিনিয়োগের সঙ্গে সরবরাহব্যবস্থা সম্পৃক্ত রয়েছে। ফলে সরবরাহ ও চাহিদা নির্ভর করবে বিনিয়োগের ওপর। সুতরাং বিনিয়োগকে একটি স্বস্তির জায়গায় নিতে হবে। তাহলেই মূল্যাক্ষীতি একটি স্বস্তির জায়গায় নিয়ে আসতে পারব।

রাজস্ব সংস্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে কিভাবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বাড়ানো যায়, কিংবা সরকারের আয় শক্তিশালী করা যায় তার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এই সংস্কারের মধ্যে আছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পুনর্গঠন। আবার বিভিন্ন কর কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন বা প্রণোদনা কাঠামোর পরিবর্তন—এগুলো সংস্কারের মধ্যে রাখতে হবে।

সরকারের ব্যয় বা বাজেট বাস্তবায়নে সংস্কারের একটি বড় বিষয় আছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এই বাজেট বাস্তবায়ন করে। তাই মন্ত্রণালয়গুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি দরকার। সার্বিকভাবে জবাবদিহি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার কাজ করতে হবে। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা যাতে বাড়ে এ জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার দরকার। সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই জবাবদিহির সংস্কৃতি, স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কাজ করতে হবে। এগুলোই এখন বড় কাজ। প্রশাসনিক বিভিন্ন সংস্কার করলে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়বে বলে আমার মনে হয়। প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়েছে। এখন কমিটি কাজগুলো যত দ্রুত করবে, তাদের পরামর্শ যত দ্রুত পাওয়া যাবে তত ভালো। এগুলো বাস্তবায়নের জন্য যেসব সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া যাবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের মানুষের প্রত্যাশা অনেক। দেশের প্রবৃদ্ধি যেটা হয়েছে, সেখানে বণ্টনের ন্যায্যতা অনেক কম ছিল। যার ফলে আয়বৈষম্য, ভোগবৈষম্য ও সম্পদবৈষম্য বেড়েছে। দুর্নীতির মাধ্যমে দেশ থেকে টাকা পাচার হয়েছে। প্রকল্প থেকে টাকা পাচার হয়েছে। মানুষের প্রত্যাশা ছিল, আরো ভালোভাবে ন্যায্যতার মাধ্যমে বণ্টন হবে। এই বণ্টনের ক্ষেত্রে ভালো কিছু আকাঙ্ক্ষা মানুষের আছে। দ্বিতীয়ত, আমাদের সমপর্যায়ের দেশগুলো, বিশেষ করে থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং সেই দিকটি আমাদের মনে রাখতে হবে। কিভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উচ্চ স্তরে হবে, ন্যায্যতা নিশ্চিত হবে—এ দুই দিকে আরো বেশি প্রচেষ্টা থাকতে হবে। দেশের আর্থ-সামাজিক সূচকে অবশ্যই উন্নতি হয়েছে, যেখানে ধারাবাহিকভাবে সরকার ও সরকারবর্হিভূত ব্যক্তি খাতসহ অনেকের ভূমিকা আছে। দেশের উন্নয়নে জনগণের বড় ভূমিকা আছে। কিন্তু নীতিমালা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সুশাসন শক্তিশালী করার মাধ্যমে আমাদের জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধির গতি বাড়ানো এবং বণ্টনের ন্যায্যতা নিশ্চিত করা দরকার। এ দুটিই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

কালের কণ্ঠ

১২ জানুয়ারি ২০২৫

অনানুষ্ঠানিক খাত বড় হচ্ছে বলে রাজস্ব আয় বাড়ছে না

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

□ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সম্প্রতি কমেছে। এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রবৃদ্ধির কাঠামোও গুরুত্বপূর্ণ। এত দিন প্রবৃদ্ধির হার বেশি ছিল, যদিও সেই পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন ছিল; এখন প্রবৃদ্ধির হার কমেছে, কিন্তু তার কাঠামো অপরিবর্তিত থেকে গেছে। যতটুকু প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, তার গুণগত মান আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

বিষয়টি হলো একটি দেশের অর্থনীতির গুণগত মান কেমন, তা বোঝার অন্যতম মানদণ্ড হচ্ছে সংগঠিত খাত। একটি দেশের সংগঠিত খাত কতটা বড়, তার সঙ্গে সেই দেশের মানুষের কর্মসংস্থান, বিশেষত শোভন কর্মসংস্থান, নিয়মিত আয়ের নিশ্চয়তা, শ্রম অধিকার এবং সর্বোপরি সরকারের রাজস্ব আয়ের সম্পর্ক আছে। আমাদের দেশের রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত যে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম কম, তার অন্যতম কারণ অনানুষ্ঠানিক খাতের বাড়বাড়ন্ত। পরিতাপের বিষয় হলো, অর্থনৈতিক শুমারিতে জানা গেছে, গত ১১ বছরে অনানুষ্ঠানিক খাতের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে ৭৮ শতাংশ।

অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান হচ্ছে, কিন্তু সেই কর্মসংস্থান শোভন নয়। সেখানে যেমন মজুরির হার কম, তেমনি শ্রম অধিকারের নিশ্চয়তাও নেই। এসব মানুষের জীবন অনেকাংশে অনিশ্চিত। শোভন কর্মসংস্থানে যেমন বেতনের বাইরেও কিছু সুযোগ-সুবিধা থাকে, এসব ক্ষেত্রে তা নেই।

বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের অর্থনীতির ৮৫ ভাগের বেশি অনানুষ্ঠানিক। এই অনুপাত রাতারাতি বদলে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই খাতের উন্নয়নে সরকার বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। অন্যান্য কিছু পরিসংখ্যান থেকে এই খাতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা

বোঝা যায়। সেটা হলো, বাংলাদেশের বেসরকারি বিনিয়োগ ও বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ অনেকটাই কমে গেছে।

বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি অনুপাতে দীর্ঘদিন ধরেই ২৪ থেকে ২৫ শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সম্প্রতি আমরা জানতে পেরেছি, দেশে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমে গেছে, অর্থাৎ উৎপাদন খাতের প্রবৃদ্ধি কমে গেছে, অর্থনৈতিক শুমারির প্রতিবেদনে যে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে অনানুষ্ঠানিক খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানো গেলে এবং এই খাতে কর্মরত মানুষের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হলে উৎপাদনশীলতা অনেকটাই বাড়বে বলে আমি মনে করি। তাতে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে।

এলডিসি বা স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বাংলাদেশ কয়েক বছরের মধ্যেই বেরিয়ে আসবে। তখন আমাদের প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা বাড়তে হবে। এত বড় অনানুষ্ঠানিক খাত নিয়ে সেই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া কতটা সম্ভব, তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। সে জন্য এখন অর্থনীতির গুণগত মান উন্নয়নে নজর দিতে হবে।

প্রথম আলো

৩০ জানুয়ারি ২০২৫



মতামত

চ্যালেঞ্জের সময় বাজেট কী ভূমিকা রাখতে পারে

ড. ফাহিমদা খাতুন

বাংলাদেশের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ২ জুন প্রকাশিত হবে। এই বাজেট এমন এক সময়ে আসছে, যখন দেশের অর্থনীতি এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষেপে রয়েছে। সুতরাং জাতীয় বাজেট দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দুর্ভাগ্যবশত, আগের সরকারের দুর্বল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের অভাবে দেশ এক গভীর সংকটে নিপতিত হয়েছে, যার বোঝা এখন দেশকে বহন করতে হচ্ছে। দেশ ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি, রাজস্ব আহরণে দুর্বলতা, বিনিয়োগের নিম্নহার, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা, ব্যাংক খাতে উচ্চ খেলাপি ঋণ, বৈদেশিক ঋণ পরিশেবার চাপ বৃদ্ধি এবং সরকারি অর্থের অদক্ষ ব্যবহারের মতো গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

এই পটভূমিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে প্রত্যাশা অনেক। এই প্রত্যাশা আরও বেড়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতির কারণে। স্বাভাবিকভাবেই বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সরকারের। এবারের বাজেটের লক্ষ্য উচ্চাভিলাষী প্রবৃদ্ধি অর্জন নয়; বরং এটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে মনোযোগী হবে—সেটাই সবার চাওয়া।

জানা যাচ্ছে, আগামী বাজেটের আকার হবে ৭ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন টাকা, যা চলতি ২০২৫ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় শূন্য দশমিক ৮৮ শতাংশ কম। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির

(এডিপি) আকার হবে প্রায় ২ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন টাকা, যা ২০২৫ অর্থবছরের মূল বরাদ্দের তুলনায় ১৩ দশমিক ২ শতাংশ কম। এই সংকোচন সরকারের রাজস্ব শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করে। বাজেটে সামষ্টিক আর্থিক ঘাটতি জিডিপির প্রায় ৩ দশমিক ৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য রয়েছে, যা এক দশকের বেশি সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন। এটি সুশৃঙ্খল আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করছে। তবে চ্যালেঞ্জ হলো এই রাজস্ব সংযমের নীতি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা খাতের বিনিয়োগকে যেন বাধাগ্রস্ত না করে।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ এখনো মোট জিডিপির ১ শতাংশের নিচে রয়েছে, যা কয়েক দশক ধরে অপরিবর্তিত আছে। একইভাবে শিক্ষা খাতে বরাদ্দও জিডিপির ২ শতাংশের মতো, যা মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে। তাই আর্থিক কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে সামাজিক খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে কোনো ধরনের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

সরকারের জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো রাজস্ব আহরণ শক্তিশালী করা, যা সম্ভাবনার তুলনায় অনেক কম। এক দশক ধরে রাজস্ব আহরণের নিম্নহার থাকায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্য থেকে ৭ দশমিক ৬ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধির পরিকল্পনা আবাস্তব মনে হচ্ছে। সরকারের উচিত করহার বৃদ্ধি না করে করভিত্তি সম্প্রসারণ, সঠিকতা নিশ্চিতকরণ এবং করব্যবস্থার ডিজিটলাইজেশনের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বাড়ানো। উচ্চ আয়ের ব্যক্তিরা ও অনানুষ্ঠানিক খাতকে কর নেটের আওতায় আনা গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পুনর্গঠন পরিকল্পনা স্থগিত হওয়া এবং এর মাধ্যমে রাজস্ব প্রশাসন উন্নত করার প্রচেষ্টা, যা কর্মকর্তাদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে, রাজস্বব্যবস্থার সংস্কারের জটিলতা তুলে ধরছে। রাজনৈতিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও আধুনিক কর প্রশাসন, সঠিকতা রক্ষা এবং কর ফাঁকির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

ভর্তুকি সংস্কার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। জ্বালানি ও কৃষি খাতে অব্যাহত ভর্তুকি আর্থিক চাপ বাড়চ্ছে। বাজেটে এ ধরনের ভর্তুকি ধাপে ধাপে কমিয়ে লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং সম্পদের দক্ষ বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে।

বাজেটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সরকারি ব্যয়ের সুষ্ঠু ব্যবহার। বাজেটে ব্যাংক থেকে বাণিজ্যিক ঋণের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা উচিত হবে না, কারণ এতে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে এবং ঋণ গ্রহণ ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে। যেখানে সম্ভব সেখানে স্বল্প সুদে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধসক্ষমতা এবং প্রকল্পের আর্থিক-সামাজিক রিটার্ন মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের উচিত সামাজিকভাবে উপকারী ও উচ্চ প্রভাবসম্পন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগের ওপর জোর দেওয়া এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, নিম্ন রিটার্নের প্রকল্প বাদ দেওয়া।

জাতীয় বাজেট থেকে উচ্চ প্রত্যাশার একটি দিক হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি। বাংলাদেশে যুব বেকারত্ব ও আংশিক বেকারত্ব ক্রমবর্ধমান, যা শ্রমবাজারের কাঠামোগত সমস্যার সঙ্গে যুক্ত। বাজেটের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত শ্রমঘন খাতের, যেমন তৈরি পোশাক, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি এবং নির্মাণ। বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন, ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং উদ্যোক্তা সহায়তার ওপর বিনিয়োগ জরুরি। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়ন, সক্ষমতা উন্নয়ন এবং বাজার সংযোগের সহায়তা প্রদান করতে হবে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে অবশ্যই আগামী বছরে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) মর্যাদা থেকে উত্তরণের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক দিকনির্দেশনা থাকা উচিত। শুষ্কমুক্ত-কোটামুক্ত বাজারসুবিধা এবং কম সুদে ঋণের সুবিধা হারানোর কারণে রপ্তানি প্রতিযোগিতা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্রিয় কৌশল প্রয়োজন। বাজেটে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য সহজীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং রপ্তানির বৈচিত্র্যায়ণে বিনিয়োগ বিষয়ে পদক্ষেপ থাকা উচিত, যাতে কয়েকটি পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো যায়। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশোধমূলক শুষ্ক এবং এলডিসি থেকে উত্তরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাজেটে শুষ্ককাঠামো যৌক্তিকীকরণ করা উচিত, যাতে বৈশ্বিক বাণিজ্য মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা যায় এবং প্রতিযোগিতা বাড়ানো যায়।

যখন স্থিতিশীলতা ও সংস্কার অপরিহার্য, তখন বাজেটকে সামাজিক ন্যায্যবিচারের কথা ভুলে গেলে চলবে না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাবিত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সংখ্যা হ্রাস করে উপকারভোগীর আওতা বাড়ানোর পরিকল্পনা দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতিফলন। তবে সামাজিক সুরক্ষার জন্য বরাদ্দ এখনো অপরিপািত।

প্রথম আলো

২৮ মে ২০২৫

বাজেট প্রস্তুতিতে সহযোগিতা, সমন্বয় ও স্বচ্ছতার অভাব

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ। বর্তমানে তিনি আর্থ-উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো হিসেবে কর্মরত। বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন বিষয়ে বেসরকারি উদ্যোগে গঠিত নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। এ ছাড়াও তিনি জেনেভায় জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেছেন। ২০২৪ সালে দেশের বিদ্যমান সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। দেশের অর্থনৈতিক সংস্কার, বাজেট, শে^১তপত্রের সুপারিশ বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সম্প্রতি তিনি কথা বলেছেন দেশ রূপান্তরের সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন- বিজনেস এডিটর মো. মাসুম বিল্লাহ

দেশ রূপান্তর : আপনি তো শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান ছিলেন। শ্বেতপত্র প্রণয়নের প্রেক্ষাপট কী ছিল?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : সরকারের পক্ষ থেকে অর্থনীতির পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সূচনা বিন্দু হচ্ছে শ্বেতপত্র প্রণয়ন। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার যে অর্থনীতিকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেল, সেটির মূল চরিত্র কী ছিল, অর্থনীতিকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে বেগবান করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো কী সেগুলো চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে লক্ষ্যেই অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়নে শ্বেতপত্র প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কোন ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে অন্তর্বর্তী সরকার অর্থনীতিকে আরেকটু সুষ্ঠু এবং সচল করতে পারে, সেটার পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা হচ্ছে শ্বেতপত্র। সরকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী তিন মাসের মধ্যে আমরা ১২ জন মিলে

যথাসময়ে এবং যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে এটির কাজ সম্পন্ন করেছি। বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে এটি একটি অনন্য ঘটনা। সম্পূর্ণভাবে স্বপ্রণোদিত হয়ে ও স্বচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এবং জাতীয় দেশজ বিদ্যা ও মেধার ভিত্তিতে আমরা এই কাজটা সম্পন্ন করেছি। আগের টাস্কফোর্সগুলোর সঙ্গে এটির ভিন্নতা এই যে, এটি একটি চলমান সরকারের অভিপ্রায়ে তার মেয়াদকালে সম্পন্ন হয়েছে। এটা এমন না যে, এক সরকারের আমলে লিখিত হয়ে প্রণীত হয়েছে এবং আরেক সরকার এসে তা বাস্তবায়ন করবে। সেই পার্থক্যটা এখানে ছিল না।

দেশ রূপান্তর : শ্বেতপত্র প্রতিবেদন কি সরকার যথাযথভাবে ধারণ করেছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : এ সরকারের আমলে যতগুলো কমিটি বা টাস্কফোর্স বা কমিশন হয়েছে, সবই হয়েছে সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো মন্ত্রণালয় বা সংস্থার অধীনে। শ্বেতপত্র ছিল একমাত্র সরকারি উদ্যোগ, যা প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরের অধীনে হয়েছে। আমার বিভিন্ন লেখা দেখে প্রধান উপদেষ্টা মনে করেছেন যে, একটি শ্বেতপত্র হওয়া উচিত। সেই অভিপ্রায় থেকে তিনি এটি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শ্বেতপত্র প্রণয়নে কোনো কমিশন ছিল না, একটি কমিটি ছিল। আর এ কমিটি অনেক স্বাধীন এবং পেশাগতভাবে অনেক বেশি ব্যুৎপত্তিগত অবস্থানে ছিল। কমিটিতে যারা সদস্য ছিলেন, তাদের যোগ্যতা নিয়েও কোনো প্রশ্ন ছিল না। এটি যেহেতু প্রধান উপদেষ্টার অভিপ্রায় ছিল, তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রধান উপদেষ্টা এটিকে কীভাবে গ্রহণ করেছেন। প্রধান উপদেষ্টা এটিকে খুবই আন্তরিকভাবে এবং সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। আমরা ৩০ নভেম্বর প্রতিবেদনটি জমা দেই। আর ১৬ ডিসেম্বর প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিন মিনিট তিনি শুধু শ্বেতপত্রের ওপর বক্তব্য রেখেছেন। এতেই বোঝা যায়, তিনি এটিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। তা ছাড়া আমার জন্য বিশেষ সম্মানের যে, তিনি শ্বেতপত্রের ওপর বক্তব্য দেওয়ার সময় আমার নাম উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি তিনি শ্বেতপত্রের বিভিন্ন অনুমতি ও মূল্যায়ন সেখানে তুলে ধরেছেন এবং এটিকে জাতির জন্য একটি বড় অবদান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে স্বীকৃতির দিক থেকে কোনো ঘাটতি আছে বলে মনে করি না। কারণ যিনি আমাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি এটিকে বেশ সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

দেশ রূপান্তর : সরকারের অন্যান্য দপ্তর কি শ্বেতপত্রের যথাযথ মূল্যায়ন করেছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : এই মুহূর্তে অর্থনীতির বিভিন্ন অঙ্গন নিয়ে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অন্তত ৫ জন ব্যক্তি যুক্ত আছেন। অর্থসংক্রান্ত প্রধান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আছেন আরও দুজন। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট আরও ৪-৫টি মন্ত্রণালয় আছে, যেগুলোর বিষয়ে শ্বেতপত্রে উল্লেখ আছে। আরও প্রায় ৮-১০টি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিষয় শ্বেতপত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এসব মুখ্য অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো (অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক খাত, বাণিজ্য খাত, শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত ইত্যাদি) তাদের চলমান কার্যক্রমের সঙ্গে শ্বেতপত্রকে প্রাসঙ্গিক মনে

করেছেন কি না, এটিকে তারা অধ্যয়ন করেছেন কি না, শ্বেতপত্রের প্রধান প্রধান উপলব্ধিগুলো তারা তাদের চলমান কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছেন কি না, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এটিকে বিবেচনা করেছেন কি না এ ধরনের কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। একজন উপদেষ্টাও আমাদের ডেকে জিজ্ঞেস করেননি যে, তাদের চলমান কার্যক্রমের সঙ্গে শ্বেতপত্রের প্রাসঙ্গিকতা কী? ফলে এটি একটি স্বাধীন মূল্যায়ন হিসেবেই রয়ে গেছে। সরকারি কার্যক্রমের আনুতোষিক বা একটি কার্যকর উপাদান হিসেবে প্রচলিত হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এটিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ না করলেও বিদেশিরা এবং বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এটিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছে। বিদেশিরা আমাদের কাছে এটির বিভিন্ন বিষয় বুঝতে চেয়েছেন এবং তাদের দেশের উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে এটির প্রাসঙ্গিকতা কতখানি, তা তারা বুঝতে চেয়েছেন। শ্বেতপত্রের আলোকে চলমান প্রকল্পগুলোর ভবিষ্যৎ কী হবে, সেটির বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটি একটি বড় বিষয় শ্বেতপত্রকে কেন্দ্র করে হয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি খাত এটির বিষয়ে বেশ আগ্রহ দেখিয়েছে। বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় আমাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। শিল্প, বাণিজ্য ও পুঁজিবাজারের পাশাপাশি বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য পরিস্থিতি, মিয়ানমার ও ভুটানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা তারা বুঝতে চেয়েছেন। বিবর্তনশীল বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক পরিস্থিতিতে এগুলোকে কীভাবে আমাদের বুঝতে হবে এবং এসব বিষয়ের তাৎপর্য কি সেটি তারা বিশ্লেষণ করেছেন। এর বাইরে সরকারের নানা সংস্থা যেমন প্রশাসনবিষয়ক প্রশিক্ষণ একাডেমি, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (এনডিসি, স্টাফ কলেজ ইত্যাদি) এটি বোঝার জন্য পড়তে চেয়েছে। আর বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাও (এনজিও) এর বিষয়বস্তু বুঝতে চেয়েছে। পরিহাসের বিষয় হচ্ছে, সবচেয়ে বেশি যাদের আত্মস্থ করার দরকার ছিল, তারা এটিকে ব্যবহার করেননি। তবে সমাজের একটি বৃহৎ অংশ যারা সমাজের নানা ধরনের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তারা এটিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কেন এত গুরুত্ব দিল না? সে ক্ষেত্রে একটা সাধারণ উত্তর হতে পারে, উনারা হয়তো সবই জানেন। তাই এ বিষয়ে তাদের হয়তো অধিকতর জানার দরকার নেই।

দেশ রূপান্তর : এই সরকারের শুরু থেকেই নানা ধরনের সংস্কারের বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছিল, সে মোতাবেক কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়ন নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : সরকার প্রথম সংস্কারটাই করেনি। তা হচ্ছে, এই সরকার আগের সরকারের প্রস্তুত করা বাজেট নিয়ে দিনযাপন করছে। সরকার যদি আগের সেই কাঠামোর মধ্যেই অবস্থান করে, তাহলে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তারা কী সংস্কার করবেন? দ্বিতীয়ত, সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্থগিত করেছে। কিন্তু এর পরিবর্তে কোনো মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা দেয়নি। যেহেতু তারা কোনো মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা দেয়নি, তাই এই সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা কীভাবে মধ্যমেয়াদি নীতি পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে বা উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে সেটিও তারা

বলেননি। সংস্কারকে বুঝতে হলে, একটি নীতি কাঠামোর ভেতরে সময় নির্দিষ্টভাবে কিছু লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেটির উদ্যোগ নিতে হবে। সংস্কার নির্ভর করে অর্থনৈতিক ও বাস্তবিক ফলাফলের ওপরে। সরকার কি ফলাফল অর্জন করতে চাচ্ছে, সেটি আমরা বুঝতে পারলাম না। ফলে সংস্কারকে মূল্যায়ন করার সুযোগও হলো না। কি সংস্কার করতে হবে জানলাম, কিন্তু করতে চাচ্ছি কি না, কীভাবে করছি, কতখানি করছি সেটা তো জানা হলো না। বর্তমান সরকারের এটি একটি কাঠামোগত দুর্বলতা। এর ফলে সরকারের স্বচ্ছতার অভাব স্পষ্ট হয়েছে। সংস্কারের উদ্যোগগুলো কারা, কীভাবে, কতখানি বাস্তবায়ন করছে, সেটি সরকারের কোনো সংস্থার কাছে স্পষ্টভাবে বিধৃত নয়। সরকারের কোনো উপদেষ্টাকে দেখলাম না, যিনি এই পুরো বিষয়টি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে অবহিত এবং তিনি এটির বিষয়ে দায়িত্ব নিয়ে মানুষকে অবহিত করতে পারেন। সমসাময়িক সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কী হচ্ছে, জ্বালানি খাতে কী হচ্ছে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিস্থিতি কী সব বিষয়কে আত্মস্থ করে বর্তমান সরকারের সংস্কারের পথরেখাকে ব্যাখ্যা করার মতো কোনো স্পোকসপার্সন নেই।

দেশ রূপান্তর : এখন তো সংসদ নেই। তাহলে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে কীভাবে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দেশে যে আইন আছে, সেখানে লেখা আছে যে, তিন মাস পর পর বাজেট ও আর্থিক পরিস্থিতির ওপর সংসদে প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। বর্তমানে সংসদ নেই, তাই বলে কি এই সরকারের কোনো স্বচ্ছতা বা দায়বদ্ধতা থাকবে না? সরকার তো একটা সংবাদ সম্মেলন করে বাজেট ও আর্থিক পরিস্থিতির প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ করতে পারে। সরকারের ৯ মাস হয়ে গেছে। এ সময়ে তিনটি বিবৃতি হওয়ার কথা। কিন্তু একটিও দেওয়া হয়নি। ভাগ্যিস প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মাঝে একবার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছিলেন। সে কারণে আমরা কিছুটা জানতে পেরেছি। অর্থ উপদেষ্টা বা পরিকল্পনা উপদেষ্টার তরফ থেকে আমরা জানতে পারিনি। আমাদের এখন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের কাছ থেকে জানতে হয় যে, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কী।

দ্বিতীয়ত, সরকারের স্বচ্ছতার অভাব দেখা দিয়েছে। স্বচ্ছতার অভাব দেখা দিলে যা ঘটে তা হচ্ছে, আপনি যদি কোনো ভালো কাজ করে থাকেন, সেটি জানা যায় না। আবার যদি কোনো বিষয়ে সংশোধনের দরকার হয়, সে ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমালোচনাও সরকারের কাছে পৌঁছাতে পারে না। এর বড় কারণ হলো, উপদেষ্টাদের নিজেদের কাজের মধ্যে সমন্বয় নেই। অর্থনৈতিক বিষয়ে একজন উপদেষ্টা অন্যজনের সঙ্গে একটি সামগ্রিক টিম হিসেবে কাজ করেন বলে মনে হয় না। ফলে তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সমন্বয়ের অভাবের কারণে সরকারের পক্ষ থেকে কেউ বলতে পারবে না যে, কোন ক্ষেত্রে কতটুকু সংস্কার হয়েছে। ফলে সরকার ভালো-মন্দের কোনো ক্রেডিট নিতে পারছে না। এখন যদি কোনো উপদেষ্টার কাছে জিজ্ঞেস করা হয়, এডিপি বাস্তবায়নের পরিস্থিতি কেমন বা মেগা

প্রকল্পগুলোর পরিস্থিতি কী অথবা এবার কোন নীতির ভিত্তিতে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হচ্ছে তাহলে এ বিষয়ে তিনি সঠিকভাবে বলতে পারবেন বলে মনে হয় না। উপদেষ্টাদের মধ্যে কেউ একজন আরেকজনের কাজের বিষয়ে কোনো জ্ঞান রাখেন বলে মনে হয়নি। উপদেষ্টাদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব, সমন্বয়ের অভাব এবং স্বচ্ছতার অভাব দেখা যাচ্ছে। সহযোগিতা নিজেদের মধ্যেও নেই, বাইরের জগতের সঙ্গেও নেই।

দেশ রূপান্তর : কিছু দিনের মধ্যে সরকার আগামী অর্থবছরের বাজেট দিতে যাচ্ছে। এবার যে প্রক্রিয়ায় বাজেট প্রণীত হচ্ছে, সে বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : সরকার আগামী অর্থবছরের বাজেট দিতে যাচ্ছে। গত তিন দশক ধরে আমি বাজেট প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। ব্যক্তি খাতের সঙ্গে বাজেট নিয়ে এত কম আলোচনা আগে কখনো দেখা যায়নি। আগের সরকারের আমলে লোক দেখানো হলেও ব্যক্তি খাতের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করা হতো। লোক দেখানোর জন্য হলেও ঢাকার বাইরে বাজেট নিয়ে দুটো আলোচনা হতো। পেশাজীবীদের সঙ্গে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হতো। এখন তো সংসদ নেই। রাজনীতিবিদরা যমুনাতে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এতবার আলোচনায় বসলেন, তারা একবারও কি বাজেট নিয়ে কোনো আলোচনা করেছেন? তাহলে স্বচ্ছতা বা দায়বদ্ধতা থাকে কোথায়? সবচেয়ে দায়বদ্ধহীনভাবে ও অস্বচ্ছভাবে একটি বাজেট প্রণীত হতে চলেছে। আর বাজেটটি হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে আমলানির্ভর। সেই আমলারা এ কাজ করছেন, যারা গত সরকারের আমলে জিডিপির পরিমিতিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখিয়েছেন। বিগত সরকারের কোনো পরিসংখ্যান সংস্কার হয়নি। নতুন করে কোনো পরিমিতি করা হয়নি।

দেশ রূপান্তর : বিগত সরকারের পরিসংখ্যান নিয়ে নানা প্রশ্ন ছিল। বর্তমান সরকার কি পরিসংখ্যানের সঠিকতা নিশ্চিত করে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : প্রধান উপদেষ্টা যখন তার বক্তৃতায় বলেন, আমাদের জিডিপির পরিসংখ্যান স্ফীত এবং এটা ঠিক না তখন সেটা আমাদের শে^তপত্রের পর্যালোচনাকে সমর্থন করে। উনার উপদেষ্টারা বা আমলারা কেউ এ বিষয়ে কোনো কাজ করল না। প্রধান উপদেষ্টা ভবিষ্যতে হয়তো ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ হবেন এ কারণে যে, উনি শ্বেতপত্রের ওপর ভিত্তি করে যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেটিকে উনার আমলারা আক্ষরিক অর্থে প্রমাণ করতে দেননি। আগের সরকারের ত্রুটিপূর্ণ পরিসংখ্যান নিয়েই তো উনি বাজেট দিতে যাচ্ছেন। এর ফলে একটা বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। কারণ সরকার যে বাজেট দেওয়া হবে, সেটিতে তো বিগত সরকারের জিডিপির ধারাবাহিকতার ভিত্তিতেই বিভিন্ন প্রাক্কলন করা হবে। আর ওই জিডিপির ভেতরে তো অতিরঞ্জন আছে। এখন সরকার বাজেট দেবে সেই পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে। ফলে এখানে তো আলোচনার সুযোগই থাকে না। এটা বিব্রতকর পরিস্থিতির জন্ম দেবে।

দেশ রূপান্তর : সংস্কারের অংশ হিসেবে এনবিআর ভাগ করা নিয়ে যে জটিলতা দেখা দিল, সে বিষয়ে আপনার মতামত কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : সহযোগিতা, স্বচ্ছতা ও সমন্বয়ের অভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) দুই ভাগ করা নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা। এনবিআরের নীতি ও বাস্তবায়ন পৃথক করার বিষয়ে আমরা সুপারিশ করেছিলাম। এটি পৃথক করার প্রয়োজন ছিল। উনারা করেছিলেনও। কিন্তু ভালো কাজ যদি বৈঠকভাবে করা হয়, তাহলে যে ব্যাকফায়ার করে, এটিই তার উদাহরণ। উনারা আলোচনা ও সমন্বয় ব্যতিরেকে, এমনকি স্বচ্ছতা ও সত্যতাকে পাশ কাটিয়ে এটি করেছেন। যেভাবে ভাগ করার সুপারিশ করা হয়েছিল, সেভাবে করা হয়নি। কাজ সঠিকভাবে না করলে যে কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা এখান থেকে বোঝা গেল।

দেশ রূপান্তর : সরকার যে বাজেট দিতে যাচ্ছে, তারা কি সেটি বাস্তবায়ন করতে পারবে বলে আপনি মনে করেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : এই সরকারের তো বাজেট পুরোপুরি বাস্তবায়ন করার সুযোগ নেই। সরকার আগের সরকারের বাজেট ঘাড়ে বহন করেছে কোনো ধরনের স্বচ্ছ পরিমার্জন না করেই। আগের সরকারের নীতিগুলো পরিমার্জন করার বিষয়ে আমরা সুপারিশ করেছিলাম। এমনকি একটি দুই বছর মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা বলেছিলাম। বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বিদেশি অর্থায়নকারী সংস্থা, বিদেশি বিনিয়োগকারী ও যারা রেমিট্যান্স পাঠায় তাদের নিয়ে একটি উন্নয়ন ফোরাম আয়োজনের কথা বলেছিলাম। কিন্তু সেগুলো করা হয়নি। ফলে এখন বিদেশিরা এসে অর্থলব্ধি করার সঠিক জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। তারা বলছেন যে, অর্থ দিতে চান। কিন্তু কোথায় কীভাবে দেবেন, সেটা বুঝতে পারছেন না। একটি বিনিয়োগ সম্মেলন হলো। কিন্তু বিনিয়োগকারীদের সঠিকভাবে বিনিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো না। ফলে তারা কার সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানে কাজ করবেন, বুঝতে পারছেন না।

দেশ রূপান্তর : এই মুহূর্তে সরকারের কোন বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে দেখি, সেটি হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা খাত। যোগ্য ব্যক্তিদের উপযুক্ত হারে সহায়তা প্রদান করতে হবে। একই সঙ্গে সহায়তা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের একটি সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার তৈরি করতে হবে। যাতে যারা এই সুবিধার বাইরে আছে, তাদের সুবিধাভোগীদের তালিকার মধ্যে আনা এবং মাথাপিছু বরাদ্দ বাড়ানো যায়। এ কাজগুলো করা বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে এ কারণে যে, এখন স্থানীয় সরকার নেই। আর অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন তহবিলকে সামাজিক সুরক্ষার বাইরে রাখতে হবে।

এ ছাড়া সাধারণ মানুষের নিজস্ব স্বাস্থ্য ব্যয় (আউট অব পকেট এক্সপেন্ডিচার) অনেক বেশি। এটি কমানোর বিষয়ে কী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, সেটি দেখলাম না। সর্বোপরি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো ভালো নয়। কিছু ক্ষুদ্র সংখ্যার মানুষ সংঘবদ্ধভাবে মানুষের অধিকার হরণ করছে, জীবননাশের হুমকি দিচ্ছে, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যকে হুমকিতে ফেলছে। এটি চলতে পারে না। যে অর্থনীতিতে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই, যেখানে কোনো সামাজিক চুক্তি কাজ করে না। যেখানে সহনশীলতা নেই, সেখানে তো অন্য সবকিছু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে চাই। ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে দেশে সরকার পরিবর্তন হলো। কিন্তু ছাত্রদের কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য কোনো পরিকল্পনা করা হলো না। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি বা শিক্ষার গুণমান বাড়ানোর বিষয়ে কোনো উদ্যোগ দেখলাম না। এত এত সংস্কার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু মূল যে বিষয় নিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, সেই কর্মসংস্থান নিয়ে কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। কারিগরি শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সে খাতে সংস্কারের কোনো আলোচনা হলো না। সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টারা এসব বিষয়ে কার্যকর কোনো সংস্থার কথা বলছেনও না।

দেশ রূপান্তর : সম্প্রতি একটি গুজব শোনা গেল যে, প্রধান উপদেষ্টা পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন। সার্বিকভাবে এক ধরনের অস্থির পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থনীতিতে এতে কোনো ধরনের প্রভাব পড়তে পারে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : যেকোনো ধরনের অনিশ্চয়তা অর্থনীতির জন্য খারাপ। এমনিতেই আমরা একটা অন্তর্বর্তী সময়ে আছি। অর্থাৎ একবিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে পৌঁছাতে চাচ্ছি। এর মাঝে যদি আবার দুই-তিন রকমের পথরেখা বের হয়, তাহলে তো নতুন চিন্তার উদ্ভব হবে। এমন পরিস্থিতি মানুষকে আরও বিভ্রান্ত করবে, বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করবে, কর্মসংস্থানে অসুবিধা সৃষ্টি করবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও দুর্বল হয়ে যাবে এবং কিছু সংখ্যক মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে পরিস্থিতির সুযোগ নেবে। কাজেই এটি কোনো ভালো বিষয় নয়। অনিশ্চয়তা অর্থনীতির জন্য কখনোই ভালো কোনো বিষয় নয়।

দেশ রূপান্তর : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, সময় দেওয়ার জন্য।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : দেশ রূপান্তরের জন্য শুভকামনা থাকল।

দেশ রূপান্তর

২৯ মে ২০২৫

এবারের বাজেটে বৈষম্যবিরোধী চরিত্র থাকবে তো?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ। বর্তমানে তিনি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো এবং বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন বিষয়ে বেসরকারি উদ্যোগে গঠিত নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের 'শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি'র প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সম্প্রতি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের বর্তমান অবস্থা, সংস্কারসহ নানা বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার বিভূষণ সরকার ও মাসুদ রানার সঙ্গে।

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

বর্তমান সরকার যখন দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন আমরা কয়েকটি বড় সমস্যা চিহ্নিত করেছিলাম। যেমন বিগত সরকার উন্নয়নের যে ব্যয় তৈরি করেছিল, সেখানে অনেক ধরনের সমস্যা ছিল। সেই অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে বর্তমান সরকার দায়িত্ব নিয়েছিল। তথ্য-উপাত্তের মধ্যে নানা ধরনের অসংগতি ছিল, একই সঙ্গে মেগা প্রকল্প নিয়ে অতি মূল্যায়ন ও প্রচার ছিল। বিগত সরকারের পক্ষ থেকে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগকে চাঙা করতে না পারার একটা ব্যাপার ছিল। একই সঙ্গে কর আদায় করতে না পারা, মানবসম্পদ উন্নয়নে যথেষ্ট বরাদ্দ না দেওয়া। এ ছাড়া আরও অনেক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা ছিল।

আমরা তো প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশক্রমে শ্বেতপত্র করলাম। এটা দিয়ে উত্তরাধিকারের ভিত্তিভূমিটা পরিষ্কার হলো। এরপর এই সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ দাঁড়াল—অর্থনীতিকে স্থিতিশীলতার মধ্যে নিয়ে আসা। দ্রব্যমূল্য ও মূল্যস্ফীতি ক্রমে বাড়ছিল, টাকার দাম দুর্বল হচ্ছিল এবং বৈদেশিক মুদ্রার মজুত কমে যাচ্ছিল। বৈদেশিক মুদ্রা যথেষ্ট না থাকার কারণে

ঋণ পরিশোধ করা যাচ্ছিল না। আমদানির জন্য এলসি খোলা যাচ্ছিল না। তার প্রভাব জ্বালানিসহ অন্যান্য সেক্টরেও পড়েছিল। সেই জায়গায় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা একটা বড় ব্যাপার ছিল। সে ক্ষেত্রে সরকার ৮-৯ মাসে কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছে। এখন টাকার মূল্যমানে স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। রেমিট্যান্সের প্রবাহ ভালো থাকা এবং রপ্তানি চালু থাকার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে।

তবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে কাঠামোগত কিছু সংস্কার করা না গেলে অর্থনীতিকে যেভাবে সচল, দক্ষ ও প্রতিযোগিতার মধ্যে দেখতে চাই, সেভাবে এটি করা সম্ভব না। ব্যাংকিং খাত ও আর্থিক খাতের অন্যান্য দিক, যেমন কর আহরণ ও অর্থায়ন এবং দক্ষভাবে সরকারিভাবে উন্নয়ন নীতি পরিচালনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে জ্বালানি খাত এবং অতি মূল্যায়িত সরকারি প্রকল্পগুলোতে কীভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে এবং এগুলোকে যৌক্তিকভাবে তৈরি করা যায়—এগুলো একটা সংস্কারের ব্যাপার ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাচার হওয়া অর্থ কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায় এবং সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুনভাবে নেতৃত্ব কীভাবে তৈরি করা যায়। সরকার কিছু বিষয়ে অগ্রগতি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ও দক্ষভাবে তা প্রতিভাত হয়নি।

এই মুহূর্তে অর্থনীতির স্থিতিশীলতাকে টেকসই করা এবং বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির হারকে বেগবান করা দরকার। বিদেশি বিনিয়োগ তথা ব্যক্তি খাতে মোট বিনিয়োগ আগামী বছর বাজেটে গুরুত্ব পাবে আশা করি। এর ভেতর দিয়ে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্যবিমোচনকে গভীর করতে বাজেটকে ভূমিকা রাখতে হবে।

বিদেশি বিনিয়োগ তেমন আসছে না। এর মূল কারণ কী?

বিনিয়োগের পতনের বিষয়টি নতুন না। বিগত সরকারের সাড়ে ১৫ বছরে ব্যক্তি বিনিয়োগ ও জাতীয় আয় আনুমানিক ২৩ শতাংশে আটকে ছিল। তাই বিনিয়োগের স্থবিরতার বিষয়টি হলো দেড় দশকের আলোচনার বিষয়। বিষয়টি হলো, আমরা বিনিয়োগের ধারাটিকে কীভাবে উর্ধ্বমুখী করতে পারি? সমস্যাটা হলো, আমাদের মূল্যস্ফীতি বেশি ছিল। ফলে আইএমএফসহ অন্য ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদেরা বলেছেন, অর্থনীতির সংকোচনের মধ্যে পড়লে, সেখানে অর্থের প্রবাহ কমাতে পারলে মূল্যস্ফীতি কমে যায়। এটা কমানোর একটা জায়গা হলো, ব্যক্তি খাতে ঋণ দেওয়া কমানো। অর্থাৎ, সুদের হার এমন করতে হবে যে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করলে লাভ করতে পারবে না। এখানে সেটাই হয়েছে। সুদের হার এমন জায়গায় গেছে, আমাদের দেশের বিনিয়োগকারীরা টাকা ধার করে লাভজনক থাকতে পারছেন না।

এখন যদি মূল্যস্ফীতি ক্রমান্বয়ে কমে আসে এবং টাকার মূল্যমান যদি স্থিতিশীল থাকে, তাহলে আশা করা যায়, সুদের হার কমবে এবং বিনিয়োগের হার বাড়বে। কিন্তু বিনিয়োগ পরিস্থিতি আরও উন্নতি করার জন্য প্রাসঙ্গিক আইনি এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামোকে যথেষ্ট দক্ষ করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে সেবা প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণমান

বৃদ্ধি করার, তবে অগ্রগতি খুব সামান্য (আইনশৃঙ্খলাসহ)। কিন্তু যে ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক পরিস্থিতির মধ্যে থাকে, তাতে কিছুটা চাপ কমানো যায়।

একদিকে হলো গ্রহণযোগ্য সুদে অর্থ পাওয়ার ব্যাপার, অন্যদিকে গ্যাস ও বিদ্যুৎ পাওয়ার একটা বড় সমস্যা আছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জ্বালানি সংকটটা একটা বড় প্রতিবন্ধকতা। এলএনজি নিয়ে এসে সেটা কীভাবে পূরণ করা যায়, এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আগামী দিনে সেটা কীভাবে মোকাবিলা করা যাবে, সেটা আমরা বুঝতে চাই। বিশ্ববাজারে এখন গ্যাসের দাম কমছে, তাই দ্রুততার সঙ্গে এবং দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে এলএনজি আমদানি করে জ্বালানি সমস্যা সমাধান করা হোক। দেশের ভেতরও গ্যাস অনুসন্ধান অব্যাহত রাখতে হবে।

আর একটা বিষয় হচ্ছে শ্রমিক অসন্তোষ। ন্যূনতম মজুরি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ নিয়ে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার এবং মজুরির বাইরে তাঁদের ন্যায্য যে পাওনাগুলো আছে, যেমন সামাজিক সুরক্ষা, তা তাঁদের দিতে হবে। এসব হলো আধুনিক শিল্প সম্পর্কের অনুষঙ্গ। শুধু দেশের মধ্যে না, বিদেশে পণ্য রপ্তানি করার জন্য এসব মানবিক ব্যাপারগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু এগুলো নিয়ে বড় ধরনের সমস্যা রয়ে গেছে।

বর্তমান সরকারের কোনো মধ্যমেয়াদি কাঠামো নেই। ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তারা মধ্যমেয়াদি ভাবনা নিয়ে ওয়াকিবহাল না। এ সরকার যদি আগামী এক বছর পর না থাকে এবং নতুন সরকার যদি আসে তাহলে এখনকার নিয়মনীতির ধারাবাহিকতা থাকবে কি না, তা নিয়ে দৃষ্টিশ্রী আছে। এটাও একধরনের অসুবিধার সৃষ্টি করছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা একে ঘনীভূত করতে পারে।

আবার বিচার, সংস্কার ও নির্বাচনের রোডম্যাপ তৈরি না হওয়ার কারণে অর্থনীতির রোডম্যাপেও অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে ব্যক্তি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে।

আপনি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের পক্ষে কথা বলে আসছেন। এখন কোন সংস্কার সবচেয়ে জরুরি?

বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে যেসব সংস্কার-সম্পর্কিত কমিটি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার জায়গা থেকে তৈরি করা হয়েছে, সেটার সংখ্যা ১৫-এর মতো। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্কার প্রস্তাব একমত কমিশনের হাতে আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তনের জন্য সরকার

কোনো কমিশন গঠন করেনি। শ্রেতপত্র কমিটিতে আমরা অতীতের অবস্থার ব্যবচ্ছেদ করেছি মাত্র। আর একটা টাস্কফোর্স করা হয়েছিল, সেটা কিছু কিছু পরিস্থিতি নিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগে বড় কাজ হচ্ছে। জ্বালানি খাত নিয়েও একটা বড় ধরনের কাজ

হচ্ছে। অর্থনীতির কাজের পরিপূরক হিসেবে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপার আছে। যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন ও স্থানীয় সরকারের বিষয়। এর বাইরে অন্যান্য উপরিকাঠামোর পরিবর্তন অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে আমি মনে করি, সেসব প্রাসঙ্গিক নয়। অর্থনীতির ভিত্তিক রাখার জন্য যে ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা রয়েছে, সেগুলো ঠিক আছে কি না, তা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সেই জায়গায় আমি বড় ধরনের পরিবর্তন প্রত্যাশা করি।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সামনে জাতীয় বাজেট পেশ হবে। জাতীয় বাজেটের সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আমার প্রত্যাশা ছিল—যথাযথভাবে কর ব্যবস্থাপনা করা হবে। আমাদের দেশ পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যক্ষ কর যাঁরা দেন, তাঁদের আরও করের বোঝা চাপানো হয়। এ জন্য আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম, এবার প্রত্যক্ষ করকে বিস্তৃত করার জন্য যাঁদের কর দেওয়ার ক্ষমতা আছে, কিন্তু দেন না এবং তাঁরা টাকা কীভাবে নিয়ে যান। এঁদের চিহ্নিত করার কোনো উদ্যোগ এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। আবার রাজস্ব ব্যয় যেমন ভাতা, বেতন, ভর্তুকি ও সুদ দিতেই ৯০ শতাংশের বেশি ব্যয় হয়ে যায়। সেখান থেকে কোনো উদ্বৃত্ত উন্নয়ন ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় না। আমার প্রত্যাশা ছিল, রাজস্ব ব্যয় এমনভাবে দাঁড় করানো হবে, যেন উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য কোনো ঋণ গ্রহণ করতে না হয়।

বিগত সরকারের মেগা প্রকল্প নিয়ে এত সমালোচনার পর ঝেঁড়ে-মুছে ফেলে দেওয়া হলো কি না বা নতুন প্রকল্প কোন মাপকাঠিতে গ্রহণ করা হবে, তা নিয়ে স্বচ্ছতা ও পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে না। একইভাবে ঘাটতি বাজেট আমরা বিদেশের টাকার ওপর নির্ভরশীল হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যাংকের ওপর নির্ভর করে অথবা সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে ঘাটতি মিটিয়ে থাকি। ঘাটতি বাজেটের অর্থ জোগাড় করতে কী ধরনের কাঠামোগত সংস্কার করা হবে, সেটা আমরা জানতে চেয়েছি। কিন্তু আমাদের জানা-বোঝার আকাঙ্ক্ষাটা অর্থনীতি-সম্পর্কিত হলেও, তার কোনো খবর আমরা এখন পর্যন্ত জানি না।

আবার অনেক লোকসানি সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন চিনি ও পাটকল আছে, এসবকে কীভাবে পরিবর্তনের মধ্যে আনা হবে—আমরা জানতে চেয়েছি। এরপর গার্মেন্টসের পরে যেসব শিল্প আছে, তা নিয়ে নাটকীয় কী পরিবর্তন করা হবে, এসব বোঝার ব্যাপার ছিল। আবার গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে সুরক্ষার জন্য যেসব ভাতা চালু ছিল—তাদের নিয়ে কত টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে এবং সেগুলো সঠিকভাবে প্রাপ্ত লোকের কাছে পৌঁছাবে কি না, জবাবদিহি কীভাবে করা হবে। কিন্তু এসব নিয়ে কোনো ভাবনা চোখে পড়ছে না।

আমরা বারবার বলেছি, মানুষ যদি ঠিকভাবে খেতে-পরতে না পারে এবং স্বস্তিতে না থাকে, কর্মসংস্থান না হয়—এই ছাত্র-যুবকেরা যে আন্দোলন করল চাকরির জন্য কোটার বিরুদ্ধে, সেই শোভন কর্মসংস্থান যদি না হয়, তাহলে যতই সংবিধান সংস্কারের কথা বলা হোক, কোনো কিছুতেই স্বস্তি আসবে না।

বন্দর ব্যবস্থাপনা ও মানবিক করিডর নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। আপনি কী বলবেন?

এই দুটি বিষয়ের একটিতেও আমার কোনো বিশেষ জ্ঞান নেই। তবে আমি সাধারণভাবে বুঝি, এইসব বিষয়ে দীর্ঘ মেয়াদে দেশের স্বার্থকে দেখে, জাতীয় সক্ষমতা, নিরাপত্তা এবং পরিবর্তনশীল ভূকৌশল অবস্থানকে বিবেচনায় রেখে সম্পূর্ণভাবে জনগণের মতামত নিয়ে এসব করা উচিত। এ জন্য মুক্ত আলোচনা এবং জনগণের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে করা হলে সেটাই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্বাভাবিক নেই—তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আপনি কীভাবে দেখছেন?

এটা তো পরিষ্কার সাড়ে ১৫ বছর ধরে যে সরকারটি ছিল, তাদের প্রতি ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। তাদের যদি সেই সমর্থন না থাকত, তাহলে তারা যেসব দুরাচার করেছে, সে মাত্রায় করতে পারত না। কিন্তু ভারত কোনো দায়দায়িত্ব নেয়নি। তারা যে বিবেচনা থেকে কাজটি করেছিল, সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং সেটা যে ব্যর্থ হয়েছে, সেটা তারা এখনো স্বীকার করে নিচ্ছে না।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে দুই দেশের সম্পর্ক সঠিক ও সুস্থ রাখার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমি নিজেই এর সাক্ষী। সেপ্টেম্বর মাসে প্রধান উপদেষ্টা যখন জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে গেলেন, তখন এস জয়শঙ্করের সঙ্গে সভা হয়েছে। সেই সভা আমি দেখেছি। সেই সভা কিন্তু আমাদের আগ্রহের কারণে সম্ভব হয়েছিল, যাতে করে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কটা জায়গামতো ফিরে আসে। এই সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব ঢাকায় সফর করেছিলেন। এটাও একটা অগ্রগতি ছিল। সেই সময়ে আমরা চেয়েছি উচ্চপর্যায়ের একটা মিটিং হোক। আবার আমাদের আগ্রহের কারণেই বিমস্টেক সম্মেলনের পাশেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই ঘটনাগুলোকে আমি দুই দেশের সম্পর্ক নতুন করে নির্মাণের ব্যাপার হিসেবে দেখি।

তারপরে প্রত্যাশার পরে যে ঘটনাগুলো ঘটল এবং অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে দুই দেশের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হলো, সেটা আমার চিন্তার মধ্যে ছিল না। আমরা স্থলপথে সুতা আনা বন্ধ করে দিলাম। তারা ট্রান্সিশিপমেন্ট বন্ধ করে দিল আমাদের তৃতীয় দেশে যাওয়ার। কিছুদিন আগে আমরা জাহাজনির্মাণ চুক্তি বাতিল করলাম। এ ধরনের রেঘারেঘি দুই দেশের জন্যই ভালো হবে না। বাংলাদেশ ভারতকে যেমন সমুদ্রে ফেলে দিতে পারবে না, আমরাও ভারতকে হিমালয়ে পাঠিয়ে দিতে পারব না। সুতরাং দুই দেশের সম্পর্ককে সুস্থ রাজনীতি ও পারস্পরিক সম্মানের ওপর গড়ে তোলার ব্যাপার। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত যদি মনে করে এ সরকারের সঙ্গে কোনো কার্যক্রম করবে না, তাহলে সেটা বিবেচনাপ্রসূত হবে না।

আবার বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী যদি যেকোনো ঘটনাবলিকে ভারতের ওপর দায় দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চায়, সেটাও উপকারী হবে না। আমার কাছে মনে হয়, বিজ্ঞ, বিবেচনাপ্রসূত দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাধারা ও উভয়ের মৌল স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আমাদের এই সংকট থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে।

বাংলাদেশ ভূ-রাজনীতির খেলায় পরিণত হচ্ছে। চীন, আমেরিকা, রাশিয়া ও ভারতের একেক দেশের একেক রকম স্বার্থ। আমরা কি আসলেই স্বার্থের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আপনি কী মনে করেন?

আমরা এখনো অন্যের স্বার্থের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। তবে কোন কোন দেশের এই ভূ-রাজনীতির খেলা নিয়ে আগ্রহ জন্মাচ্ছে, সেটা বিবেচনায় রাখতে হবে। দুটির একটিও আমাদের জন্য উপকারী হবে না। আমাদের খেলার ভিকটিম হওয়ার জন্য এবং প্লেয়ার হওয়ার জন্য উচ্চাশা করা ঠিক হবে না। জ্ঞানোচিত, সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নের সম্ভাবনাকে বিবেচনায় রেখে অগ্রসর হওয়া উচিত। এটা চটজলদির বিষয় না। এটাকে মধ্য মেয়াদে দেখা উচিত।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের কাছে দ্বিপক্ষীয় ঐকমত্যের বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। এটা কোনো একক পক্ষের বিষয় না। অন্য কাউকে ছোট বা বড় করার ব্যাপার না। এটার জন্য আমাদের জাতীয় স্বার্থের জায়গা থেকে দুই পক্ষের ঐকমত্য লাগবে।

ড. মুহাম্মদ ইউনুস আন্তর্জাতিক মানের মানুষ। আমরা কি তাঁর এই ৯ মাসের শাসনামলে ইউনুস ম্যাজিক দেখতে পেলাম?

তিনি ম্যাজিক দেখাতে পারবেন কি না, সেটা আমি জানি না। তবে তাঁকে তো ম্যাজিশিয়ান মনে করেই জাতি নিয়ে এসেছিল। ছোট বা বড় ম্যাজিক থাকে। অনেক সময় দর্শকেরা ম্যাজিকের কলকবজা ধরেও ফেলতে পারে। সেই অর্থে দেশে কিন্তু অনেক কিছু ঘটছে। অর্থনীতি একটা খাত থেকে বের হয়ে এসেছে। বাংলাদেশ একটা বড় ধরনের সিভিল আনরেস্ট থেকে বের হতে পেরেছে। বৈদেশিক সম্পর্কগুলোকে আমরা স্বাভাবিক করতে পেরেছি। সুতরাং এই ৯ মাসে মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে ও ব্যক্তিত্বে একটা নতুন উচ্চ রেখায় আমরা পৌঁছেছি। কিন্তু এটা তো বিবর্তনশীল একটা উত্তরণকালীন সময়।

যেকোনো দেশের ক্ষেত্রে একটা উত্তর এবং পূর্ব পর্ব থাকে। উত্তর ও পূর্ব কালের মাঝখানে একটা কালপর্ব থাকে। কালপর্বের মধ্যে ধ্বংস ও সৃষ্টিও থাকে। এ জন্য এটা একটা উত্তরণকালীন সময়ও বটে। এ সময়েই মানুষের মাঝে জমে থাকা সব ধরনের ক্রন্দ, ঘৃণা, ব্যর্থতা ও হতাশা বেরিয়ে আসে। সবচেয়ে কলুষ মনের প্রকাশ ঘটে। এটা আমাদের নারী,

বিপন্ন ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর প্রতি এবং সংখ্যালঘু জনগণের প্রতি আমরা আমাদের হিংসা ও বিদ্বেষ ধাবিত করি। আবার তাদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাও সংঘবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। এ রকম একটা সময়ের ভেতরে আমরা এখন অবস্থান করছি। এ সময়ে আমাদের সবচেয়ে কলুষ জিনিসটা প্রকাশ পাচ্ছে, একই রকমভাবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে অথও মানবিকতার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। দুর্বলভাবে হলেও সেটা প্রকাশ্যে আসছে। এটার মধ্য দিয়ে দেশ এগিয়ে চলছে।

ইউনুস ম্যাজিকের বাতাবরণ আমাদেরকে সঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষায় আছি।

মব জাস্টিস নিয়ে কী বলবেন?

যে কালপর্ব চলছে, সেখানে ব্যক্তি, গোষ্ঠীর কলুষ দিকটি বের হয়ে আসে, সংঘবদ্ধভাবে তারা মানুষের ওপর অত্যাচার করার চেষ্টা করে। সেটিকে মব জাস্টিস বলা হচ্ছে। মব কীভাবে বিচারের মধ্যে পড়ে, সেটা আমার জানা নেই। দেখা যাচ্ছে, এই মবের মাধ্যমে সবচেয়ে বিপন্ন মানুষগুলোর ওপর আক্রমণ হচ্ছে। সে কারণে বর্তমান সরকারের মনোযোগের জায়গাটা শুরু হয়েছিল সংস্কার নিয়ে, তারপর সেই সংস্কার থেকে সরে গিয়ে কোনো কোনো দল নির্বাচনকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু নাগরিক অধিকার, নাগরিক নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বেশি নিমজ্জিত থাকতে হচ্ছে এখন। স্বল্পসংখ্যক মানুষ যে সংঘবদ্ধভাবে পুরো সমাজকে বিপন্ন করে দিতে পারে এবং একটা রাষ্ট্রকে অসহায় করে দিতে পারে, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন থেকে আমাদের বড় শিক্ষা নেওয়ার ব্যাপার আছে। কীভাবে নাগরিকেরা এটাকে প্রতিরোধ করবে, সেটা নিয়ে ভাবার দরকার আছে। শ্রীলঙ্কায় আমাদের মতো অভ্যুত্থান হয়েছে।

কিন্তু আমরা কেন তাদের মতো করে ঘুরে দাঁড়াতে পারছি না?

শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিকভাবে পার্থক্যটা হলো, সেখানে আমাদের মতো গণ-অভ্যুত্থান হয়ে রাজনৈতিক সরকারের পতন হয়েছে। কিন্তু তাদের যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল, সেগুলো আমাদের চেয়ে অনেক বেশি টেকসই এবং অনেক বেশি পেশাদার ছিল। সেগুলো অনেক বেশি অরাজনৈতিকভাবে কাজ করত। ১৫-২০ বছর বা আরও বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন বিচারব্যবস্থা, আইন সভা, নির্বাহী বিভাগ এবং নজরদারি করার জন্য কমিশনগুলো শ্রীলঙ্কায় অনেক বেশি পেশাদারত্ব ও অরাজনৈতিকভাবে কাজ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে দুঃখজনকভাবে এসব প্রতিষ্ঠানকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে দলীয় প্রভাব তৈরি করে।

সে জন্য শ্রীলঙ্কা যত তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে, বাংলাদেশ সেভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। শুধু শ্রীলঙ্কা কেন, নেপালে একটা মাওবাদী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে। কিন্তু কখনো শুনেছেন নেপালে নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে কোনো দল বিতর্কে জড়িয়েছে। তাদের নির্বাচন কমিশন কিন্তু ঠিকভাবে কাজ করেছে। এসব দেশ থেকে কিন্তু বাংলাদেশের অনেক কিছু শেখার আছে।

আপনি কি এই সরকারের মধ্যে সমন্বয়হীনতা দেখতে পান?

এই মুহূর্তে সরকারের ভেতরে শুধু (অর্থনীতির বিষয়ে বলতে চাই) সমন্বয়হীনতার চেয়েও বেশি দেখি সহযোগিতার অভাব। এটা হলো একটা অনির্বাচিত সরকার, সীমিত ম্যান্ডেটের সরকার এবং নির্দিষ্ট সময়ের সরকার। সরকারের সবার সঙ্গে সহযোগিতা নেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু সেটা আমি এখনো দেখিনি। ড. মুহাম্মদ ইউনূস সেটা করলেও তাঁর সহযোগীরা সেটা করেন না। তাঁদের পক্ষপাতও আমি অনেক সময় দেখতে পাই। তাঁরা টিম হিসেবেও কাজ করেন না। তাঁরা আসলে নিজেরা নিজেদের মতো করে কাজ করেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই এবং সে কারণে সংস্কারের পরম্পরাও দেখা যাচ্ছে না।

সবশেষ হলো স্বচ্ছতা। তাঁরা যেসব কাজ করেন, সেটাও ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারেন না। আমি অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে বলতে চাই, অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে উন্নতিটুকু হলো, সেটার ক্রেডিটও তাঁরা নিতে পারেন না কৌশলগত যোগাযোগের অভাবে। আমাদের অর্থনীতির বিষয়ে জানতে হলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব যদি অর্থনীতি নিয়ে ব্রিফ করেন, তখন জানতে পারি। মানে অর্থ উপদেষ্টা সেভাবে জানাতে পারেন না। এসব ঘটে সহযোগিতার অভাবের কারণে। সহযোগিতা, সমন্বয়হীনতা, স্বচ্ছতার অভাব দেখছি। একই সঙ্গে সিদ্ধিচার অভাবও দেখছি।

এ সরকার সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

এই সরকার সম্পর্কে জনগণের যে প্রত্যাশা, সেটা যেন হতাশায় পরিণত না হয়। আমরা সেই প্রত্যাশার প্রতি অনুগত থাকতে চাই।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা সুবর্ণ সুযোগ ছিল একটা কাঠামোগত সংস্কারের জন্য। সেই কাঠামোগত সংস্কারের সুযোগটা এই দুর্যোগের মধ্যে এসেছিল। সেই সুযোগটা তারা যেন নষ্ট না করে। এখন পর্যন্ত সেই জায়গায় কোনো অগ্রগতি দেখছি না। আর রাজনীতির ক্ষেত্রে বলব, একটা সঠিক নির্বাচনই হলো এই সংকট থেকে উত্তরণের চাবিকাঠি। তাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক সঠিক নির্বাচন (আসন ভাগাভাগির নির্বাচন না)—এ রকম একটা নির্বাচন দেখার জন্য দেশবাসী অপেক্ষায় আছে।

সবকিছু মিলিয়ে কী মনে করেন, সেই ধরনের একটি নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

বাংলার মানুষ সব সময় আমাদের চমকিত করেছে। আশা করি, এবারও করবে। আমি ভরসা রাখি মানুষের ওপরে।

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আপনাদেরও ধন্যবাদ।

আজকের পত্রিকা

১ জুন ২০২৫

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের কোনো উদ্ভাবনী কৌশল নেই

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশের আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও প্রত্যাশা পূরণে সাফল্যের বিচারেই ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে বিভিন্ন দিকের মূল্যায়ন সমীচীন ও যৌক্তিক হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কালে প্রণীত এ বাজেটের মূল দর্শন হওয়ার কথা ছিল বৈষম্য হ্রাস এবং কর্মসৃজনের মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির ভিত রচনা করা, যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক সরকারের জন্য একটি পথনির্দেশ রেখে যেতে পারে। বাজেটে প্রস্তাবিত রাজস্ব আয় ও কর কাঠামো, রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়ের-বিন্যাস, আয় পুনর্বণ্টনের ন্যায্যতা, খাতওয়ারি ব্যয় এবং ও উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রাধিকার নির্ধারণের মাপকাঠিতেই বাজেটকে মূল্যায়ন করা, সে কারণে যুক্তিযুক্ত হবে। আর এসব অর্জন করতে হলে উচ্চমূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে চাঞ্চল্য আনা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে এবং বিনিয়োগ-ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগের প্রস্তাব থাকলেও বণ্টনের ন্যায্যতা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির বর্তমান চাহিদার নিরিখে প্রস্তাবিত বাজেট গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী হয়েছে, সে কথা বলা যাবে না।

আয়বৈষম্য হ্রাস ও প্রত্যক্ষ কর কাঠামো

গত দুই বছরে গড় মূল্যস্ফীতির উচ্চহারের কারণে ভোগ্যপণ্যের মূল্য ২০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সে বিবেচনায় করমুক্ত আয়ের সীমা ২০২৫-২৬ করবর্ষের জন্য অপরিবর্তিত রেখে ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ করবর্ষে ২৫ হাজার টাকা মাত্র বৃদ্ধি করা হয়েছে। দুই বছর আগে নির্ধারিত করমুক্ত যে আয়ের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল তার ক্রয়ক্ষমতার অবনমনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয়কর কাঠামো নিম্ন মধ্যবিত্তের

ওপরে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে। এ সীমা ৪ লাখে নিলে এবং ২০২৫-২৬ করবর্ষ থেকে বাস্তবায়িত হলে তা অধিকতর যুক্তিসম্মত হতো। অন্যদিকে, আয়করের বিভিন্ন স্ল্যাবের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন করা হয়েছে (৫ শতাংশ স্ল্যাব বাতিলের প্রস্তাবের সাপেক্ষে) তা মূল্যস্ফীতির চলমান প্রেক্ষাপটে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করবে, বিশেষত যখন মজুরি ও আয় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে না। যাদের বাৎসরিক আয় ৬ লাখ টাকা বা ১০ লাখ টাকা তাদের আয়কর প্রস্তাবিত করহারের ফলে আগামী দুই করবর্ষে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ১২.৫ শতাংশ ও ১৬.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। যেসব পরিবারের মাসিক আয় ৬০-৭০ হাজার টাকা, ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ করবর্ষের জন্য প্রস্তাবিত কর কাঠামোয় তাদের কর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের তুলনায় প্রতি বছর ১১ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যেসব পরিবারের বাৎসরিক আয় ৩০ লাখ টাকা তাদের কর তুলনামূলকভাবে কম হারে অর্থাৎ ৭.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। এটা অবশ্য ইতিবাচক যে, বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য করমুক্ত আয়ের ক্ষেত্রে বাড়তি ছাড় দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ কর হার কোভিড-পূর্ব ৩০ শতাংশের পর্যায়ে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ করবর্ষ থেকেই কার্যকর হবে। এ প্রস্তাব আয় পুনর্বন্টনের ন্যায্যতার দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হয়েছে তা অবশ্য অনস্বীকার্য।

এটা সুবিদিত যে, আয়বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের ওপর জোর দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ করের অণুপাত এক-তৃতীয়াংশ বনাম দুই-তৃতীয়াংশ। অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেই এটা বিপরীত। এটা প্রত্যাশিত ছিল যে, প্রত্যক্ষ করের ওপর জোর দিয়ে এবং অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা না চাপিয়ে কর ভারে সমতা বিধান ও বন্টনে ন্যায্যতা আনার সচেতন প্রয়াস প্রস্তাবিত বাজেটে পরিলক্ষিত হবে। সর্বোচ্চ কর হার ৩০ শতাংশে নেওয়া এবং সম্পদের সারচার্জ পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে সে লক্ষ্যে একটি চেষ্টা বাজেটে আছে। কিন্তু এসব আগেও ছিল। এসবের অতিরিক্ত পদক্ষেপ হিসেবে সম্পদ কর বা উত্তরাধিকার করের মতো ব্যতিক্রমী উদ্যোগের প্রস্তাব বাজেটে করা হয়নি।

অপ্রত্যক্ষ করকাঠামো ও তার তাৎপর্য

আইএমএফের সঙ্গে ২০২৩ সালে সম্পাদিত ঋণ চুক্তির অধীনে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশের অভিন্ন কাঠামোয় নেওয়ার জন্য সংস্থাটির একটি শর্ত ছিল, যার প্রতিফলন বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাবে দেখা গেছে। বেশ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে ভ্যাট বৃদ্ধি করা হয়েছে; অনলাইন ব্যবসায় কমিশনের ওপর ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে; গৃহস্থালি পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। এগুলো ভোক্তার ওপরই শেষ বিচারে বর্তাবে। যদিও অপ্রত্যক্ষ করকাঠামোর যৌক্তিকরণ ও অ্যান্টি-এক্সপোর্ট বায়াস হ্রাসের লক্ষ্যে বেশ কিছু পণ্যে আমদানি শুল্কহার হ্রাস করা হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ও ট্রান্সপের পাল্টাপাল্টা শুল্কের পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ গ্রহণও এ ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা রেখেছে। বাজেটে ন্যূনতম মূল্য ও ট্যারিফ মূল্য প্রত্যাহারের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে এবং কয়েকটি

পণ্যের ন্যূনতম মূল্য হ্রাস করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে আবার কয়েকটি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিও করা হয়েছে, যার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

শুল্ককাঠামো ও সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে বাড়তি আরও একটি স্তর যোগ করা হয়েছে। আমদানিপণ্যের ওপর শুল্কের পুনর্বিন্যাস কোন কোন বিবেচনায় নির্ধারণ করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে স্পষ্টতা থাকা উচিত ছিল। আমদানি প্রতিস্থাপক, শিল্পের সুরক্ষা, অ্যান্টি-এক্সপোর্ট বায়াস হ্রাস বা অন্য যেসব বিবেচনা শুল্কহার বিন্যাসের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা হিসেবে কাজ করেছে তা স্বচ্ছতার সঙ্গে উপস্থাপন করা উচিত ছিল। বাণিজ্যনীতি ও শিল্পনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও আমদানি শুল্ক, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ককাঠামো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্প খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ওপর তার প্রভাব কতটা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে তাও স্পষ্ট নয়। ফলে, স্থানীয় শিল্প আমদানিকৃত পণ্যের সঙ্গে আরও বেশি অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনা

কর আদায় বৃদ্ধি, সহজভাবে কর আদায়ের সুবিধার্থে এবং কর ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা মোকাবিলা করতে গিয়ে অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম ভ্যাট ইত্যাদিসহ উৎসে কর কর্তনের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা বিগত সময়ে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রচলিত ধারা থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বের হতে পারেনি। অনেক পণ্যে নতুন করে দুই শতাংশ হারে অগ্রিম আয়কর আরোপ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের ক্ষেত্রে আগাম কর ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ করা হয়েছে, যদিও এটাকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ধরে নেওয়া হবে বলা হয়েছে। জানা কথা, পরবর্তীতে প্রদেয় করের সঙ্গে অগ্রীম করের সমন্বয় করার ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হয়। যদিও এবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে অগ্রিম ভ্যাটকে চূড়ান্ত হিসেবে ধরা হয়েছে, এবং কিছু ক্ষেত্রে সমন্বয়ের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। সমস্যা হলো, এ ধরনের অগ্রিম আয়কর অনেক ব্যবসায়ী বিক্রয় কর হিসেবে বিবেচনা করেন এবং ভোক্তার ওপরে চাপিয়ে দেন। এটা আয়কর আরোপের নীতিমালা ও দর্শনের পরিপন্থি। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ভ্যাটের হার যা অনেকক্ষেত্রেই সেলস ট্যাক্স (বিক্রয় কর)-এর মতোই কাজ করে, সে ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করে অভিন্নভাবে প্রয়োগ করা কতটা যুক্তিসংগত তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। বাজেটে ভ্যাটহার কিছুটা নামিয়ে (যেমন ১০ শতাংশ) সমভাবে প্রয়োগের দিকে গেলে ভ্যাট বাস্তবায়ন সহজতর হতো এবং ভ্যাট কার্যক্রমে গতিশীলতা নিয়ে আসাও সম্ভব হতো। এটা মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশে যত পয়েন্টে ভ্যাট আদায় করা হয়, সরকারের কোষাগারে তার একটি অংশ মাত্র যোগ হয়। ৩ লাখ ইএফডি মেশিন স্থাপনের পরিকল্পনা থেকে রাজস্ব কর্তৃপক্ষ সরে এল কি না তাও বোধগম্য নয়। জরিমানা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বেশ কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যদিয়ে বাস্তবতার পরিবর্তন নয়, বাস্তবতা মেনে নেওয়ার দিকেই বেশি ঝোঁক দৃশ্যমান বলে প্রতীয়মান হয়।

রাজস্বকাঠামো ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিনিভর নিয়মনীতির মাধ্যমে নির্ধারিত ও পরিচালিত হওয়ার কথা। কিন্তু অতীতে এ ক্ষেত্রে অনেক ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে। দেখা গেছে, ব্যক্তিস্বার্থ এবং কোম্পানিস্বার্থকে বিবেচনায় নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আয়কর ও করপোরেট করের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এবার অবশ্য সে ধরনের প্রবণতা বাজেটে নেই, যা ইতিবাচক ও অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এটাই প্রত্যাশিত ছিল। করপোরেট করের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারে লিস্টেড ও নন-লিস্টেড কোম্পানির মধ্যে করপোরেট করহারের পার্থক্য বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সব ধরনের আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করলে বাড়তি সুবিধার কথা বলা হয়েছে। মার্চেন্ট ব্যাংকের কর হার ১০ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। এসব প্রস্তাব ইতিবাচক। তবে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, পুঁজিবাজারে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে এবং বিনিয়োগকারী ও ব্যক্তি খাতের মালিকানাধীন ভালো কোম্পানির আস্থা অর্জন করতে সক্ষম না হলে কেবলমাত্র কর হারের পরিবর্তন করে স্থবির পুঁজিবাজারকে চাঙা করা যাবে না ও বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করা সম্ভব হবে না। এসব ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন কী হয়েছে বা পুঁজিবাজার সংস্কার কমিটির সুপারিশ কীভাবে বাস্তবায়িত হবে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যার দারি রাখে। বাজেটে এসব বিষয়ে তেমন কিছু বলা হয়নি।

সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠাসহ বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা রপ্তানিকারকদের জন্য সুবিধাজনক হবে। এটা ভালো প্রস্তাব, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বন্ড ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে আরও নজরদারি করতে হবে এবং বন্ড ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে হবে, যাতে এ সম্প্রসারিত সুযোগ বড় রাজস্ব ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। নিরীক্ষণ শক্তিশালী করার জন্য ডিজিটাল মনিটরিং শক্তিশালী করতে হবে।

প্রণোদনা, ভর্তুকি ইত্যাদির সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন অস্বীকার করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে সানসেট ক্লজ (কখন এসব ছাড় বা প্রণোদনা প্রত্যাহার করা হবে) আরও স্বচ্ছতার সঙ্গে উপস্থাপন করাও প্রয়োজন। বাজেটের প্রস্তাবনাগুলোর কারণে কর ব্যয় কত হ্রাস পাবে তা হিসাব করলে বাজেটের স্বচ্ছতা আরও বৃদ্ধি পেরে। বাজেটে উল্লিখিত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ছাড়ের পরিমাণ মোট জিডিপি ২.৩৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে প্রস্তাবিত কর কাঠামোয় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কত দাঁড়াবে তার একটা হিসাব উপস্থাপন করা প্রয়োজন ছিল।

করজাল সম্প্রসারণ

রাজস্ব বাজেটের আয়ের ভিত্তি ও করজালের সম্প্রসারণ, নতুন রাজস্বের উৎস শনাক্তকরণ ও কর ফাঁকির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতার সুযোগ ছিল এ বছরই। কিন্তু বাজেটে গতানুগতিকভাবে আমদানি কর, ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক ইত্যাদির সুবাদে ও আয়কর বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের প্রচলিত ধারাই আব্যাহত আছে। তবে এটা ইতিবাচক যে, আইটি এনাবল্ড সেবা খাত, যেমন- ই-কমার্স ও এফ-কমার্সকে করজালে আনার একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। জানা কথা, জনসাধারণ যে কর-রাজস্ব দিয়ে থাকেন তার একটা বড় অংশ সরকারের কোষাগারে

জমা পড়ে না। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আন্ডার-ওভার ইনভয়েসিং, কর প্রদানের ক্ষেত্রে করজালে না থাকা এবং কর ফাঁকি ও কর পরিহার এবং রাজস্ব খাতে দুর্নীতির কারণে বড় ধরনের রাজস্ব ক্ষতি হয়ে থাকে। কর ব্যবস্থাপনায় সংস্কার করে ও তাকে যুগোপযোগী করে, প্রযুক্তিকে আরও ব্যাপক পরিসরে ও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে এবং ব্যয় ও আয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ‘আধার কার্ড’-এর অনুরূপ ব্যবস্থা চালু করে বাড়তি কর আহরণের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য যে উদ্যোগ-উদ্যম প্রয়োজন ছিল ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সে ধরনের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির উল্লেখ নেই। নতুন কতজনকে করজালে আনা হবে, কর ফাঁকি রোধ করে ও প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো থেকে কত বাড়তি রাজস্ব আয় আসবে বলে প্রাক্কলন করা হচ্ছে, তার ধারণা বাজেট থেকে পাওয়া যায় না। আয়বৈষম্য, ভোগবৈষম্য ও সম্পদবৈষম্য কী পরিমাণে হ্রাস পাবে, বাজেট থেকে সে সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া কষ্টকর।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগে ত্বরণ সৃষ্টি

২০২২ সালে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর বাংলাদেশের উচ্চমূল্যস্ফীতির ধারাবাহিকতা তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাম্প্রতিক সময়ে প্রবাসী আয়ে চাঙাভাব ও ভালো রপ্তানি আয়ের সুবাদে রিজার্ভের অব্যাহত পতন রোধ করা সম্ভব হয়েছে। আমদানিতে কিছুটা গতি এসেছে। ফলে, আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে যা সার্বিক মূল্যস্ফীতির হারকে কিছুটা হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। এসব ইতিবাচক, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, উচ্চমূল্যস্ফীতির কারণে মূল্যস্তর বর্তমানে বেশ উঁচুতে অবস্থান করছে। মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে বিনিয়োগকে চাঙা করতে হবে, যার মাধ্যমে একদিকে সরবরাহে গতি আসবে অন্যদিকে শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্ত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে কিছু বিষয় আছে, যেগুলো বাজেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অন্যগুলো বাজেটের বাইরে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষতার সঙ্গে জড়িত এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর এবং নির্বাচন নিয়ে নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তার ওপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল।

বিদ্যুৎ-জ্বালানির ভর্তুকি হ্রাস ও এসবের মূল্যবৃদ্ধি বাজেটের আগেই করা হয়েছে। অতীতের পুঞ্জীভূত দুর্নীতি, অনিয়ম ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা বিনিয়োগকারীদের এবং ভোক্তামহলকে বহন করতে হচ্ছে চড়া দামে বিদ্যুৎ-গ্যাস ক্রয়ের বাধ্যবাধকতায়। উচ্চ সুদহার, বিদ্যুৎ-জ্বালানির উচ্চমূল্য, গ্যাসের প্রাপ্যতায় সমস্যা, টাকার বড় ধরনের অবমূল্যায়ন ও উচ্চমূল্যস্ফীতিকে বাজেটের মাধ্যমে প্রাপ্য বাড়তি সুবিধার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন, এমন আশা বাজেট দেখাতে পারেনি। তবে ব্যক্তি খাত ও বিনিয়োগে চাঞ্চল্য শেষের বিচারে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার গুণগত মান, উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশ ও বিনিয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যয় হ্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুঘটকের ওপরই বেশি নির্ভর করবে।

সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মসূচন

প্রান্তিক জনসাধারণের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিকট অতীতে উচ্চমূল্যস্ফীতির কারণে এ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার ধারাবাহিক অবনমন হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কিছু কাঠামোগত সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ভিত্তি ও প্রাপ্তির সম্প্রসারণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা ইতিবাচক। এটা বর্তমানে বিশেষভাবে জরুরি এ কারণে যে, সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাওয়ার আশঙ্কায় আছে উচ্চমূল্যস্ফীতির চাপের কারণে। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষার অধীনে প্রাপ্তি ও ভাতার ক্রয়ক্ষমতাও এসব কারণে হ্রাস পেয়েছে। শহরাঞ্চলে যেহেতু সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি নেই বললেই চলে, সে কারণে প্রয়োজন ছিল শ্রমিকদের জন্য রেশনিং সুবিধা চালু করার মতো পদক্ষেপ। কিন্তু বাজেটে সে ধরনের উদ্যোগ নেই। শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে শ্রমিক ঘনবসতি এলাকায়, খোলা বাজারে বিক্রয়ের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমেও শ্রমিকদের কিছুটা স্বস্তি দেওয়া যেতে পারে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি বিনির্মাণের পূর্বশর্ত হলো শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে শোভন আয়ের সুযোগ সৃষ্টি। সুবিদিত যে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, বিশেষত শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের জন্য বর্ধিত হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ছিল জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের অন্যতম দাবি। শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-কর্ম জগতের বাইরে বিশাল এক জনগোষ্ঠী আছে যাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি উন্নয়নের একটি মূল দর্শন হওয়ার কথা ছিল। লেবার ফোর্স সার্ভে থেকে দেখা যাচ্ছে, চলমান অর্থবছরে প্রথম ছয় মাস বেকারের সংখ্যা ২১ লাখ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার বড় অংশই নারী। পুরাতন ও নতুন বেকারের জন্য লক্ষ্যনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ ও ব্যক্তি খাতকে অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশের নিশ্চয়তা দেওয়ার মাধ্যমেই এ সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব। বাজেটে লক্ষ্যনির্দিষ্টভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়ার প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিশেষত শিক্ষিত যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বাজেটে নেই। কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান রাজস্বনীতি, আর্থিকনীতি ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ত্রিমাত্রিক কার্যকর সংশ্লেষের মাধ্যমেই সম্ভবপর হবে। বাজেটে এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকলে এ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যেত।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

এবার যেহেতু আকার নয়, উন্নয়ন প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়নকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, সেহেতু সাশ্রয়ীভাবে ও সুশাসনের সঙ্গে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও সময়মতো প্রকল্প শেষ করার ক্ষেত্রে অধিকতর মনোযোগী হতে হবে। অতীতে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ও বিশেষ গোষ্ঠীস্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প নির্বাচন ও অতিমূল্যায়িত বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেটের আকার কিছুটা ছোট রেখে তারই ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সুফল নির্ভর করবে সব পর্যায়ে

সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সাশ্রয়ীভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সময়মতো প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার ওপর। এগুলোর প্রয়োজনীয়তা ২০২৫-২৬ অর্থছরে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও জরুরি হয়ে দাঁড়াবে।

বাজেটের আকার ও ঋণনির্ভরতা

রাজস্ব বাজেটে উদ্বৃত্ত না থাকার কারণে বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সম্পূর্ণটাই অব্যাহতভাবে ঋণনির্ভর থেকে গেছে। রাজস্ব আয় ৫ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা আর রাজস্ব ব্যয় ৫ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা। আদায়কৃত রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চলে যাচ্ছে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধে, যদিও রাজস্ব ব্যয়ে কেবলমাত্র ঋণ পরিশোধে সুদের অংশই দেখানো হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে ঋণ সুদ-ব্যয় শিক্ষাকে ছাড়িয়ে রাজস্ব ব্যয়ের দ্বিতীয় প্রধানতম খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটেও এ প্রবণতা অব্যাহত আছে।

কর জিডিপির হার ৮-৯ শতাংশের মধ্যে থাকলে, তার সঙ্গে ঘাটতি অর্থায়ন জিডিপির হার ৪-৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হলে, বাংলাদেশের সরকারি ব্যয় জিডিপির হার ১৩-১৪ শতাংশের বেশি করা যাবে না। উন্নয়নশীল বিশ্ব ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপির হার অন্যতম সর্বনিম্ন। প্রতিবেশী দেশ ভারত ও নেপালে এ হার ২৪ শতাংশের বেশি। অনেক উন্নত দেশে এ হার ৩০-৪০ শতাংশ। সুতরাং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি ব্যয়ের যে আকার প্রস্তাব করা হয়েছে উদ্যম-উদ্যোগ-কর্মসূচি গ্রহণের নিরীখে তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং তার থেকে বেশি প্রত্যাশা করা অনুচিতই হবে। দুঃখের বিষয় হলো, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট বহুদিনের দুঃসূচ থেকে বের হয়ে আসার পথ দেখাতে পারেনি। মধ্যম আয় এবং এলডিসি থেকে উত্তরকালীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য কর ও রাজস্ব-জিডিপির নিম্ন হার একবিংশ শতাব্দীতে চলার পথে অনতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বরং অপ্রত্যাশিত অর্থ সাদা করার সুবিধা অব্যাহত রেখে জুলাই-আগস্ট আন্দোলন-সংগ্রামের মূল চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং আন্দোলনের মূল আকাঙ্ক্ষার প্রতি যথার্থ ন্যায়বিচার করা হয়নি।

শেষ কথা

প্রয়োজন ছিল গতানুগতিকতার বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে এসে ভিন্নধর্মী চিন্তার ও উদ্ভাবনী ভাবনার আলোকে নতুন ধারার বাজেট উপস্থাপন। পরিতাপের বিষয়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট সেদিক থেকে আশাহতই করেছে।

খবরের কাগজ

১৯ জুন ২০২৫

অধ্যায় ৬

বিনিয়োগ, শিল্প ও কর্মসংস্থান



নতুন বছরে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্যোগ প্রত্যাশা করি

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

২০২৫ সাল সামগ্রিকভাবে চ্যালেঞ্জিং হবে—অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক প্রস্তুতি উভয় দিক থেকেই। সেই সঙ্গে আমাদের এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতি চলছে; ২০২৬ সালে আমাদের এলডিসি উত্তরণ হওয়ার কথা। সবকিছুর পেছনে কাজ করবে ২০২৪ সালের আগস্ট মাসের পটভূমি। ফলে প্রত্যাশা কিছুটা বেশিই থাকবে।

২০২৪ সালে আগস্টের পর প্রাথমিক অনিশ্চয়তা কাটিয়ে আমাদের অর্থনীতি ইতিবাচক মোড় নেবে, সেই প্রত্যাশা থাকবে। অর্থনৈতিক বণ্টনে আগস্ট অভ্যুত্থানের চেতনার প্রতিফলন দেখতে চাইবে মানুষ, যাকে বলে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের চেতনা। আমাদের আশা, চলমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অন্তর্বর্তী সরকার সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি হাতে নেবে।

অর্থনীতির বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ সঙ্গে নিয়ে আমরা ২০২৫ সালে পদার্পণ করতে যাচ্ছি। যেমন কয়েক বছর ধরে চলা উচ্চ মূল্যস্ফীতি, স্তিমিত বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা ইত্যাদি। সামনে বাজেট; এ ছাড়া মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। তার আলোকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। সব মিলিয়ে অর্থনীতিকে বেশ চ্যালেঞ্জিং সময় পার করতে হবে।

নতুন বছরে বিনিয়োগে গতি আনা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ না বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়বে না। মনে রাখা দরকার, কোটা সংস্কার আন্দোলনের মূল কারণ ছিল বেসরকারি খাতের অপ্রতুল কর্মসংস্থান। কর্মসংস্থান না বাড়লে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে না। বৈষম্য নিরসনে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্যোগ প্রত্যাশা করি।

আমরা আশা করব, উচ্চ মূল্যস্ফীতি মোকাবিলায় সরবরাহব্যবস্থা উন্নত করার পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যবস্থা নেবে সরকার। সেই সঙ্গে চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান কমানোর উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

সেই সঙ্গে পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হোক। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের চেতনার আলোকে এই শ্রেণির মানুষের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা দরকার।

কিছু ইতিবাচক বিষয়ও আছে অর্থনীতিতে, যেমন রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি ভালো। সেই সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার রিজার্ভের পতন ঠেকাতে পেরেছে; বিনিময় মূল্য বেশ কয়েক মাস স্থিতিশীল থাকার পর সম্প্রতি আবার কিছুটা টাকার অবনমন হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিনিময় মূল্য স্থিতিশীলতার দিকে যাচ্ছে। এসব প্রবণতা ২০২৫ সালে আরও শক্তিশালী হবে, সেই প্রত্যাশা করি।

যেসব সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলো চলমান থাকুক। ইতিমধ্যে শ্বেতপত্র কমিটি অর্থনীতির দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রতিবেদন দিয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন কমিশন গঠিত হয়েছে। তারাও কিছুদিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়া শুরু করবে। তাদের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকার সচেষ্ট থাকবে বলেই প্রত্যাশা করি, যদিও সব সুপারিশ বাস্তবায়িত হবে না, এটাই স্বাভাবিক।

আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সেবামূলক ব্যবস্থা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, সামগ্রিকভাবে সুশাসন নিশ্চিত করা—এসব ক্ষেত্রে সংস্কারের সুপারিশ বাস্তবায়িত হবে, সেই আশা করি। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসার পরও এসব কর্মসূচি চলমান থাকুক।

সর্বোপরি সর্বক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রথম আলো

১ জানুয়ারি ২০২৫

গ্যাস-বিদ্যুৎ না দিলে বিনিয়োগ আসবে না

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

আগের সরকারের আমলে ইকোনমিক জোন করার ক্ষেত্রে অপরিকল্পিতভাবে উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। ইকোনমিক জোন করার সময় পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ব্যবস্থা একই সঙ্গে করা দরকার ছিল। সেটা করলে এখন শিল্প কারখানাগুলো চালু করতে কোনো সমস্যা হতো না।

বেজা এরই মধ্যে পাঁচটি ইকোনমিক জোন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে। মিরেরসরাইয়ে যেহেতু জমি অধিগ্রহণ, প্লট বরাদ্দ ও শিল্প স্থাপনের কাজগুলো এগিয়ে গেছে, সেহেতু সেখানে শিল্প চালু করতে দ্রুত পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

শুধু জমি দিলে তো হবে না। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সেবাগুলোও দিতে হবে। সেটা না দিলে তো সেখানে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী কেউ-ই আসবে না। তাই এটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে মনে করি।

গ্যাস, সিইটিপিসহ বেশ কিছু সেবা যেগুলো শিল্প চালু করতে দরকার সেগুলো দ্রুত দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। সেগুলো চালু করতে পারলে যেমন কর্মসংস্থান হবে, তেমনি পণ্য বিদেশে রপ্তানি করাও যাবে।

আগের সরকারের আমলে গ্যাস বিদ্যুতের কোনো ব্যবস্থা না করেই একটার পর একটা ইকোনমিক জোন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

এ ধরনের অপরিকল্পিত পরিকল্পনা নেওয়া ঠিক হয়নি। কোনো কিছুর ব্যবস্থা না করে উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা নিলে তো সেটা বাস্তবায়ন করা যায় না। সেটাই এখন দেখা যাচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে করা হলে এখন অনেক শিল্প কারখানা চালু করা যেত।

কালের কণ্ঠ

২০ জানুয়ারি, ২০২৫

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

ড. মোস্তাফিজুর রহমান একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মাননীয় ফেলো। তিনি সিপিডির নির্বাহী পরিচালক (২০০৭-১৭) এবং তারও আগে সিপিডির গবেষণা পরিচালক (১৯৯৮-০৭) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. মোস্তাফিজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে শিক্ষক হিসেবে ২৫ বছর অধ্যাপনার পর ২০১২ সালে সিপিডিতে পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। রাজস্ব, আর্থিক নীতি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাণিজ্যনীতি এবং বাণিজ্য সংস্কার, বহুপক্ষীয় বাণিজ্যব্যবস্থা এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলোর স্বার্থ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসহ অর্থনীতির নানা বিষয়ে কথা বলেছেন খবরের কাগজের সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সম্পাদকীয় বিভাগের জ্যেষ্ঠ সহ-সম্পাদক শেহনাজ পূর্ণা

খবরের কাগজ: কর-জিডিপি অনুপাতে বিশ্ব বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে নিচে। রাজস্ব আহরণ বাড়াতে কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার বলে মনে করেন?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: কর-জিডিপির অনুপাতে উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে কেবল শ্রীলঙ্কাই আমাদের কাছাকাছি আছে। অর্থাৎ প্রতিবেশী দেশগুলোর কর-জিডিপির অনুপাত আমাদের দ্বিগুণের মতো। এটার ফলে বাংলাদেশ একটা বিপজ্জনক এবং বাধ্যতামূলক ঋণনির্ভরতার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। যেটা থেকে আবার ঋণ পরিষেবার একটা বড় চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। যা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। সুতরাং অবশ্যই আমাদের কর-জিডিপির হার বাড়াতে হবে।

সেখানে বর্তমান সরকার সংস্কার কমিটি করেছে। সেই সংস্কার কমিশন কাজ করেছে। তারা বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিচ্ছে। আমার মনে হয় যে, একটা হতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন এবং দ্বিতীয়ত হতে হবে প্রযুক্তির বাস্তবায়ন। প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এখন যে সিস্টেম

আছে, এটাতে বড় ধরনের পরিবর্তন করতে হবে। এনবিআরের নিজস্ব যে জনশক্তি আছে, তা দিয়েই কাজ পরিচালনা করতে হবে। এনবিআরের নীতিমালা প্রণয়ন এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। এনবিআরে যারা কাজ করেন তাদের ওপরের দিকে ওঠার রাস্তা যাতে রাখা হয়, এমন ধরনের সংস্কার করতে হবে। এটার একটা দিক আছে, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। প্রযুক্তিকে যত বেশি কাজে লাগানো যাবে তত বেশি সুফল পাওয়া সম্ভব হবে। আমরা ইতিবাচক একটা দিক দেখলাম যে, এবার ই-সাবমিশন বা ইলেকট্রনিক সাবমিশন অনেক ভালো হয়েছে। করপোরেটের ক্ষেত্রে, ব্যক্তি খাতের ক্ষেত্রে এগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। ডিজিটাল প্রস্তুতিটা রাখতে হবে। আমাদের কাস্টমস, ভ্যাট, ইনকাম ট্যাক্স- এগুলোর মধ্যে একটা সমস্বয় করতে হবে। যে সফটওয়্যারগুলো তারা ব্যবহার করেন সে ক্ষেত্রে ইন্টার অপারেবিলিটি থাকে। একটার সঙ্গে আরেকটার সংযোগ একই সঙ্গে সমস্বয় থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের সঙ্গে থাকে- যাতে ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম আমরা করতে পারি। আমাদের প্রত্যক্ষ কর মাত্র ৩২-৩৩ শতাংশ। এটাকে আরও কীভাবে বাড়ানো যায় তা ভাবতে হবে। সেটা করতে গেলে ইন্টার-অপারেবিলিটি অব দ্য সিস্টেমস অর্থাৎ কাস্টমস, ভ্যাট, ইনকাম ট্যাক্স- এগুলোর সমস্বয় করতে হবে। বেশি বেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইনকাম ট্যাক্সের কাজকে কেন্দ্রীয়ভাবে করতে হবে। এটা বিভিন্ন দেশে আছে।

ভারতে যে রকম আধার কার্ড প্রচলন করা হয়েছে, ইচ্ছা করলে আমরা সে রকম পারসোনাল অ্যাকাউন্ট নম্বর বা যেটা আমরা টিন বলি সেটার মাধ্যমে ইনফরমেশন দিতে পারবে। আধারের ইউনিক নম্বর দিয়ে তারা বড় ধরনের সব খরচের হিসাব করতে পারবে। তাহলে যিনি ইনকাম ট্যাক্সের বিষয়গুলো দেখেন, তিনি তখন সমস্বয় করতে পারবেন। একটা মানুষ কী রকম ব্যয় করছেন আর তিনি আয় করে কত দেখাচ্ছেন সেটা জানা যাবে। বিভিন্ন দেশে এগুলোর বেস্ট প্র্যাকটিস বা ব্যবহার আছে। এগুলো গ্রহণ করতে হবে। আমার মনে হয় যে, ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত বাড়ানোর বিশাল সুযোগ আমাদের আছে। সাধারণ জনগণের ওপর অপ্রত্যক্ষ কর বাড়িয়ে নয়, প্রত্যক্ষ কর কীভাবে আমরা বাড়াতে পারি সেই চিন্তা করতে হবে। যাদের কর দেওয়ার শক্তি আছে, কিন্তু দেন না, যাদের বিভিন্ন সময় শুল্ককর ১০ শতাংশ দিলেই সব সাদা করা যাবে, রিয়েল এস্টেট, বিনিয়োগ করলে সাদা করা যাবে- এ ধরনের যারা আছেন, তাদের প্রণোদনা দিয়ে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কাজ হয়নি। তা থেকে সরে এসে ডিজিটলাইজেশনে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং এনবিআরের মধ্যে জবাবদিহি এবং প্রণোদনা দুটির সমস্বয় করে আমাদের এগুলো মোকাবিলা করতে হবে। কারণ দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব যা আহরণ করি, রাজস্ব ব্যয়ে তা চলে যায়। পুরো উন্নয়ন ব্যয়টা হয়ে গেছে ঋণনির্ভর। হয় অভ্যন্তরীণ, নয় বৈদেশিক। এটা টেকসই হবে না। যার ফলে বিনিয়োগ পরিবেশের ভার ক্রমান্বয়ে বাড়ছেই। আমরা যদি রাজস্ব আদায় বাড়াতে পারি, তাহলে উদ্বৃত্ত রাজস্ব দিয়েও উন্নয়ন ব্যয়ের একটা অংশ মেটাতে পারব। ঋণনির্ভরতা এবং সুদাসলের কারণে বড় ধরনের একটা ঝুঁকি আমাদের বাজেটে রাখতে হচ্ছে; যা রিজার্ভের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। এটা টেকসই হয় না এবং এটা থেকে আমাদের ফিরে আসতে হবে।

খবরের কাগজ: বেসরকারি বিনিয়োগ অনেক বছর ধরে একই জায়গায় স্থবির হয়ে আছে। বিনিয়োগ বাড়াতে সরকার কী পদক্ষেপ নিতে পারে?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল অনুঘটক হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগ ছাড়া প্রবৃদ্ধি হয় না। আর দ্বিতীয় কথা হলো, আমি কত ইউনিট বিনিয়োগ করে ১ শতাংশ জিডিপি গ্রোথ করতে পারি। আমি যদি রেশিও কমাতে পারি, তার মানে হলো- আমার উৎপাদনশীলতা ভালো। আমি যদি ৪ ইউনিট দিয়ে ১ শতাংশ জিডিপি গ্রোথের পরিবর্তে ৩ ইউনিট বিনিয়োগ করে ১ শতাংশ জিডিপি গ্রোথ করতে পারি, এটাই উৎপাদনশীলতা। এই উৎপাদনশীলতাটুকু জরুরি। আমাদের দেশে যেটা দেখছি, ২৪-২৫ শতাংশের মধ্যে বিনিয়োগ থমকে আছে কয়েক বছর। ক্রেডিট নেওয়া হয় ব্যাংক থেকে বিনিয়োগের জন্য, এখানেও স্থবিরতা দেখছি। আমরা দেখছি যে, আমদানি ক্রেডিটের মেশিনারি আমদানির মাধ্যমে যন্ত্রপাতি এনে যে বিনিয়োগ করা হয়, সেই আমদানি নিয়েও একটা স্থবিরতা আছে। সবটা মিলিয়ে বিনিয়োগে একটা বড় ধরনের স্থবিরতা আছে। এর সঙ্গে কর্মসংস্থান, শোভন কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির চাপকে সামাল দেওয়া- অনেক কিছু জড়িত। সুতরাং আমাদের অবশ্যই বিনিয়োগে চাপ্তল্য আনতে হবে।

এক ধরনের অনিশ্চয়তা ছিল গত কয়েক মাসে। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল- ঘটনা কোন দিকে যায়। এখন নিশ্চয়তা বা স্থিতির একটা সময় এসেছে। কাজেই আশা করব যে, বিনিয়োগকারীরা সে সুযোগটা নেবেন। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরাও আসবেন। দুটি ভালো পদক্ষেপ হয়েছে; সেটা হলো- আমাদের রিজার্ভের ওপর চাপ কিছুটা কমেছে। এলসি খোলার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ছিল, এগুলো ক্রমান্বয়ে তুলে নেওয়া হচ্ছে। ক্যাপিটাল মেশিনারিজের আমদানি, বিভিন্ন ইন্টারমিডিয়েট ইনপুটের আমদানি- এগুলোর মধ্যে কিছুটা চাপ্তল্য আমরা দেখছি। সেটার একটা প্রতিফলন ১৩ শতাংশ ইন্টারেস্ট রঙনি বৃদ্ধির মধ্যে আমরা দেখছি। বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বাজার। নতুন বিনিয়োগ করে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তার পর সেই টাকা খরচ করার ক্ষেত্রে এখনো প্রতিবন্ধকতা আছে। ১৫-১৬ শতাংশ সুদে ঋণ নিয়ে একজন ব্যবসায়ী কত মুনাফা করতে পারবেন। যেটা দিয়ে তিনি বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন! সুতরাং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আসছে। দ্বিতীয় হচ্ছে, অনেক জায়গায় আমরা স্পেশালি ইকোনমিক জোন করেছিলাম। যেখানে বিনিয়োগকারীদের নিষ্কটক জমি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটার সঙ্গে আমাদের অন্য সার্ভিসগুলো দিতে হবে।

আমরা একটা ওয়ানস্টপ সার্ভিস করেছি ২০১৮ সালে। সেটা আমরা এখনো কার্যকর করতে পারিনি। এগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে। ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করতে হলে আমাদের বিদ্যুৎ, গ্যাস দিতে হবে। যোগাযোগব্যবস্থা ভালো করতে হবে। এসব জায়গায় আমাদের বড় ধরনের একটা দুর্বলতা রয়েছে। এটাকে মোকাবিলা করতে হবে। বর্তমান সরকার ১০০টা প্ল্যানের জায়গা থেকে সরে এসে ১০টা স্পেশাল জোনকে ভালোভাবে চালু করতে চাচ্ছে।

আমরা কিন্তু আগেই বলেছিলাম, ১০০টা স্পেশাল জোন করার জন্য জমি অধিগ্রহণ না করে ১০ থেকে ১২টা করে ভালোভাবে চালান। বর্তমান সরকার এ পদক্ষেপগুলোই এখন নিচ্ছে। আমার মনে হয় এটা খুব ভালো যে, তারা এটা করতে চাচ্ছে। এটা হলে বিনিয়োগে চাঙাভাব আসবে। আর যারা বৈদেশিক বিনিয়োকারী, যারা আমাদের দেশে ২ বিলিয়ন ডলারের মতো নেট এসডিআই নিয়ে আসে, ভিয়েতনামে যেখানে ১৮ থেকে ২০ বিলিয়ন ডলার, কম্বোডিয়া কত ছোট একটা দেশ- সেখানেও বৈদেশিক বিনিয়োগ অনেক বেশি। বৈদেশিক বিনিয়োগ যদি বাড়ানো যায় তাহলে রপ্তানি বাজারে একটা ভালো সংযোগ থাকে। আমাদের রপ্তানিও বাড়ে। আমরা ৫০ বিলিয়ন ডলারের মতো রপ্তানি করি।

ভিয়েতনামের অর্থনীতি সাইজে আমাদের থেকে ছোট। তারা ৩৮০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করেছে গত বছর। সুতরাং যারা আমদানি করবে, রপ্তানি করবে এবং স্পেশাল জোনগুলো ব্যবহার করবে, তাদের জন্য ওয়ানস্টপ সার্ভিসের ক্ষেত্রে গ্যাস, বিদ্যুৎ, সেন্ট্রাল প্ল্যান, দক্ষ জনশক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করতে হবে। শুধু জোন করলেই হবে না। আরও অনেক সমান্তরাল কাজ আমাদের করতে হবে। সেসব জায়গায় এখনো অনেক দুর্বলতা আছে। যা এখন উদ্যোগ-উদ্যম নিয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক একটা পুনর্গঠন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার বিভিন্ন ধরনের পলিসিগত পরিবর্তনও আনার চেষ্টা চলছে এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টাও চলছে। বিনিয়োগ ছাড়া প্রবৃদ্ধি হবে না, কর্মসংস্থান হবে না, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, জীবনমান উন্নত হবে না। সেই বিনিয়োগ মূলত ব্যক্তি খাতেই করতে হবে। আমাদের দেশে ব্যক্তি খাত ৪ টাকা বিনিয়োগ করলে, সরকার বিনিয়োগ করে ১ টাকা। ব্যক্তি খাত সরকারি বিনিয়োগকে চাঙা করতে পারে। সুতরাং সরকারি খাতের বিনিয়োগ ও ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের মধ্যে এটা সমান্তরাল সমন্বয় দরকার আছে। যাতে করে ব্যক্তি খাত সরকারি বিনিয়োগের সুবিধা নিয়ে ব্যবসা করতে পারে।

খবরের কাগজ: আমাদের দেশে তরুণ উদ্যোক্তা তৈরি করতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: নতুন উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে আমি বলব যে, দেশের অর্থনীতিতে শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ হলো সার্ভিসেস সেক্টর। কৃষি ১২ শতাংশ, বাকি যেটুকু থাকে ওইটুকু হলো আমাদের শিল্প খাত, অর্থাৎ ৩২ শতাংশ। তার মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং আরও কম। সার্ভিসেস সেক্টরে নতুন অনেক ধরনের কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। আমি বলব- শুধু শিল্পোদ্যোক্তা নয়, সার্ভিসেস সেক্টর, ই-সার্ভিস, আইটি অ্যানাবল সার্ভিসেও নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে। যারা আসতে চাচ্ছেন তাদের জন্য দেশের শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য আমাদের ইনসেন্টিভ আছে। সেবা খাতে যে উদ্যোক্তা ইয়াং জেনারেশন, তাদের জন্য স্পেশাল উইনডো সৃষ্টি করা দরকার। এগুলোতে আরও উদ্যোগ-উদ্যম নিয়ে কাজ করতে হবে। ইন্টারনেটের স্পিড বাড়ানো, তার খরচ কমানো- আইটি অ্যানাবল সার্ভিসে যারা আসে তাদের জন্য এ সুযোগগুলো অব্যাহত করতে হবে। নতুন নতুন খাতে সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের দেশে

ই-কমার্স এখন সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিশেষত কোভিডের পর থেকে এই জায়গাগুলোতে নতুন উদ্যোক্তারা আসছেন। শিল্পোদ্যোক্তা ও সেবা খাতের উদ্যোক্তা- দুটির দিকে নজর দিতে হবে। যাতে করে কর্মসংস্থান বাড়ে, আবার রপ্তানিও আমরা করতে পারি। সুতরাং একটা সমন্বিত পরিকল্পনা দরকার। বিশেষত, সেবা খাতে উদ্যোক্তাদের কীভাবে আমরা সহায়তা করতে পারি। আমরা জানি যে, ইন্ডিয়ায় আইটি অ্যানাবল সার্ভিসের এক্সপোর্টই হলো ১৬০ থেকে ১৭০ বিলিয়ন ডলার। আমার জানা মতে, ১৯৯৯-২০০০ সালে এটা ৫ বিলিয়ন ডলারও ছিল না। এটাকে সমন্বিত পরিকল্পনা নিতে হবে। উদ্যোক্তারা যাতে ওয়ানস্টপ সার্ভিসের সুবিধাটা পেতে পারেন, অবকাঠামোর সুবিধা পেতে পারেন, গ্যাস-বিদ্যুতের সুবিধা পেতে পারেন, আমদানি স্তরে যাতে হয়রানির সম্মুখীন না হন, পোর্টের টান অ্যারাউন্ড টাইম যাতে আমরা কমাতে পারি। আমাদের অনেক বাণিজ্যে, বিশেষ করে ভারত আমাদের বড় ট্রেড পার্টনার। আমরা যদি আমদানি খরচ কমাতে পারি তাহলে এটা ভোক্তা, উদ্যোক্তা, রপ্তানিমুখী শিল্প; যারা আমদানির ওপর নির্ভর করে, তাদের জন্য ইতিবাচক। সুতরাং সেসব জায়গায়ও আমাদের ট্রেড ফেইজ সিলেকশন, বাণিজ্য সহজীকরণের যেসব উদ্যোগ পেপারলেস ট্রেড, সিঙ্গেল উইন্ডো- এসব জায়গায় নজর দিতে হবে। কারণ ল্যান্ড পোর্টের মাধ্যমে আমাদের এই আঞ্চলিক বাজারে প্রবেশ এবং এটা আমাদের উদ্যোক্তাদের খরচ অনেক কমায়। এই পলিসি কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, সেটার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন রকম সহায়তা করতে হবে। কৃষি খাতে আমরা বাইরে যেতে পারছি না। অ্যাগ্রোবেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ সেখানেও দরকার। আমাদের এসপিএস, ইবিটি- এ ধরনের স্ট্রানভার যা আছে সেগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কুল চেইন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। এগুলো সামনের দিকে আরও বাড়বে। গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট প্রতিযোগিতার যে পরিবেশ, সেই পরিবেশও চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। সুতরাং সেটার সঙ্গে তারা যাতে সামঞ্জস্য বিধান করেও উৎপাদন, রপ্তানি করতে পারেন, তাদের সেই সহযোগিতা করতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত বাণিজ্য পরিস্থিতি, বিশ্বায়ন পরিস্থিতি- এটাতে তারা শক্তিশালী অবস্থান থেকে যাতে সেখানে ঢুকতে পারেন, সে জন্য তাদের প্রয়োজনমাত্রিক সহায়তা দিতে হবে। আমাদের যে প্রণোদনা কার্যক্রম আছে, তার পরিবর্তন লাগবে। রেডিমেট গার্মেন্টসের ভেতরেও অনেক সম্ভাবনা আছে। মেইনমেইড ফাইবারের এখন গ্লোবাল মার্কেট ৭৫ শতাংশ আর আমাদের এখানে মেইনমেইড হলো ২৫ শতাংশ। কটন বেইজড ৭৫ শতাংশ। তার পর আছে আরএমজি বৈচিত্র্যকরণ। আরএমজির বাইরে যারা আসতে চাচ্ছেন, যেমন- সিনথেটিক, লেদার, ফুডওয়্যার, লাইটিং ইঞ্জিনিয়ারিং, আমাদের ফার্মাসিটিক্যালস, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

আমি মনে করি যে, শ্রমঘন যে প্ল্যান্ট আছে- এসব জায়গায় আমাদের বড় ধরনের একটা সুযোগ আছে। এগুলোকে আইডেনটিফাই করে আমরা যদি বিশেষ করে ইকোনমি জোনগুলো, বিশেষ করে নিষ্কণ্টক জমির অভাব বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। সেটার সঙ্গে সমন্বয় করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, দক্ষ শ্রমিক তৈরি ভালোভাবে করতে পারলে স্থানীয় বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। আগামী ৫ থেকে ১০ বছরে বাংলাদেশও ভিয়েতনামের মতো বড় রপ্তানিকারক দেশ হতে পারবে। রপ্তানির ভেতরে টেকনোলজিক্যাল যে কম্পোনেন্ট,

আমাদের দেশে উচ্চ টেকনোলজি কম্পোনেন্ট ১ শতাংশেরও কম আর ভিয়েতনামে ৪৩ শতাংশের বেশি। সেই রকম একটা টেকনোলজিক্যাল রেডিয়েশন করে আমাদের কিন্তু তুলনামূলক যে সুবিধাগুলো আছে, তাকে প্রতিযোগিতার সক্ষমতায় রূপান্তরিত করার একটা সুযোগ আছে। আগামীতে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন হচ্ছে, তখন অনেক রেফারেন্স সুবিধা, বাজারসুবিধা, শুদ্ধমুক্ত সুবিধা, কোটামুক্ত সুবিধা চলে যাবে। সেখানেও আমাদের উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে হবে। যাতে করে এই বাজার সুবিধানির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা থেকে তারা দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতানির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় উত্তীর্ণ হতে পারে। যার মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বল্পোন্নত দেশের গ্র্যাজুয়েশন, যেটা ২৪ নভেম্বর ২০২৬-এ হবে, তা টেকসইও মসৃণভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি।

খবরের কাগজ: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: আপনাকেও ধন্যবাদ।

খবরের কাগজ

২২ জানুয়ারি ২০২৫

নারী উদ্যোক্তা হওয়ার অনুকূল পরিবেশ অনুপস্থিত

ড. ফাহিমদা খাতুন

সফল নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকজন। অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে ব্যবসায় নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় খুবই নগণ্য। নারী উদ্যোক্তা তৈরির জন্য যে ধরনের নীতি ও পরিবেশ দরকার তা অনুপস্থিত। ফলে নারী উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহিমদা খাতুন।

বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে জাগো নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জাগো নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি ইব্রাহীম হুসাইন অভি।

জাগো নিউজ: একজন সফল অর্থনীতিবিদ হিসেবে বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে কী ধরনের বাধা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

ড. ফাহিমদা খাতুন: বর্তমানে দেশে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা খুবই কম। যারা আছেন তাদের অনেকেই আবার পারিবারিক সূত্রে। নতুন উদ্যোক্তা তৈরির পথে অন্তরায় অনেক। নারীদের জন্য নতুন ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি একটি বড় বাধা। কোনো নারীকে ব্যবসায় অর্থ লব্ধি করার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাংক আগ্রহী নয়। অন্যদিকে যারা দিতে চান তারা এমন সব শর্ত আরোপ করেন যা একজন নারীর পক্ষে পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে নতুন বিনিয়োগকারীকে ঋণ দিতে আগ্রহী নন তারা। বড় ধরনের ব্যবসা কিংবা যাদের সঙ্গে লেনদেন আছে শুধু তাদেরই ঋণ দেন। ফলে নতুনদের জন্য ঋণ পাওয়া খুবই কঠিন। অনেক সময় নারী উদ্যোক্তার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

এছাড়া বিজনেস লিটারেসির অভাব রয়েছে। অনেকে জানেন না কোথা থেকে ঋণ পাওয়া যায়। কিংবা কীভাবে পেতে হয়। এর পাশাপাশি আরেকটি বড় বাধা হয়েছে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে অনেকেই নারীর উদ্যোক্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ইতিবাচকভাবে দেখে না।

একজন নারীর জন্য দেশে অ্যানাবেলিং বিজনেস এনভায়রনমেন্ট বিরাজ করে না। ফলে নতুন ব্যবসা শুরু করতে সামাজিক, আর্থিক এবং নীতিগত বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হয় একজন নারীকে। এক কথায় বলা যায় বর্তমানে যে ধরনের পরিবেশ রয়েছে তা একজন নারীর নতুন করে ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা হওয়ার অনুকূল পরিবেশ থাকে না।

জাগো নিউজ: প্রচলিত এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য কী প্রয়োজন?

ড. ফাহিমদা খাতুন: প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে সর্বপ্রথম দরকার পারিবারিক সমর্থন ও সহযোগিতা। আমাদের সমাজব্যবস্থা সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং যে ধরনের নীতি ও আইন রয়েছে তা পরিপূর্ণ নারীর উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। এক্ষেত্রে সরকারকে নীতির পরিবর্তন করতে হবে এবং পরিবার থেকে নারী সদস্যদের ব্যবসায়ী উদ্বুদ্ধকরণে আর্থিক ও মানসিক সমর্থন জোগাতে হবে।

নারীর সত্যিকারের এমপাওয়ারমেন্ট তৈরির জন্য যে নীতি প্রয়োজন সেটা অনুপস্থিত। পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইস্যুগুলোতে পরিবর্তন আনা জরুরি। আশার কথা হলো এ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অনেকে কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় মনোবলের কারণে সফল হয়েছে।

জাগো নিউজ: উদ্যোক্তা না চাকরি?

ড. ফাহিমদা খাতুন: নারীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির চেয়ে নারীদের এন্টারপ্রেনার বা উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। একজন নারী নিজে উদ্যোক্তা হলে একটি চাকরির পরিবর্তে সে আরও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে অন্যের চাকরি করার চেয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করার পাশাপাশি অন্যের জন্য কর্মসংস্থান তৈরিতে আনন্দ বেশি।

জাগো নিউজ: উদ্যোক্তা তৈরির জন্য আপনার সুপারিশ কী?

ড. ফাহিমদা খাতুন: উদ্যোক্তা তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যেমন অনলাইন ট্রেনিং, অফলাইনে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদনকৃত পণ্যের বাজারজাতকরণে সরকার এবং এসএমই ফাউন্ডেশনসহ যত ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ করতে না পারলে একজন উদ্যোক্তার জন্য টিকে থাকা কঠিন। তাই দেশীয় এবং বিদেশি ক্রেতা ধরতে বিভিন্ন ধরনের মেলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকার ও বিভিন্ন সংগঠনকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জাগো নিউজ

২৪, ৮ মার্চ ২০২৫



কর্মসংস্থান না বাড়লে দীর্ঘ মেয়াদে শিক্ষা তৈরি হতে পারে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকার এমন এক সময়ে দায়িত্ব নিয়েছিল যখন রপ্তানি প্রবৃদ্ধি তলানিতে নেমেছিল, রেমিট্যান্স আসা অর্ধেক নেমেছিল, ডলারের রিজার্ভ নেমেছিল তলানিতে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে ধস নেমেছিল, অনিয়ম ও দুর্নীতিতে ব্যাংক খাতে চলছিল লুটপাট, মূল্যস্ফীতির চাপে পিষ্ট ছিল ক্রেতা, সহযোগী দেশগুলো সহায়তার হাত গুটিয়ে নিয়েছিল।

তবে সেই অবস্থা থেকে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশের অর্থনীতি। রপ্তানিতে সাত মাসে ১০ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে, রেমিট্যান্স ইতিহাসের রেকর্ড গড়ে ১৮ বিলিয়নে নামা রিজার্ভ ২১ বিলিয়ন ছুঁয়েছে।

ব্যাংক খাতে লুটপাট বন্ধ হয়েছে, আস্থা ফিরেছে। অনেকটাই কমেছে মূল্যস্ফীতি, পাশে দাঁড়িয়েছে সহযোগী দেশগুলোও। তবে এখনো বাকি রয়েছে অনেক কাজ, এই সরকারের প্রতি জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি।

সরকার পরিবর্তনের পর অর্থনীতিতে বহু পরিবর্তন এসেছে। এর কিছু ইতিবাচক এবং কিছু নেতিবাচক। যেমন—আমরা রপ্তানি ও রেমিট্যান্সে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখেছি। বাণিজ্যের মাধ্যমে টাকা পাচার বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। হুন্ডিচক্র দুর্বল হওয়ার ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক রেমিট্যান্স কমে বৈধ পথে প্রবাহ বেড়েছে।

এটার একটা প্রভাব আমরা রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবৃদ্ধির মধ্যে দেখেছি, যার ফলে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য (বিওপি) স্বস্তির মধ্যে রয়েছে। অনেক দিন পরে চলতি

হিসাবে আমরা পজিটিভ হয়েছি। এটার সুযোগে আমদানির ওপরে যে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা রাখা হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে তুলে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে এগুলো ইতিবাচক।

আবার উচ্চ মূল্যস্ফীতিকে নামিয়ে নিয়ে আসার বিষয়ে মানুষের যে প্রত্যাশা ছিল তা পুরোপুরি পূরণ হয়নি।

কিছুটা কমলেও মূল্যস্ফীতি এখনো উচ্চ স্তরেই রয়েছে। এটা সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তার কারণ। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাংকসংস্থার সুদহার একাধিকবার বাড়ানো হয়েছে, যার ফলে নতুন কোনো বিনিয়োগ হচ্ছে না।

বিনিয়োগকে চাপা করা একটি চ্যালেঞ্জ। সেটা অর্থনীতিতে কিন্তু রয়েই গেছে। অভ্যন্তরীণ বাজারে নতুন কর্মসংস্থান না বাড়লে দীর্ঘ মেয়াদে শঙ্কা তৈরি হতে পারে। এটাও একটা চিন্তার কারণ।

বিনিয়োগ পরিস্থিতিতে তেমন ইতিবাচক উন্নতি নেই। মূলধনী যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে শিল্প-কারখানার আমদানিতে স্থবিরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। ব্যাংকের উচ্চ সুদহারের কারণে বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করতে না পারায় বিডার পরিকল্পনাও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তারা কয়েকটি স্পেশাল ইকোনমিক জোন চালু করতে চেয়েছিল, কিন্তু গ্যাস সংযোগ, বিদ্যুৎ সরবরাহ দেওয়া যাচ্ছে না। সরকারের সার্বিক সক্ষমতা কম হওয়ায় আমাদের অর্থনীতিকে পুরোপুরি বিনিয়োগবান্ধব করা সম্ভব হয়নি।

ব্যাংক সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক চেষ্টা করে যাচ্ছে। যেমন—বিভিন্ন টাস্কফোর্স গঠন, বিএফআইইউ সক্রিয়করণ এবং দুদক মিলে কাজ করছে। তারা ব্যাংক লুটকারীদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত খেলাপীদের চিহ্নিত করা যায়নি। ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও এখনো দৃশ্যমান হচ্ছে না, কারণ অর্থনীতিতে যেকোনো পদক্ষেপের সুফল পেতে কিছুটা সময় লাগে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার দিকে মনোযোগী হতে হবে। এ ছাড়া সংস্থাগুলোকে উদ্যোগী করা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সক্রিয় করতে পারলে রাজস্ব আহরণ ও বাজেট ঘাটতি কমানো যাবে। বাজেট সামনে রেখে ডিজিটাইজেশন ও করনেট বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশা থাকবে। বিশেষত প্রত্যক্ষ কর বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে যেসব কর ফাঁকি আছে, সেগুলো প্রতিরোধ করতে হবে।

যেহেতু আমাদের ক্রয়ক্ষমতার অবনতি হয়েছে, আমানতের বৃদ্ধির থেকে মূল্যস্ফীতির হার প্রায় দ্বিগুণ, তাই সামাজিক সুরক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হবে। খোলাবাজারে পণ্য বিক্রি বৃদ্ধি, ভাতা, বিভিন্ন কার্ড বাড়াতে হবে। এ জন্য যে টাকার প্রয়োজন হবে তা প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমেই আসবে। তাই প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধির মাধ্যমে সার্বিক রাজস্ব বাড়তে হবে।

ঋণ পরিশেবার চাপ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সুতরাং রাজস্ব আদায় না বাড়াতে পারলে ঋণ এনে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সেটা কোনো অর্থনীতির জন্যই ভালো নয়। সার্বিক চাপ সরকারকে সামাল দিতে হচ্ছে। তাই সামনে সুশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার হয়তো সব কিছু করে যেতে পারবে না। তাদের দেখানো পথে পরের সরকার এসে বাকি কাজগুলো বাস্তবায়ন করবে বলে আশা থাকবে।

কালের কণ্ঠ

৮ মার্চ ২০২৫

অধ্যায় ৭

বাণিজ্য, শুল্ক ও বৈদেশিক খাত



অবহেলিত সার্ক কার্যকর হলে বাড়বে আমদানি-রপ্তানি

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৮ আগস্ট দায়িত্ব নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এরপর ভারত-পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্কে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তনের হাওয়ায় পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক কীভাবে উন্নতি করা যায় এবং ভারতকে পাশে রেখে আমদানি-রপ্তানিতে বিকল্প উৎস সন্ধানের বিষয়ে কথা বলেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

সিপিডি কার্যালয়ে বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এ মুহূর্তে পাকিস্তানের বাজার বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুত নয়। আর দীর্ঘদিনের সার্ক কার্যকর হলে পাকিস্তান থেকে ভারত হয়ে আমদানি-রপ্তানি করতে পারবে বাংলাদেশ।

প্রশ্ন: ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তান, ভারত, চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কী পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: গত ৫ আগস্টের পরিবর্তনটা হয়েছে রাজনৈতিক। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ের তুলনায় দেশের রাজনীতিতে একটি গুণগত পরিবর্তন এসেছে। এর ফলে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্নির্ধারণ করেছে।

বহির্বিশ্বও বাংলাদেশ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করেছে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। জো বাইডেন প্রশাসন অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন দিয়েছে। এবার ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বেলায়ও কিছু গুণগত পরিবর্তন হবে।

কারণ, বৈশ্বিক পর্যায়ে আমেরিকার ফাস্টনীতি, যাকে ‘আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন’ বলে সেই নীতিতে এগোবে ট্রাম্প প্রশাসন। নিজের স্বার্থ রক্ষায় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিষয়গুলো ভিন্নভাবে দেখা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যার ইঙ্গিত ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন: ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে টানা পোড়েন পড়বে বলে ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে, এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: ভারত বলছে বলে আমি বলছি না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্কে যে একটা নতুন পরিণতির দিকে যাচ্ছে, সেটা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

যেমন চীনের পণ্যের ওপর যদি যুক্তরাষ্ট্র বাড়তি শুল্ক আরোপ করে তখন যুক্তরাষ্ট্রে চীনা পণ্যের দাম বাড়বে। এতে মার্কিন নাগরিকরা অন্য দেশের পণ্যের দিকে ঝুঁকবেন, বিকল্প উৎস থেকে পণ্য খুঁজবেন মার্কিন বায়াররা। সেটা বাংলাদেশের জন্য বাণিজ্যিক সুযোগ হতে পারে। অন্যদিকে চীন চাইবে উদীয়মান দেশগুলোর সঙ্গে তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে। এটা বাংলাদেশের বাণিজ্য বিনিয়োগে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে। তবে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দূটোই গুরুত্বপূর্ণ। আগের সরকারের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক ছিল। তবে সম্পর্ক অতিব্যবহার হয়েছে। ভারত তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। এটাও ঠিক যে, ভারত আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম আমদানির উৎস। প্রায় ১৩-১৪ বিলিয়ন ডলার আমরা ভারত থেকে আমদানি করি। ভারতের ষষ্ঠ বা সপ্তম রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ। ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের প্রয়োজনীয়তা ও আমদানিতে স্থলভাগ ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে আমাদের। সে ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বিষয়ে ভারতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। তাই অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে।

প্রশ্ন: অর্থনীতি বা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভারতকে একটু পাশ কাটিয়ে অন্যদেশের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানো যাবে কি না। যেমন বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে ভারতের বন্দর ব্যবহার না করে মালদ্বীপের বন্দর ব্যবহার করা হচ্ছে কয়েকটি ক্ষেত্রে।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: পূর্ববর্তী সরকারের আমলে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ বিশেষ করে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক লেনদেন কম ছিল, যা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে পাকিস্তান থেকে ৭৮০ মিলিয়ন ডলার পণ্য আমদানি করছে বাংলাদেশ, রপ্তানি হচ্ছে ২৩০ মিলিয়ন ডলারের মতো। অথচ ভারতে আমরা পণ্য রপ্তানি করছি ২ বিলিয়ন ডলার আর আমদানি করছি প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলারের মতো। বিপুল পরিমাণ এই আমদানি ও রপ্তানির উৎস নতুন করে খুঁজতে হবে। যেমন আমাদের পণ্যগুলো বিকল্প

বাজারে রপ্তানির সুযোগ রয়েছে কি না। কিন্তু ভারতের বাজারে আমাদের পণ্যের যে চাহিদা রয়েছে তা কিন্তু এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কা বা পাকিস্তানের বাজারে নেই। এদিকে চীনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেশ ভালো। হংকং থেকে আমরা ভারতের চেয়েও কম খরচে পণ্য আমদানি করতে পারি। অর্থাৎ চীন এ ক্ষেত্রে নতুন কোনো উৎস নয়। আবার আমাদের অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজন কর কম হওয়ার কারণে চীনে আমরা রপ্তানি বাড়াতে পারছি না। চীনের শূন্য শুল্ক সুবিধা নিতে পারছি না। সুতরাং রুট বদলে দিলেই আমরা সুবিধাটা পাব না। পাকিস্তান থেকে পণ্য পরিবহনে বড় জাহাজে আমদানি-রপ্তানিতে সেই ধরনের চাহিদা থাকার প্রয়োজন রয়েছে। এখন যেটা হচ্ছে করাচি থেকে ২৮ দিন পর পর একটা সাইকেলে (চক্রে) জাহাজগুলো আসে। আর কোনো একটা দেশের সঙ্গে নিয়মিত বাণিজ্য করতে হলে এতো দীর্ঘ বিরতি দিয়ে পণ্য আমদানি-রপ্তানির চাহিদা ঠিক রাখতে পারব না। বরং যেটা করা দরকার, বাণিজ্যিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে পাকিস্তানের সঙ্গে আরও পণ্য আমদানি-রপ্তানির সুযোগের সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে পণ্য আদান-প্রদানে করাচি থেকে চট্টগ্রাম কিংবা দুবাই হয়ে চট্টগ্রাম এটা কার্যকর হবে না। সুতরাং ভারতকে পাশে রেখেই আমাদের চিন্তা করতে হবে অন্যান্য দেশের সঙ্গে রপ্তানি-আমদানির কীভাবে বাড়াতে পারি।

প্রশ্ন: চীনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও বাড়ানোর উপায় কী?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: চীনের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমাদের দুই ধরনের উদ্যোগ রয়েছে। একটি হলো এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর মুক্তবাণিজ্য জোট রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ-আরসেপ। যেখানে চীন, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো ১২টি দেশ রয়েছে। সেই আরসেপে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। কম শুল্কে সেখান থেকে আমরা পণ্য আমদানি করতে পারব। আরেকটি হচ্ছে চীনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় পর্যায়ে আমরা কম্প্রিহেনসিভ পার্টনারশিপে যেতে পারি কি না। শূন্য শুল্ক করার সুবিধা দেওয়ার পরও চীনে আমরা রপ্তানি এক বিলিয়ন ডলারের বেশি বাড়াতে পারছি না। কারণ, তাদের শর্ত অনুযায়ী ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজন করতে হবে। এতো উচ্চ মূল্য সংযোজন আমরা খুব বেশি পণ্য করতে পারি না। আর এই শর্ত থেকে বেরিয়ে আসার উপায় চীনের সঙ্গে সমন্বিত বাণিজ্য চুক্তিতে যেতে পারি। যেখানে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সেবা সবই থাকবে।

প্রশ্ন: বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক তাহলে কী হতে পারে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: ইতোমধ্যে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ভেতরে অবকাঠামোগত, জ্বালানিগত খাতে এবং সড়কের প্রকল্প রয়েছে। স্বাভাবিক গতিতে প্রকল্পগুলোর কাজ চলছে। আমরা চাচ্ছি আমাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক

(এআইআইবি) থেকে চীন বিনিয়োগ করুক। চীন যেন তাদের উন্নত ম্যানুফ্যাকচারিং আমাদের ডোমেস্টিক ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে আরও বেশি করে নিয়ে আসে। চীন যদি তার সোলার বেজড ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং বাংলাদেশে করে তবে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে একটা সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশ থেকে ওষুধ আমদানি করতে চায় পাকিস্তান। এ বিষয়টি কীভাবে দেখছেন

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: ওষুধ আমদানিকে অবশ্যই ইতিবাচক হিসেবে দেখব। আমাদের ওষুধশিল্প খুবই সমৃদ্ধ। আমরা ১০১টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করি, ৬০০ মিলিয়ন বা তার কিছু কম রপ্তানি আয়। যদিও বড় পরিসরে রপ্তানি হচ্ছে না। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় রপ্তানি শুরু হয়েছে। পাকিস্তানে রপ্তানি একটা ভালো উদ্যোগ হতে পারে। তবে কম পণ্য দিয়ে একটা ট্রেড রুট চালানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে দুবাই হয়ে শিপমেন্ট করেও সেখান থেকে করাচিতে রপ্তানি করা যায়। এটা আরও সশ্রমী হবে সরাসরির চেয়ে। এ কারণেই কিন্তু হাবগুলো গড়ে ওঠে। যেমন শ্রীলঙ্কা একটি হাব, দুবাই একটি হাব। আমি যে কথটা বলছি, আমাদের নিয়মিত বাণিজ্যিক চুক্তি, রুট ঠিক থাকুক। রাজনৈতিক সম্পর্কের পতনের কারণে যেন একটি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যেটা আগের সরকারের সময়ে হয়েছে। আরেকটি বড় সুযোগ সার্ক। আমরা সার্ককে দীর্ঘদিন অবহেলা করেছি। ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের জন্য সার্ক কার্যকরী হচ্ছে না সেভাবে। সার্কের অধীনে মোটর ভিহিকল চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কথা। সেটা ড্রাফ্ট (খসড়া) হয়েই পড়ে আছে। ওটা হলে পাকিস্তান থেকে স্থল দিয়ে ভারত হয়ে আমরা বাংলাদেশে আমদানি-রপ্তানি করতে পারতাম।

প্রশ্ন: পাকিস্তান হাইকমিশনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে মার্চের মধ্যেই বাংলাদেশ-পাকিস্তান রুটে বিমান চলাচল শুরু হবে, এতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান কেমন হবে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: এ মুহূর্তে পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি ফ্লাইট নেই, দুবাই হয়ে যেতে হয়। এটা ব্যয়বহুল। সরাসরি হলে ব্যয় কমবে। কিন্তু সরাসরি বা পূর্ণাঙ্গ রুট চালু হওয়া মানে দুই দেশের মধ্যে সেই পরিমাণ বাণিজ্য, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক থাকা। যাতে অনেক বেশি লোক আসা-যাওয়া করে। পাকিস্তানের সঙ্গে এখন পর্যন্ত উল্লেখ করার মতো বাণিজ্য, বিনিয়োগ, মানুষজন চলাচল বেশি মাত্রায় নেই। সে ক্ষেত্রে নিয়মিত একটি ফ্লাইট চালানোর মতো সম্ভাব্যতা কতটা রয়েছে সেটা বড় প্রশ্ন। কোনো ফ্লাইটই তো লোকসান দিয়ে চালাবে না। সম্ভাবে একটি-দুটি ফ্লাইট হতে পারে। যেমন ইজিপ্ট এয়ারলাইনকে আমরা দিচ্ছি। পাকিস্তানও সেটা করতে পারে।

প্রশ্ন: দুর্বল ব্যাংকের তারল্য সংকট মেটাতে সাড়ে ২২ হাজার কোটি টাকা ছাপানো হয়েছে। তারপরও গ্রাহকরা ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারছেন না। ডলারের দামও বেড়ে গেছে। তারল্য সংকট কাটাতে এই নোট ছাপানোর সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক ছিল?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আমার মনে হয় একটি জায়গায় সরকারকে নীতিগত ও কঠোর হওয়া প্রয়োজন। সেটা হলো কিছু ব্যাংককে বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। কারণ, যতই লিকুইডিটি সাপোর্ট দেন, এই ব্যাংকগুলো কোনোভাবেই তার ঋণের উত্তরণ ঘটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারবে না। টাকা ছাপিয়ে সহায়তা করে এসব ব্যাংক দীর্ঘদিন চালানো যাবে না। বলতে পারেন এসব ব্যাংক তলাবিহীন হয়ে গেছে। তবে এসব ব্যাংক বন্ধ করার আগে সেখানে আমানতদারদের বিষয়ে ভাবতে হবে, কীভাবে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া যায়।

বাংলা নিউজ২৪

জানুয়ারি ২১, ২০২৫



টিকফার মাধ্যমে আমাদের অবস্থান তুলে ধরে শুদ্ধ হ্রাসের আলোচনা শুরু করতে হবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্র ঠিক কিসের ভিত্তিতে বাংলাদেশের ওপর এই শুদ্ধ আরোপ করল, তা পরিষ্কার হলো না। তারা হিসাব করে বের করেছে, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেসব পণ্য আমদানি করে, সেসব পণ্যে ৭৪ শতাংশ শুদ্ধ আরোপ করেছে; সেই হিসাবে বাংলাদেশের পণ্যে ৩৭ শতাংশ শুদ্ধ আরোপ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই শুদ্ধের হিসাবের মধ্যে শুদ্ধ ছাড়াও আরও কিছু বিষয়ে আমলে নেওয়া হয়েছে। যেমন মুদ্রার বিনিময় হার, অশুদ্ধ বাধা, সংশ্লিষ্ট দেশের বাণিজ্যনীতি ইত্যাদি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ যেসব পণ্য আমদানি করে, সেগুলোতে আমদানি শুদ্ধ খুবই কম।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ যে তিনটি পণ্য সবচেয়ে বেশি আমদানি করে, সেগুলো হলো স্ক্রাপ আয়রন, পেট্রোলিয়াম ও কটন। এর মধ্যে স্ক্রাপ আয়রন ও কটন কাঁচামাল হিসেবে আমদানি করা হয়, এসব পণ্যে শুদ্ধ নেই অর্থাৎ এই দুটি পণ্য বিনা শুদ্ধে আমদানি করা হচ্ছে। সুতা দিয়ে তৈরি পোশাক সেই যুক্তরাষ্ট্রেই রপ্তানি হচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যেসব পণ্য রপ্তানি করি, তার ৯০ ভাগই এই তৈরি পোশাক। বাস্তবতা হলো যুক্তরাষ্ট্রের কটনের পঞ্চম বৃহত্তম ক্রেতা দেশ বাংলাদেশ। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নিজেরই নিয়ম আছে, তাদের দেশের কাঁচামাল আমদানি করে প্রস্তুতকৃত পণ্য সেই দেশেই রপ্তানি করা হলে শুদ্ধের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেওয়া হবে কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম প্রযোজ্য হলো না।

এই বাস্তবতায় আমাদের কথা বলার অবকাশ আছে। আমি মনে করি, টিকফার মতো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে আমাদের এ কথা তুলতে হবে। প্রথমত, আমাদের জানতে চাইতে হবে কিসের ভিত্তিতে তারা ৭৪ শতাংশ শুদ্ধের হিসাব করল। তাদের কাছ থেকে আমদানি করা পণ্যে

আমাদের শুল্ক অনেক কম। তারা মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ে কারসাজির হিসাব করেছে। একসময় আমাদের টাকার বিনিময় হার কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে রাখা হতো ঠিক; কিন্তু গত তিন বছরে ধাপে ধাপে মুদ্রার বিনিময় হার বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। ফলে আমাদের বিনিময় হার এখন বাজারের হারের কাছাকাছি। এই বিষয়গুলো আমাদের তুলে ধরতে হবে।

এদিকে চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বড় দেশগুলো এই শুল্কের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেবে হয়তো। এর জেরে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হবে। শুল্ক বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিকভাবে মার্কিন নাগরিকদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাবে। স্বাভাবিকভাবে মানুষের কেনাকাটা কমে যাবে। সেই সঙ্গে বাড়বে মূল্যস্ফীতি—পরিণতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধির হার কমে যাবে, এমনকি মন্দাও হতে পারে। সেটা হলে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও তার প্রভাব পড়বে। অর্থাৎ এই শুল্ক বৃদ্ধির নানামুখী প্রভাব দেখা যাবে।

এই শুল্ক কত দিনের জন্য, তা বলা হয়নি, তবে আলোচনার দরজা খোলা আছে। যে দেশ যখন শুল্ক কমাবে, যুক্তরাষ্ট্রও তাদের ওপর শুল্ক কমাবে। বাংলাদেশের উচিত হবে টিকফা ব্যবহার করে আমাদের অবস্থান তুলে ধরা এবং শুল্ক হ্রাসের আলোচনা শুরু করা।

প্রথম আলো

০৩ এপ্রিল ২০২৫

অপ্রত্যাশিত শুষ্কের মাত্রা আশ্চর্যান্বিত করেছে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্র যে অতিরিক্ত শুষ্ক আরোপ করল এটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু এটার মাত্রা কিছুটা আমাদের আশ্চর্যান্বিত করেছে।

তারা হিসাব করেছে যে বাংলাদেশের জন্য অতিরিক্ত শুষ্ক হওয়ার কথা ৭৪ শতাংশ কিন্তু তারা ৩৭ শতাংশ আরোপ করেছে। এ ৩৭ শতাংশও যোগ হবে আমাদের যে চলমান শুষ্ক মার্কিন বাজারে গড়ে ১৫ শতাংশ আছে তার সঙ্গে। সবটা মিলিয়ে প্রায় ৫২ শতাংশ বসবে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর। এটা যেকোনো বিচারেই একটা বড় মাত্রার আমদানি শুষ্ক।

মার্কিন বাজারে আমাদের ৯০ শতাংশই তৈরি পোশাক রফতানি হয়। ফলে তৈরি পোশাক বা অন্য যেকোনো বাংলাদেশী পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুষ্কের কারণে মূল্য বাড়বে। তখন মার্কিন ভোক্তারা আমাদের পণ্যের ওপর থেকে চাহিদা কমিয়ে দেবে। যেমন ১০ ডলারের একটি টি-শার্ট, এটার ওপর আগে ১৫ শতাংশ শুষ্ক বসালে দাম পড়ত সাড়ে ১১ ডলার। এখন এটার উপর আরো ৩৭ শতাংশ শুষ্ক বসালে ১৫ ডলার দাম পড়বে। ফলে চাহিদার দিক থেকে একটা সংকোচন হবে। এতে করে বাংলাদেশের রফতানির ওপরও পড়বে নেতিবাচক প্রভাব।

অন্যদিকে, আমাদের যারা প্রতিযোগী আছে তাদের ওপরও অতিরিক্ত শুষ্ক বসেছে। চীনের ওপর আগের ২০ এখন ৩৪ মিলিয়ে ৫৪ শতাংশ বসেছে, ভিয়েতনামের ওপর বসেছে নতুন করে ৪৬ শতাংশ, কম্বোডিয়ার ওপর বসেছে ৪৯ শতাংশ। সেটা আমাদের থেকে বেশি। ফলে কিছুটা হয়তো সুবিধা হতে পারে। অন্যদিকে ভারতের ওপর ২৭ শতাংশ, পাকিস্তানের ওপর ২৯ শতাংশ। তাদের আবার আমাদের তুলনায় কিছুটা সুবিধা হবে। সুতরাং, সব দিক থেকে একটা প্রভাব তো পড়বেই। দ্বিতীয় যেটা, এ অতিরিক্ত শুষ্কারোপের ফলে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হবে। যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং চীন বলেছে, তারাও অতিরিক্ত শুষ্কারোপ শুরু করবে। এখন যেটা অতিরিক্ত আরোপ করেছে, তার বাইরেও আরো অতিরিক্ত শুষ্কারোপের সম্ভাবনা

রয়েছে। যার ফলে বৈশ্বয়িক বাণিজ্যের ওপর একটা নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হবে। যে কারণে বৈশ্বয়িক বাণিজ্য প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব দেখা দেবে। এর ফলে শুধু মার্কিন বাজার না, অন্যান্য বাজারেও আমাদের পণ্যের চাহিদা কমে যেতে পারে।

এখন আমাদের যেটি করা যেতে পারে যে দ্বিপক্ষীয়ভাবে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জিঙ্কস করতে পারি—তোমরা কী হিসাবে আমাদের ৭৪ শতাংশ করলা। কারণ বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের তুলার পঞ্চম প্রধান রফতানি গন্তব্য। সেটার সুযোগ কিন্তু বাংলাদেশ নিতে পারে। কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, যেসব পণ্য উৎপাদনে মার্কিন পণ্য কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয়, সেখানে শৈথিল্য দেখানো হবে। আমরা তাদের থেকে যে পেট্রোলিয়াম, যে গ্যাস আমদানি করি সেখানে ৩১ শতাংশ শুল্ক রয়েছে। কিন্তু লোহা যে আমদানি করি আমরা, আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তর আমদানি পণ্য সেখানেও কিন্তু শূন্য শুল্ক। এখন আমাদের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত আছে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলারে মতো। তারা এটাকে বড় করে দেখেছে। কিন্তু এটার জন্য আমাদের এ রকম মাশুল দিতে হবে, সেটা কতটুকু যৌক্তিকতা আছে...। ফলে এগুলো নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা দরকার।

এখন আমাদেরও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়াতে হবে, রফতানিকারকদের জন্য কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস কমাতে হবে। যেসব সংস্কার করা দরকার, সেগুলো করে আমাদের সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। বাজারের বৈচিত্র্যকরণের দিকে নজর দেয়া দরকার। এ ঘটনা সেসব প্রয়োজনীয়তাকেও মনে করিয়ে দেয়।

বণিক বার্তা

৪ এপ্রিল ২০২৫

রপ্তানির ভেতরে শুল্কের মধ্যে সমাধান খোঁজা বিবেচনা প্রসূত হবে না

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। এসব নিয়েই ডয়চে ভেলের সঙ্গে কথা বলেছেন সিটিজেন্স প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

ডয়চে ভেলে : ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধির কারণে যে অব্যবহিত বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হলো এতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, সেটা সামাল দেওয়ার সক্ষমতা বাংলাদেশের কতটা?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : ট্রাম্প প্রশাসন যে শুল্ক যুদ্ধ শুরু করেছে, তার প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীব্যাপী আমরা দুইটা ধারা দেখি। যারা বড় দেশ, বড় অর্থনীতি, যাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা আছে, তারা অনেকেই প্রতিশোধমূলক শুল্ক আরোপ করছে। চীন যেমন একজন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো কোনো দেশ সম্ভবত হবে। আবার অপরদিকে যারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল অর্থনীতি, যারা রপ্তানির দিক থেকে মার্কিন বাজারের উপর নির্ভরশীল, তারা যেটা করছে, সময় চাচ্ছে আলোচনা করার জন্য। তার পাশাপাশি তারা একতরফাভাবে শুল্ক কমিয়েছে। আবার যারা মধ্য ও উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ আছে, তারা শুল্কও কমিয়েছে, আলোচনাও করছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের খাত রক্ষা করার জন্য বাড়তি শুল্কও আরোপ করছে। আমরা এই দুটো ধারা দেখি, আবার মিশ্র ধারাও দেখি। তৃতীয় আরেকটা পদক্ষেপ এখানে আছে। চীনের মতো দেশ ডাব্লিউটিওতে গেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতির বরখেলাপ ঘটেছে। সেইটাতে তারা অনুযোগ করেছে। সমস্যা হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাতে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য যে বিচার ব্যবস্থা আছে, সেটা অকার্যকর হয়ে রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য যে প্যানেলটা আছে, সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের মনোনয়ন দেয়নি। ফলে এটা বহুদিন যাবত অকার্যকর হয়ে রয়েছে। ফলে এখান থেকে কোনো সুরাহা বের হবে না।

রপ্তানি গন্তব্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ ছাড়া কি আমাদের তেমন কোন বিকল্প কি আছে?

বিকল্প আছে। আমরা সাম্প্রতিককালে দেখেছি, অপ্রচলিত বাজারে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে যেমন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে, একইভাবে কোরিয়া ও জাপানের বাজারে এর পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া, কানাডা আছে। বিগত সময়ে এসব বাজারে অগ্রগতি আমরা দেখেছি। এটা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য শুল্ক সুবিধা ব্যতিরেকেও প্রতিযোগিতা সক্ষম হয়ে উঠেছে। অনেকেই যেখানে নেতিবাচক বা দুর্যোগপূর্ণ মনে করেন আমি কোনোভাবেই সেটা মনে করি না।

তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপের বাজারের উপর নির্ভরশীলতার কারণে কি আমরা একটু বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছি?

ইউরোপের বাজারে যেহেতু আমরা শুল্ক সুবিধা পাই, ফলে তার উপর নির্ভরশীলতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তো আমরা শুল্ক দিয়েই প্রতিযোগিতা করি। গত এক-দুই বছরে মার্কিন বাজারে আমাদের পণ্যের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজারে বাংলাদেশের অংশও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবৃদ্ধির হারও ভালো, বাজারের অংশও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্য বারবার আমি যেটা বলতে চাই- বাংলাদেশের রপ্তানি শিল্প খুই একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে আছে- সেটা আমার মনে হয় না। অপ্রচলিত বাজারে এবং মার্কিন বাজারেও শুল্ক দিয়ে আমরা একটা অবস্থানে আছি। অন্যান্য প্রতিযোগী দেশগুলোর উপর যে শুল্ক আরোপ করা হচ্ছে, সেটার তুলনায় কী দাঁড়াবে সেটা দেখার বিষয়। সেক্ষেত্রে ভিয়েতনাম একটা বড় বিষয়। ভিয়েতনামের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সম্পর্ক, যে বাণিজ্য সুবিধা আছে, সেগুলো এবং বিশেষ করে ভিয়েতনাম যে একতরফাভাবে শুল্ক হ্রাস করে মার্কিন বাজারের সাথে একটা দেওয়া-নেওয়ার ভেতরে যেতে চাচ্ছে, সেটা বাংলাদেশের লক্ষ্য রাখার বিষয়।

সরকার বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটাতে কি পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব?

শেষ বিচারে বাংলাদেশের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, অর্থাৎ, আমার রপ্তানি পণ্যের যে সীমিত সমাহার, সেটাকে বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশ যতই স্বল্পোন্নত দেশের থেকে বেরুবে, তত বেশি তারা রপ্তানি পণ্যের বহুমুখিকরণ, একইভাবে বাজারের বহুমুখিকরণ এই দুটো বিষয় খুবই গুরুত্বসহকারে আমাদের নীতি অঙ্গনে রয়েছে। এখন দেখার বিষয়, এই ধাক্কাতে যে কাজটা আমরা বহুদিন ধরে করিনি, সেই কাজটা করার ক্ষেত্রে নতুন কোনো সেই অর্থে প্রেরণা বা তাগিদ সৃষ্টি হলো কিনা। আমি ইতিবাচকভাবে দেখতে চাই যে, এরকম একটা ধাক্কাতে, যখন একটা সংকট হয়, সেটাকে একটা সুযোগ হিসেবে দেখার ব্যাপারে আমরা কতটা উদ্যোগী হবো।

শুল্ক বৃদ্ধির কারণে আমাদের কী পরিমাণ রপ্তানি কমে যেতে পারে?

এখনো বোঝা যাচ্ছে না, কারণ, পরিস্থিতি তো এখনও স্থিতিশীল হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি নিয়েছে, সেটা মধ্য মেয়াদে কতখানি রাখবে সেটাও এখনো পরিষ্কার না। এটা তো শুধু আমাদের বাজারগুলোর বিষয় না। মার্কিন অর্থনীতির পরিস্থিতিও এটার উপর প্রতিঘাত ফেলে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বা মার্কিন নীতি প্রণেতাদের যে মূল লক্ষ্য, সেটা শুল্ক বৃদ্ধি করে তারা বাণিজ্য ঘাটতি কমাবে, এটার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন দেশকে বাধ্য করবে তাদের দেশে বিনিয়োগ করার জন্য বা অন্য দেশে তাদের পণ্যের শুল্ক সুবিধা পাবে এসবের আকাঙ্ক্ষা থেকে তো করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে যে পণ্য রপ্তানি হয়, তাতে প্রস্তুত পণ্যের চেয়ে সেবা খাতের গুরুত্ব বাড়ছে। যে সমস্ত দেশ প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়ে আছে, তারা অনেক ক্ষেত্রে শিল্পজাত পণ্যের চেয়ে সেবা খাত ধর্মী পণ্যে যেতে পারছে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেই সুযোগ বাংলাদেশও নেবে কিনা সেটা দেখার বিষয়। এটার মধ্য দিয়ে বাইরের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা যতখানি বিচলিত হই, কিন্তু আমি মনে করি, দেশের ভেতরে বিনিয়োগ এবং রপ্তানি, শ্রমের উৎপাদনশীলতার দিকে এতদিন আমরা যথেষ্ট নজর দেইনি। এই ধাক্কাটাকে আমাদের জেগে উঠার একটা নতুন সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করা দরকার। কিন্তু শুধু বাণিজ্য দিয়ে যদি এই পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটা ভ্রান্ত হবে। এই অবস্থাকে মোকাবেলা করতে হলে আমাদের উৎপাদনশীলতা, বহুধাকরণ, আমাদের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানির ভেতরে থেকে আমরা যদি শুল্কের মধ্যে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করি, তাহলে খুব বেশি বিবেচনাপ্রসূত হবে না।

ইতিমধ্যে অনেকেই ক্রয়াদেশ স্থগিত করেছে। এতে কি পোশাক কারখানা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে না?

চাহিদা কমে গেলে তো এটা হতে পারে। বাংলাদেশের তরফে পোশাক কারখানা বন্ধ করার বিষয় না। বিষয়টা হলো, উনারা যদি আমাদের কাছ থেকে পণ্য নিয়ে বিক্রি করতে না পারে, তাহলে এই ধাক্কা তো আসবে। আশঙ্কা তো থাকবে। এখানে আমি দু'টি বিষয় বলছি, এই পরিস্থিতিতে বিচলিত হয়ে আমরা এমন কিছু না করি যেটা মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের জন্য উপকারী না হয়। সবচেয়ে বড় কথা, এই পরিস্থিতিতে আমাদের অর্থনীতিতে যে পরিমাণ সংস্কার করা প্রয়োজন, সেটার ক্ষেত্রে আমরা মনোযোগী হবো কিনা? এই ধরনের উদ্যোগ আমি এখন নীতি প্রণেতাদের মধ্যে দেখিনি।

ট্রাম্প প্রশাসনকে প্রধান উপদেষ্টা চিঠি দিয়ে তিন মাস অতিরিক্ত শুল্ক স্থগিত রাখতে বলেছেন। ট্রাম্প প্রশাসন ইতিমধ্যে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এরপর আমরা কী করবো?

এই তিন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতির ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন আনার সুযোগ আছে সেটা দেখা দরকার। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেসব অনুযোগ-

অভিযোগ আছে সেগুলো। আমাদের দেশে মার্কিন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যদি কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বাংলাদেশ থেকে মুনাফা তাদের দেশে নেওয়ার ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা না থাকে বা যদি দিতে না পারি, এসব বিষয় এখন এর সঙ্গে যুক্ত হবে। আমাদের দেশে মার্কিন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যদি কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা যদি থাকে, সেগুলো তুলে দিতে হবে। এখানে মার্কিন বিনিয়োগের বিষয়টিও আসবে। এটা শুধু বাণিজ্য নীতি দিয়ে মোকাবেলা করা যাবে না। এখানে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা নিতে হবে।

সার্বিকভাবে আমাদের অর্থনীতি কতটা চাপের মুখে পড়বে?

অর্থনীতি কিছুটা চাপের মুখে পড়বে। কিছুটা এই জন্য যে, আমাদের বিনিয়োগ পরিস্থিতি ভালো না। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যে সমর্থনটা পাওয়া দরকার, সেটা পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ, ব্যাংকিং পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। সুদের হারও বড় আছে। অর্থায়নের দিক যেমন রয়েছে, সুদের হারের বিষয়ে সেরকম রয়েছে। অপরদিকে কাঁচামাল আমদানি করার ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার জোগান দেওয়ার উপরও অনেকখানি নির্ভর করবে। আমার দৃষ্টিতে এটা যতখানি না শুল্ক আরোপের ফলে চাপটা হবে, সেটা আমার দেশের যে চলমান সমস্যা আছে, সেগুলোকেই আরো বেশি প্রতীয়মান করে তুলবে। সেদিকে নজর দেওয়া এবং একই সঙ্গে যে পরিস্থিতি আছে তাতে রপ্তানির উপর যেন চাপ সৃষ্টি না হয় তার জন্য আলোচনার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সেটাকে কার্যকরভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে যেসব ক্রয় প্রতিষ্ঠান আছে, যারা বিদেশি ক্রেতাদের পক্ষে এখান থেকে পণ্য কেনে, তাদেরও এখানে ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে।

ডয়েচে ভেলে

১২ এপ্রিল ২০২৫

বিরোধ কমিয়ে বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

চীনের পরই দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে ভারতের অবস্থান। ২০১১ সালে ভারত প্রদত্ত শূন্য শুল্ক বাজার-সুবিধার সুবাদে দেশটিতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আবার ভারত থেকে নিত্যপণ্য, কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্য ও যন্ত্রপাতি আমদানি হচ্ছে, যেগুলো উৎপাদনমুখী শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গত অর্থবছরে ভারতের বাজারে ১৫৭ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছিল বাংলাদেশ। তার বিপরীতে ভারত থেকে আমদানি হয়েছিল প্রায় ৯০০ কোটি ডলারের পণ্য। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বাংলাদেশের ঘাটতি প্রায় ৭৫২ কোটি ডলার, যা আগে আরও বেশি ছিল।

রপ্তানি বাড়িয়ে ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য-ঘাটতি হ্রাস করার যখন চেষ্টা হচ্ছে, সে সময় পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশের ওপর তুলনামূলকভাবে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ওপর ঋণাত্মক প্রভাব পড়বে। এর আগে কলকাতা বিমানবন্দর ব্যবহার করে বাংলাদেশকে যে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তা ভারত বাতিল করেছে। এতে ভারতের বিমানবন্দর ব্যবহার করে রপ্তানিতে যে বিকল্প পথ ছিল, সেটি বন্ধ হয়ে গেছে।

ভারতের সর্বশেষ সিদ্ধান্তের কারণে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর সম্ভাবনাময় বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হলো। প্রাণ গ্রুপসহ আমাদের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এখানে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করার চেষ্টা করছিল। এখন সেই সুযোগ তারা হারাবে।

ভারতের শূন্য শুল্কের সুবিধা নিয়ে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক ভারতের বাজারে গত কয়েক বছরে কিছুটা জায়গা করে নিতে শুরু করেছিল। এখন বেশির ভাগ তৈরি পোশাকই স্থলবন্দর দিয়ে যায়। সমুদ্রপথে যদি যেতে হয়, তাহলে পোশাক রপ্তানিতে সময় ও ব্যয় দুই-ই বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দেশটিতে আমাদের পোশাকের চাহিদা কমে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

ভারতের মধ্য দিয়ে নেপাল ও ভুটানে বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট এখনো চালু আছে। নেপাল থেকে ভারতের গ্রিড ব্যবহার করে বাংলাদেশ ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছে। ঝাড়খণ্ডে আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের এক-দশমাংশ বিদ্যুৎ আমদানি হচ্ছে। নির্মাণের অপেক্ষায় থাকা মাতারবাড়ী সমুদ্রবন্দরের মতো বাংলাদেশের বড় বিনিয়োগ থেকে প্রয়োজনমার্কি রিটার্ন পাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বাণিজ্য একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। পারস্পরিক পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপের কারণে এগুলো যদি ব্যাহত হয়, তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বাংলাদেশ যেভাবে ভারত থেকে পণ্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল, ভারতও রপ্তানির বড় বাজার হিসেবে বাংলাদেশের ওপর কম নির্ভরশীল নয়। এ জন্য আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটি হবে উভয় দেশের জন্যই ইতিবাচক।

প্রথম আলো

১৯ মে ২০২৫



ট্রাম্প প্রশাসনের বাণিজ্যনীতি বাংলাদেশের করণীয়

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ১৯৭০ সালে প্রদেয় ‘জাতীয় অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা’ সম্পর্কিত বিশেষ ক্ষমতাবলে চলতি ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসের ২ তারিখ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর বিভিন্ন হারে পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি পণ্যের ওপর যেসব দেশ অন্যায্যভাবে শুল্ক আরোপ করে থাকে এবং যেসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিকৃত পণ্য বিভিন্ন অ-শুল্ক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, সেসব দেশকে মোকাবিলা করার জন্য পাল্টা শুল্ক আরোপ করার অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে। সব দেশের জন্য ন্যূনতম পাল্টা শুল্ক নির্ধারণ করা হয় ১০ শতাংশ এবং এর বাইরে ৫৭টি দেশের ওপর বিভিন্ন মাত্রায় অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক নির্ধারণ করা হয় ৩৭ শতাংশ। তবে ৯ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পাল্টা শুল্কের কার্যকারিতা তিন মাসের জন্য ‘স্থগিত’ ঘোষণা করেন এবং এ সময়কালে সব দেশের জন্য ১০ শতাংশ হারে অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য হবে বলে ঘোষণা দেন। যদিও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এপ্রিল ২ তারিখকে ‘লিবারেশন ডে’ হিসেবে অভিহিত করেন, তার এ ধরনের সিদ্ধান্ত ছিল একতরফা এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নীতিমালা ও শৃঙ্খলার পরিপন্থি।

পাল্টা (অতিরিক্ত) শুল্কহার নির্ধারণ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য খাতে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণকে সে দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিমূল্যকে ভাগ দিয়ে (শতাংশ হিসেবে)। প্রাথমিক পর্যায়ে এ ফর্মুলা অনুসারে যে আমদানি শুল্ক হিসাব করা হয়, তার অর্ধেক পরিমাণ পাল্টা শুল্ক হার হিসাবে আরোপ করা হবে বলে ঘোষণায় বলা হয়। যেমন, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি ছিল ৮.৬ বিলিয়ন ডলার; এ সময়ে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি ছিল ২.২ বিলিয়ন ডলার। ফলে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়ায় ৬.৪ বিলিয়ন ডলার।

সে হিসাবে বাংলাদেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক দাঁড়ায় ৭৪ শতাংশ (বাণিজ্য ঘাটতি ভাগ আমদানিমূল্য, শতাংশ হিসাবে)। এর ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জন্য অতিরিক্ত পাল্টা শুল্কহার নির্ধারণ করা হয় ৩৭ শতাংশ। অর্থাৎ চলমান গড় ১৫.২% শুল্কের সঙ্গে যোগ করলে তা দাঁড়ায় ৫২.২%।

সব দেশের জন্যই একক একটি ফর্মুলা প্রয়োগের মাধ্যমে পাল্টা শুল্ক নির্ধারণ যে কোনো বিচারেই একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি ও অসন্তুষ্টির যদি কারণ থেকেও থাকে তা দেশভেদে ভিন্নতর হওয়ার কথা, তাই একটি অভিন্ন ফর্মুলা প্রয়োগের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। যেমন- যুক্তরাজ্যের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য খাতের বাণিজ্যে উদ্ভূত আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ন্যূনতম ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্কহার যুক্তরাজ্যের ওপরও আরোপ করা হয়। যেমন করা হয়েছে, জনমানববিহীন হার্ড অ্যান্ড ম্যাকডোনাল্ড দ্বীপের ওপর! এটাও উল্লেখ্য যে, অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে কেবল পণ্য খাত বিবেচনা করা হয়েছে; সেবা খাত বাণিজ্যকে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। বৈশ্বিক বাণিজ্যে ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি ছিল ১২০০ বিলিয়ন ডলার, কিন্তু একই সময়ে সেবা খাতে বৈশ্বিক বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভূত ছিল ২৯৫ বিলিয়ন ডলার (যা ২০০০ সালে ছিল ৭৭ বিলিয়ন ডলার)। কিন্তু পাল্টা শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সেবা খাত বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের যে উদ্ভূত আছে, সে তথ্যকে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। প্রশ্ন থেকে যায়, যেসব দেশের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সেবা খাতের বাণিজ্যে ঘাটতি আছে, তারাও যদি যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ পাল্টা শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে?

বর্তমানে ৯০ দিনের জন্য (৯ এপ্রিল থেকে ৮ জুলাই, ২০২৫) সব দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানির ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপিত থাকবে। অর্থাৎ তিন মাসের জন্য বাংলাদেশের পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপিত হবে গড়ে ২৫.২ (১৫.২%+১০%) শতাংশ হারে। চীনের ওপর অবশ্য ১৪৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক বলবৎ থাকবে (চীনও অবশ্য তার ওপর প্রযোজ্য শুল্কের উত্তরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর ১২৫ শতাংশ পাল্টাপাল্টি অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে)।

প্রস্তাবিত পাল্টা শুল্ক আরোপ হলে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি গুরুত্বভারীত্ব গড় শুল্কহার আগের ৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াত ২৮%-এ! তিন মাসের জন্য প্রস্তাবিত ১০% অতিরিক্ত আমদানি শুল্কহার প্রয়োগ করলে তা দাঁড়াবে ১৩%। প্রকৃত অর্থে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এ ধরনের উচ্চ শুল্কহার অন্তত গত ৭৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

সম্ভাব্য অভিযাতগুলো

এ ধরনের সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপের ফল কী হতে পারে, তার কিছুটা ধারণা অবশ্য পাওয়া যায় ইতিহাস থেকে। ১৯৩০ সালে স্মুট-হাওলি অ্যাক্টের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনেরই শুল্ক

দেয়াল নির্মাণ করেছিল। এর ফলে ১৯২৯ সালের শেষার মার্কেট ধসের পর যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে, তা প্রলম্বিত হয়েছিল। উনিশ শতকের ত্রিশের দশকের অর্থনৈতিক মহামন্দার জন্য অনেক অর্থনীতিবিদই এই অ্যাক্টকে দায়ী করেন। এ কথাও সুবিদিত যে, এ তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনে এবং পরে মুক্তবাণিজ্য উদারীকরণের পক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু হওয়া গ্যাট আলোচনা ও ১৯৯৫ সালে বিশ্ববাণিজ্য প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। পৃথিবীর যে কয়েকটি দেশ গত পাঁচ দশকের বাণিজ্য উদারীকরণ ও অপেক্ষাকৃত মুক্ত বিশ্ববাণিজ্যের সুবাদে লাভবান হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ছিল তার মধ্যে অন্যতম- ২০০৮ সালে ইউরোজোন অর্থনীতি ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির আকার ছিল প্রায় সমান; ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির আকার দাঁড়ায় ইউরোজোনের দ্বিগুণ। ৩০ বছর আগে জাপানের মাথাপিছু আয় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুণ, আর ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় ছিল জাপানের দেড়গুণেরও বেশি। সুতরাং চলমান বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা কোনোভাবেই বলা যাবে না। বিভিন্ন বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, এ ধরনের অতিউচ্চ পাল্টা আমদানি শুল্ক আরোপের ফলে মার্কিন অর্থনীতি উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও হ্রাসকৃত চাহিদা, উচ্চ উৎপাদন ব্যয় ও নিম্ন বিনিয়োগ হার এবং এর ফলে নিম্ন প্রবৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির এমন একটি দুশ্চক্রের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। প্রকৃত বিচারে ভোক্তা ও উৎপাদকের ওপর বাড়তি আমদানি শুল্ক কী ধরনের মূল্যচাপ সৃষ্টি করবে, তা অবশ্য নির্ভর করবে শুল্কের মূল্য সংবেদনশীলতা, আর অন্যদিকে চাহিদার মূল্য সংবেদনশীলতার ওপর। ব্র্যান্ড-বায়াররা চেষ্টা করবে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের কাঁধে উচ্চ শুল্কের পূর্ণ বা একটি অংশ চাপিয়ে দিতে। ভোক্তারা চাহিদা সংকোচন করে মূল্যবৃদ্ধির উত্তর দিতে পারে, এ আশঙ্কায় তাদের চেষ্টা থাকবে ভোক্তা পর্যায়ে শুল্কের প্রভাব যতটা সম্ভব কম রাখা, যাতে চাহিদার ওপর আনুপাতিকভাবে কম প্রভাব পড়ে। ইতোমধ্যে ব্র্যান্ড-বায়াররা বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের ডিসকাউন্টে তৈরি পোশাক বিক্রয় করার জন্য চাপ দিচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। এ ধরনের শুল্ক আরোপের ফলে যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে, তার অভিঘাত বিশ্ববাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং পাল্টা শুল্ক আরোপের নেতিবাচক অভিঘাত শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা বৈশ্বিক বাণিজ্য-বিনিয়োগেও বিরূপ প্রভাব ফেলবে এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক অভিঘাতের আশঙ্কা আছে। ইতোমধ্যে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন দেশ ট্রাম্প প্রশাসনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কৌশল নির্ধারণে সচেতন হয়েছে। মূলত এ ক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। চীন ও কানাডার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ পাল্টা শুল্কের বিপরীতে প্রতিশোধমূলক (রিটালিয়েটারি) শুল্ক আরোপ করে জবাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ইসরায়েলসহ বেশ কয়েকটি দেশ অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক শূন্যে নামিয়ে আনার প্রস্তাব দিয়েছে। ৭০টির বেশি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে; ইতোমধ্যে অনেক দেশ (বাংলাদেশের মতো) যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসন ইতোমধ্যে চীনের সঙ্গে

দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু করেছে এবং ট্রাম্প বলেছেন, আলোচনা ফলপ্রসূ হচ্ছে। সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী (১২ মে, ২০২৫), যুক্তরাষ্ট্র চীনের ওপর আরোপিত শুল্কহার ১৪৫% থেকে ৩৫%-এ নামিয়ে আনার প্রস্তাব দিয়েছে। অন্যদিকে চীন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আরোপিত শুল্ক ১২৫% থেকে ১০%-এ হ্রাস করতে স্বীকৃত হয়েছে। এ সমঝোতা ৯০ দিনের জন্য কার্যকর হবে এবং আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক কাঠামো

বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০২৪ সালে ২ হাজার ৫১৫টি পণ্য আমদানি করে। এগুলোর মধ্যে ২৯৭টির ওপর বাংলাদেশে কোনো আমদানি শুল্ক নেই; এ ধরনের পণ্যের আমদানির পরিমাণ ছিল ৭৫৭.৩ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশের বেশি আমদানিতে কোনো শুল্ক ছিল না। বাকি ২ হাজার ২১৮টি পণ্যের ওপর বিভিন্ন মাত্রায় শুল্ক আছে, যার মধ্যে ৭৮২টি পণ্যের ওপর শুল্ক ২০ শতাংশের কম। এ ধরনের পণ্যের মোট আমদানির পরিমাণ ১ হাজার ৯২০.৬ মিলিয়ন ডলার এবং ২০২৪ সালে এসব পণ্য থেকে মোট শুল্ক আদায় হয়েছে ৮৫.৫ মিলিয়ন ডলার। ১ হাজার ৫৩৬টি পণ্যের ওপর শুল্কহার ছিল ২১ শতাংশের বেশি; যেসব পণ্যের মোট আমদানি মূল্য ছিল ৩৭১.০ মিলিয়ন ডলার এবং মোট আরোপিত আমদানি শুল্কের পরিমাণ ছিল ৯৫.০ মিলিয়ন ডলার।

সুবিদিত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্যস্থান। যুক্তরাষ্ট্রের হিসাব মতে, ২০২৪ সালে সে দেশে বাংলাদেশ থেকে আমদানি হয়েছে ৮৬০ কোটি ডলার। বাংলাদেশ ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৯১ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করেছে (শুল্ক, পরিবহন খরচ, ইন্সুরেন্স ইত্যাদির কারণে দুই দেশের আমদানি-রপ্তানির হিসাবে কিছু পার্থক্য আছে)। বাংলাদেশে এ আমদানির মধ্যে ৭৫ কোটি ডলারের পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধায় এসেছে। বাকি ২১৬ কোটি ডলারের আমদানির বিপরীতে বাংলাদেশে মার্কিন পণ্যের ওপর ১৮ কোটি ডলার শুল্ক আদায় করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া ৮৪৫ কোটি ডলার পণ্যের মধ্যে ৪০ কোটি ডলারের পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুল্কমুক্ত আমদানি সুবিধা পেয়েছে; বাকি ৮০৫ কোটি ডলারের পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ১২৭ কোটি ডলার আমদানি শুল্ক আদায় হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানির ওপর যে শুল্ক আদায় করেছিল, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর তার চেয়ে ৭ গুণ বেশি শুল্ক আদায় করেছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আমদানি গুরুত্ব ভারিত গড় শুল্কহার ছিল ৬.২ শতাংশ। যদি আদায়কৃত শুল্ক থেকে আমদানিকারকদের ফেরতযোগ্য শুল্ক বাদ দেওয়া হয় (যেমন- আগাম ভ্যাট, আগাম আয়কর ইত্যাদি), তা হলে এ গড় শুল্কহার হবে মাত্র ২.২ শতাংশ। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আমদানি গুরুত্ব ভারিত গড় শুল্কহার এ সময়কালে ছিল ১৫.২ শতাংশ; তৈরি পোশাক, যার অবদান মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৯০ শতাংশের কাছাকাছি, তার ওপর আরোপিত গড় শুল্কহার ছিল ১৬.০ শতাংশ। তাই অবশ্যই বলা যায়, বাংলাদেশই

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তুলনামূলকভাবে বেশি সহজ শর্তে বাজার সুবিধা দিচ্ছে; বিপরীতটি ঠিক নয়। এ কারণে বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ অন্যায় ও অযৌক্তিক।

বাংলাদেশের সম্ভাব্য কৌশল

ট্রাম্পের অনুসৃত শুল্কনীতির কারণে যে নেতিবাচক অভিঘাত বাংলাদেশের বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে পড়তে পারে এবং যে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তা মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সুচিন্তিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। পাল্টা শুল্ক আরোপের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে কিছু প্রস্তাব এবং আরোপিত পাল্টা শুল্ক তিন মাসের জন্য স্থগিতের অনুরোধসহ একটি পত্র প্রেরণ করেন। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) অফিসে পত্র পাঠিয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা অবহিত করেন যে, বাংলাদেশের শুল্ক তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বর্তমানে আমদানিকৃত ১৯০টি পণ্যের ওপর বর্তমানে কোনো শুল্ক নেই এবং এর বাইরে বাংলাদেশ আরও ১০০টি আমদানিকৃত পণ্যকে শুল্কমুক্ত তালিকায় যুক্ত করার চিন্তাভাবনা করছে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আমদানি হওয়া প্রধানতম তিনটি পণ্য (স্ক্রাপ, এলপিজির উপাদান বিউটেনস এলপিজি ও প্রোপেন) থেকে গত বছর ৬ কোটি ১৬ লাখ ডলার শুল্ক আদায় হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী, এসব পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে শুল্কমুক্ত আমদানি সুবিধা প্রদান করতে হলে অন্য দেশের জন্যও সেটি সমানভাবে প্রয়োগ করতে হতে হবে (এমএফএন বা মোস্ট ফেভারড নেশান নিয়ম অনুসারে)। ফলে এ তিন পণ্যে বাংলাদেশকে মোট ১৬ কোটি ৮০ লাখ ডলারের শুল্ক ছাড় দিতে হবে, যা দেশীয় মুদ্রায় ২ হাজার ৫০ কোটি টাকার সমান। অন্যান্য পণ্যেও যুক্তরাষ্ট্রকে শূন্য শুল্ক সুবিধা প্রদান করলে শুল্ক ছাড়ের এ অংক আরও বাড়বে। যেমন, যদি গ্যাস টারবাইন, সেমি কন্ডাক্টর ও মেডিক্যাল ইকুইপমেন্টের আমদানির ক্ষেত্রেও শূন্য শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয় ও অন্য সব দেশের থেকে এসব পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে একই ধরনের শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রযোজ্য হলে এ তিন পণ্যে মোট শুল্ক ছাড় দিতে হবে ১১.৭ কোটি ডলার বা ১ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা। সুতরাং কোন পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে কোন ধরনের শুল্ক সুবিধার প্রস্তাব দেওয়া হবে, সে সিদ্ধান্ত সবদিক বিবেচনা করেই নিতে হবে।

এ ধরনের রাজস্ব ক্ষতি এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করার কথা বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে পারে। এফটিএ হলে অন্য দেশের থেকে সমজাতীয় পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সেসব দেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ শুল্ক সুবিধা, অর্থাৎ সমপরিমাণ শুল্ক ছাড় দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। স্মরণ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোস্টারিকা, ডমিনিকান রিপাবলিক, বাহরাইন, জর্ডানসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের দ্বিপাক্ষিক এফটিএ আছে। এসব দেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এফটিএ চুক্তি সাধনের বিষয়টি বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে

এফটিএ সম্পাদন করলে তা ভারত ও চীনের সঙ্গে এফটিএ করার চেয়ে তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের জন্য বেশি সুবিধাজনক হবে। এর কারণ হলো, যেখানে শেষের দুটি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বড় আকারের বাণিজ্য ঘাটতি আছে (যথাক্রমে ১২ বিলিয়ন ও ১৬ বিলিয়ন ডলার), সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত আছে (৬.৪ বিলিয়ন ডলার)। এ কারণে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র এফটিএর পরে পরস্পরকে শূন্য শুল্ক বাজার দিতে সুবিধা প্রদান করলে বাংলাদেশের শুল্ক ছাড় হবে তুলনামূলকভাবে কম, আর অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক ছাড় থেকে বাংলাদেশের লাভ হবে তুলনামূলকভাবে বেশি, যার সুবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। চীন ও ভারতের সঙ্গে এফটিএ করা হলে ও পারস্পরিক শূন্য শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হলে বাংলাদেশের বড় ধরনের আমদানি শুল্ক ছাড় দিতে হবে। কিন্তু বিপরীতে যেহেতু এ দুই দেশেই বাংলাদেশের রপ্তানি অনেক কম, সে কারণে শূন্য শুল্কপ্রাপ্তির সুবিধা হবে অনেকটাই সীমিত। আর বর্তমানে এ দুই দেশই বাংলাদেশকে প্রায় সব পণ্যে শূন্য শুল্ক সুবিধা দিচ্ছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তবে এটাও ঠিক যে, কেবল শুল্ক ছাড় বিবেচনায় নিয়ে এফটিএর লাভ-ক্ষতি হিসাব করা ঠিক হবে না। মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ইতিবাচক দিকসমূহ ও ঝুঁকি সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতি গভীরতর ও বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের দাবি রাখে এবং এ হিসাব বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিদ্যমান ব্যবসা-বাণিজ্য বিনিয়োগ-অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলো বিবেচনায় নিয়ে এবং সুনির্দিষ্টভাবে ও দেশভিত্তিকভাবে করতে হবে।

চীনের ওপর ১৪৫.০% শুল্ক আরোপিত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাংলাদেশ সে বাজারের বড় অংশ দখল করতে সক্ষম হবে এমন ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের কৃত্রিম তন্তুনির্ভর তৈরি পোশাকের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। গত এক দশকে মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের তুলানির্ভর তৈরি পোশাকের রপ্তানি ৭৫ শতাংশ থেকে ৬৩ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে, যেখানে চীনের অনুরূপ রপ্তানি ৪৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে; ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে তা ৫৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উত্তরোত্তর বৃদ্ধিমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে এ সময়কালে দেশ দুটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কৃত্রিম তন্তুভিত্তিক তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে যেহেতু কৃত্রিম তন্তুভিত্তিক তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বর্তমানে বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে আছে, সুতরাং শুল্ক পার্থক্যের কারণে চীন ও ভিয়েতনামের তুলনায় মার্কিন বাজারে এ পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে। তবে তুলানির্ভর যেসব তৈরি পোশাক পণ্যে চীন বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, সেসব পণ্যে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা প্রযোজ্য আমদানি শুল্কহারের পার্থক্যের সুবাদে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আরেকটি বিষয় অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। চীনের ওপর ২০১৬ সালে ট্রাম্প প্রশাসন যখন ২৫% অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছিল (যা পরে বাইডেন প্রশাসনও অব্যাহত রেখেছিল), তখন চীন (এবং হংকং) ভিয়েতনামে (এবং সীমিত পরিসরে কম্বোডিয়ায়) তাদের বৈদেশিক বাজারমুখী বিনিয়োগ বহুলাংশে বৃদ্ধি করা শুরু করে। ফলে ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন বাজারে

চীনের বৈদেশিক বিনিয়োগনির্ভর রপ্তানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ধারণা করা যায়, ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রেক্ষাপটে, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ চীন আরও সক্রিয়ভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করবে এবং এ ধরনের কৌশলের ওপর নির্ভর করে চীনের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অস্বাভাবিক শুল্ক বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সচেষ্ট হবে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি শূন্য নামিয়ে আনতে হলে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রে তার রপ্তানি স্থির রেখে আমদানি বাড়াতে হবে ২৮৪ শতাংশ। বিশ্ববাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে এভাবে হিসাব করার অবশ্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্কের যৌক্তিকরণ ও আমদানি সহায়ক নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি হয়তো কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব এবং বাংলাদেশের রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত পণ্যের অংশ (যেমন তৈরি পোশাকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত তুলার অংশ) সীমিত পরিমাণে হলেও বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে মার্কিন তুলার জন্য বিশেষ ওয়্যারহাউজ নির্মাণের কথা ভাবা যেতে পারে ও বিলম্বিত পরিশোধ সুবিধা প্রদানের কথা ভাবা যেতে পারে। শেষের বিচারে বাংলাদেশের ব্যক্তি খাত, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত পণ্যের প্রায় সবটাই যারা আমদানি করে থাকে, তাদেরই এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এটাও মনে রাখতে হবে যে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক বাজার সুবিধা দেওয়া হবে এবং অনুরূপ সুবিধা অন্য দেশকেও দেওয়া হবে, তখন অন্যান্য দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিকারকদের বাংলাদেশে শুল্কমুক্ত সুবিধাপ্রাপ্তির কারণে প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হবে না।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশকে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে বাজার ও পণ্য বৈচিত্র্যকরণের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। চীনের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে আগামীতে বৈদেশিক বিনিয়োগের গন্তব্যস্থল ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার বাইরে সম্প্রসারিত করতে চীনের পক্ষ থেকে আগ্রহ থাকার কথা। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে, যার সুযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে চীনের বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বাংলাদেশকে আরও সচেষ্ট ও সক্রিয় হতে হবে। কর্ণফুলী নদীর অপর পারে আনোয়ারায় চীনের জন্য নির্দিষ্ট যে বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার কথা, তার আশু বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার ও অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। চীন ৪ এপ্রিল এক সাবমিশানের মাধ্যমে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিবাদ নিষ্পত্তি সংস্থায় (ডিএসবি) যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক—এ যুক্তি দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ‘কনসালটেশন’ চেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৭ এপ্রিল তার উত্তরে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাকে জানিয়েছে, যদিও যুক্তরাষ্ট্র মনে করে না যে, সে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার কোনো বিধান লঙ্ঘন করেছে, তা

সত্ত্বেও তারা চীনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে সম্মত আছে। বাংলাদেশের উচিত হবে, এসব আলোচনা কীভাবে অগ্রসর হয়, তার দিকে সতর্ক নজর রাখা ও শুল্কযুদ্ধ কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে, তা সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

এ ধরনের পাল্টা শুল্ক বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে বৈশ্বিক বাণিজ্যকে একটি সর্বসম্মত নীতিমালার আলোকে পরিচালনা করার মূল উদ্দেশ্যকেই নস্যাৎ করে দেবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল সব দেশের জন্য একটি নীতিনির্ভর (রুল-বেইজড) বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা 'সবলের খবরদারি আর দুর্বলের ওপর ছড়ি য়োরানো' ধরনের বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থার তুলনায় (চলমান ব্যবস্থার বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও) অধিকতর শ্রেয়। তাই বাংলাদেশের উচিত হবে অন্য সব দেশের সঙ্গে মিলে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র যেসব অশুল্ক বাধার কথা ইউএসটিআর (মার্চ, ২০২৫)-এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে তার মধ্যে আছে মেধাস্বত্ব আইনের লঙ্ঘন, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, মার্কিন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মুনাফা প্রেরণের ক্ষেত্রে সমস্যা, ব্যাপক মাত্রায় দুর্নীতি, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় ভর্তুকি সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল না করা, খর্বিত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি। এসব বিষয়ে বাংলাদেশকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে কোনো এফটিএ আলোচনায় এগুলো হবে পূর্বশর্ত। ইতোপূর্বে বাংলাদেশ যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য অঞ্চলবিষয়ক আলোচনা করার কথা উত্থাপন করেছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, এ ধরনের আলোচনার জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত নয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সুবাদে এসব সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে; কিছু পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রেক্ষাপটে এফটিএর আলোচনা বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক প্ল্যাটফর্ম 'টিকফা'তে আবার উত্থাপন করা যেতে পারে।

উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহ নিতে হবে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগের কারণে নয়, বরং এসব পদক্ষেপ বাংলাদেশকে গ্রহণ করতে হবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মেধাস্বত্ব আইনের প্রয়োগ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা বিধান ও সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের আশু প্রয়োজনীয়তার কারণে এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রাধিকারভিত্তিক চাহিদা ও করণীয়ের নিরিখে। এসব উদ্যোগকে দেখতে হবে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে।

এসব ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল ভূ-অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনায় ঝুঁকি হ্রাসে সমর্থ হবে, সম্ভাব্য সুযোগের

সদ্ব্যবহার করতে পারবে এবং মধ্যম আয়ের ফাঁদ এড়িয়ে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণকে টেকসই করতে সক্ষম হবে।

আমাদের সময়

২৬ মে ২০২৫



ভিয়েতনামসহ প্রতিযোগীদের তুলনায় আমরা বড় বাধার সম্মুখীন হব

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

গত ২ এপ্রিল যখন প্রথম রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ ঘোষণা করা হলো, তখন আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা চিঠি লিখলেন। আমরা বেশ কিছু ছাড় দিলাম। পরে আমাদের নীতিনির্ধারকেরা তিন মাস ধরে আলাপ করলেন। আমরা শুনলাম, বাংলাদেশ হলো অন্যতম প্রধান দেশ, যারা নাকি প্রথমেই আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে ইউএসটিআরের সঙ্গে। কিন্তু তিন মাস পরে এই আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা দেখলাম, প্রাথমিকভাবে যে ৩৭ শতাংশ ট্যারিফ বসানো হয়েছিল, সেটা কেবল ২ শতাংশ কমিয়ে আগামী ১ আগস্ট থেকে ৩৫ শতাংশ করা হচ্ছে। এটা আমাদের জন্য খুবই হতাশাজনক। আমরা এখন যে গড় ১৫ শতাংশ দিচ্ছি, তার সঙ্গে আরও ৩৫ শতাংশ যোগ হবে। ফলে আমরা যা রপ্তানি করব, ওইসব আইটেমের ওপরে গড়ে ৫০ শতাংশের মতো শুল্ক বসবে। অবশ্যই এটা বাংলাদেশের রপ্তানির জন্য একটা বড় বিপর্যয় ডেকে আনবে।

প্রতিদ্বন্দী দেশগুলোর সঙ্গে আমরা গত তিন মাসে ১০ শতাংশের একটা সমপর্যায়ের শুল্কে ছিলাম। চীন বাদ দিলে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও অন্যান্য দেশের সমপর্যায়ে ছিলাম। এখন একটা পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে, অন্যতম প্রতিদ্বন্দী দেশ ভিয়েতনাম, সে তো নেগোশিয়েট করেছে। তার পণ্যের ওপরে ২০ শতাংশ শুল্ক বসবে। তার মানে ভিয়েতনাম থেকে আরও ১৫ শতাংশ বেশি শুল্ক আরোপিত হবে আমাদের ওপর। আমাদের রপ্তানির ৯০ শতাংশ তৈরি পোশাক, লেদার পণ্যসহ আরও কিছু পণ্য আছে, সেগুলোর ওপরে যে রকম হারে এখন শুল্ক বসবে, তা দিয়ে আমাদের প্রতিযোগিতা করা খুবই দুষ্কর হবে।

প্রতিযোগিতা তো মার্কিন প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে হবে না। অন্য যেসব দেশ সেখানে রপ্তানি করে, তাদের সঙ্গে হবে। চীনের ওপরে ৩০ শতাংশ, ভিয়েতনামের ওপর ২০ শতাংশ।

অন্যরাও আলাপ-আলোচনা করছে। প্রতিযোগিতার দিক থেকে আমরা একটা বড় বাধার সম্মুখীন হব।

আমাদের যে ব্র্যান্ড বায়ার রয়েছে, তারা কিছুটা হয়তো ভার নেওয়ার চেষ্টা করবে। ভিয়েতনামের সঙ্গে তুলনা করলে যে বাড়তি ১৫ শতাংশ শুল্ক, এটার কিছুটা আমাদের রপ্তানিকারকদের ওপর দিয়ে নিজেরা নেবে। চেষ্টা করবে প্রতিযোগিতার আবহটা আগের মতো রাখার। কিন্তু সেটা বেশি দিন উঠতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। পরে তারা শিফট করাই চেষ্টা করবে। এখন যেহেতু অর্ডার অনেক হয়ে গেছে এবং বাংলাদেশ একটা বড় সাপ্লায়ার, ফলে হঠাৎ করে এখান থেকে অন্য আরেকটা জায়গায় নেওয়া দুষ্কর হবে। কিন্তু মধ্য মেয়াদে এটা একটা অশনিসংকেত আমাদের জন্য, বিশেষত রেডিমেড গার্মেন্টসের জন্য।

আমরা তাদের কী অফার করেছিলাম, কী অনুরোধ ছিল, অফেন্সিভ ইন্টারেস্ট কী ছিল, ডিফেন্সিভ ইন্টারেস্ট কী ছিল—এগুলো আমরা জানি না। তারা প্রাথমিকভাবে যে ফ্রেমওয়ার্ক পাঠিয়েছিল, সেখানে একটা নন-ডিসক্লোজার ছিল। এই নন-ডিসক্লোজারের কারণে আমাদের নীতিনির্ধারণেরা এটা খুব বিস্তৃতভাবে আলাপ করেননি। সুযোগ হয়তো ছিল একটা নেগোশিয়েটিং টিম করে নন-ডিসক্লোজার করেই আলাপ-আলোচনাটা করার। তবে আমরা প্রথম থেকেই অনেক কিছু ছাড় দেওয়ার কথা বলেছি। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদের প্রধান আমদানি উপকরণগুলোতে শূন্য না হলেও দুই বা তিন শতাংশ শুল্ক। আমরা বাজেটেও অনেকগুলো স্পেশাল এনেক্স করে বলেছি এগুলোতে আমরা শূন্য শুল্ক দেব। সেদিক থেকে ভিয়েতনামের সঙ্গে আমাদের বড় ধরনের কী পার্থক্য হলো, আমি জানি না। এখানে শুল্ক ছাড়া অশুল্ক কোনো চাহিদাও ছিল কি না, সেটাও আমাদের কাছে স্পষ্ট না।

মার্কিন আমদানির ওপরে আমরা শূন্য শুল্ক দেব বলেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ এখানে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, বলেছে তারা। আমরা সেটা অ্যাড্রেস করব বলেছি হয়তো। এগুলো আছে। সরকারি ক্রয় কীভাবে বাড়ানো যায়, সেটা নিয়ে হয়তো মার্কিন দাবি থাকতে পারে। সেখানে বাংলাদেশের অন্যান্য দেশের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষীয় বিভিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ ডব্লিউটিওর সদস্য। এগুলো বাংলাদেশকে বিবেচনা করতে হয়েছে আলাপ-আলোচনায়। এখন এগুলোর বাইরে বাংলাদেশ আর কী অফার করতে পারে, যাতে অন্তত শুল্ক ২০ শতাংশে নেমে আসতে পারে, সেদিকে নজর দিতে হবে।

আমার মনে হয়, পলিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট নিশ্চয় রয়েছে। এটা কেবল অর্থনীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিন্তু পলিটিক্যাল কোন এলিমেন্টগুলোকে চাচ্ছে, সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। আলাপ-আলোচনায় কেবল যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অর্থনীতির বিষয়গুলো আলোচিত হচ্ছে, সেটা বোধহয় নয়, এর বাইরে ভূরাজনৈতিক, ভূ-অর্থনৈতিক বিভিন্ন ইস্যু আলোচনার মধ্যে থাকতে পারে।

মার্কিন বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ভিয়েতনামের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একটা পার্থক্য রয়েছে। ভিয়েতনাম থেকে যে রপ্তানিটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হয়, সেটা বেশির ভাগই এফডিআই। সেখানে মার্কেটের সঙ্গে সম্পর্ক ও নেটওয়ার্ক একটু ভিন্ন ধরনের। আমাদের এখানে রপ্তানিকারকেরা প্রস্তুত করেন এবং বেশির ভাগই ব্র্যান্ড বায়াররা কেনে। সুতরাং ব্র্যান্ড বায়ারদের বড় ধরনের শক্তি রয়েছে। তারা কতটুকু আমাদের রপ্তানিকারকদের ওপরে চাপাবে, সেটাও কিন্তু নির্ভর করবে।

এখন আমাদের এলডিসি থেকে গ্র্যাজুয়েশনের সময়। এই সময়টাতে বিভিন্নমুখী চাপের মধ্যে আমরা পড়ব। এ রকম অবস্থায় আমাদের যে স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি, সেটাও বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে গেলে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। উৎপাদনশীলতা যদি আমরা বাড়াতে পারি, তাহলে যে শুল্ক আরোপ হচ্ছে, সেটার অভিঘাত প্রশমিত করতে পারি উৎপাদন খরচ কমিয়ে। সুতরাং, সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

আজকের পত্রিকা

০৮ জুলাই ২০২৫



বাড়তি শুদ্ধ ভিয়েতনামের সমপর্যায়ে নামাতেই হবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

অতিরিক্ত শুদ্ধ আরোপ করে গত এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণার পর আলোচনার জন্য সময় চেয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে চিঠি দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রও স্বীকার করেছিল, যেসব দেশ দ্রুতই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। এর পর তিন মাস ধরে আলোচনা চলেছে। কিন্তু ফল হতাশাজনক। প্রস্তাবিত ৩৭ শতাংশ শুদ্ধ মাত্র ২ শতাংশ কমিয়ে ৩৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। ফলে বর্তমানে গড়ে ১৫ শতাংশ শুদ্ধের সঙ্গে আরও ৩৫ শতাংশ যোগ হয়ে ১ আগস্ট থেকে বাংলাদেশের পণ্যে মোট ৫০ শতাংশ শুদ্ধ কার্যকর করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত ব্যাপক প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ভিয়েতনামের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ইতোমধ্যে একটি সমঝোতা হয়েছে, যার আওতায় তাদের পণ্যে মাত্র ২০ শতাংশ শুদ্ধ বসবে। অর্থাৎ আমাদের পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১৫ শতাংশ শুদ্ধ থাকছে, যা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন করে তুলবে। যদি প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোনো দেশ এমন সুবিধা বাগিয়ে নেয়, তা আরও বড় সমস্যা তৈরি করবে।

নতুন শুদ্ধহার কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ব্র্যান্ডগুলোর যারা বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানি করে, তারা হয়তো প্রাথমিকভাবে অতিরিক্ত শুদ্ধের একটা ছোট অংশ নিজেরা বহন করবে এবং বাকিটা চাপিয়ে দেবে রপ্তানিকারকের ওপর। ফলে রপ্তানিকারকরা পণ্যের দাম কমাতে বাধ্য হবেন। তবে দীর্ঘ মেয়াদে এ ব্যবস্থা টিকবে না। শেষ পর্যন্ত ব্র্যান্ডগুলো ভিয়েতনাম বা এমন দেশেই চলে যাবে, যেখানে কম খরচে পণ্য পাবে।

এখন প্রশ্ন ওঠে- আমরা কেন ভিয়েতনামের মতো সমঝোতা করতে পারলাম না? এর সুনির্দিষ্ট উত্তর সরকারের কাছেই আছে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত সমঝোতার খসড়া

গোপন রাখার শর্ত ছিল। তবে চাইলে সরকার একটি ‘সমঝোতা দল’ গঠন করে বিষয়টি নিয়ে পেশাদার ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করতে পারত।

আমরা জানি না, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কছাড় ছাড়াও কোনো অশুল্ক দাবি ছিল কিনা। বাংলাদেশ এর আগে স্ক্রাপ লোহা, সয়াবিন, এলএনজি ও তুলার মতো প্রধান আমদানীকৃত মার্কিন পণ্যে শূন্য শুল্ক আরোপ করেছে বা করতে চেয়েছে। তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র হয়তো আরও কিছু চেয়েছে; যেমন- তাদের বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশে নীতিগত সুবিধা বা সরকারি ক্রয়ে বিশেষ সুযোগ। এসব বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা হয়তো তাদের কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি। আবার হতে পারে, যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছে- তাদের পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে শূন্য শুল্কছাড় দেওয়া হোক, যা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়মের পরিপন্থি। এমন শর্তে সরকার হয়তো রাজি হয়নি; কিন্তু ভিয়েতনাম রাজি হয়েছে।

তবে এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। ১ আগস্ট পর্যন্ত আমাদের হাতে তিন সপ্তাহ সময় আছে। এ সময়ের মধ্যে যদি আলোচনার মাধ্যমে অন্তত ভিয়েতনামের মতো একটি সমঝোতায় পৌঁছানো যায়, তাহলে সেটাই হবে ‘মন্দের ভালো’। প্রয়োজনে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অতিরিক্ত কিছু ছাড় আদায়ের চেষ্টা করা যেতে পারে।

যেহেতু সরকার এখনও পরিকার করেনি, যুক্তরাষ্ট্রকে কী কী সুবিধার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, আমরা কেবল অনুমান করতে পারি- মূলত শুল্কছাড় ও নীতিগত সুবিধার কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের হয়তো আরও স্পষ্ট, সময় সীমাবদ্ধ ও বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতি চেয়েছে। সরকারি ক্রয়ে হয়তো অগ্রাধিকার চেয়ে থাকতে পারে। সমস্যা হলো, আমাদের আরও কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী দেশকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। তাদের স্বার্থের দিকটিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

সব মিলিয়ে সামনের সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে আলোচনার কৌশল, প্রস্তুতি ও নেতৃত্ব- সবকিছুই হতে হবে সুপরিকল্পিত। শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, অন্যান্য সম্ভাব্য বাজারের দিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে কোনো একটি দেশের সিদ্ধান্ত আমাদের রপ্তানি সক্ষমতাকে হুমকির মুখে না ফেলে। বিশেষত আমরা উৎপাদন বাড়াতে পারলে খরচ কমিয়ে অতিরিক্ত শুল্কহারে চাপ কমানোরও চেষ্টা করতে পারি।

সমকাল

০৯ জুলাই ২০২৫

২% শুল্ক কমানো হতাশাজনক

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্র গত ২ এপ্রিল পাঁচটা শুল্কের ঘোষণা দেওয়ার পরপরই বাংলাদেশ সরকার এটি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। প্রধান উপদেষ্টা এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে চিঠি লিখলেন। সেখানে আমরা কিছু ছাড় দেওয়ার কথা বললাম। পরবর্তী সময়ে আমাদের বাণিজ্য উপদেষ্টা কথা বলেছেন। এরপর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটেও যুক্তরাষ্ট্র সুবিধা পাবে—এমন কিছু পণ্যে শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আরও যেসব অশুল্ক বাধার কথা যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, যেমন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা, মেধাস্বত্ব আইন প্রয়োগ প্রভৃতি নিয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রাখলাম।

প্রায় তিন মাসের আলাপ-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচটা শুল্ক ৩৭ শতাংশ থেকে কমে ৩৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ আলাপ-আলোচনায় তেমন কোনো সুবিধা আমরা করতে পারিনি।

শুল্ক আলোচনার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র যে ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্টের (চুক্তি) খসড়া পাঠিয়েছিল, সেটার মধ্যে কী ছিল, আমরা কিছুই জানি না। যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা কী ছিল এবং বিনিময়ে কী দেবে বলেছে; বিপরীতে আমাদের (বাংলাদেশের) চাহিদা কী ছিল এবং বিনিময়ে আমরা কী দেব বলেছি—এই চারটি বিষয়ের কোনোটিই আমরা স্পষ্টভাবে জানি না।

ট্রান্সপের পাঁচটা শুল্ক আরোপের পর সব দেশের মধ্যে বাংলাদেশই নাকি সবার প্রথমে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে, এ রকম একটা ধারণা আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু তিন মাস আলাপ-আলোচনা করে এইটুকুই আমরা এখন জানতে পারছি যে শুল্ক মাত্র ২ শতাংশ কমানো গেছে। এটা অবশ্যই হতাশাজনক।

সরকার থেকে জানানো হয়েছে, চুক্তির খসড়ায় একটি নন-ডিসক্লোজার ক্লজ (তথ্য প্রকাশ করা যাবে না এমন ধারা) ছিল। তবে আমি মনে করি সরকার দর-কষাকষির জন্য অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি বিশেষ দল (টিম) গঠন করতে পারত। ওই দলের সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের কৌশল নির্ধারণ করা হলে সেটি বেশি কার্যকর হতে পারত। কিন্তু আমরা দেখেছি অল্প কয়েকজন লোক কাজটি করেছেন। তাতে শেষমেশ দেখা যাচ্ছে, আদতে কোনো লাভ হয়নি।

ট্রান্সপের নতুন শুল্ক আমাদের জন্য উদ্বেগের। কারণ, আমাদের মূল প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম শুল্ক কমিয়ে ২০ শতাংশে নামাতে পেরেছে, যা আমাদের চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশি। এতে আমাদের তৈরি পোশাক খাতের জন্য বড় ধরনের ধাক্কা লাগবে। বিদেশি ক্রেতারা এই বাড়তি শুল্কের ভার কতটা নিতে চাইবে, তা বলা যায় না। ধারণা করছি, এটা তারা আমাদের রপ্তানিকারকদের ঘাড়ে দিতে চাইবে। কিন্তু এত বড় শুল্ক ব্যবধান নিয়ে প্রতিযোগীসক্ষম থাকা খুবই কঠিন।

সব মিলিয়ে বলা যায়, নতুন পাল্টা শুল্কে আমাদের জন্য খুব বড় একটা ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে স্বল্প মেয়াদে আমরা প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাতে পারি। আর এই শুল্ক অব্যাহত থাকলে মধ্য মেয়াদে আমাদের পণ্যের ক্রেতারা অন্যত্র চলে যেতে পারে। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র বড় একটি আমদানিকারক দেশ। সুতরাং তাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। ১ আগস্ট থেকে নতুন পাল্টা শুল্ক কার্যকর করার ঘোষণা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। তাই পরবর্তী তিন সপ্তাহে আমরা তাদের আরও কী দিতে পারি, তা দেখতে হবে।

বাণিজ্য আলোচনার মধ্যে ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ও রয়েছে। আমরা তো আর সেগুলো জানতে পারছি না। এখন বাংলাদেশ কতটুকু দিতে পারবে, সেটি দেখতে হবে। কারণ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সদস্য হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধও রয়েছে। সে দিক দিয়ে আমাদের পক্ষে হয়তো অনেক কিছু সম্ভব হবে না। ফলে এ বিষয়গুলো বিচার-বিবেচনা করেই আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে।

শুল্ক কমানোর বিষয়ে আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। শুল্ক অন্ততপক্ষে ভিয়েতনামের সমপরিমাণও যদি নামাতে পারি, তাহলে প্রতিযোগিতা সক্ষমতার দিক থেকে আমরা মোটামুটিভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো অবস্থায় থাকতে পারব। কিন্তু ৩৫ শতাংশ শুল্ক অব্যাহত থাকলে আমাদের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া বোধ হয় কঠিন হয়ে যাবে বা সম্ভব হবে না।

প্রথম আলো

৯ জুলাই ২০২৫

ভূরাজনৈতিক সমীকরণে না জড়িয়ে শুধু অর্থনৈতিক এবং শুষ্কের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত

ড. ফাহিমদা খাতুন

ড. ফাহিমদা খাতুন, বাংলাদেশের অন্যতম আর্থ-উন্নয়নবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবেও কাজ করছেন তিনি। এছাড়া তিনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য। বাংলাদেশী পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুদ্ধ আরোপের নানা দিক নিয়ে কথা বলেছেন বণিক বার্তায়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাবরিনা স্বর্ণা

উচ্চহারের শুদ্ধ তিন মাস স্বর্গিভের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশী পণ্যে ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুদ্ধ নির্ধারণ করেছে। এর ফলাফল কী হতে যাচ্ছে?

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশী পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুদ্ধ আরোপ করেছেন। নতুন শুদ্ধহার ঘোষণা করে তিনি বাংলাদেশসহ ১৪টি দেশকে সোমবার চিঠি দিয়েছেন। এ শুদ্ধহার ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগেই বিদ্যমান ১৫ শতাংশ শুদ্ধহারের সঙ্গে যদি নতুন শুদ্ধ যুক্ত হয়, তাহলে সেটি দাঁড়াবে ৫০ শতাংশে। যেখানে ১৫ শতাংশ থেকে শুদ্ধহার ৩৫ শতাংশে উন্নীত করাটাই অনেক বেশি, সেখানে সেটি ৫০ শতাংশ হলে বড় ধাক্কা পাবে দেশের রফতানি পণ্য। বিশেষত আমাদের তৈরি পোশাক রফতানি খাত। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাবে।

তৈরি পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলোর জন্য নতুন শুল্কহার নির্ধারণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যেমন তৈরি পোশাক রফতানিতে প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম ভিয়েতনাম। এ দেশের ওপর পাণ্টা শুল্ক আরোপ করা হয়েছে ২০ শতাংশ। বাংলাদেশের ওপর আরোপিত শুল্কহারের তুলনায় এটি ১৫ শতাংশ কম। এতে ভিয়েতনামের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা আমাদের চেয়ে বেড়ে যাবে। এছাড়া ভারতও এক্ষেত্রে প্রতিযোগী দেশগুলোর একটি। ভারতের জন্য শুল্কহার কত শতাংশ নির্ধারণ করা হবে তা এখনো জানা যায়নি। তবে এর আগে এ বছরের এপ্রিলে ভারতের ওপর পাণ্টা শুল্ক ২৬ শতাংশ নির্ধারণ করেছিল। যেটি আমাদের চেয়ে অনেক কম। অর্থাৎ এখানেও আমাদের প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা কমে যাবে। ভারত এখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিনি বাণিজ্য চুক্তি করতে যাচ্ছে। সেখানে শুল্ক আরো কমেতে পারে। তাহলে বাংলাদেশের তুলনায় তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা আরো বাড়বে। সারকথা, উচ্চহারের শুল্ক তিন মাস স্থগিতের পর এখন বাংলাদেশী পণ্যে ৩৫ শতাংশ পাণ্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা গুরুতর দুঃসংবাদ। কারণ এর প্রভাব কেবল রফতানি আয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। রফতানি আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে; পাশাপাশি সামগ্রিক অর্থনীতিতে বিরাট প্রভাব পড়বে। ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স সেবা, পরিবহন খাত, কর্মসংস্থান এবং আয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ রফতানি পণ্যে উচ্চ শুল্কের প্রভাব যে বহুমাত্রিক ও গুরুতর হবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সরকার এখন কী করতে পারে?

এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে প্রথমত নতুন শুল্কহার আগামী ১ আগস্ট কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত নীতিনির্ধারকদের কূটনৈতিক আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে শুল্কহার যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা যায়। যদিও এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা তিন মাস সময় পেয়েছিলাম। কিন্তু এ তিন মাসে আলোচনা যে ফলপ্রসূ হয়নি সেটি বর্তমানে স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ২ শতাংশ কমিয়ে শুল্কহার ৩৫ শতাংশ করেছে। অথচ ভিয়েতনাম কার্যকরী আলোচনা করে এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানীকৃত পণ্যে তাদের দেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে শুল্ক ছাড় দিয়ে তাদের নিজেদের ওপর আরোপিত পাণ্টা শুল্কহার ২০ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। আমরা তিন মাস সময় পেয়েও এমন কিছু করতে পারিনি।

আমাদের উচিত ছিল সব পক্ষের সঙ্গে বিশেষ করে রফতানিকারকদের সঙ্গে আরো গভীর আলোচনা করে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে যেসব পণ্য আমদানি করে সেগুলোর শুল্কহার উল্লেখ করে একটি তালিকা তৈরি করা। কিন্তু বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে সরকার থেকে এসব পণ্যের তালিকা পাঠানো হয়নি। আমাদের চলতি অর্থবছরের বাজেটে ১০০টি পণ্যের ওপর করছাড় দেয়া হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো এতে যুক্তরাষ্ট্র কী ভাবে—১০০টি পণ্যে কর বা শুল্কছাড়ে তাদের লাভ হলো কিনা। অবশ্য শুল্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের (ইউএসটিআর) বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এখনো আলোচনা চলছে। তবে এক্ষেত্রে এ আলোচনায় রফতানি বাণিজ্যের অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত

করা দরকার। তারা অনেকেই বলছেন তাদেরকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ ধরনের জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মূল অংশীজনদের দূরে রাখা সঠিক নয়।

শুধু চুক্তির ক্ষেত্রে কিছু শর্তের কথাও উঠে এসেছে...

চুক্তির শর্তগুলো জনসম্মুখে আসেনি। তাই সেগুলো নিয়ে মন্তব্য করা যাচ্ছে না। তবে বাংলাদেশ পৃথিবীতে একা বসবাস করে না। পৃথিবীর কোনো দেশই এককভাবে বসবাস করে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখতে হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন এবং নিয়ম মেনে চলতে হয়। বাংলাদেশও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠানের সদস্য। যেমন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সদস্য বাংলাদেশ। ডব্লিউটিওর সদস্য হয়ে বাংলাদেশ নিয়মকানুনের বাইরে গিয়ে পদক্ষেপ নিতে পারে না। তাহলে নীতি উপেক্ষা করা হবে। বড় ক্ষমতাবান দেশগুলো অনেক কিছু উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র দেশ তা পারে না। বাংলাদেশকে তাই একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখানে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো দেশের স্বার্থ রক্ষা করা।

একদিকে উচ্চ শুদ্ধতার কমানোর চেষ্টা, অন্যদিকে শর্ত মেনে নেয়া—এমন উভয় সংকটে পড়লে কী করা উচিত হবে বলে মনে করছেন?

অর্থনীতিকে রাজনীতি থেকে আলাদা করা যায় না। ট্রাম্পের পাঁচটা শুষ্কের ভূরাজনৈতিক দিক রয়েছে। বাণিজ্যের বিষয়ে ভূরাজনৈতিক দিক থাকার কারণে বিভিন্ন দেশ সেটির অংশ হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে একটি ছোট অংশীজন। ভূরাজনীতিতে বাংলাদেশ কেবল অংশীজনই নয়, বাংলাদেশকে বরং ব্যবহার করা হয়। সেই ভূরাজনৈতিক সমীকরণে বাংলাদেশ ঢুকে যাবে কিনা সেটি চিন্তার বিষয়। কারণ সেই রাজনৈতিক জালে আটকে গেলে তা সামলে নেয়ার সক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। সেজন্য ভূরাজনৈতিক সমীকরণে না জড়িয়ে শুধু অর্থনৈতিক এবং শুষ্কের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

শুধু ছাড়া যদি অন্যান্য শর্ত দেয়া হয়, সেগুলো পরিপালন করতে গেলে একদিকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে, অন্যদিকে অন্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সব মিলিয়ে তেমন পরিস্থিতিতে যাওয়া কারো জন্যই ভালো হবে না। বর্তমানে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছাড়া কোনো দেশ চলতে পারে না। বাণিজ্য ছাড়া এককভাবে কোনো দেশ অগ্রগতি অর্জন করতে পারে না। বাণিজ্য সব দেশকে করতে হবে। বাণিজ্যের নিয়ম হচ্ছে, যে দেশ যে পণ্য উৎপাদনে ভালো, সেই দেশ সেই পণ্য উৎপাদন করবে এবং অন্য দেশ তা কিনবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভূরাজনৈতিক সমীকরণ এমন হয়ে উঠেছে যে সেখানে বাণিজ্য, অর্থনৈতিক বিষয় ও নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়কে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের সমীকরণে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ করা ঠিক হবে না।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পোশাক রফতানির জন্য সবচেয়ে বড় বাজার। পাঁচটা শুল্ক কার্যকর হলে খাতটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ খাতের জন্য আপনার সুপারিশ কী থাকবে?

আরো আলোচনার পর বাংলাদেশ কিছুই না পেলে উচ্চ শুল্ক নিয়েই এগোতে হবে। এতে তৈরি পোশাক খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শুধু একটি পণ্য ও নির্দিষ্ট কয়েকটি বাজারের ওপর নির্ভর করলে কেমন ধাক্কা আসে তা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমরা আগে থেকেই বলেছি, রফতানি বহুমুখীকরণ করতে হবে। শুধু রফতানি বহুমুখীকরণ নয়, বাজারের বহুমুখীকরণও জরুরি। অন্যান্য বাজার খোঁজা ও সেই বাজারের চাহিদা অনুপাতে পণ্য তৈরি করা দরকার। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাজারে তৈরি পোশাক যাচ্ছে। অন্য বাজারের জন্য অন্য পণ্য তৈরি করতে হবে। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য—এ দেশগুলোতে বাজার খুঁজতে হবে। পোশাক শিল্পের বাইরে অন্য যেসব পণ্য রয়েছে, সেগুলোর সম্ভাব্য বাজার খুঁজতে হবে। পোশাক শিল্প ছাড়াও আমাদের চামড়া শিল্প, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মাসিউটিক্যালস ও পাটজাত পণ্য আছে। তাছাড়া আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হচ্ছে মানবসম্পদ। যখন আমার রফতানি বহুমুখীকরণের কথা বলছি, তখন মানবসম্পদ বা সেবা বাণিজ্যের কথাও বলতে হবে। আমাদের বাণিজ্য কৌশল বদলাতে হবে। বাণিজ্যকে দুই-একটি পণ্যে সীমিত না রেখে আরো প্রসারিত করতে হবে।

নতুন রফতানিমুখী খাত ও রফতানি গম্ভব্য তৈরিতে সময় লাগবে। স্বল্পমেয়াদে বাংলাদেশের সামনে কোন পথ খোলা রয়েছে?

হ্যাঁ, অন্যান্য শিল্প ও বাজার গড়ে তোলার জন্য সময় লাগবে। এ মুহূর্তে আমাদের পোশাক খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো দরকার। প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রফতানিতে বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক যদি গুনতে হয়, তাহলে এখন উৎপাদন খরচ ৫ শতাংশ কমানো গেলেও সেটি মোট উৎপাদন ব্যয়ে সাশ্রয় আনবে। উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়ার পেছনে আমাদের এখানে নানা সমস্যা বিদ্যমান। যেমন বিদ্যুৎ খরচ বেশি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না, রাস্তাঘাটের অবকাঠামোর মান ভালো নয়, পণ্য শিপমেন্ট ও পণ্য ছাড়াতে দেরি হয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং ঘুস-দুর্নীতিও বড় বাধা। যদি এসব সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে উৎপাদন খরচ কমানো সম্ভব হবে না। তাই আমাদের মূল প্রচেষ্টা থাকতে হবে উৎপাদন খরচ কমিয়ে উৎপাদন দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা। এছাড়া সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতাও দরকার। ডলারের বিনিময় হার স্থিতিশীল না হলে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন বাণিজ্য অংশীদারদের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে হবে, যাতে বাণিজ্য বাধাগুলো দূর হয়। ভিয়েতনাম বহু দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করে আমাদের তুলনায় অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা যখন মুক্ত বাণিজ্য বাড়ানোর ক্ষেত্রে ক্ষমতা হারিয়ে

ফেলেছে, তাই এখন দেশগুলো নিজেদের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে দ্রুততার সঙ্গে এ পদক্ষেপ নিতে হবে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বহুমুখী প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বণিক বার্তা

১২ জুলাই ২০২৫

নতুন মার্কিন বাণিজ্য ব্যবস্থা মোকাবিলায় যা করতে হবে

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার, বিশেষত ৭১টি দেশ, যাদের সঙ্গে তার উচ্চ বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে, আলোচনা বিশ্বকে নতুন বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছে। এই বাণিজ্য ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যমূল্যভিত্তিক উচ্চ শুল্কের কারণে, যা আরোপিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ বাণিজ্য ঘাটতির দেশগুলোর ওপর। এটা আরোপ হয়েছে মোস্ট-ফেভারড-নেশন শুল্কের পাশাপাশি যেখানে নির্দিষ্ট পণ্যভিত্তিক শুল্ক রয়েছে। পৃথক এই শুল্কের হার অভিনব এক সূত্রের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে, যেখানে শুল্কের হার মার্কিন পণ্য আমদানির সঙ্গে বিপরীতভাবে সম্পর্কিত এবং মার্কিন বাজারে অ-মার্কিন পণ্য রপ্তানির সঙ্গে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-ডব্লিউটিওর নিয়মে নির্ধারিত শুল্কহারের সঙ্গে এ সূত্রের মিল কমই। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের দাবি জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত ডব্লিউটিওর বিধান অনুসরণে এ শুল্ক আরোপিত- যুক্তিটির ন্যায্যতা দেওয়া কঠিন।

বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে আরোপিত দ্বিপক্ষীয় শুল্কের কার্যকারিতা তিন মাসের জন্য স্থগিত করার পর থেকে ভুক্তভোগী দেশগুলোর বেশির ভাগই আমেরিকার সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা করেছে। আলোচনা শুধু সামগ্রিক পণ্যমূল্যভিত্তিক শুল্ক নিয়ে নয়; নির্দিষ্ট পণ্যের মূল্যভিত্তিক শুল্কও এতে অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে আলোচনায় বিভিন্ন বাজারে মার্কিন পণ্যের অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক বা প্রবেশাধিকার অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, নতুন বাণিজ্য আলোচনায় সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে একাধিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। প্রথমত, নতুন মূল্যভিত্তিক শুল্কের অধীনে মার্কিন বাজারে তাদের প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে সাহায্য করার জন্য আরও মার্কিন পণ্য আমদানি করতে হবে। তৃতীয়ত, দেশগুলো সেসব দেশে পণ্য রপ্তানিতে অসুবিধার

মুখে পড়বে, যেসব দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পণ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় চুক্তি আছে। চতুর্থত, দেশগুলো মার্কিন বাজারে উচ্চ আমদানি শুল্ক বা বিধি-নিষেধের মুখোমুখি অন্যান্য দেশ থেকে সস্তায় পেলেও পণ্য আমদানি করতে পারবে না, তাদের কৃত্রিমভাবে মার্কিন পণ্য আমদানি করতে বাধ্য করা হতে পারে।

এ ধরনের বাণিজ্য প্রক্রিয়া শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির আওতাধীন দেশগুলোর রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকেই ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, বরং তাদের কম প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে মার্কিন পণ্য কিনতে বাধ্য করবে অথবা কম খরচের উৎস থেকে আমদানি করতে বাধ্য দেবে। যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক বাণিজ্য পছন্দের কারণে অ-মার্কিন দেশগুলোর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নতুন চাপের সম্মুখীন হবে, যা অর্থনীতি-বহির্ভূত সম্পর্কেও প্রসারিত হতে পারে।

নতুন বাণিজ্য ব্যবস্থার এই বহুমাত্রিকতা থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা নেওয়া দরকার। প্রথমত, বাংলাদেশ এখন মার্কিন বাজারে আরও বেশি প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার ওপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছে। এটি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে: ক. যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি পণ্যের ওপর শুল্ক হ্রাস; খ. বিপুল পরিমাণে মার্কিন পণ্য আমদানির প্রতিশ্রুতি, যা দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসে অবদান রাখবে; গ. বাংলাদেশি পণ্যের ওপর মূল্যসংশ্লিষ্ট শুল্কহার হ্রাসের আশা; এবং ঘ. মার্কিন বাজারে শুল্ক হ্রাস নিশ্চিত করতে রপ্তানি পণ্যের স্থানীয় মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি। একই সঙ্গে আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, যদিও সেগুলো এখনও জনসমক্ষে আসেনি। যেমন বাংলাদেশে কিছু দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ। তবে বাংলাদেশকে মনে রাখতে হবে, এ ধরনের প্রতিশ্রুতি অ-মার্কিন ও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের বিরুদ্ধে যাবে।

বাংলাদেশে মার্কিন প্রধান রপ্তানি পণ্য, যেমন সয়া বীজ, এলএনজি, গম, রাসায়নিকের আমদানি বৃদ্ধির যে কোনো প্রতিশ্রুতি অন্যান্য দেশের রপ্তানি স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ব্রাজিল, কানাডা ও ইউক্রেন গমের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। একইভাবে কাতার এলএনজি আমদানির প্রধান উৎস। যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদের মতো গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত পণ্য আমদানির প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান উৎস চীন বা ভারতসহ অন্যান্য দেশের রপ্তানিস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যদিও এসব দেশের পণ্যগুলোর অন্যান্য রপ্তানি গন্তব্য রয়েছে, বাংলাদেশে রপ্তানি বাজারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হারানোকে তারা গুরুতর আঘাত বিবেচনা করতে পারে। তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের বেশি অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রগুলোতে ‘প্রতিশোধমূলক’ ব্যবস্থা নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কাতারে জনশক্তি রপ্তানি প্রতিকূল প্রভাবের সম্মুখীন হতে পারে। কানাডায় রপ্তানি পণ্য অতিরিক্ত শুল্কের সম্মুখীন হতে পারে। চীন অধ্যুষিত ব্যাংক এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক বা এক্সিম ব্যাংক অব চায়না থেকে ঋণ সহায়তা হ্রাস হতে পারে।

অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা ৪০ শতাংশে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি প্রাথমিকভাবে দেশীয় শিল্পের জন্য ইতিবাচক বলে মনে হতে পারে। তবে এ শিল্পগুলো এখনও গুণমান ও সময়োপযোগিতা বজায় রেখে প্রয়োজনীয় পরিমাণে সরবরাহে প্রস্তুত নয়। অতএব, রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্য আমদানি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। যদি মূল্য সংযোজনের মানদণ্ড বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে চীন বা ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ উৎস থেকে কিছু কাঁচামালের আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে হবে। এই অ-মার্কিন অংশীদাররা, বিশেষত চীন ও হংকং অনুকূল বাজার হারানো ইতিবাচকভাবে গ্রহণ না-ও করতে পারে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্ক চাপের মুখে পড়তে পারে।

মার্কিন পণ্যের উচ্চ আমদানির প্রতিশ্রুতি দেওয়া দেশগুলোর সঙ্গে বিদ্যমান রপ্তানির পরিমাণ বজায় রাখতে বাধার সম্মুখীন হতে পারে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক দুই ট্রিলিয়ন ডলারের রপ্তানির (২০২৪ সাল) ৫ হাজার ৫০০টি পণ্য তালিকার কিছু পণ্য বাংলাদেশও রপ্তানি করে। যেমন প্লাস্টিক পণ্য, কৃষিপণ্য, রাসায়নিক, যন্ত্রাংশ, সরঞ্জাম যা সরাসরি প্রতিযোগিতা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। কারণ একই বাজারে মার্কিন পণ্যগুলোই অগ্রাধিকার পাবে। এশিয়া, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার বাজারেও ক্ষুদ্র রপ্তানিকারকরা এ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন।

ধারণা করা হচ্ছে, ব্রাজিল, কানাডা, চীন ও ভারতের মতো দেশের প্রধান বৈশ্বিক কৃষিপণ্য, কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্য ও তৈরি পণ্যের ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপের ফলে মার্কিন বাজারের বাইরে এগুলো কম দামে পাওয়া যাবে। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাবই থাকতে পারে। একদিকে এই সম্ভা কৃষিপণ্য ও কাঁচামাল বাংলাদেশের মতো দেশকে কম দামে আমদানি করতে সাহায্য করবে। তবে মার্কিন বাজারে শুল্ক কমাতে উচ্চতর অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে বাংলাদেশ সুযোগটি কাজে লাগাতে পারবে না। অন্যদিকে যদি বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্যগুলো আমদানি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের বাজার থেকে কম দামের পণ্য কেনার সুযোগ হারাতে পারে। এ ধরনের ব্যয়বহুল ক্রয় অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেবে।

অনেক ইউরোপীয় ও এশীয় দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি স্পষ্ট। বাংলাদেশ কি ওইসব দেশকেও যুক্তরাষ্ট্রের মতো অগ্রাধিকারমূলক বাজার দিতে প্রস্তুত? সম্ভবত না। অতএব, বাণিজ্য বিষয়ে চিন্তাশীল প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশকে অন্যান্য দেশের চাপের মুখোমুখি করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের উচিত জাতীয় বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও ক্রয়নীতির কাঠামোর অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে লেনদেন করা। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আলোচনায় শুধু মার্কিন বাজারে আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক স্বার্থ স্থান পাওয়া উচিত নয়। বরং চীন, ব্রাজিল, কানাডা,

কাতার, জাপান, সৌদি আরব, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদারের সঙ্গেও একই আশ্রমগাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক স্বার্থের কথা বিবেচনায় নিতে হবে। সরকারকে বিবেচনা করতে হবে, একক দেশকেন্দ্রিক বাণিজ্যচুক্তি স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রভাব ফেলতে পারে।

সমকাল

১৮ জুলাই ২০২৫

বিশেষ সাক্ষাৎকার যুক্তরাষ্ট্রের শর্ত পূরণে অভিঘাত আসতে পারে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশি পণ্যে শুদ্ধ কমিয়ে ২০ শতাংশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু মার্কিন পণ্য আমদানিতে ব্যাপক শুদ্ধছাড় স্থানীয় শিল্পের জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ তা নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে। কম শুদ্ধ আমদানি পণ্য ঢুকলে চাপ বাড়বে স্থানীয় উৎপাদনে। এতে আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্পের উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। কালের কণ্ঠকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব নিয়ে কথা বলেছেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মাসুদ রুমী

প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যের শুদ্ধ ২০ শতাংশে নামিয়েছে—এই সিদ্ধান্তকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? এটা কি অর্থনীতির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ স্বত্তি, স্থায়ী কোনো সমাধান?

উত্তর : এটা তাৎপর্যপূর্ণ স্বত্তি। আগে আমাদের রপ্তানি পণ্যে ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত শুদ্ধ বসত, এখন সেটা ২০ শতাংশ হওয়ায় আমাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের সমপর্যায়ে চলে এসেছে। ফলে একটি ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ তৈরি হয়েছে, যদিও এটিকে স্থায়ী সমাধান বলা যাবে না।

প্রশ্ন : এই শুদ্ধ হ্রাসের পেছনে কূটনৈতিক তৎপরতা ও সম্ভাব্য প্রতিপ্রতিকূলতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে?

উত্তর : এই ছাড় এক দিনে আসেনি।

সবাইকেই কিছু না কিছু ছাড় দিতে হয়েছে। যেমন— ২৫টি বোয়িং কেনা, বড় আকারে গম ও তুলা, সয়াবিন, এলএনজি আমদানি করা—এগুলো সবই কূটনৈতিক সমঝোতার অংশ। তবে এই ছাড়েরও মূল্য আছে, তা আমাদের বুঝে নিতে হবে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে? নন-ডিসক্রোজার অ্যাগ্রিমেন্টের কারণে সাধারণ জনগণ বা রপ্তানিকারকরা কতটা অস্বস্তিতে আছেন? এই প্রতিশ্রুতি পূরণে মূল চ্যালেঞ্জ কী?

উত্তর : আসলেই অনেক কিছু অজানা থেকে যাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যাদের বৈরিতার সম্পর্ক আছে, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী হবে, সেটা আমরা জানি না। আমরা জানি না চীন বা ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক বা অন্যান্য প্রতিশ্রুতি কী দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এর অভিঘাত আছে। এ জন্য এগুলো স্পষ্টতার প্রয়োজন আছে।

এসবের সঙ্গে ভূ-রাজনৈতিক, ভূ-অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে এগুলো সরাসরি জড়িত।

আমরা যেগুলো ছাড় দিয়েছি সেগুলোর অনেকটাই কিন্তু বাস্তবায়ন করতে হবে পরবর্তী নির্বাচিত সরকারকে। তাই এখানে স্পষ্টতার ব্যাপার আছে। কয়েক বছর ধরে এগুলো বাস্তবায়িত করতে হবে। তাই স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক ঐকমত্য জরুরি।

প্রশ্ন : শুক্রযুদ্ধে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ভূমিকা তাহলে আর কী রইল?

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষি করে আমাদের ১৫ শতাংশের ওপর আরো ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ মেনে নিতে হলো। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তা নির্ধারিত হচ্ছে। এগুলোর বিরুদ্ধেই কিন্তু বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা গড়ে উঠেছিল। এখন অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার রীতিনীতির লঙ্ঘন। এই সংস্থা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। রুল বেইসড বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ভূমিকাকে ধ্বংস করার বা দুর্বল করার পদক্ষেপ হলো ট্রাম্প শুল্ক। এই ধরনের সংরক্ষণবাদী পদক্ষেপের মাধ্যমে বিশ্ববাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেটার কারণে কেবল মার্কিন বাজারেই নয়, বৈশ্বিক বাজারেই চাহিদার সংকোচন হতে পারে। এতে যুক্তরাষ্ট্রকেও ভুগতে হবে।

প্রশ্ন : ২০ শতাংশ শুল্ক হার আমাদের প্রতিযোগী ভারত (২৫ শতাংশ) ও ভিয়েতনামের (২০ শতাংশ) সঙ্গে তুলনায় কতটা সহায়ক বা প্রতিকূল? চীনের শুল্ক কতটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হবে আমাদের জন্য?

উত্তর : চীন বাদ দিলে আমাদের প্রতিযোগী সবাই এখন প্রায় একই পর্যায়ে। তবে শুধু শুল্ক নয়, পণ্যের মূল্য, উৎপাদন খরচ ও দক্ষতা—এই সবই প্রতিযোগিতার ভিত্তি। আমাদের যদি দাম বেশি হয়, তাহলে একই শুল্কেও পিছিয়ে পড়বে। চীনের শুল্ক এখনো চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়নি। তাদের বিদ্যমান ২০ শতাংশের ওপর আরো ৬০ শতাংশ বাড়ানো হয়, তাহলে আমরা সুবিধা পাব।

প্রশ্ন : এই শুল্কছাড় কোন খাতের জন্য সহায়ক আর কোন খাতের জন্য ঝুঁকি? স্থানীয় শিল্প কতটা ঝুঁকিতে পড়বে?

উত্তর : প্রধান উপকারভোগী হবে পোশাক খাত। তবে কৃষিপণ্য, চামড়া ও হোম টেক্সটাইলও লাভবান হতে পারে। তবে যেসব খাতে এখনো শুল্ক ছাড় হয়নি বা অ-শুল্ক বাধা রয়েছে, তারা ঝুঁকিতে আছে। আর তুলা-গম বেশি দামে আমদানি হলে স্থানীয় শিল্প খরচে চাপে পড়বে। আমদানি প্রতিস্থাপক দেশীয় শিল্প বাড়তি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ানো ও তাদের আমদানি শুল্ক হ্রাসের ফলে সমাজাতীয় পণ্যের উৎপাদন শিল্পে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। আমরা এখনো জানি না, কত বিস্তৃতভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানিতে শুল্ক কমানো হয়েছে। আবার শূন্য শুল্ক কিংবা নামমাত্র শুল্ক নির্ধারণ করা হলে রাজস্বে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নীতি অনুযায়ী, এই সুবিধা অন্যান্য দেশকেও দেওয়ার কথা।

প্রশ্ন : অনেকে মনে করেন বোয়িং চুক্তির বিপরীতে শুল্ক হ্রাস এসেছে—এই ধারণার ভিত্তি আছে? আর ২৫টি বোয়িং কেনার আর্থিক সক্ষমতা বিমানের আছে?

উত্তর : এটা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বোয়িং কেনা, গম ও তুলা আমদানি সবই যুক্তরাষ্ট্রকে সুবিধা দিয়েছে। কিন্তু বিমান সংস্থা নিজেরাই বলছে, তাদের ২৫টি বিমান কেনার পরিকল্পনা ছিল না। তাহলে প্রশ্ন আসে—এই চুক্তির অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা কী? এখন ৫০ হাজার কোটি টাকার বিমান কেনা হবে। সেটা আমাদের লাগবে কি না, আমাদের অবকাঠামো এটার জন্য প্রস্তুত কি না, সেগুলো দেখতে হবে।

প্রশ্ন : এবার শুল্ক আলোচনায় বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সংগঠন ও সরকারের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল কিনা? এমন আলোচনায় সবার অংশগ্রহণ কতটা জরুরি?

উত্তর : সমন্বয়ের ঘাটতি আছে। অনেক সিদ্ধান্ত এমনভাবে হয় যার প্রভাব পড়ে বেসরকারি খাতে, কিন্তু তারা আগেভাগে জানে না। এই আলোচনায় ব্যাবসায়িক স্বার্থ রক্ষা, গবেষণা বিশ্লেষণ ও স্বচ্ছ নীতি দরকার, তা না হলে ভুল ছাড়ের খেসারত দিতে হতে পারে।

প্রশ্ন : এই শুষ্ক হ্রাসকে টেকসই ও ভবিষ্যতে আরো সুবিধা আনতে বাংলাদেশকে এখন কোন কৌশলগুলো অনুসরণ করা উচিত?

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র যেসব বিষয়ে উৎকর্ষ প্রকাশ করেছে, সেসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। যেসব বিষয়ে তারা অভিযোগ করেছে সেটারও যৌক্তিকতা আছে। তারা বলেছে যে আমাদের দেশে নানা ধরনের ব্যুরোক্রোটিক জটিলতার সম্মুখীন হয় বিনিয়োগকারীরা। সে সম্মন্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

আমি এখানে যা পেলাম তার বিপরীতে আমাকে কী কী ছাড় দিতে হবে, সেটা হিসাব করারও ব্যাপার আছে। বেসরকারি খাত কেন খরচ বহন করবে? বেসরকারি খাতও বাড়তি খরচের হিসাব করবে। আগে যদি ইউক্রেন থেকে গম আমদানিতে ৩২০ ডলার ব্যয় হতো এখন সেখানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানিতে ব্যয় হবে ৩৪০ ডলার। এতে তার খরচ বেশি হবে। এখন বাড়তি খরচ বহনে বেসরকারি খাতকে সরকার কী কোনো সহায়তা দেবে, নাকি এই খরচটা ভোক্তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এ ক্ষেত্রে তিনটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ : ১. শুষ্ক লেবেল করা গেছে, এখন খরচ কমিয়ে দামে এগিয়ে যেতে হবে, ২. ব্র্যান্ড বায়ারদের সঙ্গে আলোচনায় কিছু শুষ্ক ভাগ করে নেওয়ার মডেল ভাবতে হবে, ৩. যুক্তরাষ্ট্র যেসব অ-শুষ্ক বাধার কথা বলেছে, যেমন মেধাস্বত্ব আইন বা ওয়ান স্টপ সার্ভিস, সেগুলো বাস্তবায়ন করলে শুধু মার্কিন বাজার নয়, সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিবেশও উন্নত হবে।

কালের কণ্ঠ

৩ আগস্ট ২০২৫

দেশ বাণিজ্যের আলাপ

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

রিয়াজ সেজানঃ আজ আমাদের সাথে আছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্যার, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা এই আলোচনাটি একটু আড্ডার ছলে করতে চাই আপনার সাথে। তরুণদের জায়গা থেকে একটু যদি ভাবি, নানা ধরনের প্রশ্ন আমাদের মনে তৈরি হয় সেই জায়গা থেকে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনার মত প্রাজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে আমরা নিতে চাই।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমাদের তরুণ তো প্রথম না। প্রথম প্রজন্মের না। এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রজন্মের তরুণরা এই দেশে এসেছেন। এবং প্রত্যেকটা তরুণেই তার নিজস্ব সময়ের একটা স্বপ্ন থাকে, একটা আদর্শ থাকে, একটা চেষ্টা থাকে এবং তাদের নিজস্ব অর্জন এবং হতাশাও থাকে। সেহেতু আপনি যদি মনে করেন এই প্রজন্মে তরুণরা একটা অনন্য কিছু ঘটনার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, একটা অনন্যতা আছে তাদের প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য হিসেবে। কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিক ধারাসূত্রে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান আমরা করেছি বা ৭১ এ স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে। এই তরুণরাই করেছে। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন হয়েছে। সামরিক তন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। সেহেতু প্রত্যেক প্রজন্মই আদর্শ নিয়ে বেঁচে ওঠে এবং প্রত্যেক প্রজন্মেরই একটা নিজস্ব চাওয়া-পাওয়া বা পাওয়ার না পাওয়ার বেদনা এবং আনন্দ থাকে। তাই এই প্রজন্মেরও সেই একই রকম আছে। সেহেতু বোঝার ব্যাপার হচ্ছে যে যেই স্বপ্নটা মানুষ দেখে, বাংলাদেশকে ন্যায্যতাভিত্তিক, গণতান্ত্রিক এবং বিকাশমান দেশ হিসেবে দেখার যে স্বপ্নটা আমাদের সকলের আছে, সেটা অর্জন করার ক্ষেত্রে আমরা যেই পথরেখা দাঁড় করিয়েছিলাম সেটা যথেষ্ট ঠিক ছিল কি না। এটা অভিজ্ঞতার আলোকে তত্ত্ব এবং প্রয়োগের সংমিশ্রণে যথেষ্ট যুতসই ছিল কি না এটা দেখতে হবে। সেই পথরেখা বাস্তবায়নের জন্য আমার যা করণীয় ছিল, আমার সহযোগীদের যা করণীয় ছিল সেটা কি আমরা যথাসময় করেছি কি না সেটারও মূল্যায়ন হবে। সেহেতু স্বপ্ন দেখা, বাস্তবায়ন এবং প্রতি মুহূর্তে মূল্যায়নের ভিত্তিতে আমাদের পরবর্তী

পদক্ষেপগুলো নির্ধারণ করা, এটাই যুগের ধর্ম। আগের সমস্ত যুব সমাজই এটার ভিতর দিয়ে গেছে। বর্তমান যুব সমাজেও এটার ভিতরে আছে।

রিয়াজ শেজানঃ আমরা তো একটা পরিবর্তনের কথা বলি। যেমন, পরিবর্তনটা হচ্ছে আমরা লুটপাট দেখেছি ব্যাংকে, আমরা দেখেছি নানাভাবে অবিচার। সেই বিচারিক কার্য ধারাগুলোর আমরা পরিবর্তন চেয়েছি। কিন্তু দেখা গেছে যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ওই একই ধারায় একই ফর্মুলায় আছি। আমরা ওই ফর্মুলা থেকে বেরোতে পারছি না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ এটা আমি তো একমত হলাম না পুরোটা। কারণ হলো আমরা যে পরিবর্তন চেয়েছি এবং যার ফলে ছাত্রজনতার অভ্যুত্থান হয়েছে, এইটা সম্পূর্ণভাবে একদিকে যেমন ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে দেখা যায়। আবার বিচ্ছিন্নভাবে একটি অনন্য ঘটনা হিসেবেও দেখা যায়। এখন এই অনন্য ঘটনার অন্যতম বিষয় ছিল যে একটা বৈষম্য বিরোধী চেতনার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বৈষম্যবিরোধী চেতনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য যে সমস্ত শক্তি দরকার করে সেটা একদিনের ব্যাপার না। মধ্যমেয়াদে দীর্ঘমেয়াদে প্রয়োজন করে। সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের যে ব্যাকরণ, সেই ব্যাকরণ শুদ্ধ ছিল কি না এটা ভাবার বিষয় আছে। অর্থাৎ এটা শুধু ছাত্র বা যুব সমাজের বিষয় না। এটা চলমান প্রতিষ্ঠান যেগুলি আছে সেগুলির অংশগ্রহণ কিভাবে হচ্ছে, সেটা রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, একই রকমভাবে অন্যান্য পেশাজীবীরা তাদের ভূমিকা পালন করেছে কি না বা করতে পেরেছে কি না সেইটার বিষয় আছে। যে সরকারকে আমরা বসিয়েছি, যে সরকারকে এনেছি অভ্যুত্থান উত্তর, তারা যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন কি না। তাদের কর্মপন্থা বা কর্মসূচি বাস্তবায়নযোগ্য ছিল কি না। তারা সেখানে সবাইকে নিয়ে একত্রিতভাবে, একনিষ্ঠভাবে, সততার সাথে, ধারাবাহিকতার ভিতরে আমরা যে সংস্কার কর্মসূচির কথা বলেছি সেগুলি বাস্তবায়ন করেছি কি না। সেগুলির প্রতিনিয়ত একটা মূল্যায়নের ভিতর দিয়ে আমাদের যেতে হবে। এবং যারা এটাকে করার জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিল তারা নিজেদের ভূমিকা পালন করেছেন কি না। দেখুন তারা কেউ কেউ রাজনীতিতে চলে গেছেন। কেউ কেউ নাগরিক আন্দোলন করেন। কেউ হয়তো পুরো জিনিস থেকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। সেহেতু আমাদের এই বাস্তবতাগুলোকে দেখতে হবে। এখন বোঝার বিষয় হলো দেশে তিনটি বিষয় নিয়ে আমরা আগানোর চেষ্টা করেছি। একটা হলো বিচার, একটা হলো সংস্কার, আরেকটা হলো নির্বাচন। তাহলে এই সরকারের বাদবাকি সময়ের ভিতরে আর কী সংস্কার হতে পারে সেটা একটা বড় বিষয়। আমরা যেমন নাগরিক প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে 'রিফর্ম ওয়াচ' নাম দিয়ে সংস্কারগুলোকে প্রতিনিয়ত পরিবীক্ষণের ভিতরে রাখার চেষ্টা করছি। কিন্তু একই সাথে এই সরকারের পরেও তো নতুন সরকার আসবে। সেই সরকার এগুলোকে নিবে কি না তার জন্য এই মুহূর্তে রাজনীতির ভিতরে যে নির্বাচনী ইশতেহার আসবে তাতে এই যে প্রত্যাশাগুলো ছিল, যে আকাঙ্ক্ষাগুলো ছিল, সেগুলোকে আমরা আবার স্থাপন করতে পারবো কি না এবং নতুন সরকারের কর্মসূচিকে প্রভাবিত করতে পারবো কি না সেটা দেখতে হবে। প্রজন্মকে বুঝতে হবে এই সময়কালে তার বয়স বেড়েছে। সেও প্রবীণ হওয়ার পথে আছে। সেহেতু সরকার আসবে যাবে। সময় আসবে যাবে। সামনের সময়ের জন্য তাদের প্রস্তুত হতে হবে।

রিয়াজ সেজানঃ আমাদের সমসাময়িক যারা স্বাধীনতা পেয়েছে, আমরা যদি ভিয়েতনামের কথা বলি, সিঙ্গাপুরের কথা বলি, তাদের একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে তারা তাদের দেশটাকে একটা জায়গায় নিয়ে গেছে। আমরা তো এখনো বলতে গেলে প্রাথমিক পর্যায়ে আছি।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ প্রত্যেকটা দেশের নিজস্ব ইতিহাস আছে। তার নিজস্ব রাজনীতি আছে। তার নিজস্ব উন্নয়ন ও পথচলা আছে। সেহেতু বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের সাথে তুলনীয় যদি হয়, আমরা বলি যে কোরিয়া আর ভারতবর্ষ একই আয়ের ছিল। তারা একজন কোথায় আরেকজন কোথায়। এরকমভাবে ভিয়েতনামের কথা এখন আমরা তুলনীয় বলে মনে করি। বিষয়টা হলো যে আমাদের সূচনাকালটাকে দেখতে হবে যে কোন পরিস্থিতি থেকে সূচনা করেছে। কেউ যুদ্ধের ভিতর দিয়ে, কেউ হয়তো অন্য ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিতর দিয়ে। কোরিয়া বা বাংলাদেশের সাথে তুলনা করলে দেখুন একেকজন একেক ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়েছে। আমাদের দেশের পরিকল্পনা প্রথম দিকে যেটা ছিল তার থেকে আমরা পরবর্তীতে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক পরিকল্পনা থেকে বের হয়েছি। অন্যান্য দেশে হয়তো উদারীকরণ আগে করেছে। কিন্তু পার্থক্যের একটা বড় জায়গা হলো রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে। সেটা হলো রাজনীতি আমাদের উন্নয়নের ধারাকে যথোপযুক্ত সমর্থন দিয়েছে কিনা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আশ্কেপের জায়গাটা হলো যে আমরা তথাকথিত উন্নয়নের বয়ান দিয়েছি। তার সাথে যেই

রাজনীতিটা প্রয়োজন ছিল সেই রাজনীতি তো দেইনি। আমরা গণতন্ত্রহীনতার ভিতরে ছিলাম। স্বৈরশাসনের ভিতরে ছিলাম এবং যেই অন্যায় অবিচার বা অসাম্য হয়েছে তাতে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর কোন কণ্ঠস্বর দিতে পারিনি। আমিও তো পারিনি। সেই অপর্যবোধ আমাদের মনের ভিতরেও আছে। এটা আমাদের জাতিগত সামগ্রিক একটা ব্যর্থতা। বিষয়টা হলো যে যেই অভ্যুত্থান করলাম এই অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে শিক্ষা নিয়ে আমরা পথচলাকে আবার নতুনভাবে দাঁড় করাতে পারবো কি না। এবং আপনি যেই নবীনদের কথা বলছেন উনারা আমাদের চেয়ে ভিন্নতর হবেন কি না?

রিয়াজ সেজানঃ আমার প্রশ্ন হলো অর্থনীতির আমরা জানি যে দুইটা দিক আছে। একটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক আর একটা পুঁজিবাদ। আমরা যখন পড়াশোনা করি বা এটা সম্পর্কে জানি তখন মনে হয় সমাজতান্ত্রিকতা অনেক বেশি উদার। সাম্যবাদের কথা বলে। কিন্তু প্রায়িক্যালি দেখা যায় যে চায়নামাও দিন শেষে পুঁজিবাদের ফরম্যাটে চলে আসছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ এই যে আপনি বলছেন পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র ইত্যাদি, এইসব মডেল এখন এই মুহূর্তে আমরা হয়তো উন্নয়ন চিন্তার ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে পড়াশোনা করি। কিন্তু প্রায়োগিক অর্থনীতিতে এটা আসে না। প্রায়োগিক অর্থনীতিতে হলো আপনি কীভাবে একটি কর্মক্ষম বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন। যেই বাজার ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে একদিকে আপনার প্রবৃদ্ধি হবে এবং অপরদিকে ওই প্রবৃদ্ধির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্বল জনগোষ্ঠীর সকলে হিস্যা পাবে। একটা হিংস্যাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির উন্নয়নের ধারার কথা আমরা চিন্তা করি। সেই প্রবৃদ্ধির ধারার ভিতরে যারা প্রবৃদ্ধির অংশ পাবে না তাদের আপনি

ঠেকা দেওয়ার জন্য, এই যে জালের ফাঁকে দিয়ে যারা পড়ে যেতে নিবে, তাদের আপনি সামাজিক সুরক্ষা দিবেন। এই যে সামাজিক সুরক্ষা, বিভিন্ন ভাতা, বিভিন্ন ধরনের স্টাইপেন্ড, এলাউন্স, এগুলি যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করি, এই সমস্ত দিয়ে আমি তাদেরকে আবার প্রবৃদ্ধির ধারাতে এনে যুক্ত করতে পারবো কি না এটি এখন বিষয়। সেহেতু গণতান্ত্রিক পরিবেশের সাথে, একটা গণতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে, একটা গণতান্ত্রিক অর্থনীতি দিতে হবে। একটা প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থনীতির জন্য প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি দিতে হবে। এই দুটোর সম্মিলনই এখন মডেল। এখন এটার ভিতরে কেউ আপনার রাষ্ট্রের ভূমিকাকে একটু বেশি রাখে সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে অথবা কেউ রাষ্ট্রের ভূমিকাকে একটু বেশি রাখে বিনিয়োগ বা কর্মসংস্থান বা অন্যান্য ক্ষেত্রে। এটার ভিতরে বাংলাদেশকে, তার নিজের পথচলাকে এর ভিতরে দেখতে হবে। সাম্য এবং ন্যায্যতাকে বাদ দিয়ে বাজার অর্থনীতিকে দাঁড় করাতে নিলে সে বাজার অর্থনীতি টেকসই হয় না।

রিয়াজ সেজান: স্যার, সংস্কৃতির দিক থেকেও আমরা একটু দ্বিধাস্থিত। কারণ আমরা ঐতিহ্যগতভাবেই কিছুটা কালচারাল।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি আপনাকে এটাই বলি। আমি আন্দাজ করছি আপনার প্রশ্নটাকে। সেটা হলো যে আপনি যদি একটি উদার অর্থনীতি দাঁড় করাতে চান যেটাতে আপনার প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থনীতি হবে মেধা যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং সেটার যদি সম্পূর্ণক অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি না থাকে তাহলে অর্থনীতি হবে না। আবার ওই অংশগ্রহণমূলক অংশীজনের অবদানের ভিত্তিতে যদি রাজনীতি দাঁড় করাতে হয় তাহলে আপনার এক ধরনের উদার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ লাগবে। একটা উদার সাংস্কৃতিক পরিবেশে যদি একই রকমভাবে ঐতিহ্যকে ধারণ করে অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করতে পারেন তাহলে কিন্তু অন্য দুটো আবার হবে না। ওই অর্থনীতিও হবে না আবার রাজনীতিও হবে না। সেহেতু বাংলাদেশে ঐতিহ্যগতভাবে উদার সংস্কৃতি, বহুমতের এবং বহুপন্থের সংকর জাতি তো আমরা। আমাদের তো অনেক ধরনের ধারার মিলনে এই দেশটা গড়ে উঠেছে। এটি একটা শক্তি। ওই উদার, বহুভিত্তিক, বহু মতামতের ভিত্তি যদি আমি ধারণ করতে না পারি তাহলে আমি অর্থনীতি-রাজনীতিতেও হেরে যাব। বর্তমান বিশ্বে যেই ধরনের বিভেদ এবং দ্বন্দ্ব চলছে, সেই বিভেদ-দ্বন্দ্বের ভিতরে আমাদের আশ্রয় নিতে হলে, প্রশ্রয় পেতে হলে ওই বহুমতের উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশ, উদার সাংস্কৃতিক পরিবেশ, সহমর্মিতা ও সহায়শক্তি সম্পন্ন পরমত সহিষ্ণুতা নিয়ে আমাদের দাঁড়াতে হবে। এইটি বাংলাদেশ।

রিয়াজ সেজান: এই ঐক্যমতের জায়গায় নিশ্চয়ই আপনারা কাজ করছেন। আপনারা তো নাগরিক প্ল্যাটফর্মে কাজ করছেন এবং খুব প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আপনারা যাচ্ছেন আমরা জানি। কিন্তু আমরা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ঐক্য তৈরি করতে পারছি না কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে। আমরা দেখছি যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বলা হচ্ছে আবার ধর্মীয় এক ধরনের সংঘাত আছে। আমরা আসলে এখানেও মানে দ্বিধাস্থিত। আপনি তো একদম প্রান্তিক পর্যায়ে যান। কোন একটা বিষয়ে আমরা ঐক্য তৈরি করতে পারি কি না?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ ঐক্যের অভাব মানে অনৈক্য না। ঐক্যের অভাব সবসময় বৈরী দ্বন্দ্ব হবে এমনও কোন কথা নাই। আপনি আলাপের ছলে বলেছেন আমি আলাপের ছলে বলছি। আপনি যে দ্বন্দ্ব বা ঐক্যের অভাব বলেছেন এটার সময় নির্দিষ্ট কি না। এখনকার যে সমস্ত আলোচনা চলছে চলমান সেটা এক ধরনের। আরেকটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের জাতি গঠনের ক্ষেত্রে। তো বাংলাদেশের জাতীয় গঠনের ক্ষেত্রে, বর্তমানের ঐক্যের ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে, ৭১ সালের মূল্যবোধকে অস্বীকার করবো, তার ঐতিহ্য ইতিহাসকে অস্বীকার করবো, নেতাদের আমরা ভুলে যাবো, এইটা যদি স্থাপন করে তাহলে বুনিয়াদ তো দুর্বল হয়ে যাবে। এটা আমাদের বোঝার ব্যাপার। এই যে আমাদের চিন্তার যে বিশৃঙ্খলা অথবা যে বৈসাদৃশ্য এটা আমাদের উপলব্ধির অভাবের ক্ষেত্র থেকে, শিক্ষা এবং পঠন মননের অভাবের ক্ষেত্র থেকে আসতে পারে। আর আসতে পারে হয়তো আদর্শগত পার্থক্য থেকে। এক হলো শিক্ষার অভাব থেকে আসতে পারে আর আদর্শগত পার্থক্য থেকে। এবং সেই আদর্শগত পার্থক্য বাদবাকি শিক্ষাকে বা কথাকে যে আটকে দেয়। এমনভাবে জানালা-দরজা আটকে দেয় যে আর বাতাস ঢুকতে দেয় না। তখন ভিতরটা দূষিত হয়ে যায়। বাংলাদেশে যেটা আমাদের লক্ষণীয় ব্যাপার, আমরা যেন সর্বদা জানালা-দরজা খোলা রাখি। বাতাস যেন আসতে পারে। দূষণ থেকে মুক্ত থাকতে পারি। এবং তার ভিতর দিয়ে, এই সময়ের ভিতর দিয়ে, একটা ঐক্যের জায়গায় আমরা পৌঁছাবো। আমি মনে করি এখনো ঐক্য আছে। বাংলাদেশের যে উন্নতি চাই, যে বৈষম্য বিরোধী অবস্থান চাই, যে ন্যায্যতা চাই, আগের যে অন্যায় হয়েছে সেই অন্যায়ের বিচার চাই, এটার ভিতরে তো এক ধরনের ঐক্যবোধ আছে। এটার ভিতরে তো ঐক্যচিন্তা আছে বলেই আমার কাছে মনে হয়।

রিয়াজ সেজানঃ আপনি বাতাস আসতে দেয়ার কথা বলেছেন কিন্তু আমরা ভৌগোলিকভাবে এমন একটা জায়গায় অবস্থান করছি যেটা সবারই এক ধরনের আগ্রহের জায়গা। ভারত আমাদের প্রতিবেশী দেশ। তার বাইরে আমাদের পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের সময় থেকে এক ধরনের বৈরিতা আছে। তার বাইরে আমেরিকা আছে, চীন আছে। এই দেশে এই যে বন্ধুত্বের জায়গাটা, আমরা আসলে কী করতে পারি?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমাদের যেটা বুঝার ব্যাপার সেটা হলো বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার দিক থেকে না হলেও একটি ক্ষুদ্র দেশ। যখন একটি ক্ষুদ্র দেশের ভিতরে বাজার না থাকে, আমি অর্থনৈতিক দৃষ্টি থেকে বলছি, তখন তাকে অন্য বাজারের সাথে যুক্ত হতে হয়, তার বিনিয়োগ, প্রবৃদ্ধি, তার ব্যবসা-বাণিজ্য, তার অনাবাসী আয়, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ইত্যাদির জন্য তাকে অন্যান্য বাজারের সাথে যুক্ত হতে হয়। সেহেতু বাংলাদেশের যে ভবিষ্যৎ, যে উন্নয়ন চিন্তা, তার যে বিকাশের ধারা, সেটা বিশ্বের মাঝেই অবস্থিত। সেহেতু আমার বৈদেশিক সাহায্য দরকার করে। আমার বৈদেশিক বাণিজ্য দরকার করে। আমার রেমিটেন্সের আয় দরকার করে। আমার প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ দরকার করে। আমার শান্তিরক্ষী বাহিনী বিদেশে পাঠানোর দরকার করে। যদি আমার প্রয়োজন হয় ভৌগোলিকভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, তাহলে কারোর সাথে বড় ধরনের শত্রুতা করে আমরা এটা আটকাতে বা নিতে পারবো

না। কোন কোন দেশের সাথে আমাদের হয়তো বন্ধুত্ব একসময় একটু গভীর, অন্য সময় হয়তো মনোমালিন্য হয়। যেমন এই মুহূর্তে ভারতের সাথে হচ্ছে, কারণ ভারত নিরঙ্কুশভাবে একটা সরকারকে সমর্থন করেছে। যে সরকারকে আমরা ফেলে দিয়েছি, উচ্ছেদ করে দিয়েছি। সেহেতু তার দায়-দায়িত্ব হিসেবে আমরা তাদের এই মুহূর্তে নিঃসন্দেহে দোষারোপ করি। আমাদের মনের ভিতরে ক্ষেদ আছে। আমাদের মনের ভিতরে আরো অনেক সেই অর্থে নেতিবাচক ধারণা তাদের সম্বন্ধে আছে। ভবিষ্যৎ বলবে। আবার দেখেন পাকিস্তানের সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছে আমরা। করে স্বাধীন হয়েছি। তাদের পরাজিত করেছি। তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য না হওয়ার তো কোন কারণ নেই এই মুহূর্তে। নতুন প্রজন্ম ওই দেশে এসেছে। তাদের পিতামহের জন্য তাদের সাথে আমার সম্পর্ক নষ্ট করার তো কোন কারণ নেই। আমাদের স্বাধীনতার কত পরে, বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার পরে চীন এবং সৌদি আরাবিয়া আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই বলে কি চীনের সাথে আমরা সহযোগিতা করছি না? আমরা কি সৌদি আরাবিয়াতে আমাদের মানুষ পাঠাবো না? সেহেতু আমি আবার বললাম জানালা খোলা রাখবেন। মন খোলা রাখবেন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির ভিতরে নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং তার ভিতরে আমাদের এবং পরবর্তী প্রজন্মকে একজন বিশ্বের নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশ থেকে মননে পুষ্ট বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে দাঁড় করাতে হবে। আমি সেজন্য কারো সাথেই শত্রুতা দেখি না। আমি সবই এগুলিকে কৌশলগত অবস্থান হিসেবে দেখি।

রিয়াজ সেজান: ড. মুহাম্মদ ইউনূস একটা আইডিয়া আমাদেরকে দিয়েছেন সম্প্রতি। বন্দরকে আমরা এমনভাবে আন্তর্জাতিক মানের হিসেবে তৈরি করব যেখান থেকে আসলে আমরা ল্যান্ডলক নেপাল, ভুটান কিংবা সেভেন সিস্টারে পণ্যটা দিব। একটা বড় বাজার তৈরি করার কথা উনি বলছেন। এই আইডিয়াটা আপনি কেমনভাবে দেখেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রথম কথা হলো আপনাকে আমি সাবধান করে দিই। ওই সাতটা যে রাজ্য আছে ভারতের, তাকে ল্যান্ডলক বলে ইতোমধ্যে প্রফেসর ইউনূস অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। কারণ ভারতবর্ষের জন্য এটা অত্যন্ত সংবেদনশীল একটা বিষয়। তার দেশকে তারা ল্যান্ডলক মনে করে না। তাদের আরো অনেক সমুদ্রের রাস্তা আছে। শুধু বাংলাদেশের উপর দিয়ে না। সেহেতু আমাদের ভৌগোলিক সংবেদনশীলতা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। এটা ঠিক যে এই এলাকাতে আমাদের যদি মাতারবাড়ির মত প্রকল্প নেওয়া হয় সেই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা শুধু বাংলাদেশ না নেপাল, ভুটান এবং একই রকমভাবে ভারতবর্ষের বৃহত্তর অঞ্চলে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি এবং আমরা একটা অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবো। এইটা ভরসা আমি রাখি এবং এটা আগামী দিনে হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুধু মাতারবাড়ি না, চিটাগং, মংলা ইত্যাদির দক্ষতা বাড়তে হবে। এই দক্ষতা বাড়তে গেলে ওখানে অপচয় ও দুর্নীতি কমাতে হলে বিনিয়োগ দরকার। ওই বিনিয়োগ পুরোটা বাংলাদেশের সরকারের নাই বা ব্যক্তি খাতে নাই। আমার বৈদেশিক বিনিয়োগ দরকার। সেহেতু ওই বৈদেশিক বিনিয়োগে নিয়ে আসাটাও কোন অপরাধের ব্যাপার বলে আমি মনে করি না। এটার জন্য কিছু কায়মের স্বার্থ হয়তো অখুশি হবে। কারণ ওই অদক্ষতার বিভিন্ন

সুবিধা তারা পাচ্ছিলেন। কিন্তু ওই বিনিয়োগকে আমি কিভাবে আনবো? ওই সংস্কারটা আমি কিভাবে করব এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ না। সেহেতু এই মুহূর্তে সরকার যেভাবে করলো এটা আমাদের সকলের মনে অস্বস্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি কার সাথে কি চুক্তি করলেন কিছু জানালেন না। নন ডিসক্লোজার আইটেম দিয়ে আপনি এটাকে আচ্ছাদন করে রাখলেন। এত দ্রুততার সাথে, দুই সপ্তাহের কম সময়ের ভিতরে এটাকে করে ফেললেন এবং এমন একটা সরকার করল যেটা নির্বাচিত সরকার না। বৈধ সরকার কিন্তু নির্বাচিত না। সেহেতু এই জায়গাটাতে আমার ভয় হয় যে একটা ভালো কাজকে বৈধভাবে করলে পরে অনেক সময় এটার ফলাফল ভিন্ন হয়। সেহেতু এইটা আমি মনে করি ইংরেজিতে বললে স্ট্র্যাটেজিটা ঠিক আছে, ট্যাকটিক্সটা ঠিক নাই। রণকৌশল ঠিক আছে কিন্তু কৌশলটা ঠিক হয়নি বলে আমি মনে করি। এইটা নিয়ে আমাদের সকলের মনে অস্বস্তি আছে। আমারও আছে। তবে অনেকে মনে করেন যে বৈদেশিক বিনিয়োগ করাই যাবে না। জাহাজ বন্দর দেওয়াই যাবে না। ওইটা আমি মনে করি না। আমি মনে করি সহযোগিতার জায়গা আছে। নীতিকাঠামোর ভিতরে স্বচ্ছতার ভিতরে লাভজনক অবস্থান থেকে এটা করা সম্ভব। উনারা যেভাবে এটা করেছে এটা আমার ভালো লাগেনি।

রিয়াজ সেজানঃ যখন যারা ক্ষমতার বাইরে থাকে তখন ভালো ভালো কথা বলে কিন্তু কেন্দ্রে গেলে তাদের এক ধরনের পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি। তরুণদের কথাই বলি। আপনি বলছিলেন যে তরুণরা যারা যারা এই আন্দোলনের সাথে ছিল অনেক ক্ষেত্রে আমরা তাদেরও দুর্নীতির কথা শুনছি। আবারও একই কালচার। ভবিষ্যতে রাজনীতিতে আসবে যারা মনে করেছে তারা এখনই চাঁদাবাজি করছে নানা জায়গা থেকে। যেই সংস্কৃতি আমাদের চেপে ধরে আছে, বিশেষ করে এই দুর্নীতির সেখান থেকে তো আমরা আবারও একই জায়গায় খাবি খাচ্ছি।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আপনি বলেন কেন হলো। আপনি তো আলাপ করতে এসছেন আমার সাথে। আপনি বলেন কেন হলো।

রিয়াজ সেজানঃ এখানে প্র্যাকটিসটাই হচ্ছে গিয়ে এরকম। আমার কাছে মনে হয় যে সিস্টেমটা আমরা তৈরি করে রেখেছি, আমলাতন্ত্রের সিস্টেম, এক ধরনের জটিল জায়গা। ওই জায়গায় চাইলেই কেউ ঢুকতে পারছে না। এগুলোই কি আমাকে ওই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে কি না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আপনাকে বুঝতে হবে যেই নতুন শক্তির উত্থান আমরা দেখেছিলাম ৫ই আগস্টের ভিতর দিয়ে, সেই নতুন শক্তি কি এত বলিয়ান হতে পেরেছিল ক্রমান্বয়ে, যার ফলে সে এই কাঠামোকে পরিবর্তন করতে পারে? সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করতে পারে? আচরণকে পরিবর্তন করতে পারে? এই যে বললাম কাঠামো, প্রতিষ্ঠান, আচরণ, এমনকি সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করার শক্তি সে কি অর্জন করতে পেরেছে কি না? এখন আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে পারছে না এবং হয়তো ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তার একটা বড় কারণ হলো যে উনারা যে পদ্ধতিটা বেছে নিলেন, শেষ পর্যায়ে উনারা তো প্রথাগত রাজনীতির পদ্ধতিই বেছে

নিয়েছেন। উনারা রাজনৈতিক দল করেছেন। রাজনৈতিক দল করাটা আমি কোন অন্যায় বলছি না। ওইটাও একটা পদ্ধতি। কিন্তু এর পাশাপাশি স্বার্থসংঘাতের থেকে নিজেদের যদি দূরে রাখতেন এবং কণ্ঠহীন মানুষকে যদি উনারা কণ্ঠ দেওয়ার চেষ্টা সামাজিক আন্দোলন হিসেবে অব্যাহত রাখতেন তাহলে হয়তো পরিস্থিতি ভিন্ন হলেও হতে পারতো। এখন তো উনারা এই যে টাকাপয়সার রাজনীতি, মনোনয়ন বাণিজ্য, ভোট কেনা, এই যে কাঠামো, তার ভিতরে তো উনারা বিলীন হয়ে যাবেন কি না এই আশঙ্কা আমাদের মনের ভিতরে এসেছে। এবং পরবর্তীতে উনারা কী আচরণ করবেন সেই পুরানা কৃষ্টির অংশ হিসেবে সেইটাও আশঙ্কাও আছে। কিন্তু আরেকটা অংশ যদি সামাজিক আন্দোলনকে অব্যাহত রাখতো, কণ্ঠহীন মানুষের পক্ষ হয়ে দাঁড়াতে এবং তারা আগামী দিনে শুধু ছাত্র না, তারা পেশাজীবী হিসেবে, সং পেশাজীবী হিসেবে, ভালো ডাক্তার, ভালো ইঞ্জিনিয়ার, ভালো আমলা, ভালো সাংবাদিক আর অপদার্থ অর্থনীতিবিদ হয়ে যদি আগামীতে আসতো তাহলে আরেক রকমের হতে পারতো। আর যদি উনারা দেশ থেকে পালিয়ে যান তাহলে তো আরো বলার কিছু থাকবে না আর কি। আমি কিন্তু অতখানি হতাশগ্রস্ত না। অনেক মানুষ, অনেক বড় জনসংখ্যা এবং অনেক ধরনের তরুণ এখানে আছেন। উনারা যেই চেতনা দেখিয়েছেন এই চেতনার জন্য আগামী প্রজন্মও হয়তো উজ্জীবিত হবে। উনারা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে যতখানি হওয়ার কথা হতে পারছেন না এখন পর্যন্ত। আমরা দেখছি আবার অনেক ক্ষেত্রে যে নতুন চেতনা, যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে উনারা দিয়েছেন, আত্মত্যাগের যে আদর্শ উনারা স্থাপন করেছেন যে তারা জীবন দিতে পারেন, এটা তো ফেলে দেওয়ার বিষয় না।

রিয়াজ সেজান: স্যার, আপনারা গবেষণা করে দেশকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করছেন। কিন্তু যেই গবেষণাগুলো আমার পক্ষে আসছে সেটার পক্ষে আমি থাকছি। কিন্তু যেটা আমার বিপক্ষে যাচ্ছে তখন আমরা নানা ধরনের কথা বলছি। বিশেষ করে গবেষণা নিয়ে ফান্ডিং নিয়ে। এটাকে আপনি স্যার কীভাবে দেখেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই বাংলাদেশের ভিতরে যদি গান নিয়ে তর্ক হতে পারে, কোন ধরনের গান হবে কোন ধরনের হবে না, কার কবিতা পড়বো কার কবিতা পড়বো না, কে আসল নেতা কে ছোট নেতা, যদি কোন জেলা বেশি ভালো কোন জেলা কম এগুলি নিয়ে যদি তর্ক-বিতর্ক থাকতে পারে, তাহলে আমাদের মত ছোটখাট অর্থনীতির বিশ্লেষকদের নিয়ে থাকবে না এটা কেন মনে করেন? আমাদের দেশে যেই ধরনের বিভক্তি সমাজে আছে সেখানে কারো পক্ষে যাবে কারো পক্ষে যাবে না। মনে রাখতে হবে আমরা বুশ-উত্তর যুগে বাস করি। সেইটার তত্ত্বটাই হলো তুমি যদি আমার সাথে না থাকো তাহলে তুমি আমার শত্রু। সেহেতু এই জয়গায় অন্য কিছু নাই। গণতন্ত্রের চর্চার ঘাটতির এটা অংশ। তথ্য উপাত্তের প্রতি আমি আস্থা রাখি না। আমি আগে ঠিক করি কী আমার দরকার, তারপরে ঠিক করি ওই তথ্য উপাত্ত আমি রাখবো কি রাখবো না। সেহেতু এটাকে কি বলি আমরা? তত্ত্বমায়িক তথ্য চাই। তো আগে তত্ত্ব মানে তারপরে তথ্য ঠিক করা হয়। আর আমরা তথ্য ঠিক করে তারপর তত্ত্ব পৌঁছাতে চাই। আমি আস্থা রাখি বাংলার মানুষের প্রতি আর সাংবাদিকদের প্রতি আস্থা রাখি। কারণ গত দেড় দশকে আমাদের মত লোকেরা এখনো যে বেঁচে আছে এত কিছু বলার পরে, এটা

তো হলো সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে। সংবাদ মাধ্যম অল্প অল্প করেও প্রিন্ট মিডিয়াতে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে যেটুকু জায়গা করে দিয়েছে আমাদের সেটুকু দিয়ে মানুষের মনে আমরা স্থান পেয়েছি। সেটার জন্য টিকে আছি। সংবাদ মাধ্যমকে স্বাধীন রাখবেন। তত্ত্ব আর

তথ্য আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

রিয়াজ সেজানঃ স্যার, একেবারে শেষ প্রশ্ন। আমরা নানা কিছু নিয়ে আলোচনা করছি। আপনারাও একটা ঐক্য তৈরি করতে চাচ্ছেন বা নাগরিকের মধ্যে একটা সংযোগ তৈরি করতে চাচ্ছেন। আসলে আমাদের দেশটাকে এগিয়ে নিতে হলে আমরা যদি আগের কথা বাদও দেই, এখন থেকে শুরু করতে চাই, কোন জায়গা থেকে শুরু করবো? আমাদের জাতীয় ঐক্যটা কী হতে পারে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ জাতীয় ঐক্যের জন্য কতগুলো জায়গা আছে খুবই পরিষ্কার। এক হলো উন্নয়নের লক্ষ্যটা কী আমার? ওই উন্নয়নে লক্ষ্যের ভিতরে সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষ, বিকাশমান মধ্যবিত্তের জায়গা আছে কি না? আরেকটা জায়গা আছে যদি আপনি বাইরের কথা বলেন তাহলে আমার দেশের স্বাধীনতা, আমার দেশের সার্বভৌমত্ব এইটার ভিতরে কোন ধরনের আমরা ব্যত্যয় আমরা দেখতে চাই না। আমরা অর্থনীতিতে এমন কিছু করবো না যা আমার সার্বভৌমত্ব মানে আমার স্বাধীনভাবে নীতি গ্রহণ করার ক্ষমতাকে সীমিত করে দেয়। এমন জায়গা আমরা হবো না। আমরা বাংলার মানুষ হবো, বাঙালি হবো, বাংলাদেশী হবো এবং একই সাথে বিশ্বের নাগরিকও হবো। সেহেতু বৈশ্বিক মূল্যবোধের ভিতরে আমার থাকতে হবে। এইরকম দুই তিনটি জায়গাতে ঐক্যমতের জায়গা আছে। আমি নতুন জায়গাতে উপনীত হতে চাই কিন্তু ঐতিহ্যকে আমি ফেলে দিতে চাই না। ওই ঐতিহ্যকে আমি ধারণ করতে চাই। ঐতিহ্য, ভবিষ্যৎ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আমার সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি কতগুলো বিষয়ে ঐক্যমতের জায়গা আছে বলেই আমি মনে করি। কেউ কেউ তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে, রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণ করার জন্য, অন্যান্য মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য এই সমস্ত খুবই পবিত্র এবং সংবেদনশীল বিষয়গুলোকে নিয়ে অনেক সময় ক্ষুদ্র আচরণ করেন।

রিয়াজ সেজানঃ আমরাও মনে করি জাতীয় স্বার্থে এক ধরনের ঐক্য তৈরি হবে এবং আমাদের এই যে দ্বিধা, এই দ্বিধা কাটবে। এবং আপনাদের মত মানুষ আমাদেরকে পথ দেখাবে এটাই আমরা প্রত্যাশা করি।

দেশ টিভি নিউজ

২৮ নভেম্বর ২০২৫

দেশে বাণিজ্যনীতি ও শিল্পনীতির মধ্যে সমন্বয় জরুরি

অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান

মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে একটি চ্যালেঞ্জ হলো স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানদণ্ডের মান্যতা নিশ্চিত করতে হবে- নগদসহায়তা ও ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শৃঙ্খলার আরোপ, শ্রম, পরিবেশ, জেডার, কার্বন নিঃসরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে আরোপিত বিভিন্ন মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বিধান করতে হবে। বাজার-সুবিধানির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা থেকে উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা, ও মানদণ্ড-মান্যতানির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় উত্তরণ করতে হবে। বাণিজ্যনীতি ও শিল্পনীতির মধ্যে সমন্বয় বিধান করতে হবে।...

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল অনুঘটক হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগ ছাড়া প্রবৃদ্ধি হয় না। আর দ্বিতীয় কথা হলো- আমি কত ইউনিট বিনিয়োগ করে ১ শতাংশ জিডিপি গ্রোথ করতে পারি। আমি যদি রেশিও কমাতে পারি, তার মানে হলো- আমার উৎপাদনশীলতা ভালো। আমি যদি ৪ ইউনিট দিয়ে ১ শতাংশ জিডিপি গ্রোথের পরিবর্তে ৩ ইউনিট বিনিয়োগ করে ১ শতাংশ জিডিপি গ্রোথ করতে পারি, এটাই উৎপাদনশীলতা। এ উৎপাদনশীলতটুকু জরুরি। আমাদের দেশে যেটা দেখছি, ২৪-২৫ শতাংশের মধ্যে বিনিয়োগ থমকে আছে কয়েক বছর। ক্রেডিট তারা যা নেন ব্যাংক থেকে বিনিয়োগের জন্য, এখানেও স্থবিরতা দেখছি। আমরা দেখছি যে, আমদানি ক্রেডিটের মেশিনারি করে আমদানির মাধ্যমে যন্ত্রপাতি এনে যে বিনিয়োগ করা হয়, সেই আমদানি নিয়েও একটা স্থবিরতা আছে। সবটা মিলে বিনিয়োগে একটা বড় ধরনের স্থবিরতা আছে। এর সঙ্গে কর্মসংস্থান, শোভন কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির চাপকে সামাল দেওয়া- অনেক কিছু জড়িত। সুতরাং, আমাদের অবশ্যই বিনিয়োগে চাপ্তল্য আনতে হবে।

অনেক উন্নয়নশীল দেশ তাদের উন্নয়ন পথযাত্রায় একটা পর্যায়ে পৌঁছানোর পরবর্তীতে আর উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। যেমন, নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ করল, কিন্তু সেখান থেকে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে পারছে না, বা উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ করতে সক্ষম হলেও উচ্চ আয়ের দেশে যেতে পারছে না। এটাকেই বলে মধ্য আয়ের ফাঁদ- প্রথমটিকে বলা হয় নিম্নমধ্যম আয়ের ফাঁদ, আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় উচ্চমধ্যম আয়ের ফাঁদ। আলোচনা অগ্রসর করার আগে বিভিন্ন ‘আয়’-এর সীমারেখা সম্পর্কে বলা দরকার। মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত এ সীমারেখাগুলো বিশ্ব ব্যাংক বিভিন্ন বিবেচনার প্রেক্ষাপটে নির্ধারণ করে থাকে, যা বৈশ্বিক অগ্রগতির নিরিখে প্রতি বছর পর্যালোচনাসাপেক্ষে পুনর্নির্ধারণ করা হয়। যেমন ২০২৫-২৬ সালের জন্য এগুলো ছিল নিম্নরূপ- নিম্ন আয়: ১ হাজার ১৩৫ ডলার বা তার নিচে, নিম্নমধ্যম আয়: ১১৩৬-৪৪৯৫ ডলার, উচ্চমধ্যম আয়: ৪ হাজার ৪৯৬ থেকে ১৩ হাজার ৯৩৫ ডলার এবং উচ্চ আয়: ১৩ হাজার ৯৩৬ বা তার ওপরে। অ্যাটলাস মেথড অনুযায়ী মার্কিন ডলারে প্রতি বছর জুলাই মাসে বিশ্বব্যাপক এ হিসাব দিয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো, কেন অধিক সংখ্যক দেশ উন্নয়নের পথপরিক্রমায় একটা ধাপে থমকে যায় এবং প্রবৃদ্ধির গতিধারা অব্যাহত রেখে পরবর্তী ধাপে উত্তরণ করতে সক্ষম হয় না। বাংলাদেশের জন্য এ প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কারণে। বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নির্ধারিত মাপকাঠিতে জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ করে, তখন এ ধাপের জন্য মাথাপিছু আয়ের সীমা ছিল ১ হাজার ৪৬ থেকে ৪ হাজার ১২৫ ডলার। সে বছর বিশ্বব্যাপকের অ্যাটলাস মেথড অনুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ১ হাজার ২৮০ ডলার। ২০২৪ সালে এটি এসে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮২০ ডলার।

মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে একটি চ্যালেঞ্জ হলো স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা। যেমন ২০১৫ সালে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার কারণে বাংলাদেশ আগের মতো (নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে) সহজ শর্তে ঋণ পাচ্ছে না। আগে বিশ্বব্যাপকের আইডিএ ঋণ ছিল বাংলাদেশের অন্যতম সূত্র, সেখানে সুদের হার শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ, গ্রেস পিরিয়ড (এখন কেবল সুদ পরিশোধ হয়) ছিল ১০-১৫ বছর ও রিপেমেন্ট পিরিয়ড (যখন সুদ ও আসল পরিশোধ করতে হয়) ছিল ৩০-৪০ বছর। এখন বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপকের হিসাবে ব্র্যান্ড দেশ (যা স্যাপ-দেশ) যখন সহজ ও অ-সহজ দুই ধরনের ঋণ পেতে পারে (এবং ক্রমান্বয়ে শেষেরটি বাড়ছে এবং বাংলাদেশে মূলত: বাজারভিত্তিক শর্তে বৈদেশিক ঋণ পাচ্ছে (এসব কঠিন শর্তের মধ্যে আছে ৩-৫% হারে ঋণের সুদ, গ্রেস পিরিয়ড ৫ থেকে ১০ বছর ও রিপেমেন্ট পিরিয়ড ১৫ থেকে ২০ বছর)। ফলে বর্তমানে ও আগামীতে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ অধিসেবার চাপ বাড়ছে/বাড়বে। যেমন, কয়েক বছর আগেও সেখানে প্রতি বছর বৈদেশিক ঋণ পরিষেবার পরিমাণ ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি, সেখানে সাম্প্রতিক সময়ে এ সংখ্যা ৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। যেসব খাতে ঋণ গ্রহণ করা হচ্ছে, যেসব প্রকল্পে ঋণ টাকা ব্যবহৃত হচ্ছে, তার নির্বাচন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে এখন আরও সতর্ক হওয়ার সময় হয়েছে। বিশেষত: যখন সাম্প্রতিক অতীতে টাকার

বড় ধরনের অবমূল্যায়নের কারণে যেসব প্রকল্প থেকে টাকায় রিটার্ন আসে সেগুলোর ঋণ পরিশোধের দায়ভার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (এ কথাটি বিদ্যুৎ-জ্বালানি-যোগাযোগ খাতের প্রকল্পের জন্য সমধিকভাবে প্রযোজ্য)। মধ্যম আয়ের ফাঁদকে যে অনেক সময় ঋণ ফাঁদের সঙ্গে সমার্থক করে দেখা হয়, তার মধ্যে যৌক্তিকতা আছে। এলডিসি থেকে উত্তরণের ফলে যখন শুষ্কমুক্ত বাজার সুবিধা থাকবে না, তখন বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পকে বাড়তি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে বিশ্ব বাজারে। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানদণ্ডের মান্যতা নিশ্চিত করতে হবে- নগদসহায়তা ও ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শৃঙ্খলার আরোপ, শ্রম, পরিবেশ, জেডার, কার্বন নিঃসরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে আরোপিত বিভিন্ন মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বিধান করতে হবে। বাজার-সুবিধানির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা থেকে উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা, ও মানদণ্ড-মান্যতানির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় উত্তরণ করতে হবে। বাণিজ্যনীতি ও শিল্পনীতির মধ্যে সমন্বয় বিধান করতে হবে।

পরিকল্পিত শিল্পায়নের মাধ্যমে ট্রান্সপোর্ট করিডরগুলোকে ইকোনমিক করিডরে রূপান্তর করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে, শাস্ত্রীয়ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা নিশ্চিত করে কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস হ্রাস করতে হবে এবং ব্যবসা-পরিবেশ উন্নত করতে হবে। বিনিয়োগ-যোগাযোগ-বাণিজ্যের ত্রিমাত্রিক সম্পর্কের মাধ্যমে তা সরবরাহ সক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ ও বাজার বহুধাকরণের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ এলডিসি উত্তরকে মসৃণ ও টেকসই করার জন্য যে স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি (এসটিএস) প্রণয়ন করেছে তাতে এসব ক্ষেত্রে ১৫৭টি লক্ষ্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। কার কী দায়িত্ব তা উল্লিখিত আছে এবং কখন তা ডেলিভারি দেওয়া হবে তাও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। সিঙ্গেল উইনডো স্থাপন, লজিস্টিক পলিসির বাস্তবায়ন, এপিআই শার্ক প্রতিষ্ঠা (বিশেষত, যেহেতু এলডিসি উত্তরণের ফলে ওষুধশিল্পের ওপরে বড় নেতিবাচক অভিঘাত পড়বে) ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কালবিলম্ব না করে উদ্যোগ-উদ্যম গ্রহণ করতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার এসটিএস বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এগুলোকে যৌক্তিক সমাপ্তিতে নিতে হবে।

বাংলাদেশ ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। অনেকে বলে থাকেন বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি থেকে উত্তরণ করে মধ্যম আয়ের দেশেও গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ধারণাটি ভুল। মধ্যম আয়ের দেশের বিশ্বব্যাংকের দ্বারা নির্ধারিত; অন্যদিকে এলডিসি গ্রুপ জাতিসংঘের দ্বারা সংজ্ঞায়িত। এলডিসি থেকে উত্তরণের পরবর্তীতে বাংলাদেশ এলডিসি-বহির্ভূত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যেটা আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের (নিম্ন) মধ্যম আয়ের গ্রুপে উন্নীত হয়েছে ২০১৫ সালে। যেখানে ‘মধ্যম-আয়’ উত্তরণ সংজ্ঞায়িত শুধু মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে, সেখানে এলডিসি উত্তরণ সংজ্ঞায়িত হয় তিনটি সূচকের ভিত্তিতে- মাথাপিছু জাতীয় আয় (বর্তমানে ১ হাজার ৩০৬ ডলার বা তার ওপরে), মানবসম্পদ সূচক (৬৬ বা তার ওপরে) এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতার সূচক (৩২ বা তার নিচে)।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ‘মধ্যম-আয় ফাঁদ’-এর আলোচনায় এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, বাংলাদেশকে দ্বৈত-উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আগামীতে অগ্রসর হতে হবে- মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ (যা ইতোমধ্যে ২০১৫ সালে সংঘটিত হয়েছে) এবং এলডিসি উত্তরণ (যা আগামী বছর হতে যাচ্ছে)। এ দুই উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে এবং তা করতে সক্ষম না হলে বাংলাদেশ তার পরবর্তী পর্যায়ে, অর্থাৎ উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে দ্রুত উন্নীত হতে সমর্থ হবে না। ফলে নিম্নমধ্যম আয়ের ফাঁদে আটকে পড়ার আশঙ্কা থেকে যাবে। বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, প্রাতিষ্ঠানিক, শক্তিমত্তা ও সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতার ওপর নির্ভর করে পরবর্তী ধাপে অর্থাৎ উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ নিশ্চিত করতে হবে। কাজটি বেশ কঠিন। এ কারণেই প্রথমেই বলা হয়েছে যে অনেক দেশ এটা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এর ফলে তারা নিম্ন ও উচ্চমধ্যম আয়ের ফাঁদে বছরের পর বছর আটকে পড়ে আছে।

ফিলিপাইন নিম্নমধ্যম আয়ের ফাঁদে আটকে আছে ৩৮ বছর। দক্ষিণ এশিয়ার ভুটান (১৬ বছর), ভারত (১৫ বছর) ও পাকিস্তান (১৪ বছর)-এর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। উচ্চমধ্যম আয়ের ফাঁদে আটকে পড়া দেশের মধ্যে থাইল্যান্ড (১২ বছর), মালয়েশিয়া (৩০ বছর), ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার (৩৫ বছর) কথা উদাহরণ হিসেবে আনা যায়। যদিও এ দুই ফাঁদে আটকে থাকা দেশের তালিকা বেশ দীর্ঘ।

সংশ্লিষ্ট তথ্যউপাত্তের ভিত্তিতে উল্লিখিত দেশগুলোর ক্ষেত্রে মধ্যম আয়ের ফাঁদের কিছু সাধারণ অনুষ্ঠানের কথা বলা সম্ভব: অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনে দুর্বলতা, অনেক খাতে বিশিষ্টায়ন, কৃষি খাতকে শিল্প খাতের সঙ্গে অগ্র ও পশ্চাৎ সংযোগের মাধ্যমে সংযুক্ত করতে না পারা, অকাঠামোগত দুর্বলতা, প্রযুক্তি ও দক্ষতার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে স্লথ অগ্রগতি, দুর্বল অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, ঋণের ফাঁদে পড়া, শিক্ষা-সংস্কৃত-সামাজিক সুরক্ষা খাতে সর্বোপরি মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে সক্ষম না হওয়া, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী অবস্থান থেকে সংযুক্ত হতে না পারা। বাংলাদেশকে এসব দেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং দ্বৈত উত্তরণকে টেকসই করে উচ্চমধ্যম আয়ের ধাপে উন্নীত হওয়ার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশের দ্বৈত-উত্তরণ এমন সময়ে হতে যাচ্ছে যখন বৈশ্বিক পরিবেশ একেবারেই অনুকূল নয়। ট্রাম্পের তথাকথিত ‘পাল্টাপাল্টি শুল্ক’ আরোপ এক অনানুকূল বিশ্ব পরিস্থিতিরই ইঙ্গিতবাহক। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাধীন রুলস বেসড বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে; ভূ-অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে এ উত্তরণ সময় পার হতে হবে। আঞ্চলিক সহযোগিতার গভীরায়ণ করতে হবে, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক জোট গঠনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বর্তমানে জাপান ও সিঙ্গাপুরসহ বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে এ ধরনের জোট গঠনের আলোচনা চলমান। এগুলোর সম্পাদন

ও সমাপ্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশের নেগোসিয়েশন সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজন সামষ্টিক ও খাতভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করে, সুশাসনভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও মানবসম্পদ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সামনে এগিয়ে চলা। ঋণ ফাঁদ ও মধ্যম-আয় ফাঁদ পরিহার করে সাফল্যজনকভাবে দ্বৈত উত্তরণ করার সক্ষমতা বাংলাদেশের আছে।

খবরের কাগজ

১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

অধ্যায় ৮

এলডিসি উত্তরণ ও উন্নয়ন কৌশল



এলডিসিতে যাওয়াটা ঐচ্ছিক, বেরিয়ে আসাটা পূর্বনির্ধারিত

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

মোস্তাফিজুর রহমান বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো। প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সাত মাসে অর্থনীতির হালচাল, পাচার করা টাকা আনার উপায়, এলডিসি থেকে উত্তরণের বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ এবং ট্রান্সপের শুষ্কযুদ্ধের ফলাফল—এসব বিষয়ে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মনোজ দে

প্রথম আলো: অন্তর্বর্তী সরকারের সাত মাস পেরিয়েছে। ভেঙে পড়া অর্থনীতিটাকে কতটা লাইনে আনা সম্ভব হলো?

মোস্তাফিজুর রহমান: অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যখন ক্ষমতা নেয়, তখন আমাদের অর্থনীতি বড় ধরনের চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সেটা অনেক বছরের পুঞ্জীভূত একটা চাপ।

উচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল, বিনিয়োগে স্থবিরতা নেমে এসেছিল। বিনিময় হারে বড় ধরনের অবনমন হয়েছিল, যেটা আমদানি করা মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিয়েছিল। ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা নষ্ট করে দিয়েছিল। আমানতকারীরা টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছিলেন। ব্যাংক আমানতের একটা বড় অংশ দেশের বাইরে পাচার হয়ে গেছিল। এতে ব্যাংকাররা যে ঋণ দিচ্ছিলেন, তাতে সুদহার অনেক বেশি রাখতে হচ্ছিল। এর ফলে বিনিয়োগের ওপর একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ছিল। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছিল। অনেক বেশি ব্যয়ে অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছিল। সবটা মিলিয়ে অর্থনীতির ওপর বড় চাপ সৃষ্টি হয়েছিল।

অন্যদিকে এনবিআর রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে বড় কোনো পরিবর্তন আনতে পারিনি। আমাদের করব্যবস্থাকে অপ্রত্যক্ষ থেকে প্রত্যক্ষের দিকে নিয়ে যেতে পারিনি। আমাদের অপ্রত্যক্ষ কর এখনো দুই-তৃতীয়াংশ। যাঁরা ক্ষমতালী ছিলেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ করার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। সাধারণ মানুষের ওপর ট্যাক্স-ভ্যাট বাড়ানোর দিকেই সরকারের আগ্রহ ছিল।

এর ফলে আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় পুরোটাই করতে হয়েছে দেশি-বিদেশি উৎস থেকে নেওয়া ঋণের টাকা দিয়ে। এর সবটাই উত্তরাধিকার সূত্রে অন্তর্বর্তী সরকারকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

প্রথম আলো: অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর জনপ্রত্যাশার একটা বড় চাপও আছে...

মোস্তাফিজুর রহমান: সবাই মনে করেছেন, একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে। সবাই ভেবেছে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগে ভাটা, বৈষম্য—দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত এসব সমস্যা হয়তো অন্তর্বর্তী সরকার খুব দ্রুত সমাধান করে ফেলতে পারবে; কিন্তু এটা বাস্তবে সম্ভব নয়। সেটা সম্ভবও হয়নি। প্রত্যাশার চাপ ও পুঞ্জীভূত চাপ দুটো মিলিয়েই সরকারকে দায়িত্ব নিতে হয়েছে।

গত বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বড় ধরনের শ্রমিক অসন্তোষ হয়েছে। সাপ্লাই চেইনে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটিছে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কম হয়েছে। এর ফলে মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ পড়েছে, বিনিয়োগে স্তিমিত ভাব দেখা গেছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়নি। প্রথম প্রান্তিকে এই প্রবণতাটা দেখা গেছে; কিন্তু ইতিবাচক ব্যাপারটা হচ্ছে, সর্বসাম্প্রতিক মাসগুলোতে উত্তরণটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, সর্বনিম্ন জায়গায় নেমে যাওয়ার পর আমরা আবার ওপরের দিকে উঠতে শুরু করেছি। আমরা দেখছি, প্রবাসী আয় ভালো আসছে। এখানে নিঃসন্দেহে আমাদের প্রবাসী শ্রমিকদের বড় অবদান আছে। আবার বৈধ পথে টাকা পাঠালে যে দেশের কাজে লাগবে, ছড়ি-হাওয়া যে ভালো নয় এবং এর মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ, করখেলাপি, ঋণখেলাপি, রাজনীতিবিদদের একটা অংশ দেশ থেকে টাকা পাচার করে ফেলে—এখান থেকে প্রবাসীদের বের করে আনার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। অন্তর্বর্তী সরকার প্রবাসীদের মধ্যে নিজেদের একটা পরিষ্কার ভাবমূর্তি তৈরি করতে পেরেছে। এর ফলে আমরা দেখছি সর্বকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় আসছে।

আমাদের রপ্তানিকারকেরা এত চ্যালেঞ্জের মধ্যেও ১২ শতাংশের মতো রপ্তানি প্রবৃদ্ধি করেছেন। রপ্তানির মাধ্যমে আভার ইনভয়েসিং এবং আমদানির মাধ্যমে ওভার ইনভয়েসিংয়ের প্রবণতাটা স্তিমিত হয়েছে। এর ফলে বাইরের দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের জায়গাটা স্থিতিশীল হয়েছে। এটা একটা বড় ঘটনা। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকেও স্থিতিশীল করা গেছে। এতে বিনিময় হারটা স্থিতিশীল হয়েছে। এর ফলে আমদানি করা মূল্যস্ফীতির উচ্চ চাপটা সুস্থির অবস্থায় এসেছে।

এ ছাড়া আমদানির ওপর বড় ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাটি শিথিল করা গেছে। আমদানিও কিছুটা চাঙা হচ্ছে। শীতকালীন সবজির সরবরাহ ভালো; কিন্তু চালের দামটা উর্ধ্বমুখী। আমাদের সময়মতো চাল আমদানি করতে হবে, চালের পর্যাপ্ত মজুত করতে হবে। ওএমএস, ফ্যামিলি কার্ড বাড়তে হবে। মূল্যস্ফীতির চাপটা কিছুটা নিম্নমুখী হলেও মূল্যস্তরটা ওপরের দিকে আছে। এর ফলে ক্রয়ক্ষমতার যে অবনমন, সেটা অব্যাহত আছে। বিশেষ করে মজুরি হার বৃদ্ধির চেয়ে মূল্যস্ফীতি হারের বৃদ্ধির গড়টা বেশি।

সরকারের সামনে মূল চ্যালেঞ্জের জায়গাটা হলো বিনিয়োগটাকে আবার চাঙা করা। কিন্তু এখানে এখনো বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কেননা, ব্যাংকিং খাতে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির কারণে উদ্যোক্তাদের উচ্চ সুদে ঋণ নিতে হচ্ছে। আমাদের গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়তে হচ্ছে। সরকার হয়তো যুক্তি দিতে পারে, আগের সরকারের আমলের ভুল নীতির খেসারত তাদের দিতে হচ্ছে। কিন্তু দিন শেষে উদ্যোক্তা ও ভোক্তাকেই তো বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে।

প্রথম আলো: বিগত সরকারের আমলে বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। পাচার করা টাকা ফেরত আনা কি দ্রুত সম্ভব?

মোস্তাফিজুর রহমান: এখানে দুটি দিক আছে। একটি হলো সামনের দিনে যাতে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিয়ে আমরা টাকা পাচার বন্ধ করতে পারি। দ্বিতীয়টা হলো যে টাকা পাচার হয়ে গেছে, সেটা আমরা কীভাবে ফেরত আনতে পারি।

অর্থনীতি নিয়ে শ্বেতপত্র কমিটির প্রতিবেদনে আমরা হিসাব দিয়েছি, হাসিনা সরকারের শাসনামলে প্রায় ১৬ বিলিয়ন ডলার আমাদের দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে। এটা আমাদের জিডিপি প্রায় ৫ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে, খেলাপি ঋণের একটা বড় অংশ বাইরে চলে গেছে। দুর্নীতি যাঁরা করেছেন, তাঁদের টাকাটাও বাইরে চলে গেছে। আমরা দেখেছি, হুন্ডি-হাওলা এবং রেমিট্যান্সের বিপরীতে একটা দুশ্চক্র গড়ে উঠেছে, যারা দুবাই, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডায় আমাদের এখান থেকে টাকা পাচার করেছে। তারা সেখানে ব্যাংক হিসাবে টাকাটা রেখেছেন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কিনেছে।

আমাদের এখান থেকে প্রকৃত যে ব্যক্তি টাকাটা পাঠিয়েছেন, আর বিদেশে বসে প্রকৃত যে ব্যক্তি টাকাটা পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকগুলো স্তর তাঁরা তৈরি করেছেন। এমন করে ধুমজাল তাঁরা সৃষ্টি করেছেন যে পেপার ট্রেইলটা প্রতিষ্ঠা করা খুব মুশকিল। কিন্তু পাচার হওয়া টাকাটা আমাদের আনতেই হবে। সর্বসম্প্রতি অ্যাঙ্গোলা তাদের দেশে ৫ বিলিয়ন ডলার ফেরত এনেছে। ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া টাকাও ফেরত এনেছে। এমনকি আমাদের দেশ থেকে অন্য দেশ তাদের পাচার হওয়া টাকা ফেরত নিয়ে গেছে।

প্রথম আলো: আমরা কেন অন্য দেশ থেকে আমাদের টাকাটা ফেরত আনতে পারব না?

মোস্তাফিজুর রহমান: এর একটা প্রক্রিয়া আছে। বিশেষ আদালত করে টাকা পাচারের এসব অপরাধের দ্রুত বিচার করা প্রয়োজন। সেটা হলে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারব যে এসব টাকা আমাদের দেশ থেকে দুর্নীতি, ঋণখেলাপিসহ নানা অবৈধ উপায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশ থেকে অবৈধভাবে টাকা নিয়ে যাওয়ার একটা বড় অংশ হলো ট্রেড মিস-প্রাইসিং। আমদানিকারক সেজে পাচারকারী যে পণ্যের দাম ১৫ ডলার, সেটাকে দেখিয়েছি ৫০ ডলার। এলসি খুলে সরকারি দামে ডলার কিনে তারপর সেটা পাচার করা হয়েছে। দেশকে কতভাবে ক্ষতি করা যায়, তার সবটাই তারা করেছে। এই লোকগুলোই বহু বছর ধরে ডলারের দামের বিপরীতে টাকার মান অবনমন করতে দেয়নি। কারণ, তারা ৮৬ টাকায় ডলার কিনে সেটাকে পাচার করতে চেয়েছিল। ১২২ টাকায় ডলার কিনতে গেলে তাদের তো কিছুটা লোকসান হয়!

টাকা পাচারের আরেকটা কৌশল হিসেবে স্বর্ণকে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম আলোতে দেখলাম, সংযুক্ত আরব আমিরাতে থেকে ১০ বছরে স্বর্ণ এসেছে প্রায় ৩৬৬ কোটি ৬৪ লাখ ডলারের। টাকার অঙ্কে ৪০ হাজার কোটি টাকার। বাংলাদেশে আমদানি দেখানো হয়েছে মাত্র ৮২ লাখ ডলারের স্বর্ণ। এর মানে হচ্ছে, অর্থ পাচারের সঙ্গে স্বর্ণ চোরাচালানিদের একটি একটি দুষ্টচক্র সৃষ্টি হয়েছে।

দেশ থেকে পাচার করা টাকা ফেরত আনতে হবে তিনটি কারণে। এক. দেশ থেকে যারা অবৈধভাবে টাকাটা নিয়েছে, সেটা দেশের টাকা। দুই. যারা টাকাটা নিয়েছে, তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা, সামাজিকভাবে তাদের উন্মোচন করা। তিন. যারা এটা ভবিষ্যতে করতে চায়, তাদের হৃদয়ের ভেতরে একটু ভীতি ঢোকানো।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেছিলেন, তাঁদের এই আমলেই তাঁরা পাচার হওয়া টাকার বড় একটা অংশ দেশে ফেরত আনতে পারবেন। সেটা আনতে পারলে ভালো, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় সেটা দুরূহ হবে। তবে পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জন্য পাচারের অর্থ ফেরানোর একটা রোডম্যাপ রেখে যেতে হবে।

প্রথম আলো: পাচার করা টাকা ফেরত আনতে সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এগুলো কি যথেষ্ট?

মোস্তাফিজুর রহমান: পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটা বিশেষ ট্রাস্টফোর্স গঠন করেছে। আমরা দেখছি যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, দুর্নীতি দমন কমিশন এ ব্যাপারে উদ্যম নিয়ে কাজ করছে। বিভিন্ন দেশের কাছে তারা তথ্য

চেয়ে পাঠিয়েছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় চুক্তি এবং বহুপাক্ষীয় সংস্থার সঙ্গে চুক্তিও তারা করছে। বিশ্বব্যাংকের স্টার প্রোগ্রামের তারা সদস্য হয়েছে। এর সবই ভালো উদ্যোগ।

কিন্তু আমাদের ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন করে এমন বিশেষজ্ঞ কোম্পানির সহায়তা নিতে হবে। সে জন্য বাজেটে আমাদের বরাদ্দ রাখাও দরকার। কেননা পাচারের পেপার ট্রেইলটা প্রতিষ্ঠা করা সোজা বিষয় নয়। সে কারণেই এ কাজে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাদের সহায়তা আমাদের নিতে হবে।

প্রথম আলো: এলডিসির তালিকা থেকে উত্তরণের নির্দিষ্ট সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়া হবে কি হবে না, তা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে একটা দোদুল্যমান অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি। সরকারের এ অবস্থানকে কীভাবে দেখছেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমার কাছে মনে হয়, অন্তর্বর্তী সরকার দোদুল্যমান অবস্থান থেকে সরে এসেছে। ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তারা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছে। এটা ইতিবাচক।

কিন্তু আমাদের রপ্তানিকারকদের বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের দুশ্চিন্তা আছে, সেটা অস্বীকার করা যাবে না। আমাদের রপ্তানি আয়ের ৮৫ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক থেকে। আমাদের রপ্তানির ৭০ শতাংশ পণ্য বিভিন্ন ধরনের শুষ্কমুক্ত সুবিধাও পায়। এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে সাড়ে ১১ শতাংশ, কানাডার বাজারে ১৫ শতাংশ শুষ্ক দিয়ে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। ভারত ও চীনের বাজারে যেতে হলেও আমাদের একটা শুষ্ক দিতে হবে। সাধারণভাবেই সারা পৃথিবীতে তৈরি পোশাকের ওপর শুষ্কটা উচ্চস্তরে থাকে।

আমাদের ওষুধশিল্পের জন্য মেধাস্বত্বটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওষুধের ক্ষেত্রে এখনো লাইসেন্স পেটেন্ট আমাদের কিনতে হয় না। পেটেন্টের ওষুধগুলো আমরা নিজেরা উৎপাদন করতে পারি। এলডিসি থেকে বেরিয়ে গেলে এই সুবিধাগুলোও আমাদের থাকবে না। ফলে আমাদের পোশাকশিল্প, আমাদের ওষুধশিল্পের উদ্যোক্তারা বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে একটা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবেন। তাঁদের প্রতিযোগিতার পরিবেশে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে।

আবার এটাও সবার মনে রাখা দরকার যে এলডিসি থেকে উত্তরণের বিষয়টা আমাদের ওপর নির্ভর করে না। এটার একটা প্রক্রিয়া আছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারটা একটা দেশের জন্য ঐচ্ছিক। যেমন: জিম্বাবুয়ে এলডিসির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কিন্তু এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার বিষয়টা ঐচ্ছিক নয়। এটা অনেকটাই পূর্বনির্ধারিত। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক, জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা—তিন সূচকের তিনটিতেই আমরা প্রত্যাশিত ফল অর্জন করেছি।

৫০ বছর ধরে আমরা স্বল্পোন্নত দেশের সুবিধা নিয়ে আসছি। সব কটি স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে শুষ্কমুক্ত সুবিধা সবচেয়ে বেশি ভোগ আমরাই করতে পেরেছি। তার কারণ, অনেকগুলো স্বল্পোন্নত দেশের সরবরাহ সক্ষমতাই নেই।

বাস্তবতা হলো, একটা পর্যায়ে এলডিসি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে। ২০২৬ সালের ২৩ নভেম্বর এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নেপাল প্রস্তুত হচ্ছে। প্রতিবেশীদের মধ্যে ভুটান ২০২৩ সালে এলডিসি থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমরা বেরিয়ে না এলে যুদ্ধবিক্ষুব্ধ আফগানিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে থাকবে। এটা আমাদের জন্য খুব ইতিবাচক হবে না।

প্রথম আলো: এলডিসি থেকে বেরিয়ে এলে শুষ্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পাবে না বাংলাদেশ। তৈরি পোশাকশিল্প ও ওষুধশিল্পে একটা বড় ধাক্কা লাগবে। এর জন্য কতটা প্রস্তুতি আছে বাংলাদেশের।

মোস্তাফিজুর রহমান: তৈরি পোশাকশিল্প, ওষুধশিল্পসহ রপ্তানির অন্য খাতগুলোকে সহায়তা করতে হবে, যাতে তারা বাজার সুবিধানির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা থেকে দক্ষতা-উৎপাদনশীলতানির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় উত্তরণ করতে পারে। আমাদের অবশ্যই ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করতে হবে।

আমাদের রপ্তানিকারকের ব্যাংক থেকে ১৪-১৫ শতাংশ সুদে ঋণ নিতে হয়, কিছুদিন পরপর গ্যাসের দাম বাড়ে, বন্দরে দেরি হয়—এসব কারণে ব্যবসার খরচটা বাড়ে। অন্য দেশের বাজারে শূন্য শুল্কের যে সুবিধাটা তাঁরা পান, সেটা দিয়ে এই বাড়তি খরচের বোঝাটা তাঁরা পূরণ করতে পারেন। এখন দুই দিকটাই তাঁদের যদি হারাতে হয়, তাহলে তাঁরা তো বড় ধরনের সমস্যা পড়বেন।

এলডিসি থেকে বেরিয়ে এলে আমরা এখানে আর রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোতে নগদ প্রণোদনা দিতে পারব না। আমদানিতে স্থানীয় উৎপাদনের সঙ্গে বৈষম্য হয় এমন কোনো ট্যাক্স-ভ্যাট বসাতে পারব না।

এর জন্য আমাদের প্রস্তুতিটা নিতে হবে। আমরা যেসব জায়গায় নগদ প্রণোদনা দিচ্ছি, সেগুলো ধীরে ধীরে তুলে নিতে হবে। আমাদের দক্ষতা, আমাদের ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করতে হবে। রপ্তানি ব্যয়ের সাশ্রয় করার উপায় বের করতে হবে।

আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কানাডার বাজারে অতিরিক্ত তিন বছর শুষ্কমুক্ত সুবিধা পাব। চীনও আমাদের শুষ্কমুক্ত সুবিধা দিতে চেয়েছে। এ ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি। একটা ব্যাপার হলো, ভিয়েতনাম ৫২টি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করে ফেলেছে।

আমরা কিন্তু ভুটানের সঙ্গে পিটিএ (অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি) ছাড়া কারও সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে পারিনি। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যচুক্তি করেই আমাদের শুল্ক সুবিধা নিতে হবে।

একটা ইতিবাচক দিক হচ্ছে, জাপানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। অন্য দেশগুলোর সঙ্গেও আমাদের খুব জোরালোভাবে কাজটি করতে হবে।

প্রথম আলো: প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতিটা আসলে কোথায়? এই ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে করণীয় কী?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমাদের চীন, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনামের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। এখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে করণীয় আছে। প্রথমত, দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলো আমরা কীভাবে করতে পারি, তার একটা সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ থাকতে হবে। অনেকগুলো দেশের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলেও বাণিজ্য চুক্তি করিনি। অন্য দেশে বাজার সুবিধাটা আমরা চাইলেই তো হবে না, আমাদেরও সেটা দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, এলডিসি থেকে উত্তরণ হোক আর না হোক, বৈশ্বিক ব্যবসার পরিবেশ বদলাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রশ্ন তুলছে, পোশাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণ কতটা হচ্ছে, বা পানি কতটা ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এখানে আমাদের প্রস্তুতি অনেক কম। আমাদের পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি আনতে হবে। সেই প্রযুক্তিটা যাতে শূন্য শুল্কে আনা যায়, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, শ্রমমান কী হবে, সেটা নির্ধারণ করতে হবে। শ্রম আইন কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সভাগুলোতে বছরের পর বছর ধরে শ্রমমান, শ্রম আইনের প্রয়োগ না হওয়া নিয়ে তারা একই ধরনের উদ্বেগ জানিয়ে আসছে। এলডিসির দেশ হিসেবে তারা হয়তো অন্য দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কিন্তু উত্তরণ হলে তারা কিন্তু অন্যদিকে তাকিয়ে থাকবে না।

আমাদের নেগোসিয়েশন করার সক্ষমতা খুবই দুর্বল। এ জন্য আলাদা সেল গঠন করা দরকার। এখন বলা হয় যে আলোচনাগুলোতে একটি দেশ সেটাই পায়, যেটা সেই দেশটি নোগোসিয়েট করে, দেশটি যেটা প্রত্যাশা করে, সেটা পায় না।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাটা ঠিক করতে হবে। এখন যদি উচ্চ খেলাপি ঋণের কারণে ঋণের সুদহার অনেক উঁচু রাখতে হয়, তাহলে আমাদের উদ্যোক্তারা তো প্রতিযোগিতা করতে পারবেন না। আমাদের এখানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন হয়েছে ২০১৮ সালে। কিন্তু এই আইনের বাস্তবায়ন কোথায়? বিভা বলেছে তারা ৫টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল পুরোদমে চালু করবে। সেটা দ্রুত করতে হবে। আমাদের চামড়াশিল্প আমরা পরিবেশবান্ধবভাবে করতে পারিনি। সাভারে একটা কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) করতে ১৫ বছর লেগেছে। মুলগিঞ্জের গজারিয়ায় ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্টস পার্কে ২০ বছরেও আমরা একটা সিইটিপি করতে পারিনি। এই যে আমাদের অদক্ষতা, এর পরিবর্তন আনতে হবে।

উদ্যোক্তা পর্যায়ে করণীয় হচ্ছে, কমপ্লায়েন্সগুলো নিশ্চিত করা। শোভন কর্মপরিবেশ আছে কি না, শোভন মজুরি আছে কি না, উৎপাদনশীল প্রযুক্তি আসছে কি না—এগুলো নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিযোগিতার সক্ষমতা তাদের বাড়তে হবে। দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও প্রযুক্তির ত্রিমাত্রিক সংমিশ্রণ করে শূন্য শুল্ক সুবিধার যে বাড়তিটা তাঁরা পেতেন, সেটাকে কমপেনসেট করতে হবে।

প্রথম আলো: এলডিসি থেকে উত্তরণে আমাদের লাভ ও লোকসানের যদি হিসাব কষি, তাহলে কোন দিকে পাঁচটা ভরী রাখবেন। বাংলাদেশের লাভ কোথায়, আর লোকসান কোথায়?

মোস্তাফিজুর রহমান: এটাকে আমি লাভ-লোকসান বলব না। এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে আমাদের রপ্তানির ওপর বড় ধরনের চাপ পড়বে। উদ্যোক্তারা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন। ২০২০ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার একটা হিসাব আছে, যে ১২টি দেশ এলডিসি থেকে বেরিয়ে গেলে রপ্তানি বাণিজ্যে যতটা প্রভাব পড়বে, তার ৮৫ শতাংশের বেশি পড়বে বাংলাদেশের ওপর। ফলে চ্যালেঞ্জটা অনেক বেশি।

সবচেয়ে বড় লাভের জায়গাটা হলো, আমাদের দেশের ব্র্যান্ডিংটিকে বদলে ফেলার সুযোগ এসেছে। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর থেকে শুরু করে আমরা ৫০ বছর ধরে এলডিসিতে আছি। উত্তরণটা আমাদের সাফল্যের পরিচয়। বাংলাদেশ খুব কম দেশগুলোর একটি, যারা তিন সূচকেই ভালো ফল অর্জন করেছে।

শ্বেতপত্রে আমরা বলেছি, আমাদের যে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে ঘাটতি আছে, যেসব তথ্য ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, সেটা বিবেচনায় নিলেও তিন সূচকেই আমাদের অনেক উদ্বৃত্ত আছে। এই অর্জনটা শুধু সরকারগুলো করেছে, তা নয়। আমাদের সাধারণ জনগণ, উদ্যোক্তা, এনজিও, বেসরকারি খাত—সবারই বড় ধরনের অবদান এখানে আছে। ফলে এটা আমাদের সবার জন্য একটা স্বীকৃতি। ক্রেডিট রেটিং বা সভরেন বন্ডের ক্ষেত্রে এই অর্জন আমাদের জন্য ইতিবাচক হবে।

এফডিআই আকর্ষণের ক্ষেত্রেও আমরা সুবিধা পাব। আমরা যে উন্নয়নশীল দেশ, আমাদের অর্থনীতিটা গতিশীল, আমাদের একটা বড় অভ্যন্তরীণ চাহিদা আছে—এটা তো আমাদের বিনিয়োগকারী বলি আর বিদেশি বিনিয়োগকারী বলি, তাদের কাছে বিশাল একটা আকর্ষণ। আমাদের এখানে যদি ১০ শতাংশও মধ্যশ্রেণি হয়, সেটাও তো সিঙ্গাপুরের ৫ গুণের বড় বাজার।

প্রথম আলো: ট্রান্সপের বাণিজ্যযুদ্ধ ও শুষ্কনীতি বিধে একটা নতুন অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। অনেকে বৈশ্বিক মন্দার আশঙ্কাও করছেন। এ বাস্তবতা বাংলাদেশের সামনে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে?

মোস্তাফিজুর রহমান: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণকালীন সময়টা একটা বৈরী বৈশ্বিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। করোনা মহামারির কারণে যেসব স্বল্পোন্নত দেশ এলডিসি থেকে উত্তরণ করছিল, তারা সবাই উত্তরণের সময়টা দুই বছর পিছিয়ে দিয়েছিল। এরপর শুরু হলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধের প্রলম্বিত নেতিবাচক অভিঘাত। সর্বসম্প্রতি ট্রাম্পের শুষ্কনীতি। অনেকে বলছেন, চীনের ওপর বাড়তি শুষ্কের কারণে বাংলাদেশের সুবিধা হতে পারে। কিন্তু আমি সেটা মনে করি না। চীন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ম্যান মেড ফাইবারের পোশাক রপ্তানি করে। আর আমাদের তৈরি পোশাকশিল্প মূলত তুলান্তিত্তিক। ফলে চীন যে পণ্য রপ্তানি করে, সেই বাজারে আমরা প্রতিযোগিতাও করি না। এখানে লাভবান হতে পারে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ভারত।

ট্রাম্পের উচ্চ হারের শুষ্কনীতির কারণে জিনিসপত্রের দাম বাড়লে যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তারা তাদের চাহিদাটাই কমিয়ে দিতে পারে। ফলে একটা বৈশ্বিক মন্দাও আসতে পারে। এসব মিলিয়ে এলডিসি থেকে আমাদের উত্তরণটা হচ্ছে একটা বৈরী বৈশ্বিক পরিবেশে। এবং আমাদের মতো দেশগুলোতে আগের সরকারগুলো বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেনি। ২০১৮ সাল থেকে আমরা প্রস্তুতির সময় পেয়েছি। একটা রূপান্তরের একটা পথনকশা তৈরি করা হয়েছিল; কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত হয়নি।

সর্বসম্প্রতি আমরা দেখেছি, অ্যাপোলা ২০২১ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে। কারণ, তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় অ্যাপোলার অর্থনীতি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সলোমন আইল্যান্ডের উত্তরণের সময়সীমা পিছিয়ে ২০২৭ সালের মার্চ মাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মালদ্বীপের উত্তরণের সময়সীমা ছিল ২০০৫, সেটাকে পিছিয়ে করা হয়েছিল ২০১১-তে। সুতরাং উত্তরণের সময়সীমাকে যে বিলম্বিত করা যায় না, তা নয়। ২০২৬ সালে কোনো কারণে আমাদের অর্থনীতি যদি চাপে পড়ে, সূচক যদি নিম্নমুখী হয়, তাহলে তখনকার নির্বাচিত সরকার জাতিসংঘে আবেদন করতে পারে। চাইলে নেপাল ও লাওসের সঙ্গে সম্মিলিতভাবেও আবেদন করতে পারে। সেটা আরও জোরালো হবে।

এলডিসি থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলার সঙ্গে সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনারও উত্তরণ ঘটাতে হবে। আগামী নির্বাচিত সরকার যারাই আসুক না কেন, এ খাতে তাদের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকতে হবে। সব রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে সুস্পষ্ট রোডম্যাপ থাকতে হবে। তাহলে জনগণও সরকার ও রাজনৈতিক দলকে জবাবদিহির মধ্যে রাখতে পারবে।

প্রথম আলো

২৩ মার্চ ২০২৫

এলডিসি উত্তরণে চ্যালেঞ্জ ও প্রস্তুতি

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে। ৫০ বছর পর নভেম্বর ২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তীর্ণ হবে। যেহেতু ভুটান ২০২৩ সালে উত্তীর্ণ হয়েছে, এবং বাংলাদেশের সঙ্গে নেপালও একই সময়ে এই গ্রুপ থেকে উত্তীর্ণ হবে, দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র আফগানিস্তানই তখনো স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে থেকে যাবে। যেকোনো বিচারে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

এ মাইলফলক একদিকে যেমন বাংলাদেশ ও তার জনগণের ইতিবাচক আর্থ-সামাজিক অর্জনের পরিচয় বহন করে, অন্যদিকে এ উত্তরণের সঙ্গে অনেক চ্যালেঞ্জও বাংলাদেশকে মোকাবেলা করতে হবে।

স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিগত সময়ে এসব দেশের জন্য প্রযোজ্য অনেক সুবিধা ভোগ করেছে। যেমন—বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে শুষ্কমুক্ত, কোটামুক্ত বাজার সুবিধা (যা থেকে দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৭০ শতাংশ লাভবান হয়ে থাকে), বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মেধাস্বত্ব চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ছাড়, বাণিজ্য শক্তি বৃদ্ধিতে আর্থিক-কারিগরি সহায়তা, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন অ্যাগ্রিমেন্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ও পার্থক্যমূলক সুবিধাপ্রাপ্তি ইত্যাদি। বাংলাদেশের বিভিন্ন খাত, বিশেষ করে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতসহ বিভিন্ন রপ্তানি পণ্য ও দেশীয় ওষুধশিল্প এসব সুবিধা ব্যবহার করে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছে এবং দেশি ও বিদেশি বাজারে নিজ নিজ অবস্থান শক্তিশালী করেছে।

তৈরি পোশাক খাতে বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে শুষ্কমুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকারের বড় ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। শুধু উন্নত দেশ নয়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, জাপানের সঙ্গে ভারত, চীনসহ বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশও বাংলাদেশকে প্রায় সব

পণ্যের ক্ষেত্রে শুষ্কমুক্ত বাজার সুবিধা দিয়েছে। এসবই বাংলাদেশের রপ্তানি, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

উৎপাদন, বিনিয়োগ, প্রণোদনা, ভর্তুকি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে শৈথিল্য দেখানো হয়, যার সুযোগও বাংলাদেশ পেয়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর এসব দেশের জন্য প্রত্যক্ষভাবে প্রযোজ্য বিভিন্ন সুবিধা আর থাকবে না। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, কানাডা, চীনসহ বেশ কিছু দেশ শুষ্কমুক্ত প্রবেশাধিকার কিছু সময়ের জন্য (দু-তিন বছর) সম্প্রসারিত করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উত্তরণকে টেকসই করতে সহায়তা করার কথা বলেছে। এ সুবিধা যে সীমিত ও সাময়িক, তা বিবেচনায় রাখতে হবে। মেধাস্বত্ব আইনের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ২০১৬-এর পরে আর থাকবে না। পেটেন্ট/লাইসেন্স মানতে হবে, বিশেষত পেটেন্ট আওতাধীন ওষুধের ক্ষেত্রে।

বাজার প্রবেশাধিকার, বাণিজ্য সহজীকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য উৎপাদন সহায়তা এসবের ক্ষেত্রে উত্তরণ-পূর্ব দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। এ ধরনের একটি নিকট ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশকে যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হবে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ শ্রুত গ্র্যাজুয়েশন স্ট্র্যাটেজি (মসৃণ উত্তরণ কৌশল) প্রণয়ন করেছে। যার মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণকে টেকসই করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে; সময়াবদ্ধভাবে বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনও করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এ কৌশলের বাস্তবায়ন নিরীক্ষণের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উত্তরণ প্রস্তুতি কর্মকাণ্ডকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশকে বাজার সুবিধানির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা থেকে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতানির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতার রূপান্তর নিশ্চিত করতে হবে। উৎপাদন পর্যায়ে শ্রম অধিকার, জেডার অধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ এসব বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয়-বহুপক্ষীয় মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ও অগ্রণী হতে হবে। এ প্রচেষ্টা চলমান আছে, একে আরো বেগবান করতে হবে। মান নিয়ন্ত্রণ, মেধাস্বত্ব আইনের প্রয়োগ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। এসব ক্ষেত্রে যেসব উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে, তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করতে হবে। এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, অর্থায়ন ও জনবল দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। সব ক্ষেত্রেই সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

এর আগে যে আটটি দেশ স্বল্পোন্নত থেকে উত্তরণ করেছে তাদের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার, জনসংখ্যা, আমদানি রপ্তানিসহ বিভিন্ন সূচকে ব্যতিক্রমী ও বৃহৎ। বস্তুতপক্ষে

এই প্রথম একটি বৃহৎ স্বল্পোন্নত দেশ উত্তরণ করতে যাচ্ছে। যেকোনো বিচারে, বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বড় অর্জন ও গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ উত্তরণ অর্জিত সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে বিশ্ববাজারে ও বিশ্ব অর্থনীতিতে বৃহৎ পরিসরে অংশগ্রহণের একটি সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। ক্রেডিট রেটিং, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঋণ সুদহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত করার তাগিদ সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে এ উত্তরণের পর বাংলাদেশকে বহুবিধ নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বর্তমান পরিস্থিতিতে বহুপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। মার্কিন পাল্টাপাল্টি শুল্ক বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে বিপৎসংকুল করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ এমন একটা সময়ে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ করতে যাচ্ছে, যখন একটা প্রতিকূল বিশ্ব পরিস্থিতি ক্রমে দৃশ্যমান হচ্ছে।

এসব কিছু বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশকে তার পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও নতুন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখিত মসৃণ উত্তরণ কৌশলের বাস্তবায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। নিকট ভবিষ্যতের এ গুরুত্বপূর্ণ বাঁক অতিক্রম করার সামর্থ্য অর্জনের বিকল্প বাংলাদেশের সামনে নেই। তাই যথাযথ প্রস্তুতিরও বিকল্প নেই।

কালের কণ্ঠ

১৬ জুলাই ২০২৫

এলডিসি থেকে উত্তরণ স্বগিতাদেশ পেতে আমাদের হাতে আড়াইটি পথ খোলা আছে

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণকে বোঝা হিসেবে না দেখে বরং মাইলফলক হিসেবে দেখা উচিত। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, এটি অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা সংস্কারগুলো এগিয়ে নেয়ার একটি সুযোগ।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের হাতে কোন বিকল্প আছে কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, এর জন্য ‘আড়াইটি’ পথ খোলা আছে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি’র (ইউএন সিডিপি) একজন স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি লাও পিডিআর এর বিশেষ প্রতিনিধি (কান্ট্রি র‍্যাপোর্টিয়ার) হিসেবেও নিয়োজিত।

২০২৬ সালের নভেম্বরে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের প্রস্তুতি চলছে। এই উত্তরণের ফলে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে বলে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মাঝে শঙ্কা বিরাজমান। একদল ব্যবসায়ী প্রধান উপদেষ্টা এবং জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে চিঠি পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যেখানে তারা এলডিসি উত্তরণ আরও পাঁচ থেকে ছয় বছর পিছিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানাবেন।

বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই এলডিসি থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে তার সক্ষমতা ও প্রস্তুতি প্রমাণ করেছে। এলডিসি উত্তরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জাতিসংঘের শাখা সংস্থা কমিটি ফর

ডেভেলপমেন্ট পলিসি'র (ইউএন সিডিপি) ২০১৮ সাল থেকে পরিচালিত পরপর দু'টি ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় তিনটি নির্ধারিত সূচক সফলভাবে দু'বার পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে রয়েছে মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক। এর পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট বৈশ্বিক সংকটের ফলে বাংলাদেশ এলডিসি উত্তরণের জন্য ইতিমধ্যে দুই বছরের অতিরিক্ত সময় পেয়েছে, যা দেশের উত্তরণ প্রক্রিয়াকে আরও সুসংহত করেছে।

ব্যবসায়ী নেতাদের যুক্তি হলো, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা লাও পিডিআর এবং নেপালের তুলনায় ভিন্ন। যদিও এই তিনটি দেশই একই সঙ্গে ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের পথে রয়েছে।

প্রথাগত পথ

এলডিসি উত্তরণ পিছিয়ে দেয়ার জন্য বাংলাদেশের সামনে যে 'আড়াইটি' পথ খোলা আছে, তার মধ্যে প্রথমটি হলো- সরকার প্রধান সরাসরি জাতিসংঘের সিডিপি'র কাছে চিঠি লিখবেন। চিঠিতে ২০২৬ সালের পরও বাড়তি সময় চাওয়ার কারণ হিসেবে এমন কিছু পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করতে হবে যা 'অপ্রত্যাশিত' এবং 'নিয়ন্ত্রণের বাইরে'। চিঠি পাওয়ার পর সিডিপি একটি উপ-কমিটি গঠন করবে। এই কমিটি প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে এবং মূল কমিটির কাছে তাদের সুপারিশ পেশ করবে।

২০২৩ সালে এভাবেই সলোমন দ্বীপপুঞ্জ তিন বছরের জন্য উত্তরণ পিছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার জোরালো সমর্থনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ (ইউএনজিএ) তাদের এই আবেদন অনুমোদন করে। এর ফলে দেশটি এখন ২০২৭ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

দ্বিতীয় বিকল্পটি হলো সরাসরি জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে চিঠি দেয়া। এই চিঠি পাওয়ার পর অনুরোধটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাঠানো হবে।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এভাবেই অ্যাসেম্বলার এলডিসি উত্তরণ অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেয়। মূলত তেলের বাজারে ধস নামায় দেশটির অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক প্রয়োজনীয় সক্ষমতার নিচে নেমে যায়। অ্যাসেম্বলার উত্তরণ প্রক্রিয়া পুনরায় তখনই শুরু হবে, যখন দেশটি আবার সেই শর্তসমূহ পূরণ করতে পারবে।

ড. দেবপ্রিয় উল্লেখ করেন, সাধারণ পরিষদের এই প্রক্রিয়ায় সফল হতে হলে প্রভাবশালী দেশগুলোর সমর্থনের প্রয়োজন হয়। অ্যাসেম্বলার ক্ষেত্রে যেমন পর্তুগাল মূল ভূমিকা পালন করেছিল।

নতুন প্রবেশপথ

ড. দেবপ্রিয় ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ‘অর্ধেক বিকল্প’টি মূলত ‘এনহ্যান্সড মনিটরিং মেকলানিজম’ (ইএমএম)-এর মধ্যে নিহিত। এই ব্যবস্থাটি উত্তরণের পথে থাকা এবং সম্প্রতি উত্তরণ ঘটা দেশগুলোর পরিস্থিতির ওপর নজর রাখে। বর্তমানে ড. দেবপ্রিয় নিজেই সিডিপি-তে এই প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

২০২৫ সালের ২৫ আগস্ট, সিডিপি চেয়ারপারসন বাংলাদেশসহ উত্তরণ প্রক্রিয়ায় থাকা দেশগুলোকে চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে দেশগুলোর ‘স্মুদ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি’ বা সাবলীল উত্তরণ কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন চাওয়া হয়।

২০২৫ সালের ২৫ নভেম্বর সিডিপি এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটি আলোচনা সভা হতে পারে, যেখানে দেশের ইএমএম প্রতিবেদনটি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সেই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ কীভাবে নিজের পরিস্থিতি তুলে ধরবে, তার ওপরই নির্ভর করবে পরবর্তী সময়ে সময় বৃদ্ধির যেকোনো আবেদনের ভাগ্য। ইএমএম শুধুমাত্র প্রধান তিনটি শর্তই যাচাই করে না, বরং বিস্তৃত পরিসরে সাপ্লিমেন্টারি গ্র্যাজুয়েশন ইন্ডিকেটর (এসজিআই) বা সম্পূর্ণক উত্তরণ সূচকগুলোও মূল্যায়ন করে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সিডিপি তাদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এই প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করবে।

প্রচলিত ভুল ধারণা

উত্তরণ পিছিয়ে দেয়া নিয়ে বেশ কিছু প্রচলিত ভুল ধারণার আছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রায়ই বলা হয় যে মিয়ানমার নিজেই তাদের উত্তরণ পিছিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মিয়ানমার রাজি থাকলেও ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি দেশটিতে সামরিক অভ্যুত্থানের পর সৃষ্ট অনিশ্চয়তার কারণে সিডিপি তাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখে। পরবর্তীতে এই উত্তরণ প্রথমে ২০২৪ সাল এবং এরপর ২০২৭ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, অনেক দেশই দীর্ঘ সময় ধরে উত্তরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আটকে আছে। বিশেষ করে টুভালু এবং কিরিবাতির মতো ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো ২০০৯ সাল থেকে এই তালিকায় রয়েছে। পরবর্তীতে এর সঙ্গে কমোরোস এবং জিবুতি যুক্ত হয়েছে। এই দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ধাক্কার মুখে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে।

এদিকে রুয়ান্ডা, তানজানিয়া এবং উগান্ডা শীঘ্রই এই উত্তরণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ যদি এখন উত্তরণ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে দক্ষিণ এশিয়ায় আফগানিস্তান ছাড়া বাংলাদেশই হবে একমাত্র দেশ যারা এলডিসিভুক্ত থেকে যাবে।

ড. দেবপ্রিয় জোর দিয়ে বলেছেন, উত্তরণ পিছিয়ে দেয়ার যেকোনো সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সুচিন্তিত হতে হবে। এর পেছনে থাকতে হবে অকাট্য প্রায়োগিক প্রমাণ এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক সমর্থন।

তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, এই প্রক্রিয়ায় এগোতে হলে ২০২৫ সালের ১৩ মার্চ উপদেষ্টা পরিষদের নেয়া সেই সিদ্ধান্তটি বাতিল করতে হবে যেখানে ২০২৬ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের চূড়ান্ত উত্তরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল।

(দ্য ডেইলি স্টার- এর পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার নেন রেফায়েত উল্লাহ মীরথা)

ডেইলি স্টার

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ কি বিলম্বিত হবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি এলডিসি উত্তরণ পেছানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে আবেদনের সপক্ষে বাংলাদেশকে যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখ করতে হবে। উত্তরণের তিন মাপকাঠির নিরিখে বাংলাদেশের উত্তরণকে প্রশ্নবিদ্ধ করে যুক্তি দাঁড় করানো কঠিন হবে বলেই মনে হয়। বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ নিয়ে লিখেছেন মোস্তাফিজুর রহমান

২০২১ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি (লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি) থেকে উত্তরণ হওয়ার কথা। এ পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ বিলম্বিত করার বিষয়টি গণমাধ্যম ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহলের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে, গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে।

এলডিসি উত্তরণ বাংলাদেশকে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে এবং এগুলো মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশের কিছু বাড়তি সময় প্রয়োজন বলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে করছেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দিক থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিও এ পটভূমিতে সামনে চলে এসেছে।

স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে শুষ্কমুক্ত বাজার-সুবিধা, ওষুধশিল্প খাতে মেধাস্বত্ব আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছাড়, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ এবং বিভাজিত সুবিধা (যেমন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তির অধীন বাধ্যবাধকতার প্রলম্বিত বাস্তবায়ন, প্রণোদনা ও ভর্তুকি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি) এবং স্বল্পোন্নত দেশের বাণিজ্যসক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রদত্ত আর্থিক ও কারিগরি সহায়তাসহ বিবিধ সুবিধা ভোগ করে আসছে।

এলডিসি উত্তরণের ফলে এসব সুবিধা আর থাকবে না; তখন আন্তর্জাতিক বাজারে এসব সুবিধাভোগী খাতসমূহের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে, তা অমূলক নয়। এলডিসি উত্তরণের জন্য আরও কিছু বাড়তি সময় পেলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই, এটা বোধগম্য। কিন্তু এ প্রসঙ্গে চারটি প্রশ্ন গভীরতর পর্যালোচনার দাবি রাখে।

প্রথমত, এলডিসি উত্তরণ পেছানোর এ দাবি পূরণের সম্ভাবনা কতটা বাস্তবসম্মত?

দ্বিতীয়ত, উত্তরণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডের বর্তমান অবস্থা কী?

তৃতীয়ত, যদি কয়েক বছরের জন্য উত্তরণ পেছানো সম্ভবও হয় তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়টুকু কীভাবে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগানো যায়?

চতুর্থত, এলডিসি উত্তরণ পেছানো যদি সম্ভব হয়, তাহলে এই অজুহাতে প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডে অবহেলার আশঙ্কা আছে কি?

জাতিসংঘের সিডিপি ও ইকোসকের সুপারিশের পটভূমিতে ২৪ নভেম্বর ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটা কার্যকর হওয়ার কথা ২৪ নভেম্বর ২০২৬ সালে (কোভিডের কারণে সব এলডিসির উত্তরণ দুই বছর বিলম্বে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়)। বাংলাদেশের সঙ্গে কিছু দেশ একই সময়ে এলডিসি উত্তরণ করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

এলডিসি উত্তরণ পেছানোর যুক্তি ও যৌক্তিকতা

গত সরকারের আমলেই বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এলডিসি উত্তরণ কয়েক বছর পিছিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন। এলডিসি উত্তরণের সময় আরও কাছে আসার পটভূমিতে এ দাবি বর্তমানে আরও জোরালো হচ্ছে; যদিও কথাটি হওয়া উচিত: ‘সরকারের পক্ষ থেকে আবেদন করার দাবি’। কারণ, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের, বাংলাদেশ সরকারের নয়। সরকার কেবল আবেদন করতে পারে।

সাম্প্রতিককালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ‘উত্তরণ যথাসময়ে হবে’ পূর্বঘোষিত এ অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছে বলে মনে হয়। কিছুদিন আগে বাণিজ্যসচিব বলেছেন, যদি উত্তরণ তিন বছরের মতো পেছানো যায়, তা দেশের জন্য ইতিবাচক হবে। প্রধান উপদেষ্টার সাম্প্রতিক জাতিসংঘ সফরের সময় বাংলাদেশের এলডিসি প্রস্তুতির আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় উত্তরণ পেছানোর আবেদনের সম্ভাবনার বিষয়টি আবার উঠে এসেছে।

এলডিসি উত্তরণ পেছানোর উদাহরণ

এটা ঠিক, কিছু কিছু স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে এলডিসি উত্তরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও পরে বিভিন্ন কারণে উত্তরণ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মালদ্বীপের উত্তরণের কথা ছিল ২০০৫ সালে। কিন্তু অর্থনৈতিক ও জলবায়ু ঝুঁকিসম্পর্কিত বিবেচনার কারণে এবং মালদ্বীপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরণ পিছিয়ে তা কার্যকর হয় ২০১১ সালে।

জাতিসংঘের সিডিপি ২০১২ সালের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে টুভালু এবং ২০১৮ সালের মূল্যায়নে কিরিবাতির এলডিসি উত্তরণের সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু ইকোসক জলবায়ু ঝুঁকির কারণে ওই সুপারিশকে গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত মনে করেনি।

অ্যাসোলার উত্তরণ হওয়ার কথা ছিল ২০২১ সালে; কিন্তু সে সময় দেশটির আর্থসামাজিক বিভিন্ন সূচকের অবনমনের কারণে (মূলত বিশ্ববাজারে তেলের মূল্য পতনজনিত) দেশটির উত্তরণ অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জের উত্তরণ ২০২৪ সালে হওয়ার কথা ছিল। বিশেষ বিবেচনায় এখন তা ২০২৭ সালে পুনর্নির্ধারিত হয়েছে।

উত্তরণ পেছানোর আবেদন প্রস্তুতির সম্ভাব্য কৌশল

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি এলডিসি উত্তরণ পেছানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে আবেদনের সপক্ষে বাংলাদেশকে যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখ করতে হবে। উত্তরণের তিন মাপকাঠির নিরিখে বাংলাদেশের উত্তরণকে প্রশংসিত করে যুক্তি দাঁড় করানো কঠিন হবে বলেই মনে হয়।

তথ্য-উপাত্তের বিশ্বাসযোগ্যতা স্বেতপত্রে উত্থাপিত প্রশ্নের আলোকে ও পরামর্শের নিরিখে এসবের কোনো পর্যালোচনা, পুনর্মূল্যায়ন ও পরিবর্তন করা হয়নি; উত্তরণের সূচকসমূহও নতুনভাবে পরিমাপ করা হয়নি।

তবে একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে সিডিপি-ইকোসক উত্তরণের মাপকাঠিগুলো বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনীতির কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ, নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ, উত্তরণ মসৃণ ও টেকসই করা বাধাগ্রস্ত হবে কি না—এসব বিষয়ও জাতিসংঘের পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত বাস্তবায়নের আগে পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে থাকে।

যেসব স্বল্পোন্নত দেশের উত্তরণ নির্ধারিত (বা অনির্ধারিত) সময়ের জন্য পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এসব বিবেচনাই মূলত কাজ করেছে। বাংলাদেশকেও উত্তরণ মসৃণ ও টেকসই করার প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দিয়ে যুক্তি দাঁড় করাতে হবে।

এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে যখন কোনো স্বল্পোন্নত দেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত হয়, তার পরে সংশ্লিষ্ট স্বল্পোন্নত দেশকে এসটিএস (শুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি বা মসৃণ উত্তরণ কৌশল) প্রণয়ন করতে বলা হয়। এ কৌশল প্রণয়নে কাজে সিডিপি-ইকোসক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশও অনুরূপ এসটিএস প্রণয়ন করেছে, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। একই সঙ্গে সিডিপি ইএমএমের (এনহান্সড মনিটরিং মেকানিজম) মাধ্যমে এসটিএস বাস্তবায়নের অগ্রগতি উত্তরণের আগে ও উত্তরণের পরে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে।

অক্টোবরের মধ্যে বাংলাদেশকে এসটিএস বাস্তবায়নের প্রতিবেদন সিডিপির কাছে পাঠানোর কথা। নভেম্বরে মাসের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশের জন্য এই পর্যালোচনার অংশ হিসেবে একটি টিমের বাংলাদেশে আসার কথা রয়েছে। সরকার ও সিডিপির মধ্যে অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে একটি ভার্যুয়াল আলোচনাও হওয়ার কথা আছে। সিডিপির ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্লেনারি অধিবেশনে এসব প্রতিবেদনের পর্যালোচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এর আগে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জাতিসংঘের হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাঙ্কাসেডর রবাব ফাতিমার আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় একটি পর্যালোচনার কথা উঠে এসেছে। যে পর্যালোচনার প্রতিবেদন আগামী বছরের মধ্য-জানুয়ারির মধ্যে প্রস্তুত করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এসব বিভিন্ন পর্যালোচনামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয় কীভাবে করা হবে এবং তার পটভূমিতে সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়াই-বা কী হবে, তা জানা ও স্পষ্ট করা অত্যন্ত জরুরি।

আবেদনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে বাংলাদেশকে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে এবং এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করতে হবে। উত্তরণ বিলম্বের আবেদনের সপক্ষে শক্ত যুক্তি দাঁড় করাতে হবে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক অতীতে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, তার অভিঘাত অর্থনীতিতেও পড়েছে। গণতান্ত্রিক উত্তরণ নিশ্চিত করাই এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ। অর্থ পাচার, ব্যাংক খাতের বিশাল খেলাপি ঋণের বোঝাসহ নানা সমস্যা বাংলাদেশকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সংস্কার কর্মসূচির পেছনে অনেক সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। এসব কারণে উত্তরণ টেকসই করার জন্য বাড়তি সময় প্রয়োজন। যুক্তি হিসেবে এসব কারণ উত্থাপন করা যায়।

এটা মনে রাখতে হবে যে ২০১২ সালে উত্তরণের দুটি সূচকে পরিবর্তন আনার ফলেই (মানবসম্পদ ও ভঙ্গুরতার সূচক) একই সঙ্গে এতগুলো স্বল্পোন্নত দেশ একই সময় উত্তরণের জন্য বিবেচিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, জাতিসংঘের (১৯৯১ সালে গৃহীত) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশের জনসংখ্যা ৭৫ মিলিয়নের বেশি হতে পারবে না। ফলে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ তাই একরৈখিকও বটে; পরে (যেকোনো কারণে) আবার এ গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ অন্তত বাংলাদেশের সামনে নেই।

অন্য কোনো দেশ যদি উত্তরণ পেছানোর আবেদন না করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে বাংলাদেশের একার এবং একক আবেদন দুর্বল হবে—এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সে দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের এ বিষয়ে যোগাযোগ ও আলোচনা শুরুর সময় এখনই।

সব কটি দেশ সম্মিলিতভাবে উত্তরণ পেছানোর প্রস্তাব করলে সে আবেদন অবশ্যই অনেক শক্তিশালী হবে। তাহলে দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ আফগানিস্তানের সঙ্গে এক কাতারে বাংলাদেশকে (আবেদন অনুমোদন হওয়া সাপেক্ষে) স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে থাকতে হবে না।

বাংলাদেশ উত্তরণ পেছানোর আবেদনের সিদ্ধান্ত নিলে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সমর্থন পেতে হবে। যেসব উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, তাদের সমর্থন নিশ্চিত করতে হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশের জেনেভা মিশন, জাতিসংঘ মিশনসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে।

উত্তরণ বিলম্বিত যদি হয়ও, তা হবে সীমিত সময়ের জন্য, বড়জোর আরও তিন বছর যোগ হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যুক্তিসংগতভাবে উত্তরণের জন্য প্রস্তুতিকে প্রাধান্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রস্তুতির নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এসটিএসের বাস্তবায়নকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য। প্রস্তুতি কার্যক্রমে কোনোভাবেই শৈথিল্য দেখানো যাবে না।

বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ও নেতিবাচক হবে যদি টেকসই উত্তরণের লক্ষ্যে আশুकरणीयসমূহ বাস্তবায়নে দুর্বলতা থেকে যায়; আর অন্যদিকে উত্তরণ পেছানোর আবেদনেও ইতিবাচক সাড়া ও সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায়।

সুতরাং এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতি এবং টেকসই উত্তরণের লক্ষ্যে এসটিএসের বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দিয়েই সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এর পাশাপাশি এলডিসি উত্তরণ পেছানোর জন্য সরকারের দিক থেকে আনুষ্ঠানিক আবেদনের সিদ্ধান্তের সাপেক্ষে তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তিনির্ভর প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজও সমান্তরালভাবে চালিয়ে যেতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের সামনে সময় নিত্যই কম।

প্রথম আলো
২২ অক্টোবর ২০২৫

মধ্যম আয়ের ফাঁদ: বাংলাদেশ কিভাবে এড়াবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

বৈশ্বিক উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, অনেক উন্নয়নশীল দেশ তাদের উন্নয়ন পথযাত্রায় একটা পর্যায়ে পৌঁছানোর পরবর্তীতে আর উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। যেমন, নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ করল, কিন্তু সেখান থেকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে পারছে না, বা উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ করতে সক্ষম হলেও উচ্চ আয়ের দেশে যেতে পারছে না। এটাকেই বলে মধ্য আয়ের ফাঁদ-প্রথমটিকে বলা হয় নিম্ন-মধ্যম আয়ের ফাঁদ, আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় উচ্চ-মধ্যম আয়ের ফাঁদ।

বিভিন্ন 'আয়'-এর সীমারেখা সম্পর্কে বলা দরকার। মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত এ সীমারেখাগুলো বিশ্ব ব্যাংক বিভিন্ন বিবেচনার প্রেক্ষাপটে নির্ধারণ করে থাকে, যা বৈশ্বিক অগ্রগতির নিরিখে প্রতি বছর পর্যালোচনা সাপেক্ষে পুনর্নির্ধারণ করা হয়। যেমন ২০২৫-২৬ সালের জন্য এগুলো ছিল নিম্নরূপ- নিম্ন আয়: ১ হাজার ১৩৫ ডলার বা তার নিচে, নিম্ন মধ্যম আয়: ১১৩৬-৪৪৯৫ ডলার, উচ্চ-মধ্যম আয়: ৪ হাজার ৪৯৬ থেকে ১৩ হাজার ৯৩৫ ডলার এবং উচ্চ-আয়: ১৩ হাজার ৯৩৬ বা তার ওপরে। অ্যাটলাস মেথড অনুযায়ী মার্কিন ডলারে প্রতি বছর জুলাই মাসে বিশ্বব্যাপক এ হিসাব দিয়ে থাকে।

প্রশ্ন হলো, কেন অধিক সংখ্যক দেশ উন্নয়নের পথ-পরিক্রমায় একটা ধাপে থমকে যায় এবং প্রবৃদ্ধির গতিধারা অব্যাহত রেখে পরবর্তী ধাপে উত্তরণ করতে সক্ষম হয় না। বাংলাদেশের জন্য এ প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কারণে। বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নির্ধারিত মাপকাঠিতে জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ করে, তখন এ ধাপের জন্য মাথাপিছু আয়ের সীমা ছিল ১ হাজার ৪৬ থেকে ৪ হাজার ১২৫ ডলার। সে বছর বিশ্বব্যাপকের অ্যাটলাস মেথড অনুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ১ হাজার ২৮০ ডলার। ২০২৪ সালে এটি এসে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮২০ ডলার।

বাংলাদেশ এলডিসি উত্তরকে মসৃণ ও টেকসই করার জন্য যে শ্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি (এসটিএস) প্রণয়ন করেছে তাতে এসব ক্ষেত্রে ১৫৭টি লক্ষ্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। কার কী দায়িত্ব এবং কখন তা ডেলিভারি হবে তাও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। সিলেট উইনডো স্থাপন, লজিস্টিক পলিসির বাস্তবায়ন, এপিআই শার্ক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কালবিলম্ব না করে উদ্যোগ-উদ্যম গ্রহণ করতে হবে।...

বাংলাদেশ ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। অনেকে বলে থাকেন বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি থেকে উত্তরণ করে মধ্যম আয়ের দেশেও গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ধারণাটি ভুল। মধ্যম আয়ের দেশের বিশ্বব্যাংকের দ্বারা নির্ধারিত; অন্যদিকে এলডিসি গ্রুপ জাতিসংঘের দ্বারা সংজ্ঞায়িত। এলডিসি থেকে উত্তরণের পরবর্তীতে বাংলাদেশ এলডিসি-বহির্ভূত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যেটা আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের (নিম্ন) মধ্যম আয়ের গ্রুপে উন্নীত হয়েছে ২০১৫ সালে। যেখানে ‘মধ্যম-আয়’ উত্তরণ সংজ্ঞায়িত শুধু মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে, সেখানে এলডিসি উত্তরণ সংজ্ঞায়িত হয় তিনটি সূচকের ভিত্তিতে- মাথাপিছু জাতীয় আয় (বর্তমানে ১ হাজার ৩০৬ ডলার বা তার ওপরে), মানবসম্পদ সূচক (৬৬ বা তার ওপরে) এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতার সূচক (৩২ বা তার নিচে)। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ‘মধ্যম-আয় ফাঁদ’-এর আলোচনায় এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, বাংলাদেশকে দ্বৈত-উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আগামীতে অগ্রসর হতে হবে- মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ (যা ইতোমধ্যে ২০১৫ সালে সংঘটিত হয়েছে) এবং এলডিসি উত্তরণ (যা আগামী বছর হতে যাচ্ছে)। এ দুই উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে এবং তা করতে সক্ষম না হলে বাংলাদেশ তার পরবর্তী পর্যায়ে, অর্থাৎ উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে দ্রুত উন্নীত হতে সমর্থ হবে না। ফলে নিম্ন-মধ্যম আয়ের ফাঁদে আটকে পড়ার আশঙ্কা থেকে যাবে।

ফিলিপাইন নিম্ন-মধ্যম আয়ের ফাঁদে আটকে আছে ৩৮ বছর। দক্ষিণ এশিয়ার ভুটান (১৬ বছর), ভারত (১৫ বছর) ও পাকিস্তান (১৪ বছর)-এর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। উচ্চ-মধ্যম আয়ের ফাঁদে আটকে পড়া দেশের মধ্যে থাইল্যান্ড (১২ বছর), মালয়েশিয়া (৩০ বছর), ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার (৩৫ বছর) কথা উদাহরণ হিসেবে আনা যায়। যদিও এ দুই ফাঁদে আটকে থাকা দেশের তালিকা বেশ দীর্ঘ।

মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে একটি চ্যালেঞ্জ হলো স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা। যেমন ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার কারণে বাংলাদেশ আগের মতো (নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে) সহজ শর্তে ঋণ পাচ্ছে না। আগে বিশ্বব্যাংকের আইডিএ ঋণ ছিল বাংলাদেশের অন্যতম সূত্র, সেখানে সুদের হার শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ, গ্রেস পিরিয়ড (এখন কেবল সুদ পরিশোধ হয়) ছিল ১০-১৫ বছর ও রিপেমেন্ট পিরিয়ড (যখন সুদ ও আসল পরিশোধ করতে হয়) ছিল ৩০-৪০ বছর। এখন বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের

হিসাবে ব্ল্যান্ড দেশ (যা স্যাপ-দেশ) যখন সহজ ও অ-সহজ দুই ধরনের ঋণ পেতে পারে (এবং ক্রমান্বয়ে শেষেরটি বাড়ছে এবং বাংলাদেশে মূলত: বাজার-ভিত্তিক শর্তে বৈদেশিক ঋণ পাচ্ছে (এসব কঠিন শর্তের মধ্যে আছে ৩-৫% হারে ঋণের সুদ, গ্রেস পিরিয়ড ৫ থেকে ১০ বছর ও রিপেমেন্ট পিরিয়ড ১৫ থেকে ২০ বছর)। কয়েক বছর আগেও সেখানে প্রতি বছর বৈদেশিক ঋণ পরিষেবার পরিমাণ ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি, সেখানে সাম্প্রতিক সময়ে এ সংখ্যা ৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এলডিসি থেকে উত্তরণের ফলে যখন শুষ্কমুক্ত বাজার সুবিধা থাকবে না, তখন বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পকে বাড়তি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে বিশ্ব বাজারে। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানদণ্ডের মান্যতা নিশ্চিত করতে হবে- নগদসহায়তা ও ভুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শৃঙ্খলার আরোপ, শ্রম, পরিবেশ, জেডার, কার্বন নিঃসরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে আরোপিত বিভিন্ন মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বিধান করতে হবে। বাণিজ্যনীতি ও শিল্পনীতির মধ্যে সমন্বয় বিধান করতে হবে। বাংলাদেশ এলডিসি উত্তরকে মসৃণ ও টেকসই করার জন্য যে স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি (এসটিএস) প্রণয়ন করেছে তাতে এসব ক্ষেত্রে ১৫৭টি লক্ষ্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। কার কী দায়িত্ব তা উল্লিখিত আছে এবং কখন তা ডেলিভারি দেওয়া হবে তাও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। সিঙ্গেল উইনডো স্থাপন, লজিস্টিক পলিসির বাস্তবায়ন, এপিআই শার্ক প্রতিষ্ঠা (বিশেষত, যেহেতু এলডিসি উত্তরণের ফলে ওষুধশিল্পের ওপরে বড় নেতিবাচক অভিঘাত পড়বে) ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কালবিলম্ব না করে উদ্যোগ-উদ্যম গ্রহণ করতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার এসটিএস বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এগুলোকে যৌক্তিক সমাপ্তিতে নিতে হবে।

বাংলাদেশের দ্বৈত-উত্তরণ এমন সময়ে হতে যাচ্ছে যখন বৈশ্বিক পরিবেশ একেবারেই অনুকূল নয়। ট্রাম্পের তথাকথিত ‘পাল্টাপাল্টি শুদ্ধ’ আরোপ এক অনানুকূল বিশ্ব পরিস্থিতিরই ইঙ্গিতবাহক। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাধীন রুলস বেসড বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে; ভূ-অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে এ উত্তরণ সময় পার হতে হবে।

ঋণ ফাঁদ ও মধ্যম-আয় ফাঁদ পরিহার করে সাফল্যজনকভাবে দ্বৈত উত্তরণ করার সক্ষমতা বাংলাদেশের আছে। প্রয়োজন সামষ্টিক ও খাতভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করে, সুশাসনভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও মানবসম্পদ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সামনে এগিয়ে চলা।

খবরের কাগজ

২৩ অক্টোবর ২০২৫

এলডিসি উত্তরণ প্রক্রিয়া নিয়ে কেন নতুন করে ভাবতে হবে

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) শ্রেণিবিভাগের বয়স পাঁচ দশকের বেশি হয়ে গেল। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ এই শ্রেণিবিভাগ তৈরি করে। টেকসই উন্নয়নের পথে যেসব দেশ বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন, তাদের জন্য এই এলডিসি। এলডিসি মর্যাদা পেলে দেশগুলোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধার দ্বার খুলে যায়। যেমন বাণিজ্যসুবিধা, স্বল্প সুদে অর্থায়ন, কারিগরি সহায়তাসহ নানা সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার।

বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের দুয়ার খোলার সঙ্গে প্রতিষ্ঠান সংহতকরণের সুযোগ সৃষ্টি করে এই এলডিসি মর্যাদা। সেই সঙ্গে ঝড়ঝাপটার মুখে সুরক্ষাও পায় দেশগুলো। জলবায়ুজনিত, ভৌগোলিক অবস্থান, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও নানা ভঙ্গুরতার কারণে যেসব দেশ অরক্ষিত, তাদের জন্য এসব সুবিধা প্রাণশক্তির মতো কাজ করেছে।

তবে চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে এই এলডিসির কাতার থেকে বেরিয়ে আসা বা যাকে বলে ‘উত্তরণ ঘটানো’। তার আবার উত্তরণকাল আছে, যে সময়ের মধ্যে দেশগুলো এ উত্তরণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। এ হচ্ছে কাঠামো।

চূড়ান্ত রকম কাঠামোগত দুর্বলতা আছে—এমন দেশগুলোর জন্য এ কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এটি কি এখন কাজ করেছে? চিত্রটা মিশ্র। দেখা যাচ্ছে, আজ এতকাল পর কিছু দেশ এলডিসি উত্তরণে সফল হয়েছে, কিন্তু অনেক দেশ এখনো সেই একই জায়গায় আটকা পড়ে আছে। এলডিসিভুক্ত দেশগুলোতে বিশ্বের ১২ শতাংশ মানুষের বসবাস। বিশ্বের মোট শরণার্থীর ২৭ শতাংশের বসবাস এই দেশগুলোতে। কিন্তু সমস্যা হলো বিশ্বের মোট জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ এবং বিশ্ববাণিজ্যের মাত্র ১ শতাংশ জোগান দেয় এই অঞ্চল।

এটি একধরনের ভারসাম্যহীনতা। এ বাস্তবতা থেকে বোঝা যায়, বিদ্যমান উত্তরণ মডেলের সীমাবদ্ধতা কোথায়। বিষয়টি হলো বিদ্যমান উত্তরণ মডেলে কাঠামোগত বাস্তবতা উপেক্ষা করা হয় এবং তাতে অনেক দেশ অনুন্নয়নের ফাঁদে পড়ে যায়। এলডিসি যদি নিজ উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হতে চায়, তাহলে এসব দুর্বলতার প্রতিফলন তার নীতিতে থাকতে হবে। ঘটনার গতিমুখ চিহ্নিত করে বর্তমান চ্যালেঞ্জের আলোকে সহায়তা দিতে হবে।

উত্তরণের অসম পথ

এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর উত্তরণের সময় হয়েছে কি না, তা নিরূপণে জাতিসংঘের কমিটি আছে। ইউএন কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) তিন বছর অন্তর এই তালিকা পুনর্মূল্যায়ন করে। সে ক্ষেত্রে তারা মূলত তিনটি মানদণ্ড ব্যবহার করে—

১. আয়: জাতীয় মাথাপিছু আয় দিয়ে এটি পরিমাপ করা হয়।
২. মানবসম্পদ: মানুষের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষাগত সূচকের ভিত্তিতে তা মূল্যায়ন করা হয়।
৩. অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা: এটি পরিমাপ করতে এনভায়রনমেন্টাল ভালনারেবিলিটি ইনডেক্স (ইভিআই) ব্যবহার করা হয়।

এখন কথা হচ্ছে, কীভাবে উত্তরণের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। যে দেশ পরপর দুটি মূল্যায়নে তিনটি মানদণ্ডের মধ্যে দুটিতে উত্তীর্ণ হয়, তারাই উত্তরণের যোগ্য বিবেচিত হয়। কিন্তু ২০২৫ সাল পর্যন্ত মাত্র আটটি দেশ এ যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে, বাকি ৪৪টি দেশ এখনো এলডিসির কাতারে রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ, লাওস, নেপাল, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, কম্বোডিয়া ও সেনেগাল—এই ছয়টি দেশের উত্তরণকাল নিশ্চিত হয়েছে। তারা এখন উত্তরণকালীন প্রস্তুতির মধ্যে আছে।

কমোরোস, মিয়ানমার, জিবুতি, কিরিবাতি ও টুভালু—এই পাঁচ দেশ উত্তরণের শর্ত পূরণ করলেও রাজনৈতিক ও কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের কারণে উত্তরণ পিছিয়ে দিয়েছে। কিরিবাতি ও টুভালুর মতো ছোট দ্বীপরাষ্ট্র প্রায় দুই দশক ধরে উত্তরণের পাইপলাইনে আছে। তাদের ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে, যেমন তারা দেশ হিসেবে দূরবর্তী ও আকারে ছোট; সেই সঙ্গে জলবায়ুজনিত ঝুঁকির মধ্যে আছে তারা।

মিয়ানমার সেই ২০১৮ সালে তিনটি মানদণ্ডে উতরে গেলেও দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে তারা আটকে গেছে। কমোরোস ও জিবুতি ২০২৪ সালে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করলেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও দুর্বল প্রতিষ্ঠানের কারণে তাদের উত্তরণকাল পিছিয়ে গেছে।

এখন নতুন করে পাইপলাইনে আছে রুয়ান্ডা, উগান্ডা ও তানজানিয়া। ২০২৪ সালে তারা প্রথম উত্তরণের মানদণ্ডে উতরে যায়।

বাস্তবতা হলো ৩০টি এলডিসিভুক্ত দেশ কখনোই উত্তরণের শর্ত পূরণ করতে পারেনি; তারা যেন এলডিসি খেতাব ধরে বসে আছে। এই ৩০ দেশের মধ্যে ২৬টি আফ্রিকার দেশ। অন্য চারটি দেশ হলো আফগানিস্তান, তিমুর লেসেথো, ইয়েমেন ও হাইতি। এই দেশগুলো অস্থিতিশীল ও বৈশ্বিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। এ খেতার ধরে বসে থাকা দেশগুলোর মধ্যে ৪০ শতাংশ ভূবেষ্টিত। স্বাভাবিকভাবেই তারা বৈশ্বিক বাজারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার মুখে আছে। তাদের মধ্যে ৬০ শতাংশ দেশ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জর্জরিত এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দুর্বল। ৯৩ শতাংশ দেশ পরিবেশগত মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ। বিশ্বের মোট শরণার্থীর ১৭ শতাংশের বসবাস এসব দেশে।

এমন নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা আর্থিকভাবে চাপের মুখে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই এসব রাষ্ট্র দুর্বল—এলডিসি উত্তরণের পথে এসব বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এলডিসি উত্তরণের পথে যাত্রা করা তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়।

এলডিসি কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা

এই যে দেশগুলোর এলডিসি উত্তরণে এত ধীরগতি, এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে দেশগুলোর চেষ্টায় ঘাটতি আছে। বরং বাস্তবতা হলো এর মধ্য দিয়ে এলডিসি মডেলের সীমাবদ্ধতা বোঝা যায়।

বিশেষ করে বলা দরকার, এলডিসি উত্তরণের মানদণ্ডে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকের মতো আপেক্ষিকভাবে স্বল্পমেয়াদি মানদণ্ডে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এলডিসিভুক্ত অনেক দেশ অবস্থানজনিত সমস্যা থেকে শুরু করে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জলবায়ু ও নিরাপত্তার ঝুঁকির মতো সমস্যা মোকাবিলা করে, কিন্তু এই বিষয়গুলো উপেক্ষা করা হয়।

পরিবেশগত মানদণ্ড সহায়ক হলেও তার মধ্যে এসব বিষয় পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় না। আন্তর্জাতিক সহায়তাও যথেষ্ট নয়। কেননা এসব সহযোগিতা মূলত বাণিজ্য অগ্রাধিকার ও স্বল্প সুদে ঋণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেসব কারণে এসব দেশের টেকসই অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়, আন্তর্জাতিক সহায়তা সেসব ক্ষেত্রে অপ্রতুল। বাস্তবতা হলো, যেসব বিষয় এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর পক্ষে পরিবর্তন করা সহজ নয়, সেসব মানদণ্ড পূরণ করতে না পারার জন্য এলডিসিভুক্ত দেশগুলোকে শাস্তি দেওয়ার অর্থ হলো, তাদের উন্নয়নের নিচের সারিতে ফেলে রাখা।

নতুন এলডিসি কাঠামো

এলডিসি উত্তরণের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ের প্রতিফলন থাকতে হবে। সেগুলো হলো একটি দেশের অভিঘাত সহ্য করা ও ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে অগ্রগতি ধরে রাখার সক্ষমতা কতটা। সেই সঙ্গে ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা কতটা, তা-ও দেখতে হবে।

এ বাস্তবতায় আরও সমতামুখী ও কার্যকর কাঠামো প্রণয়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে নীতিনির্ধারণকরা যেসব বিষয় আমলে নিতে পারেন, সেগুলো এ রকম—

১. একটি দেশ কতটা অরক্ষিত, তা পরিমাপের মানদণ্ড আধুনিকায়ন করা। বিস্তৃত ঝুঁকি ও স্থিতিস্থাপকতা সূচক থাকলে কাঠামোগত দুর্বলতা আরও ভালোভাবে শনাক্ত করা যায়। এ ধরনের সূচক থাকলে দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি ও অভিযোজন সক্ষমতা বাড়াতে আন্তর্জাতিক সহায়তা আরও লক্ষ্যভিত্তিক করা যায়। ইউএন সিডিপি ও আঙ্কটাড যেভাবে পরিবেশগত বিপন্নতার ঝুঁকি পরিমাপ করে, তা পুনর্বিবেচনা করা উচিত—সংঘাত, ভঙ্গুরতা, জলবায়ুঝুঁকি ও শরণার্থীদের বাস্তবতা যেন ঠিকমতো প্রতিফলিত হয়, তা নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য।

২. আরও সমন্বিত মনোভঙ্গি গ্রহণ করা। এলিডিসি এজেন্ডাকে অবশ্যই অর্থনৈতিক সূচক থেকে বেরিয়ে জলবায়ু, সুশাসন, শান্তি, নিরাপত্তা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে অগ্রগতির মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এগুলোকে অর্থনৈতিক সূচকের সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

এর মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক নৈপুণ্য, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির সম্পর্ক আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত হবে। সেই সঙ্গে ২০৩০ এজেন্ডা, অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার এজেন্ডার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহায়তার সংযোগ স্থাপন সম্ভব হবে।

৩. আন্তর্জাতিক সহায়তা কর্মসূচি আরও জোরদার করে ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা তৈরির সঙ্গে তার সংযোগ ঘটাতে হবে। বিষয়টি হলো, দুর্বল ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ অর্থনীতির সমস্যা আমলে নিতে হবে। আন্তর্জাতিক সহায়তা কেবল বাণিজ্যসুবিধা ও স্বল্প সুদের ঋণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। জলবায়ু তহবিল, ঋণছাড়, সুশাসনে সহায়তা ও শান্তিপ্রক্রিয়ার মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। অর্জন দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, আর্থিক খাতের নিয়মতান্ত্রিকতা ও বহুমুখীকরণ প্রয়োজন।

এই যে নতুন কাঠামোর কথা বলা হলো, তা যে সবার জন্য প্রযোজ্য হবে, এমনটা ভাবার অবকাশ নেই। এক জামা সবার গায়ে লাগবে না, এটাই স্বাভাবিক। অনেক এলডিসিভুক্ত দেশের অভিজ্ঞতা থেকে পরিস্কার যে ভূবেষ্টিত দেশ, ছোট দ্বীপরাষ্ট্র ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপন্ন দেশগুলোর উত্তরণ কৌশল এক হবে না। সবার বিষয় পৃথকভাবে ভাবতে হবে।

ইতিবাচক দিক হলো এ মনোভাবের প্রতি সমর্থন বাড়ছে, অর্থাৎ এ ধরনের চিন্তা করা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ইউএন সিডিপি ইতিমধ্যে উত্তরণের সম্পূরক সূচক বা এসজিআই প্রণয়ন করেছে। লক্ষ্য হলো কোনো দেশের অগ্রগতি মূল্যায়নে আরও নমনীয় থাকা। দোহা প্রোগ্রাম অব অ্যাকশনে (২০২২-৩১) এলিডিসিভুক্ত দেশগুলোর বৈচিত্র্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এ কর্মসূচিতে বলা হয়েছে, সবার জন্য যথাযথ কর্মসূচি দরকার।

এসব কিছুই স্বাগত জানানোর মতো বিষয়। কিন্তু যেসব দেশ পিছিয়ে আছে, তাদের জটিল বাস্তবতা আমলে নিতে আরও কাজ করতে হবে। এলিডিসির ধাঁচ নিয়ে নতুন করে চিন্তার সময় এসেছে। যে অগ্রগতি হয়েছে এবং যেসব সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর সঙ্গে আজকের কাঠামোগত, জলবায়ু সুশাসন আর শান্তি-নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের সামঞ্জস্য আনতে হবে।

প্রথম আলো

৪ ডিসেম্বর ২০২৫

ଅଧ୍ୟାୟ ୯

ଜ୍ଞାନାନି, ଅବକାଠାମୋ ଓ
ଧାତାଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି



জ্বালানি তেলের দাম লিটারে ১০ থেকে ১৫ টাকা কমানো সম্ভব

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, হেলেন মাশিয়াত ও ফয়সাল কাইয়ুম

জ্বালানি তেলের দাম স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নির্ধারণ করার নিয়ম চালু হওয়ার পর জনসাধারণের প্রত্যাশা ছিল আন্তর্জাতিক বাজারমূল্যের সঙ্গে সমন্বয় হলে জ্বালানির দাম অনেক কমে আসবে। দুর্ভাগ্যবশত সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করায় জ্বালানি তেলের দামে যথেষ্ট পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়নি। বরং এ সময়কালে জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে মুনাফা করতে দেখা গেছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এ পর্যন্ত মোট তিনবার জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সরকার আইনি পরিবর্তনের মাধ্যমে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণের দায়িত্ব বিইআরসির পরিবর্তে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে প্রদান করে। প্রথম দফায় গত বছরের ৩১ আগস্ট অকটেন ও পেট্রলের দাম লিটারে ছয় টাকা কমানোর ঘোষণা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দফায় গত ৩১ অক্টোবর ডিজেল ও কেরোসিনের দাম শূন্য দশমিক ৫ টাকা কমিয়ে আনা হয়, যদিও পেট্রল ও অকটেনের দাম অপরিবর্তিত থাকে।

সর্বশেষ ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিজেল ও কেরোসিনের দাম লিটারে ১ টাকা কমানো হয়েছে। সিপিডির (২০২৪) পরিচালিত গবেষণামতে, এ ধরনের মূল্য সমন্বয় বাজারভিত্তিক মূল্যকাঠামোর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। সিপিডির মতে, সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে জ্বালানি তেলের দাম লিটারে ১০ থেকে ১৫ টাকা কমানো সম্ভব।

গত বছরের মার্চ থেকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ জ্বালানি তেল, বিশেষত ডিজেল, পেট্রল, অকটেন, কেরোসিন ও জেট ফ্যুয়েলের স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণী ব্যবস্থা চালু করেছে। আইএমএফের ঋণের শর্ত অনুযায়ী জ্বালানি খাতে সরকারের আর্থিক দায় কমাতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সরকারের আর্থিক দায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের

(বিপিসি) এক দশক ধরে জ্বালানি তেলের দাম প্রশাসিত মূল্য (অ্যাডমিনিস্টার্ড প্রাইসিং) ব্যবস্থায় নির্ধারণকে দায়ী করা হয়।

প্রশাসিত নীতির অধীন জ্বালানির দাম নির্ধারণ করার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারের দামের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম নিম্নমুখী হলেও বাংলাদেশের বাজারে তা পরিলক্ষিত হতো না। দেখা গেছে, আন্তর্জাতিক বাজার থেকে অধিক দামে বিপিসি স্থানীয় বাজারে তেল বিক্রি করেছে ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে। প্রতি লিটারে সর্বনিম্ন ২৫ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৪৪ টাকা পর্যন্ত দামের তারতম্য লক্ষ করা গেছে।

আইএমএফের শর্তাবলির অধীন জ্বালানি খাতে ভতুکی সমন্বয়ের জন্য মূল্য নির্ধারণের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ইতিবাচক হলেও তা ক্রটিমুক্ত নয়। বিপিসি কর্তৃক ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণী পদ্ধতির পাশাপাশি বিইআরসি কর্তৃক জ্বালানির মূল্য নির্ধারণী পদ্ধতি আগে থেকেই বিদ্যমান। যদিও বিইআরসির পদ্ধতিটি এখনো চালু হয়নি। তবে ভবিষ্যতের নিরিখে বিইআরসি মূল্য নির্ধারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে বিইআরসি কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতির গুরুত্ব বাড়বে।

লক্ষণীয়, ২০১৫ সালের পর বিপিসিকে কোনো সরকারি ভতুکی বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন হয়নি। এমনকি কোভিড-পরবর্তী সময়কালে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে যখন বিপিসি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তখনো প্রতিষ্ঠানটিকে কোনো ভতুکی বা ঋণ দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। বিপিসি কয়েক বছর ধরে ক্রমবর্ধমানভাবে মূল্য সমন্বয় এবং লাভের মাধ্যমে তার ক্ষতি সামঞ্জস্য করে আসছে। এমনকি বিপিসি বেশ কয়েক বছর ধরে আমদানি খরচ ও জ্বালানির উৎপাদন খরচের তুলনায় উচ্চ মার্জিনে মূল্য নির্ধারণ করে লাভজনক অবস্থানে আছে। ভোক্তাদের ওপর বোঝা চাপিয়ে বিপিসির উর্ধ্বমুখী মূল্য সংশোধনের মাধ্যমে ভতুکی কমানোর যুক্তি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বিপিসি বর্তমানে যে পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আন্তর্জাতিক বাজারমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থানীয় বাজারমূল্য নির্ধারণ করে থাকে, সেই পদ্ধতির কিছু গঠনগত ত্রুটি রয়েছে। যেমন গত বছর মার্চ থেকে জুন মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম কিছুটা নিম্নগামী হলেও বাংলাদেশের বাজারে তা বেড়েছে। এর কারণ, দাম নির্ধারণের স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করার পদ্ধতিতে এক্সচেঞ্জ রেটের (ডলার-টাকা বিনিময় মূল্য) সমন্বয় করার কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে গত বছর মার্চ থেকে জুনে বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমলেও বাংলাদেশে ডলারের দাম বাড়ায় স্থানীয় বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি পায়।

বিপিসি ও বিইআরসি কর্তৃক প্রণীত পদ্ধতিগুলোর একটি বড় পার্থক্য দেখা যায় জ্বালানি খাতের বিভিন্ন সেবায় আরোপিত কর ও ভ্যাটের প্রয়োগ ও মাত্রার ক্ষেত্রে। বিপিসির পদ্ধতিতে যেখানে ৬ ধাপে কর ও ভ্যাট আরোপ করা হয়, সেখানে বিইআরসি প্রণীত পদ্ধতিতে মাত্র

২ ধাপে কর ও ভ্যাট আরোপের কথা বলা আছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একই নীতিমালার অধীন দুই ভিন্ন ধরনের কর-ভ্যাট ব্যবস্থা বিপিসির পদ্ধতিকে প্রশংসিত করে।

এ ছাড়া বিপিসির মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিতে বিপিসির নিজস্ব মার্জিন হিসেবে ৩ থেকে ৫ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়, যা বিইআরসি প্রণীত পদ্ধতিতে ধরা হয়নি। যদিও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিইআরসিকে, তবু মন্ত্রণালয় নিজেই এই দায়িত্ব পালন করে আসছে।

বিপিসি ও বিইআরসি প্রণীত পদ্ধতিতে প্রতি লিটারে ১০ থেকে ২০ টাকার মতো পার্থক্য থাকার কথা, কিন্তু বিইআরসি দায়িত্ব গ্রহণের পরও জ্বালানি তেলের দাম খুব বেশি কমেনি।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সিপিডি একটি বাজারভিত্তিক মূল্যব্যবস্থা নির্ধারণের পদ্ধতি নির্ণয়ের ওপর গবেষণা করে। সিপিডি প্রস্তাবিত মূল্য নির্ধারণী পদ্ধতিতে আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়েছে। সিপিডির প্রস্তাবে বাজারভিত্তিক মূল্যব্যবস্থার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের চাহিদা, ক্রয়ক্ষমতা এবং সরবরাহকারীদের খরচ, উৎপাদন খরচ, আমদানি খরচ, অর্থাৎ গ্রাহক ও সরবরাহকারী—একটি বাজারের দুই অংশগ্রহণকারীকেই বিবেচনায় নেওয়া হয়। কিন্তু বিপিসি ও বিইআরসি কর্তৃক ব্যবহৃত পদ্ধতিতে শুধু সরবরাহকারীদের দিকটিই বিবেচনায় নেওয়া হয়, যাতে জ্বালানি তেলের দাম শুধু সরবরাহকারীদের স্বার্থই পূরণ করে।

স্পষ্টত, সিপিডির প্রস্তাবিত মূল্য নির্ধারণী পদ্ধতিতে বিইআরসিকে বাজারের রেগুলেটর হিসেবে ধরা হয়েছে। সিপিডির প্রস্তাবিত মূল্যে এক্সচেঞ্জ রেটের ওঠানামার কারণে মূল্যের ওপর হওয়া প্রভাবকে প্রশমিত করার পদ্ধতিও বিবেচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ওই পদ্ধতিতে এমনভাবে মূল্য নির্ধারণ করা হয়, যেন গ্রাহকের আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর কোনো ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব না পড়ে বা নিতান্তই গুরুতর অবস্থায় স্বল্প পরিসরে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

২০২৪ সালের জুনের তথ্য অনুযায়ী, সিপিডির প্রস্তাবিত মূল্যে বিপিসির অনুসৃত পদ্ধতিতে কর-ভ্যাট, বিপিসির মার্জিন ও বাড়তি খরচ ইত্যাদি ধরার পরও প্রতি লিটারে অকটেন ও ডিজলে ৬ টাকা, পেট্রোলে ১০ টাকা কমানো সম্ভব ছিল। যদিও বিইআরসি প্রণীত জ্বালানি তেলের দাম বিপিসির তুলনায় কম, বিইআরসির পদ্ধতির তুলনায় সিপিডির প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে জ্বালানি তেলের দাম প্রতি লিটার পেট্রোলে আরও ১৫ টাকা কমানো সম্ভব। তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে অন্য জ্বালানি তেলের দামের হিসাব বিইআরসির সূত্র অনুযায়ী নির্ণয় করা যায়নি।

সুতরাং বিপিসি ও বিইআরসির গৃহীত জ্বালানি তেলের নতুন মূল্য নির্ধারণের সূত্রগুলো সংশোধন প্রয়োজন। ফলে জ্বালানি তেলের দাম আরও কমানো সম্ভব হবে। প্রচলিত উপায়ে ভোক্তার কাঁধে বাড়তি ব্যয়ের দায় চাপিয়ে স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণের নামে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তা অগ্রহণযোগ্য।

জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণী পদ্ধতি সংশোধিত হলে, মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় গণশুনানির ব্যবস্থা না হলে এবং তা বিইআরসি কর্তৃক বাস্তবায়ন হলে ন্যায্যমূল্যে জ্বালানি তেল ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে। জ্বালানি তেলের নিম্নমুখী মূল্যের সমন্বয় সামগ্রিক পণ্য উৎপাদন ব্যয়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, এমনকি বিদ্যুতের দাম কমাতেও ভূমিকা রাখবে।

প্রথম আলো

১১ জানুয়ারি ২০২৫

কাঁচা চামড়ার মান, মূল্য, রপ্তানি ও পরিসংখ্যানের গরমিল

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, তামিম আহমেদ ও আতিকুজ্জামান সাজিদ

প্রতিবছর কোরবানির ঈদ এলেই সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত বিষয় থাকে কোরবানির চামড়া। এর সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি হবে কি না, চামড়ার মান নষ্ট হওয়ার আগেই সংরক্ষণ হবে কি না, চামড়ার রপ্তানির সুযোগ থাকবে কি না ইত্যাদি। লক্ষ করা যায়, বেশ কিছু বছর ধরেই ঈদ মৌসুমে কাঁচা চামড়ার বাজারে ব্যাপক দরপতন হয়ে আসছে। এই প্রবণতা রোধে চলতি ২০২৫ সালে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরপরও এ বছর ঈদে চামড়ার দরপতন রোধ সম্ভব হয়নি।

বলা হয়ে থাকে, অতি অল্প সময়ে অধিক পরিমাণে চামড়ার সরবরাহ, আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স সনদের অভাব, মধ্যস্থত্বভোগীদের কারসাজির কারণেই মূলত এই দরপতন হয়ে থাকে। তবে এর বাইরের কোন কারণে, বিশেষ করে অব্যবস্থাপনা, অসচেতনতা, চামড়ার মান ইত্যাদি কারণেও চামড়ার দরপতন হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। যদিও ট্যানারিমালিকদের চামড়ার মান নিয়ে নিয়মিত অভিযোগ শোনা যায়।

এমন প্রেক্ষাপটে ঈদুল আজহার সময় কাঁচা চামড়ার দামের এই তীব্র পতনে চালিকা শক্তি হিসেবে চামড়ার মানের দায় কতটুকু এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় নিরূপণে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) একটি সাম্প্রতিক গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণাটিতে বাংলাদেশের গবাদিপশু ও কোরবানি-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, চামড়ার মান এবং মূল্য-সম্পর্কিত নানা অসংগতি উঠে আসে।

গবেষণাটি মূলত ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নাটোর ও ময়মনসিংহ জেলার ৭৬৮ জন চামড়াবিষয়ক অংশীজনের (কোরবানিদাতা, মাদ্রাসা প্রতিনিধি, মৌসুমি ব্যবসায়ী, ব্যাপারী, আড়তদার ও ট্যানারির কর্মী) ওপরে করা জরিপের ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়।

গবাদিপশু ও কোরবানির পরিসংখ্যানে তথ্য বিভ্রান্তি

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত এক দশকে দেশে গবাদিপশুর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে; যেমন গরুর সংখ্যা ২০১৩-১৪ সালে ছিল প্রায় ২৩৫ লাখ, যা ২০২৩-২৪ সালে দাঁড়ায় প্রায় ২৫০ লাখে। একই সময়ে মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ৫৩৬ লাখ থেকে বেড়ে প্রায় ৫৭৬ লাখে পৌঁছায়। তবে এই সংখ্যা বাস্তবের চেয়ে অনেক বেশি।

আবার এ ধরনের গরমিল কোরবানির সময় পশুসংক্রান্ত তথ্যেও পরিলক্ষিত হয়।

যেমন ২০২৫ সালে কোরবানি করা পশুর সংখ্যা সরকারি হিসাবে ৯১ লাখের বেশি দেখানো হলেও বিসিক চামড়া শিল্পনগরে প্রাপ্ত চামড়ার সংখ্যা ছিল ৫ লাখ ১৮ হাজার (১৬ জুন ২০২৫ পর্যন্ত) এবং এর বাইরে আড়তদারেরা প্রায় দুই লাখ চামড়া সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়া এ ধরনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সারা দেশে এ সময় প্রায় ৫৭ লাখ কাঁচা চামড়া সংগ্রহ হয়েছে, যা কি না উল্লেখিত কোরবানির সংখ্যার থেকে বেশ কম।

চামড়ার গুণগত মানের ক্রমাগত অবনতি

২০১৭ সালে প্রথম শনাক্ত হওয়ার পর বাংলাদেশে লাম্পি স্কিন ডিজিজের (এলএসডি) সংক্রমণ গরুর মধ্যে বাড়ছে, যা কাঁচা চামড়ার গুণগত মানের ওপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যদিও প্রতিরোধে ভ্যাকসিন ও নির্দেশনা রয়েছে, কিন্তু যথাযথভাবে প্রয়োগ না হওয়ায় ২০২৫ সালের ঈদে এই রোগে আক্রান্ত গরুর প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা গেছে। আবার সাম্প্রতিক সময়ে গরু পরিচর্যার ধরনেও পরিবর্তন এসেছে।

বিশেষত বদ্ধ খামারে গরু পালন এবং মোটাতাজাকরণ ওষুধের প্রয়োগ, গোখাদ্যের মানের অবনতি ইত্যাদি কারণে চামড়ার গুণগতমান ধারাবাহিকভাবে কমেছে।

এর বাইরে ঈদ মৌসুমে বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার কারণেও চামড়ার মানের অবনতি লক্ষ করা যায়। সিপিডির সর্বশেষ গবেষণামতে, এবারের ঈদে মাত্র ৪ দশমিক ৮ শতাংশ গরু পেশাদার কসাই দ্বারা জবাই হয়। বাকি ক্ষেত্রে মূলত অপ্রশিক্ষিত মসজিদ-মাদ্রাসাকর্মী বা কোরবানিদাতা নিজে জবাই সম্পন্ন এবং চামড়া ছাড়ানোর কাজ করেছেন। ফলে এ বছর অন্তত ২১ শতাংশ চামড়ায় ফ্লে কাট বা কাটাছেঁড়ার ক্ষত তৈরি হয়েছে, যা চামড়ার মান ও দাম উভয়কেই প্রভাবিত করেছে।

এ ছাড়া অনুপযুক্ত স্থানে গরু কোরবানির ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যা চামড়ার মানে প্রভাব ফেলেছে। সিপিডির তথ্যমতে, এবারের ঈদে প্রধানত ৫২ দশমিক ১ শতাংশ কোরবানি রাস্তায়, ২৬ দশমিক ১ শতাংশ খোলা মাঠে এবং ৮ দশমিক ৫ শতাংশ পরিত্যক্ত জায়গায়, ৪

দশমিক ৮ শতাংশ বাগান ও ১ দশমিক ৬ শতাংশ খালপাড়ে হয়েছে। ফলে পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বৃদ্ধির পাশাপাশি চামড়ারও ক্ষতি হয়েছে।

কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের চিত্রও আশানুরূপ নয়। ঈদের দিন বৃষ্টিতে ৪৬ শতাংশ কোরবানিদাতা চামড়া খোলা জায়গায় ফেলে রেখেছেন, যা চামড়ার ব্যাকটেরিয়াসহ অন্যান্য সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়েছে। অন্যদিকে এ বছর যদিও সরকার ২০ কোটি টাকার বিনা মূল্যে লবণ দেওয়ার ঘোষণা দেয়, বাস্তবে তা অনেকেই পাননি। অনেকে আবার লবণ চামড়ায় না দিয়ে বরঞ্চ লবণ আলাদাভাবে বিক্রি করেছেন। ফলে লবণ ছাড়াই চামড়া বিক্রির চর্চা বড় আকারে অব্যাহত ছিল। সিপিডির তথ্যমতে, ১০০ শতাংশ কোরবানিদাতা এবং ৮৩ শতাংশ মৌসুমি ব্যবসায়ী চামড়ায় লবণ প্রয়োগ না করেই তা বিক্রি করেন।

চামড়ার মূল্যে অসমতা

২০২৫ সালে গরুর লবণযুক্ত চামড়ার নির্ধারিত দাম ছিল ঢাকায় ৬০-৬৫ টাকা, ঢাকার বাইরে ৫৫-৬০ টাকা, কিন্তু বাস্তবে তার প্রয়োগ ঘটেনি। বেশির ভাগ চামড়া লবণ ছাড়া বিক্রি হওয়ায় লবণসহ নির্ধারিত দাম বিক্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। সিপিডির গবেষণা অনুযায়ী, জরিপে অংশগ্রহণকারী কোনো ট্যানারিই চামড়া সরকার নির্ধারিত দামে কেনেনি। ট্যানারিগুলো লবণ ছাড়া কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করেছেন ২৩-৪৮ টাকার প্রতি বর্গফুট মূল্যে। ঢাকার বাজারে এবারের ঈদ মৌসুমে মাদ্রাসাগুলো কোরবানিদাতাদের কাছ থেকে বিনা মূল্যে পেলেও মৌসুমী ব্যবসায়ীদের কিনে নিতে প্রতি বর্গফুট সর্বোচ্চ ১৭ টাকা খরচ করতে হয়েছে। সরেজমিন দেখা যায়, বেশ কিছু মাদ্রাসা ব্যবসায়ী মূলত মৌসুমি ব্যবসায়ীদের কাছে তাদের চামড়া স্বল্প মূল্যে বিক্রি করেছেন। আবার এই চামড়াগুলোই মৌসুমি ব্যবসায়ীরা ব্যাপারী বা আড়তদারদের কাছে গড়ে সর্বোচ্চ ৩৫ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেছেন।

তবে চামড়ার মানের সঙ্গে চামড়ার মূল্যবৃদ্ধি এবং হ্রাস বিশেষভাবে লক্ষ করা গেছে। ভালো মানের চামড়ার গড় দাম যেখানে ছিল ৩৯ টাকা প্রতি বর্গফুট, সেখানে নিচু মানের (কাটা বা দাগযুক্ত) চামড়ার দাম ছিল মাত্র ২৭ টাকা—প্রায় ৪৩ শতাংশ কম। এ ছাড়া জরিপে দেখা গেছে, ট্যানারিগুলোর এবারের ঈদে মোট সংগ্রহের প্রায় ১৮ শতাংশ চামড়া ছিল নিচু মানের।

চামড়াশিল্পে বৈচিত্র্যের অভাব

বাংলাদেশের চামড়াশিল্পের অন্যতম বড় দুর্বলতা হলো পণ্যের বৈচিত্র্যের অভাব। এই শিল্প এখনো প্রায় একমাত্র কাঁচা চামড়া বিক্রির ওপর নির্ভরশীল, যার ফলে প্রতিবছর কোরবানির মৌসুমে বিপুল পরিমাণ চামড়া সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় না। অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়া থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন পণ্যের রয়েছে বিপুল চাহিদা।

যেমন বন্ডেড লেদার দিয়ে তৈরি করা যায় ফার্নিচার, গাড়ির অভ্যন্তর, ব্যাগ, ঘড়ির বেল্ট ও বইয়ের বাঁধাই; জেলাটিন ব্যবহার হয় খাবার, কসমেটিকস, ওষুধ ও কনফেকশনারিতে; কোলাজেন ব্যবহৃত হয় চিকিৎসা ও স্কিন কেয়ারে; চামড়ার গুঁড়া দিয়ে বানানো যায় ইনসোল ও সস্তা চামড়াজাত পণ্য; চামড়ার বর্জ্য থেকে তৈরি সার ব্যবহৃত হয় জৈব কৃষিতে। এ অবস্থায় প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণা, প্রযুক্তি এবং বিনিয়োগ যাতে কাঁচা চামড়াকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে বহুমুখী পণ্য তৈরি সম্ভব হয় এবং চামড়াশিল্প আরও টেকসই ও লাভজনক হয়ে ওঠে।

কাঁচা চামড়ার রপ্তানির সীমিত সুযোগ

বিগত বছরগুলোতে কাঁচা চামড়া (প্রসেসড ছাড়া) রপ্তানির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকলেও এই বছর ঈদে শেষ মুহূর্তে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিল সরকার। শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত হওয়ায় তেমন কোনো প্রভাব দেখা না গেলেও এ ধরনের সিদ্ধান্ত কাঁচা চামড়ার চাহিদা বৃদ্ধি করে, মূল্যবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

কাঁচা চামড়া (প্রসেসড ছাড়া) রপ্তানি, অন্তত লবণসহ চামড়ার রপ্তানির সুযোগ দেওয়া হলে একদিকে যেমন চামড়ার মূল্য বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে বেশি দামের জন্য চামড়ার মান বজায় রাখতে সংশ্লিষ্টরা সচেতন হবেন। আবার এর ফলে কাঁচা চামড়াশিল্পে দেশি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়বে। তবে এটি নিশ্চিত করা জরুরি যে কাঁচা চামড়া (প্রক্রিয়াজাতবিহীন) রপ্তানির সুযোগ দেওয়া হলে তা যেন যথেষ্ট আগে ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে সব সম্ভাব্য কাঁচা চামড়া রপ্তানিকারক যেন এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হতে পারেন, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

চামড়াশিল্পের উন্নয়নে করণীয়

কোরবানির মৌসুমে কাঁচা চামড়া ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সংকট মোকাবিলা ও চামড়ার মূল্য নিশ্চিত করতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবভিত্তিক ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অতিসত্তর এলএসডি (Lumpy Skin Disease) সম্পর্কে খামারিদের, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। এ ছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে ভ্যাকসিনে তত্ত্বিকি অথবা বিনা মূল্যে ভ্যাকসিন সরবরাহ করতে হবে।

ঈদ মৌসুমে কোরবানি হওয়া পশুর সংখ্যা নিরূপণে স্থানীয় সরকারকে বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। একই সঙ্গে বিসিককে ব্যবহার করে ব্যাপারী ও ট্যানারি অঞ্চলে চামড়া প্রবেশের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন চালু করা যেতে পারে। এ ছাড়া গবাদিপশুর প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) অধীনে পাঁচ বছর পরপর স্বাধীনভাবে গবাদিপশুর সংখ্যা জন্য শুমারি (সেনসাস) পরিচালনা করা উচিত।

যেহেতু কোরবানির সময় মূলত কাঁচা চামড়াই বেচাকেনা হয়, সেহেতু চামড়ার মূল্য নির্ধারণে লবণযুক্ত এবং লবণ ছাড়া উভয় ধরনের দাম রাখতে হবে।

সরকার বা স্থানীয় এনজিওগুলো ভ্রাম্যমাণ লবণ বিতরণ কেন্দ্র চালু করতে হবে, যাতে কোরবানিদাতারা সহজে চামড়ায় লবণ দিতে পারেন। এখানে উল্লেখ্য, শুধু লবণ বিতরণ করলেই হবে না, বরং লবণ কতটুকু ব্যবহার করা হলো এবং হলো না, সেটারও হিসাব রাখা ও তদারকি করা উচিত। কেননা অতিরিক্ত লবণের জন্য চামড়ার যেমন ক্ষতি হতে পারে, আবার লবণ বেশি ছড়িয়ে পড়লে পরিবেশেরও ক্ষতি হতে পারে।

প্রশিক্ষিত কসাইয়ের সংখ্যা বাড়াতে প্রশিক্ষণের আওতা বাড়ানোর পাশাপাশি ঈদের সময় ভ্রাম্যমাণ বা অস্থায়ী কসাইখানা চালু করে বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জবাইয়ের সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে।

চামড়ার মান নিশ্চিত করতে প্রতিটি ইউনিয়নে নির্ধারিত চামড়া কালেকশন পয়েন্ট স্থাপন করা যেতে পারে, যেখানে প্রশিক্ষিত কর্মীরা চামড়া সংগ্রহ ও প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ করবেন। পাশাপাশি ভালো মানের কাঁচা চামড়া সরবরাহকারী খামারি, আড়তদার বা সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীকে আর্থিক প্রণোদনা (যেমন বিনা মূল্যে লবণ, পরিবহনসেবা ইত্যাদি) দেওয়া যেতে পারে, যা তাদের চামড়ায় মান ধরে রাখার প্রতি উৎসাহী করবে।

চামড়ার মান ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সরল ও সাশ্রয়ী ডিজিটাল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা উচিত, যেখানে প্রত্যেক কোরবানির পশুর চামড়ার সঙ্গে একটি ইউনিক আইডি বা স্টিকার দেওয়া হবে। এটি চামড়ার উৎস থেকে শুরু করে ট্যানারি পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের সুযোগ দেবে।

কাঁচা চামড়া খাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবহনব্যবস্থার আধুনিকায়ন জরুরি। আধুনিক হিমাগার, মানসম্পন্ন লবণ ও সংরক্ষণসামগ্রীর সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। বিনিয়োগকারীকে উৎসাহ দিতে করছাড়, সহজ ঋণসুবিধা এবং সরকারি সহায়তায় চামড়া সংগ্রহের অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

আধুনিক স্লটার হাউস তৈরি করা সম্ভব না হলে অন্তত মৌলিক সুবিধাসহ স্লটার হাউসের সংখ্যা বাড়াতে হবে। স্লটার হাউস ব্যবহারে নাগরিকদের আগ্রহী করতে সেখানে বিনা মূল্যে পরিবহনসেবা বা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

দীর্ঘ মেয়াদে এলএসডিসহ অন্য পশুরোগ মোকাবিলায় প্রতিরোধী গরুর জাত উদ্ভাবন এবং সাশ্রয়ী ও কার্যকর চিকিৎসা উন্নয়ন জরুরি। এ লক্ষ্যে বিএলআরআই ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণাকে উৎসাহিত করতে হবে, যেখানে বেসরকারি ওষুধ কোম্পানি

ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি কাঁচা চামড়ার একমুখী ব্যবহার থেকে বেরিয়ে এসে চামড়াভিত্তিক পণ্যের বুড়িকে বৈচিত্র্যময় করার উদ্যোগ নিতে হবে।

সর্বোপরি চামড়ার মান উন্নয়ন, আনুষ্ঠানিক সরবরাহ চেইন নিশ্চিতকরণ এবং ট্যানারিশিপকে প্রাণবন্ত করতে পারলে যেমন এই শিল্পের উন্নতি হবে, তেমনি চামড়ার মূল্য নিশ্চিত হবে।

প্রথম আলো

১৫ জুলাই ২০২৫

অধ্যায় ১০

বৈদেশিক সম্পর্ক ও ভূরাজনীতি



চীনের বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে হবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

চীন বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে বিশাল বাজার। দীর্ঘদিন থেকে বাজারটিতে আমাদের খুব একটা সাফল্য আসছে না। শুধু কম মূল্যের পোশাকনির্ভর রপ্তানি বাণিজ্য দিয়ে চীনে সাফল্য পাওয়া খুবই চ্যালেঞ্জিং। আমাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দিতে হবে।

চীন প্রায় শতভাগ শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে আমাদের। কিন্তু এই সুবিধা খুব একটা কাজে আসছে না। আমরা আমদানি করি ২২ বিলিয়ন ডলার আর রপ্তানি করি এক বিলিয়ন ডলারেরও কম। বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে সে জন্যই চীন থেকে বিনিয়োগ আনাটাই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন দেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক আরোপের ফলে বাংলাদেশের লাভবান হওয়ার সুযোগ কম। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন দেশের ওপর আমেরিকার শুল্ক আরোপের ফলে তাদের অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের দাম বাড়বে। সেটা চাহিদার দিক থেকেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অনেক মার্কিন অর্থনীতিবিদ চিন্তা করছেন, শুল্কযুদ্ধে মার্কিন প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

যদি দাম বেড়ে যায়, চাহিদা কমে যায়, তাহলে রপ্তানিকারক দেশগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য মূলত কটন বেইজড। আর চীনের বাজারে বেশির ভাগ পণ্য হলো নন কটন বেইজড বা ম্যান মেইড ফাইবার। যেসব দেশ ম্যান মেইড ফাইবারের পণ্য রপ্তানি করে তারা হয়তো লাভবান হবে। কিন্তু আমরা যেহেতু কটনবেইজড পণ্য রপ্তানি করি, তাই আমাদের রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ কম।

আমাদের চেষ্টা করতে হবে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করার। এ ছাড়া বাণিজ্য সহায়ক নীতিমালা তৈরি এবং ব্যবসার খরচ কমাতে হবে। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং দক্ষতানির্ভর প্রতিযোগিতার দিকে যেতে হবে।

চীনে প্রধান উপদেষ্টার সফরে বিনিয়োগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে। আমরা যেসব ঋণ চীনের কাছ থেকে নিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও যা নেব, তার সুদের হার কমানোর ব্যাপারে আলোচনা করা উচিত। উন্নয়ন প্রকল্পের ঋণের গ্রেস পিরিয়ড বাড়ানোর ব্যাপারেও জোর দেওয়া দরকার।

এলডিসি থেকে উত্তরণের পর তারা যাতে অন্তত তিন বছর সুবিধা অব্যাহত রাখে, সেটা দেখতে হবে। চীনের সঙ্গে একসময় আমাদের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যচুক্তির আলোচনা শুরু হয়েছিল। সেটাতে এখন যাওয়ার দরকার নেই, যদি তিন বছরের সুবিধাটি দেয়। নতুন নতুন অগ্রাধিকার উন্নয়ন প্রকল্পে চীনের অর্থ সহায়তা নিয়েও আলোচনা করা যেতে পারে।

চীনকে আমরা আনোয়ারাতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল দিচ্ছি। চীনের যেসব কারখানা বাণিজ্যযুদ্ধের ফলে স্থানান্তরিত হয়ে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ায় যাচ্ছে সেগুলো বাংলাদেশে আনার ব্যাপারে আলোচনা করা দরকার।

কালের কণ্ঠ

২৬ মার্চ ২০২৫

ভারতের উচিত আগে মুসলিমদের সঙ্গে আচরণের প্রভাব স্বীকার করা

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নিরুপমা সুব্রাহ্মণিয়ান: প্রফেসর ইউনুসের চীন সফর দিয়েই শুরু করি। তিনি চীনকে বাংলাদেশে আরও বেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন এবং তারা তিস্তা নদী রক্ষা প্রকল্প ও সমুদ্র সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। শেখ হাসিনা সরকারের আমলেও বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তখন এটি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয়নি। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় আপনি কি একমত যে, বাংলাদেশ ও চীনের এই বর্ধিত সহযোগিতা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ওপর আরও বেশি চাপ সৃষ্টি করতে পারে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি যেমনটি উল্লেখ করেছেন, চীন সব সময়ই বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন ও রাজনৈতিক সহযোগী। বিগত সরকারের আমলেও এমন চিত্রই দেখা গেছে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এরপর থেকে এই সম্পর্ক কেবল বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই সফরের প্রেক্ষাপটটি আপনার ভারতীয় দর্শকদের জন্য পরিষ্কার করে বলি, বাংলাদেশ সরকার শুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি যদি প্রধান উপদেষ্টার চিন্তা ভাবনা সঠিকভাবে বুঝে থাকি, তবে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গেই প্রথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠকটি করার বিষয়ে তার অগ্রাধিকার ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, সেটি বাস্তবায়িত হয়নি।

যখন এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে ভারতের সঙ্গে কোনো শীর্ষ বৈঠক হচ্ছে না, তখনই বাংলাদেশ সরকার চীন সফরের তারিখ চূড়ান্ত করে। এটি উল্টোভাবেও হতে পারত- আগে ভারত, পরে

চীন। সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখবেন, প্রফেসর ইউনুস ক্ষমতায় আসার পর দ্বিপক্ষি সর্বোচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ করেছিল এবং তিনি তার প্রতিউত্তরে ‘সাইদার্ন কনফারেন্সে’ ভারুয়ালি বক্তব্য দেয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। সেটি ছিল একটি পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ। পরবর্তীতে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আমি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। এরপর আপনাদের পররাষ্ট্র সচিব ঢাকা সফর করেন।

এই ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে আমরা অনেকেই যৌক্তিকভাবে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকের আশা করেছিলাম। কিন্তু এখন আমরা জানি, ভারত আমাদের অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছে না। তাই প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফরটি ভারতের সঙ্গে হচ্ছে না। এটি নিশ্চিত হওয়ার পরই সরকার চীনের দিকে অগ্রসর হয়।

চীনে আয়োজিত সংবর্ধনাটি ছিল অত্যন্ত চমৎকার। প্রধান উপদেষ্টা বোয়াও ফোরামে অংশ নেন, সরকারের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন, শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন এবং তাকে একটি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এছাড়া বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশের জন্য মুক্তবাজার সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আলোচনায় তিস্তা নদী এবং বৃহত্তর ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ সহযোগিতার বিষয়গুলোও স্থান পায়।

অন্যদিকে ভারত যখন বাংলাদেশি রোগীদের জন্য ভিসা দেয়া কমিয়ে দিয়েছে, তখন বাংলাদেশ চীনের কুনমিং এবং চট্টগ্রামের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালু করার কথা বিবেচনা করছে, যাতে চিকিৎসার জন্য চীনে যাওয়া আরও সহজ হয়।

নিরুপমা সুব্রাহ্মনিয়ান: আপনার ইঙ্গিত অনুযায়ী, বাংলাদেশে এখন এমন একটি ধারণা জন্মেছে যে সম্পর্ক উন্নয়নের দায়ভার এখন ভারতের ওপর। ভারতের এখন ঠিক কী করা উচিত?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: উত্তরটা খুব সহজ। ভারতকে কিছুটা ‘আত্ম-অনুসন্ধান’ করতে হবে। আসলে ভুলটা কোথায় হয়েছে?

ভারত সরকার ক্ষমতাচ্যুত সেই সরকারকে (শেখ হাসিনাকে) অসাধারণ এবং নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছে। বহু বাংলাদেশিই মনে করেন, তারা যেটিকে একটি স্বৈরাচারী ও লুটেরা শাসন ব্যবস্থা হিসেবে দেখেছিলেন, তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ভারত দায়ী। ভারত যদি এই সম্পর্কটিকে পুনরায় স্থিতিশীল করতে চায়, তবে প্রথমে তাদের অতীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাবতে হবে এবং কোনো ভুল হয়েছে কি না তা স্বীকার করতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি আরও জরুরি। যতক্ষণ পর্যন্ত পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সমীকরণে একটি বড় প্রভাবক হিসেবে থাকবেন, ততক্ষণ সম্পর্ক উন্নয়ন সহজ হবে না। একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে আশ্রয় দেওয়া এক কথা, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে নির্বাসনে থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। এটি একটি বৈরী আচরণ হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং, এই দুটিই হলো মূল বিষয়। প্রথমত, অতীত নিয়ে পর্যালোচনামূলক চিন্তা এবং দ্বিতীয়ত, এই সমীকরণ থেকে পলাতক প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে দেয়া।

নিরুপমা সুব্রাহ্মণিয়ান: আমি এই বিষয়টি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। আপনি বলেছেন যে ভারতের এখন আত্ম-পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আপনার কী মনে হয়, বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কোন দিকটি বুঝতে ভারত ব্যর্থ হয়েছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যারা বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছেন, তারা মূলত এটিকে কেবল 'নিরাপত্তা' ইস্যুতে দেখেছেন। এমনকি যখন তারা উন্নয়ন প্রকল্প বা কানেক্টিভিটির কথা ভেবেছেন, তখনো সেটিকে নিরাপত্তার কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

কোনো দেশের ভুখণ্ড যেন অন্য দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা হামলার কাজে ব্যবহৃত না হয়—এমন 'রেড লাইন' বা সীমারেখা টানাটা যৌক্তিক। তবে এই নিরাপত্তাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে গিয়ে ভারত এমন একটি সরকারকে বেধতা দিয়ে গেছে, যারা টানা তিনটি জালিয়াতিপূর্ণ নির্বাচন করেছিল। যখন অনেক আন্তর্জাতিক সহযোগী দেশ এমন একটি সরকারের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে সতর্ক ছিল, তখন ভারত তাদের নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে গেছে। এর ফলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মনে করেন যে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বাড়াবাড়ি বা ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ করে দেয়ার পেছনে ভারতের দায় আছে। ভারতের বড় ভুল ছিল তারা কেবল আওয়ামী লীগ এবং তার নেতৃত্বের ওপরই বিনিয়োগ করেছে। তারা সুশীল সমাজ, বেসরকারি খাত বা বিরোধী দলের মতো অন্য অংশীজনদের অবজ্ঞা করেছে। এখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় নেই বলে বাংলাদেশে ভারতের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমটিও হারিয়ে গেছে।

আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, চব্বিশের ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর সাবেক প্রধানমন্ত্রী দিল্লি অথবা ভারতের কোথাও আশ্রয় নেয়ার পরও ভারতের বয়ান বদলায়নি। সাউথ ব্লক বা অন্যান্য জায়গায় যারা নীতি নির্ধারক রয়েছেন, তারা সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবা বা পরিবর্তন করার বদলে এখনো সেই পুরনো দৃষ্টিভঙ্গিই আঁকড়ে ধরে আছেন।

ভারতীয় গণমাধ্যম যেভাবে ভুয়া খবর এবং অর্ধ-সত্য প্রচার করছে, সেখানেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। হ্যাঁ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অন্যদের ওপর কিছু হামলা হয়েছে, কিন্তু

যাদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে তাদের বেশিরভাগই রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তবে এই ঘটনাগুলোকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করায় পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটেনি।

এমনকি কয়েক সপ্তাহ আগে যখন প্রধান উপদেষ্টা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে (সেভেন সিস্টার্স) সমন্বিত করার কথা বললেন, তখনো ভারতের পক্ষ থেকে তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বর্তমান সরকার একটি বৈধ প্রশাসন হওয়া সত্ত্বেও এবং নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় পক্ষ এই সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে আগ্রহী নয়।

নিরুপমা সুরামানিয়ান: আপনি বলেছেন যে ভারত সরকার কীভাবে সব পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনাকে সমর্থন দিয়ে গেছে এবং এখনো দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর তো একটা ইতিহাস আছে, তাই না? বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভারতকে বেশ কিছু নিরাপত্তা উদ্বেগের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। আপনি যে ‘রেড লাইন’ বা সীমারেখার কথা বললেন অর্থাৎ একে অপরের ভূখণ্ড ব্যবহার করে হামলা না চালানো, সেটি তখন কঠোরভাবে মানা হয়নি। সুতরাং, ভারত যে শেখ হাসিনাকে হঠাৎ করে সমর্থন দিয়েছে তা কিন্তু নয়। বাংলাদেশে কি এই বিষয়টির কোনো স্বীকৃতি আছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশে এর আগে এরশাদ সরকার, খালেদা জিয়ার সরকার এবং শেখ হাসিনার সরকার ছিল। ভারতেও সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু অন্য একটি দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কখনোই ভারতে কেমন সরকার থাকা উচিত, তা নিয়ে প্রশ্ন বিস্তার করার চেষ্টা করি না। একইভাবে, ভারতেরও উচিত বাংলাদেশের মানুষ যে সরকারকেই বেছে নিক না কেন, তাদের গ্রহণ করা এবং তাদের সাথে কাজ করতে শেখা। জনসমর্থনহীন কোনো শাসনব্যবস্থাকে কৃত্রিমভাবে টিকিয়ে রাখা বা সমর্থন দেয়া ভারতের উচিত নয়। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি হিতে বিপরীত হতে পারে। আমাদের ইতিহাসে এর আগে কখনোই ভারত-বিরোধী মনোভাব এতটা তুঙ্গে ছিল না। এর একমাত্র কারণ মানুষ বিশ্বাস করে যে, শেখ হাসিনার শাসনকালকে দীর্ঘস্থায়ী করার পেছনে দিল্লির পরোক্ষ দায়বদ্ধতা আছে।

এখন, এই ধারণাটি হয়তো পুরোপুরি সঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু রাজনীতিতে মানুষের ধারণাই হলো বাস্তবতা। এমনকি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও সম্প্রতি সংসদীয় আলোচনায় স্বীকার করেছেন যে, তারা হাসিনা-বিরোধী ক্রমবর্ধমান জনরোষ সম্পর্কে জানতেন, কিন্তু তারা কার্যকর কিছু করতে পারেননি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও তারা বিষয়টিকে যৌক্তিক পরিণতি পর্যন্ত নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছেন।

নিরুপমা সুরামানিয়ান: আপনি ‘চাপিয়ে দেওয়া সরকার’ ইঙ্গিত করছিলেন। এটি দিয়ে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন? ভারত তো আর শেখ হাসিনাকে নির্বাচিত করেনি।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সমস্যাটা ঠিক সেখানেই। গত ১৫ বছর ধরে কেউই শেখ হাসিনাকে নির্বাচিত করেনি। অথচ আমাদের বড় প্রতিবেশী দেশটি এমন আচরণ করেছে যেন তিনি (হাসিনা) বিশ্বসেরা অবস্থানে আছেন। যখন অন্যান্য বৈশ্বিক শক্তি—যেমন ওইসিডি দেশগুলো, যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সতর্ক অবস্থানে ছিল, তখনো ভারত তাকে সমর্থন দিয়েছে, মহিমাষিত করেছে এবং বৈধতা দিয়ে গেছে।

নিরুপমা সুব্রাহ্মণিয়ান: বাংলাদেশ এখন ভারতের দুই বড় ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী—চীন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশ যেমন পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন ঘটাচ্ছে, তেমনি প্রফেসর ইউনুস মাদ্রাই বেইজিং সফর শেষ করলেন। এটি কি ইঙ্গিত দেয় না যে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য উভয় পক্ষেরই কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে? এই সংকট নিরসনে বাংলাদেশ কী করতে পারে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি বিষয়টি একটু পেছন থেকে শুরু করি। বাংলাদেশ যখন চীন থেকে দুটি সাবমেরিন (ডুবোজাহাজ) কিনেছিল, তখনও কিন্তু একই ধরনের নিরাপত্তা উদ্বেগ তোলা হয়েছিল, আর সেটি ছিল শেখ হাসিনার শাসনামলে। প্রতিটি দেশেরই স্বাভাবিকভাবে কিছু নিরাপত্তা উদ্বেগ থাকবে, তবে সেটি যেন প্রতিবেশীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলে না দেয়।

আসল সমস্যা হলো, যেকোনো দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক বা আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের একটি আলোচনার প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন। আমাদের এমন একটি জায়গা দরকার যেখানে উদ্বেগের কথাগুলো জানানো যাবে, একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি শুনবে এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়া হবে। কিন্তু আমাদের সরকার প্রধানের সঙ্গে বসতে বা আলোচনা করতে রাজি না হয়ে ভারত ঠিক সেই সুযোগটিই হারিয়েছে।

ভারত এর আগেও এই ধরনের ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে। নেপালের দিকেই তাকান। ভারত যখন নেপালের ওপর অবরোধ আরোপ করেছিল, তখন তারা নেপালিদের এক প্রজন্মের স্বদিক্ষা হারিয়ে ফেলেছিল। একই ধরনের চিত্র শ্রীলঙ্কাতেও দেখা গেছে। সুতরাং, আমাদের এটি স্বীকার করতেই হবে যে প্রতিবেশীদের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়শই হিতে বিপরীত হয়েছে।

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই বলছি, ভারতের মতো এত বড়, অভিজ্ঞ এবং সক্ষম একটি দেশকে পরামর্শ দেওয়ার মতো অবস্থানে আমি নেই। তবে আমি মনে করি, এটি কেবল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে নয়, বরং আমরা সমষ্টিগতভাবে কীভাবে উন্নতি করতে পারি তা নিয়ে ভাবার সময়। আমরা এখন ট্রাম্প-পরবর্তী এক বিশ্বে বাস করছি, যেখানে গাজা থেকে গ্রিনল্যান্ড কিংবা গাজা থেকে গ্রীস—সর্বত্রই বৈশ্বিক সম্পর্কগুলো এক অস্থির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থায় দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান ঠিক কোথায় হবে?

নিরুপমা সুব্রাহ্মনিয়ান: কিন্তু গত ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী মোদি ড. ইউনুসকে চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে, একে অপরের স্বার্থ ও উদ্বেগের প্রতি পারস্পরিক সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ঢাকা এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটি ছিল অত্যন্ত চমৎকারভাবে গুছিয়ে লেখা একটি বক্তব্য এবং এটি প্রশংসিত হয়েছে। তবে এটি ছিল জাতীয় দিবসের একটি বার্তা, যা একটি কূটনৈতিক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। দিনশেষে আসল পরীক্ষাটা কথার মাধ্যমে নয়, বরং কাজের মাধ্যমে হবে।

এখানে দু'টি বাস্তবতা বিদ্যমান। প্রথমত, অর্থনৈতিক বাস্তবতা- বাণিজ্য চলছে। ভারতীয় ঠিকাদাররা বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্পে কাজ করে যাচ্ছেন। লাইন অফ ক্রেডিট (এলওসি)-এর গতি ধীর হলেও তা বহাল রয়েছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা অব্যাহত আছে। এরপর রয়েছে দ্বিতীয় বাস্তবতা- যা কিছুটা অবাস্তব। আর তা হলো বাংলাদেশের জনগণের একটি বড় অংশের মধ্যে বিদ্যমান তীব্র ভারত-বিরোধী মনোভাব।

সুতরাং, আজকের বাংলাদেশে বাস্তবতা এবং অবাস্তবতা পাশাপাশি অবস্থান করছে। দেশ এখন এক ধরনের অনুঘটক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে- যেখানে গত ১৫-১৭ বছরের পুঞ্জীভূত নেতিবাচক আবেগ এবং এর আগের ঐতিহাসিক টানাপোড়েনগুলো একীভূত হয়ে একটি নতুন রূপ নিচ্ছে।

নিরুপমা সুব্রাহ্মনিয়ান: ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর সম্প্রতি সংসদে জানিয়েছেন, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর ২৪০০টি এবং ২০২৫ সালে ৭২টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। আপনি কি মনে করেন এই সংখ্যাগুলো অতিরঞ্জিত?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই ধরনের ঘটনা গণনার একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পতনের পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে ব্যাপকভাবে ভেঙে পড়েছিল, তা কেউ অস্বীকার করে না। পুলিশ বাহিনী তখন বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। কিছু সময়ের জন্য নিরাপত্তার দায়িত্ব সেনাবাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীর হাতে থাকলেও পরিস্থিতি ছিল অস্থির।

এছাড়া, বাংলাদেশের অনেক ধর্মীয় সংখ্যালঘু ঐতিহাসিকভাবেই ক্ষমতাসীন দল—অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সমর্থক। তাই অনেক ক্ষেত্রে এটি আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে যে, কোনো হিন্দু ব্যক্তির ওপর হামলা কি তার ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে হয়েছে, নাকি তিনি আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সমর্থক ছিলেন বলে হয়েছে। তবে এখানে আরেকটি দিক বিবেচ্য। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু, যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। একইভাবে, ভারতের ধর্মীয় সংখ্যালঘু, যেমন মুসলমানরা বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই ভারত যখন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর আচরণের বিষয়ে মন্তব্য করে, তখন তাদের এটিও স্বীকার

করতে হবে যে ভারতে সংখ্যালঘুদের প্রতি তাদের নিজেদের আচরণেরও একটি প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।

নিরুপমা সুব্রাহ্মণিয়ান: আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, বাংলাদেশের একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে আপনি নিজে কতটা নিরাপদ বোধ করেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি হয়তো সেটা উদাহরণ নই। আমি দুবার ভারতে শরণার্থী হিসেবে ছিলাম। প্রথমবার ১৯৬০-এর দশকের দাঙ্গার পর ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময়। কিন্তু আমার বাবা-মা কখনো বাংলাদেশ ছেড়ে যাননি। আমি দেশে ফিরে এসেছি, নিজের মাতৃভূমিতে মেধা বিনিয়োগ করেছি এবং এখানেই জীবন গড়েছি। আমি দেশের সেবা করার জন্য বড় বড় আন্তর্জাতিক পদের মায়া ত্যাগ করেছি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও বিচারিক ইতিহাসের সঙ্গে আমার পরিবারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আমার মা শেখ হাসিনার দলের সংসদ সদস্য ছিলেন এবং আমার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক নিযুক্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তবে এই ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো আমার পেশাগত ও তথ্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো প্রভাব ফেলে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি বাংলাদেশে থাকার ঝুঁকিটুকু মেনেই নিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, পরিচয়বাদী রাজনীতি সক্রিয় আছে এমন যেকোনো দেশের যেকোনো নাগরিকের জন্যই এ ধরনের ঝুঁকি থাকে। আমি এটাও বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের সমাজের একটি বিশাল অংশ এখনো ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার এবং সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের- হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং সমতলের আদিবাসী সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্তর্ভুক্তিমূলক এই অঙ্গীকারই হলো রাষ্ট্র গঠনের মূল কথা।

নিরুপমা সুব্রাহ্মণিয়ান: রাষ্ট্র গঠন এবং বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল শক্তির উপস্থিতির কথা যখন বলছেন, তখন আপনি সাম্প্রতিক ঘটনাবলিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? বিশেষ করে সংবিধান থেকে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটির পরিবর্তে ‘বহুত্ববাদ’ যুক্ত করার প্রস্তাব? এছাড়া, কেউ কেউ পাঠ্যপুস্তক থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভূমিকা কমিয়ে দেখাচ্ছেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রথমত, সংবিধানের বিষয়ে বলি- এটি একটি কমিশনের রিপোর্ট মাত্র, কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। এটি একটি চলমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ। যেহেতু বিষয়টি এখনো পর্যালোচনার পর্যায়ে আছে, তাই এই স্তরেই অতি-প্রতিক্রিয়া দেখানো হবে অপরিণত আচরণ।

দ্বিতীয়ত, যেকোনো গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকে। কেউ কেউ অজ্ঞতা, আদর্শিক কারণ বা রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চরমপন্থী অবস্থান প্রকাশ করেন। আমি যদি ভারতকে কেবল সেই কণ্ঠস্বরগুলোর মাধ্যমে বিচার করি যারা বাংলাদেশিদের ‘উইপোকা’

বলে সম্বোধন করে, তবে সেটি ভারত সরকার ও ভারতীয় সমাজের প্রতি অন্যায় করা হবে। একইভাবে বাংলাদেশেও কিছু মানুষ ইতিহাস নতুন করে লিখতে চাচ্ছেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিই জাতীয় নীতি হিসেবে নির্ধারিত হবে।

নিরুপমা সুরামানিয়ান: আমি শুরুতে আপনার উল্লেখ করা আরেকটি বড় বিষয়ে যেতে চাই। তা হলো- দিল্লিতে শেখ হাসিনার অবস্থান। ভারত তাকে ফেরত পাঠাবে, এই দাবি কি বাংলাদেশ কখনো কাটিয়ে উঠতে পারবে? এটি কি গুরুতর দাবি?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মনে করি প্রত্যর্পণের এই দাবিটি অত্যন্ত গুরুতর, কারণ বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়া এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। মামলার ডিসিয়ার তৈরি হচ্ছে। অ্যাটর্নি জেনারেল এবং প্রসিকিউটর অফিস এ নিয়ে কাজ করেছে। এমনকি বাংলাদেশ বিষয়টি হেগের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) নিয়ে যাওয়ার কথাও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। বিভিন্ন পথ যাচাই করা হচ্ছে এবং তার উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতেই আইনি প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে।

তবে ভারতে শেখ হাসিনার অবস্থান নিয়ে আরেকটি প্রশ্ন আছে। মানবিক কারণে কাউকে আশ্রয় দেওয়া এক বিষয়, আর আশ্রয়দাতা দেশের আতিথেয়তা গ্রহণ করে সেই ব্যক্তির রাজনীতিতে লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কল্পনা করুন, দালাই লামা যদি প্রতিদিন চীনে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে ভাষণ দিতেন, তবে বেইজিংয়ের প্রতিক্রিয়া কেমন হতো?

ঠিক এটাই এখন ঘটছে। আমরা বারবার সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছি যে, তাকে আশ্রয় দেয়া ভারতের সিদ্ধান্ত হতে পারে, কিন্তু তাকে ‘মেগাফোন’ কূটনীতি করতে দেয়া- অর্থাৎ জনসমক্ষে বিবৃতি দেয়া, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে দেয়া উচিত নয়। যখন এমনটি ঘটে, তখন এর পরিণতির জন্য আশ্রয়দাতা দেশকেও কিছু দায়ভার নিতে হয়।

নিরুপমা সুরামানিয়ান: আওয়ামী লীগের প্রসঙ্গে আসি। তাদের কি নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হবে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সরকার পরিষ্কার করে দিয়েছে যে দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হবে না। যদিও এটি নিষিদ্ধ করার জোরালো দাবি রয়েছে এবং প্রধান উপদেষ্টা সেটি স্বীকারও করেছেন। অবস্থান হলো- যারা অপরাধের জন্য দায়ী তারা আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হবে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দলটিকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না।

এই মুহূর্তে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি অবাধ, সৃষ্ঠ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করা। আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ বা অনুপস্থিতি এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নয়।

প্রকৃতপক্ষে, তারা নিজেরাও প্রস্তুত নয় এবং তাদের নেতৃত্ব হয়তো তাদের এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে দেবেও না। নির্বাচন হবেই, প্রধান উপদেষ্টা তা স্পষ্ট করেছেন। এ বছরের শেষে বা বড়জোর আগামী বছরের জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন হবে এবং বিচার প্রক্রিয়াও সমান্তরালভাবে চলবে।

আসল প্রশ্ন হলো, ভারত কি সমাধানের অংশ হবে নাকি সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে? ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি যদি কেবল তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমীকরণ দিয়ে পরিচালিত হয়, তবে সেটি হবে একটি বিপজ্জনক পথ।

নিরুপমা সুব্রাহ্মনিয়ান: আপনার কথায় তো একটি হতাশাজনক চিত্র ফুটে উঠছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: একদমই না। আমরা এই সময়টিকে একটি ইতিবাচক উন্নয়ন হিসেবে দেখছি। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি সরকারের পরিবর্তন বাংলাদেশের মানুষের জন্য এক বিশাল অর্জন।

নিরুপমা সুব্রাহ্মনিয়ান: কিন্তু আপনি যখন বলছেন দেশ অবমুক্তির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার মতো ঘটনা তো একটি উদ্বেগজনক সংকেত দেয়।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ, সেই বাড়িটি পোড়ানো সম্পূর্ণ ভুল ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের এটিও প্রশ্ন করতে হবে- মানুষকে কোন বিষয়টি এমন চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করল? এমন চরম প্রতিক্রিয়া শূন্য থেকে সৃষ্টি হয় না, এগুলো দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে জন্ম নেয়। এই কাজগুলো সমর্থনযোগ্য নয়, তবে এগুলো বুঝতে হবে।

নিরুপমা সুব্রাহ্মনিয়ান: এটি তো একটি বিপজ্জনক যুক্তি, ভারতে দাঙ্গা হলে আমরা এমন কথা শুনি। লোকে বলে, ‘এটি কেবলই আবেগ’।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রতিটি দেশেরই এমন মুহূর্ত আসে। এটি কেবল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনন্য নয়। আমি কাউকে দোষারোপ করতে চাই না, তবে ভারতেও আমরা এমন পরিস্থিতি দেখেছি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কেবল পরিণতির দিকে নজর না দিয়ে কারণগুলোকে বুঝে সহমর্মিতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা।

আপনার মাধ্যমে আপনাদের পাঠকদের কাছে আমার আবেদন হলো- ভারত ও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের এই রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের ইতিহাস, ভূগোল এবং এমনকি মনস্তত্ত্বও অভিন্ন। প্রশ্ন হচ্ছে- আমরা কি আমাদের সেই অভিন্ন ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগটি হারাচ্ছি?

নিরুপমা সুব্রাহ্মণিয়ান: এই সংকটের অন্যতম বড় ক্ষতি হলো সাধারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়া। আগে দুই দেশের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা বিনিময়, সাহিত্য অনুষ্ঠান, চিকিৎসা পর্যটন কার্যক্রম চলমান ছিল, যা এখন বন্ধ।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ, এগুলো দুর্ভাগ্যজনক ক্ষতি। এগুলো সংশোধন করা প্রয়োজন। ভারতের ইতিহাস, শিক্ষা এবং কূটনৈতিক প্রজ্ঞা বলছে তাদের অতীতে আটকে থাকা উচিত নয়। কিন্তু গত ছয়-সাত মাস ধরে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারিত হচ্ছে শেখ হাসিনার সঙ্গে তাদের পুরনো সম্পর্কের ভিত্তিতে। যারা শেখ হাসিনার দৃষিকোণ থেকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন, তারাই আজও নীতি নির্ধারণ করছেন এবং তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাননি। এটি দুর্ভাগ্যজনক।

নিরুপমা সুব্রাহ্মণিয়ান: কিন্তু বাণিজ্য তো এখনো চলছে, তাই না?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় বাণিজ্যই চলছে। চীনের পর ভারত আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, শিল্পের কাঁচামাল এবং আমাদের পোশাক খাতের জন্য আমরা ভারতীয় আমদানির ওপর নির্ভর করি। একই সঙ্গে ভারতের দেয়া শুষ্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধার কারণে ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানিও বাড়ছে। সুতরাং, অর্থনৈতিক দিকটি এখনো প্রাণবন্ত। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে মানুষের যাতায়াতের ওপর বিধিনিষেধ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে- যেমন ব্যবসায়ীদের ভিসা না দেয়া। এখানেই রাজনীতি অর্থনৈতিক সম্পর্কে বাধাগ্রস্ত করছে। এখন সময় এসেছে এই সমস্যাগুলো সমাধান করে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়ার।

২০২৬ সালের মাঝামাঝি নাগাদ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক সম্ভবত আরও দৃঢ় অবস্থানে ফিরে যাবে। আসল উদ্বেগের বিষয় হলো- এই সময়কাল থেকে আমরা কোন ধরনের মানসিক বোঝা নিয়ে সামনে আগাব? আমরা কি গভীর অবিশ্বাস নিয়ে বের হবো, নাকি এই মুহূর্তটিকে সম্পর্ক পুনর্গঠনে ব্যবহার করবো?

(সাক্ষাৎকারটি ভারতের ফ্রন্টলাইন ম্যাগাজিনের ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত হয়, পরবর্তীতে দ্য হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।)

ফ্রন্ট লাইন

১ এপ্রিল ২০২৫

যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে ইইউ জোটে হিস্যা বাড়াতে হবে

প্রফেসর রেহমান সোবহান

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুষ্কনীতি বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। বিশেষ করে চীন-মার্কিন শুষ্ক লড়াইয়ের প্রভাব কোথায় গিয়ে শেষ হয় তা এখনও বলা যাচ্ছে না। এ রকম বাস্তবতায় একক প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। খুঁজতে হবে বিকল্প বাজার। জোটগত প্রধান বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) বাংলাদেশের পণ্যের হিস্যা বাড়ানো যায়। এশিয়ার দেশগুলোতে মনোযোগ বাড়াতে হবে।

ট্রাম্পের পাল্টা শুষ্কের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে এক সংলাপে এসব মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান ড. রেহমান সোবহান। বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানে হোটেল লেকশোরে সিপিডি এ আয়োজন করে। সংলাপে বিষয়ের ওপর মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহিমদা খাতুন সংলাপ পরিচালনা করেন।

বিকল্প বাজার প্রসঙ্গে ড. রেহমান সোবহান বলেন, ইইউর বাজারে আরও কয়েক বছর বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশে শুষ্কমুক্ত বাজার সুবিধা থাকবে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের বাজার অনুসন্ধান করতে হবে। এশিয়ার অন্যান্য বাজারেও রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব। আগামীতে বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র হবে এশিয়া। নিজেদের যে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা দিয়ে বিকল্প এ সব বাজারে রপ্তানি বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।

মূল প্রবন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি পরিস্থিতি তুলে ধরেন অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। গত বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানিতে শুদ্ধ বাবদ ১৮ কোটি ডলার আয় করেছে বাংলাদেশ। ওই বছর বাংলাদেশের পণ্যের আমদানি শুদ্ধ বাবদ ১২৭ কোটি ডলার আদায় করে যুক্তরাষ্ট্র। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যে ভারসাম্যতা আনতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা পণ্যে শুদ্ধ কমাতে সমস্যা হচ্ছে। অন্যান্য দেশকেও একই সুবিধা দিতে হবে। এতে বাংলাদেশের মোট শুদ্ধ লোকসান হবে ১৭ কোটি ডলার অর্থাৎ কেবল শুদ্ধ কমিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না।

সমকাল

১৭ এপ্রিল ২০২৫

অধ্যায় ১১

বৈষম্য, দারিদ্র্য ও সামাজিক ন্যায়



কাজ্জিত বৈষম্য হ্রাস অনর্জিত থেকে যাবে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের মূল্যায়ন করতে হবে যে ব্যতিক্রমী সময়ের প্রেক্ষাপটে বাজেটটি প্রণীত হয়েছে তাকে বিবেচনায় রেখে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কালে প্রণীত এই বাজেটের মূল দর্শন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের আকাজক্ষার প্রতিফলনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার কথা, যে বাজেট একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি ও জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের অভীক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

বাজেটের প্রস্তাবিত কর কাঠামো, ব্যয়বিন্যাস ও উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রাধিকার নির্ধারণ কিভাবে করা হয়েছে, তার নিরিখেই বাজেটকে মূল্যায়ন করা সে কারণে যুক্তিসংগত হবে। সামষ্টিক অর্থনীতি কিছুটা স্থিতিশীল হচ্ছে, কিন্তু উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগ চাপা করে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে বেগবান করতে এই বাজেট সক্ষম হবে কি না, এটাই বিচার্য বিষয়।

উল্লেখিত প্রেক্ষাপটে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে জনকল্যাণে এবং বিনিয়োগ-ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ ও প্রস্তাবের প্রতিফলন থাকলেও তা বণ্টনের ন্যায্যতা এবং বিনিয়োগে চাপল্য সৃষ্টির নিরিখে অর্থনীতির বর্তমান চাহিদার মাপকাঠিতে প্রস্তাবিত বাজেট ব্যতিক্রমী হয়েছে, সেটা বলা যাবে না।

গত দুই বছরে গড় মূল্যস্ফীতির উচ্চ হারের কারণে ভোগ্যপণ্যের মূল্য ২০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই বিবেচনায় করমুক্ত আয়ের সীমা ২০২৫-২৬ করবর্ষের জন্য অপরিবর্তিত রেখে ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ করবর্ষে ২৫ হাজার টাকা মাত্র বাড়ানো হয়েছে। দুই বছর আগে করমুক্ত আয়ের যে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তার ক্রয়ক্ষমতার অবনমনের নিরিখে প্রস্তাবিত আয় কর কাঠামো নিম্নমধ্যবিত্তের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে।

অন্যদিকে আয়করের বিভিন্ন স্ল্যাবের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন করা হয়েছে (৫ শতাংশ স্ল্যাব বাতিলের সাপেক্ষে), তা মূল্যস্ফীতির চলমান প্রেক্ষাপটে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করবে; বিশেষত যখন মজুরি ও আয় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে না। যাদের বার্ষিক আয় ছয় লাখ বা ১০ লাখ টাকা, তাদের আয়কর প্রস্তাবিত করহারের ফলে আগামী দুই করবর্ষে যথাক্রমে ১২.৫ শতাংশ ও ১৬.৭ শতাংশ বাড়বে। এটা অবশ্য ইতিবাচক যে বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য করমুক্ত আয়ের ক্ষেত্রে বাড়তি ছাড় দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ করহার কভিডপূর্ব ৩০ শতাংশের পর্যায়ে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ করবর্ষ থেকেই কার্যকর হবে।

এই প্রস্তাব আয় পুনর্বন্টনের ন্যায্যতার দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এসব অনেক আগেও ছিল। সম্পদ কর বা উত্তরাধিকার করের মতো ব্যতিক্রমী উদ্যোগের প্রস্তাব বাজেটে করা হয়নি।

ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশের অভিন্ন কাঠামোতে নেওয়ার জন্য আইএমএফের একটা চাপ ছিল, যার প্রতিফলন বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাবে দেখা যায়। বেশ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে ভ্যাট বাড়ানো হয়েছে; অনলাইন ব্যবসায় কমিশনের ওপর ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে; গৃহস্থালি পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে।

এগুলো ভোক্তার ওপরই শেষ বিচারে বর্তাবে। যদিও বেশ কিছু পণ্যে আমদানি শুল্কহার হ্রাস করা হয়েছে অপ্রত্যক্ষ কর কাঠামোর যৌক্তিকীকরণ ও অ্যান্টি-এক্সপোর্ট বায়াস হ্রাসের লক্ষ্যে।

বিগত সময়ে কর ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা মোকাবেলা করতে গিয়ে অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম ভ্যাট ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েছে। প্রচলিত এই ধারা থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বের হতে পারেনি। অনেক পণ্যে নতুন করে ২ শতাংশ হারে অগ্রিম আয়কর আরোপ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের ক্ষেত্রে আগাম কর ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ করা হয়েছে, যদিও এটাকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলে ধরে নেওয়া হবে বলে বলা হয়েছে। জানা কথা, পরবর্তী সময়ে প্রদেয় করের সঙ্গে অগ্রিম করের সমন্বয় করার ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হয়, যদিও এবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে অগ্রিম ভ্যাটকে চূড়ান্ত হিসাবে ধরা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সমন্বয়ের সময় বাড়ানো হয়েছে। সমস্যা হলো, এ ধরনের অগ্রিম আয়কর অনেক ব্যবসায়ী বিক্রয়কর হিসেবে বিবেচনা করেন এবং ভোক্তার ওপরে চাপিয়ে দেন। এটা আয়কর আরোপের নীতিমালা ও দর্শনের পরিপন্থী।

এটা মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশে যত পয়েন্টে ভ্যাট আদায় করা হয়, সরকারের কোষাগারে তার একটি অংশ মাত্র যোগ হয়। তিন লাখ ইএফডি মেশিন স্থাপনের পরিকল্পনা থেকে রাজস্ব কর্তৃপক্ষ সরে এলো কি না, তা-ও বোঝা গেল না। বাস্তবতার পরিবর্তন নয়, বাস্তবতা মেনে নেওয়ার দিকেই বেশি ঝোঁক দৃশ্যমান।

সামাজিক সুরক্ষা খাতের ব্যাপ্তি ও প্রাপ্তি কিছুটা বাড়ানো হয়েছে, যদিও ভাতা যা বাড়ানো হয়েছে, তা মূল্যস্ফীতি ও ক্রয়ক্ষমতার নিরিখে বেশ হতাশাজনক।

কর-জিডিপি হার ৮-৯ শতাংশের মধ্যে থাকলে, আর তার সঙ্গে (ঋণনির্ভর) ঘাটতি অর্থায়ন জিডিপির ৩-৪ শতাংশের বেশি না বাড়তে চাইলে বাংলাদেশের সরকারি ব্যয় জিডিপির ১২-১৩ শতাংশের বেশি করা যাবে না। উন্নয়নশীল বিশ্ব ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম সর্বনিম্ন। প্রতিবেশী দেশ ভারত ও নেপালে এই হার ২৪ শতাংশের বেশি। সুতরাং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত আকারের সরকারি ব্যয় নিয়ে যে ধরনের ও মানের ব্যয়বিন্যাস হওয়ার কথা, তার থেকে বেশি প্রস্তাবিত বাজেটের কাছ থেকে প্রত্যাশা করাটা অন্যায্যই হবে। দুঃখের বিষয় হলো, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট বহুদিনের এই দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসার পথ দেখাতে পারেনি।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

৩ জুন ২০২৫



নারীরা চলাফেরা, আচরণের ক্ষেত্রে যে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তা কল্পনা করা যায় না

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নারীরা পরিবার, সমাজ, প্রশাসন—কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছেন না বলে মন্তব্য করেছেন বেসরকারি সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, নারীরা আগের চেয়ে চলাফেরা, আচরণের ক্ষেত্রে যে ধরনের বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তা কল্পনা করা যায় না।

আজ বুধবার সকালে রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে ‘চ্যালেঞ্জিং সোশ্যাল নর্মস অ্যান্ড পাওয়ার ডায়নামিকস: টুওয়ার্ডস এ ফেয়ার-ফ্রি ফিউচার’ শীর্ষক জাতীয় সংলাপে তিনি এ কথা বলেন।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনের কর্মসূচি উপলক্ষে এই সংলাপের আয়োজন করে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)। সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ।

সংলাপে ঢাকার বাইরের নারীদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে কথা বলেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ঢাকা শহর তো কিছুই না, মফসসলে নারীরা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। পরিবার, সমাজ, প্রশাসন—কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছেন না।

এ সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় সংগীতে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জানান, কয়েক সপ্তাহ ধরে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে তাঁরা ঢাকার বাইরে প্রাক্-নির্বাচনী সভা করছেন। সভার উদ্দেশ্য, আগামী সরকারের কাছে জগণের

প্রত্যাশা ও নির্বাচন কমিশন কতখানি কাজ করতে পারবে, তা নিয়ে মানুষ কী ভাবছে, তা বোঝা। তিনি বলেন, এসব আলোচনায় প্রথম দিকে সুশাসন ও দুর্নীতিটা জনগণের কাছে খুব বড় বিষয় ছিল। তবে এখন এক নম্বরে রয়েছে নিরাপত্তার বিষয়টি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক—এই চার ধরনের নিরাপত্তার কথা উঠে আসছে।

মফস্বলের চিত্র তুলে ধরে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ‘আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না ওই সব নারী কীভাবে একটি নিরাপদ জায়গা খোঁজেন, যেখানে এসে কথাগুলো বলতে পারেন।... হিজড়া সম্প্রদায় যে কথা বলে, ওরা তো আত্মগোপনে চলে গেছে। অন্য যেসব ধর্মীয় মতবাদ আছে, তারা তো আত্মগোপনে চলে গেছে। মিটিং করতে চাইলে বলে, “দাদা, মিটিং করার দরকার নেই। আমরা এখন রাডারের নিচে থাকি। মিটিং করলে আরও সমস্যা হবে।”’

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দেশের ভেতরে অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য বেড়েছে। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৩০ লাখ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে এবং তার বহুলাংশই হলেন নারী। তিনি আরও বলেন, দারিদ্র্যের যে প্রক্রিয়া এবং এই মুহূর্তে বিনিয়োগ না থাকা, যুবসমাজের কর্মসংস্থান না থাকায় নারীরা অনেক বেশি নিপীড়িত হচ্ছেন আর্থিক দিক থেকে।

সাংস্কৃতিক নিরাপত্তার বিষয়ে শুধু গানবাজনা বন্ধ হওয়া নয়, পরিবারের ভেতরেও আচরণ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে বলে জানান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, সমাজের সঙ্গে নারীদের অন্যান্য যোগাযোগের ক্ষেত্রেও পূর্ণবিকাশের জায়গাগুলো থমকে যাচ্ছে। রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি নিরাপত্তাহীন উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই উত্তরণের সময়ে নারীরা রাজনৈতিক মত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আরও বেশি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

প্রথম আলো

২৬ নভেম্বর ২০২৫

উন্নয়ন টেকসই করতে প্রবৃদ্ধির গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে

ড. ফাহিমদা খাতুন

বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রা গত পাঁচ দশকে বেশ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০-এর দশকের যুদ্ধবিশ্বস্ত দেশ থেকে আজকের গতিশীল নিম্নমধ্যম আয়ের অর্থনীতিতে উত্তরণ—এটি কমসংখ্যক দেশের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশ দারিদ্র্য হ্রাসে অনেক সাফল্য দেখিয়েছে।

গ্রামীণ অঞ্চলে সেচ সম্প্রসারণ, উচ্চফলনশীল জাত, যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন ও কৃষিবহির্ভূত খাতের বিস্তার মানুষের জীবনযাত্রা বদলে দিয়েছে। নারীর কর্মসংস্থান, বিশেষত তৈরি পোশাক খাতে, তাঁদের পরিবারে স্থিতিশীল আয়ের সুযোগ করে দিয়েছে এবং নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়িয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক দরিদ্র পরিবারকে আয়ের সুযোগ করে দিয়েছে। প্রবাসী আয় রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় অনেক গ্রামীণ পরিবারকে আর্থিক নিরাপত্তা দিয়েছে, ছোট ব্যবসায় বিনিয়োগের পথ তৈরি করেছে ও সন্তানদের পড়াশোনায় সহায়তা করেছে।

তবে দারিদ্র্য হ্রাসের এই সাফল্যের স্পষ্ট সীমাবদ্ধতাও আছে। নগর দারিদ্র্য দ্রুত বাড়ছে এবং এর প্রকৃতি আগের তুলনায় বেশি জটিল। ঢাকা ও বড় শহরগুলোয় অনেক মানুষ বস্তিতে বাস করেন—নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন বা নিরাপদ আবাসন ছাড়া। জাতীয় পর্যায়ে ৮৫ শতাংশ শ্রমিক অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন, যেখানে কাজ অস্থায়ী, আয় খুব কম এবং তাঁদের কোনো আনুষ্ঠানিক সামাজিক সুরক্ষা নেই।

এ কারণে সামান্য যেকোনো ধাক্কাতেই, যেমন রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে এসব পরিবার আবার দরিদ্র অবস্থায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য মানুষের প্রকৃত আয় কমিয়ে দিয়েছে, এবং অনেক পরিবার দারিদ্র্যসীমার ওপর থেকে আবার নিচে নেমে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক জরিপ বলছে, দারিদ্র্য হ্রাসের সাফল্য কিছু ক্ষেত্রে আবার উল্টো দিকে ঘুরে গেছে।

অন্যদিকে বৈষম্যও ক্রমে স্পষ্টভাবে বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, জাতীয় আয় বণ্টনের জিনি সহগ ২০১৬ সালের শূন্য দশমিক ৪৮২ থেকে ২০২২ সালে বেড়ে শূন্য দশমিক ৪৯৯-এ দাঁড়িয়েছে, যা আয় বণ্টন আরও অসম হয়ে পড়ার ইঙ্গিত দেয়। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২-এর তথ্য থেকে দেখা যায়, দেশের শীর্ষ ৫ শতাংশ খানা মোট জাতীয় আয়ের ৩০.০৪ শতাংশের মালিক, যেখানে নিচের ৫ শতাংশ খানার কাছে রয়েছে মাত্র শূন্য দশমিক ৩৭ শতাংশ। অন্যদিকে ২০১৬ সালে শীর্ষ ৫ শতাংশ খানার আয় ছিল মোট জাতীয় আয়ের ২৭.৮২ শতাংশ এবং নিচের ৫ শতাংশের আয় ছিল মোট জাতীয় আয়ের মাত্র শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ।

শহর ও গ্রামের বৈষম্যও বিস্তর। শহরে উচ্চ উৎপাদনশীল সেবা ও শিল্প খাত বিস্তার লাভ করলেও গ্রামে বহু মানুষ কম আয় কৃষি ও অনিয়মিত কাজের ওপর নির্ভর করে চলছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকারের বৈষম্য এসব পার্থক্যকে আরও গভীর করেছে। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা নিম্নমানের বিদ্যালয়ে পড়ে, অপুষ্টিতে ভোগে এবং আধুনিক শ্রমবাজারে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের সুযোগ খুব কম পায়। এ কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি স্লথ হয়ে যাচ্ছে।

খাদ্যনিরাপত্তার ক্ষেত্রেও একই ধরনের দ্বৈত বাস্তবতা দেখা যায়। গত তিন দশকে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদন দ্বিগুণের বেশি করেছে। কৃষি প্রযুক্তিতে অগ্রগতি এবং সরকারি নীতিতে প্রণোদনা এতে বড় ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু খাদ্যনিরাপত্তা কেবল উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে না; এটি নির্ভর করে মানুষের খাদ্যপ্রাপ্তি ও ক্রয়ক্ষমতার ওপরও। জলবায়ু পরিবর্তন এখন এই ব্যবস্থার প্রধান হুমকি। সমুদ্রস্তর বৃদ্ধি, লবণাক্ততা, আকস্মিক বন্যা ও খরার কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ১৭ শতাংশ কৃষিজমি ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

২০২৩ সালে হাওর এলাকায় ভয়াবহ বন্যায় নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও সুনামগঞ্জে অনেক ধান নষ্ট হয়, যে কারণে স্থানীয় খাদ্যসংকট দেখা দেয়। শহরের নিম্নআয়ের মানুষ উচ্চমূল্যের কারণে খাদ্যের পরিমাণ কমাতে বাধ্য হয়েছেন। জাতীয়ভাবে খাদ্য পর্যাপ্ত হলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠী অনেক সময় পর্যাপ্ত খাদ্য কিনতে পারে না। এটাই আজকের প্রাচুর্যের মধ্যেও প্রাপ্তির সংকট।

সামাজিক সুরক্ষায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম বৃহৎ কাঠামো তৈরি করেছে। প্রায় ১২০টির বেশি সুরক্ষা কর্মসূচি চালু রয়েছে—বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, খাদ্যসহায়তা, কর্মসংস্থান কর্মসূচি ইত্যাদি। কিন্তু এসব কর্মসূচির কার্যকারিতা সীমিত।

সামাজিক সুরক্ষা খাতের বরাদ্দ ২০২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের মাত্র ১.৮৭ শতাংশ। তবে এই বরাদ্দের মধ্যে এমন অনেক উপাদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মূলত দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক নয়, যেমন সরকারি কর্মচারীদের পেনশন, সঞ্চয়পত্রের সুদ প্রদান ও কৃষি ভর্তুকি।

এসব উপাদান বাদ দিলে ২০২৬ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা বরাদ্দের প্রকৃত অংশ জিডিপির মাত্র ১.০৩ শতাংশে নেমে আসে। এই বরাদ্দ বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তার ওপর, লক্ষ্যভ্রষ্টতা, উপকারভোগী তালিকা হালনাগাদ না হওয়া, কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি, এবং নগর দরিদ্র ও অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের বাদ পড়া—এসব কারণে সুরক্ষার প্রভাব ক্ষীণ হয়ে যায়। তাই সুরক্ষা কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে ডিজিটাল রেজিস্ট্রি, জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা তালিকা, সঠিক লক্ষ্যভিত্তিক বরাদ্দ এবং নগর দরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় জিডিপির কমপক্ষে ৪ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।

এখন বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যকে বহুমাত্রিক কাঠামোর মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়, যেখানে জোর দিয়ে বলা হয় যে দারিদ্র্য কেবল আয়ঘাটতির বিষয় নয়; এটি একাধিক বঞ্চনার সমষ্টি। এর মধ্যে রয়েছে নিম্নমানের শিক্ষা, নিরাপদ বাসস্থানের অভাব, অপুষ্টি, পরিষ্কার জ্বালানির সুযোগ না পাওয়া ও সামাজিক বর্জন। লিঙ্গ, জাতিগত পরিচয়, ভৌগোলিক অবস্থান এবং সামাজিক শ্রেণি—এসব উপাদানই নির্ধারণ করে কারা দারিদ্র্যের মধ্যে রয়ে যায়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বাংলাদেশের দ্বৈত বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশটি দারিদ্র্য হ্রাস ও উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, তবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ভিত্তি এখনো দুর্বল। এখানে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে। তারা দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকলেও যেকোনো আঘাতে নিচে নেমে যেতে পারে। এখন বাংলাদেশের জন্য শুধু প্রবৃদ্ধির গতি নয়; বরং তার গুণগতমান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া অত্যাবশ্যক।

এ জন্য দরকার শিক্ষায় ও দক্ষতায় বড় বিনিয়োগ, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রগতিশীল করব্যবস্থা, খাদ্য বাজারে স্বচ্ছতা, জলবায়ু-সহনশীল কৃষিতে বেসরকারি বিনিয়োগ ইত্যাদি। দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য দূরীকরণ ও খাদ্যনিরাপত্তা—এগুলো আলাদা নয়; একটি সমন্বিত উন্নয়নব্যবস্থা ও টেকসই উন্নয়নের অংশ। বাংলাদেশ বছবার প্রমাণ করেছে যে অত্যন্ত কঠিন অবস্থা থেকেও দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব। এখন প্রয়োজন সেই অগ্রগতিকে আরও ন্যায্যসঙ্গত ও

স্থিতিশীল ভিত্তিতে দাঁড় করানো—যাতে দেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রবৃদ্ধির সুফল বাস্তবে অনুভব করতে পারেন।

প্রথম আলো

২৯ নভেম্বর ২০২৫



অধ্যায় ১২

স্মারক ও ব্যক্তিত্ব



বিকাশমান উদ্যোক্তা শ্রেণিকে তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিতে হবে

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে শুধু নয়, দেশের নাগরিক সমাজের মহিরুহ ছিলেন। তিনি বটগাছের মতো আমাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর যাপিত জীবন থেকে বাংলাদেশের সৎ ব্যবসা তথা মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। এই দিনে তাঁর সহধর্মিণী বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী নিলুফার মঞ্জুরের কথাও বিশেষভাবে মনে পড়ছে।

সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীর অবস্থানের ওপর নাগরিক সমাজের প্রগাঢ় আস্থা ছিল। খুবই ব্যতিক্রমীভাবে তিনি দুবার (১৯৯৬ ও ২০০১) বাংলাদেশের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) উদ্যোগে গঠিত নাগরিক কমিটি ২০০৬, যা ‘রূপকল্প ২০৩০’ প্রণয়ন করে, তার অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি।

অন্যদিকে আমরা যে দেশের অর্থনীতির বৈচিত্র্যকরণের কথা বলি, সেখানেও তিনি অনুকরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তৈরি পোশাকের বাইরে চামড়া ও চামড়াজাতীয় পণ্য খাতের ব্যাপক বিকাশ ঘটিয়ে একটি রপ্তানিমুখী শিল্প সৃষ্টি করেছেন।

দেশের বিকাশমান উদ্যোক্তা শ্রেণি সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীর কর্ম থেকে শিক্ষা নিতে পারে। তাদের কাছে তিনি বাতিঘর হয়ে থাকবেন।

সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীকে নিয়ে সিপিডি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গর্বিত। সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী আমৃত্যু সিপিডি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবং কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তাঁর চলে যাওয়াকে আমি মহাপ্রস্থান বলব। তাঁর মহাপ্রস্থান শুধু ওনার পরিবারের জন্য নয়; নাগরিক সমাজ তথা দেশের জন্য বড় শূন্যতা সৃষ্টি করবে। আমরা একজন নির্ভর করার মতো অভিভাবককে হারালাম।

জাতির উত্তরণের এই সময়ে আমরা ওনার পরামর্শ থেকে বঞ্চিত হব।

প্রথম আলো

১২ মার্চ ২০২৫

খালেদা জিয়া একজন রাজনৈতিক নেতা যিনি শুনতেন, প্রশ্ন করতেন এবং জাতীয় স্বার্থে সিদ্ধান্ত নিতেন

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জাতীয় নেতা খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আমি আমার গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি আমাদের এমন এক সময়ে ছেড়ে চলে গেছেন যখন জাতির জন্য তার দিকনির্দেশনা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। তিনি আমাদের যে চ্যালেঞ্জগুলো সাহস ও দায়িত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করতে দেখতে চেয়েছিলেন, এখন সেগুলো সম্মিলিতভাবে সমাধান করার দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায়।

আমার পেশাগত জীবনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে আমার চারবার সরাসরি সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রতিটি সাক্ষাতই রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তার সম্পর্কে আমার মনে এক দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলেছে। এমন একজন নেতা যিনি নতুন ধারণাকে মূল্যায়ন করতেন এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে গুরুত্ব দিতেন।

অর্থনীতি সমিতির সম্মেলন

তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৯১ সালের জানুয়ারিতে। এরশাদ সরকারের পতনের ঠিক পরেই। খালেদা জিয়া তখন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির (বিইএ) সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। সে সময় আমি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলাম।

আমার উদ্বোধনী বক্তব্যে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, আমরা সচেতনভাবেই সদ্য বিদায়ী সরকার প্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো থেকে বিরত থেকেছি এবং আমরা খালেদা জিয়াকে দেশের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত।

তিনি এই বক্তব্যটি লক্ষ্য করেন এবং পরে আমার কাছে এর পেছনের কারণ জানতে চান। আমি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার এবং উন্নয়নের সঙ্গে এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা ব্যাখ্যা করি। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তা শোনেন এবং স্থিত প্রশংসার মাধ্যমে এর উত্তর দেন।

ব্যাংক সংস্কার কমিটি

দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় ১৯৯০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। যখন আমি অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের নেতৃত্বে গঠিত ব্যাংক সংস্কার কমিটিতে (১৯৯৩-১৯৯৪) কাজ করছিলাম। প্রয়াত অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান আমাকে সেখানে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

সে সময় আমরা ব্যাংক কোম্পানি আইনের রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল কিছু সংশোধনী নিয়ে কাজ করছিলাম। বিশেষ করে স্পন্সর ডিরেক্টরদের (উদ্যোক্তা পরিচালক) ভূমিকা, পদের মেয়াদ এবং পারিবারিক আধিপত্য সীমিত করার বিষয়গুলো। অন্য একটি প্রসঙ্গে সুযোগ পেয়ে আমি খালেদা জিয়ার কাছে এই উদ্বেগগুলো উত্থাপন করার সাহস করি।

তিনি সহজভাবে বলেছিলেন, আপনারা যা প্রয়োজন মনে করেন, তা-ই করুন। এই স্পষ্ট এবং নীতিগত দিকনির্দেশনাটি প্রযুক্তিগত বিচারের প্রতি তার আস্থা এবং দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে তার গভীর বোঝাপড়ারই প্রতিফলন ছিল।

ডব্লিউটিও প্রতিনিধিদল

তৃতীয় ঘটনাটি আমাকে নিয়ে হলেও, সেই মুহূর্তে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। তবে ঘটনাটি বেশ শিক্ষণীয়। ২০০১ সালের অক্টোবরে যখন তিনি তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন দোহায় অনুষ্ঠিতব্য ডব্লিউটিও মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল। তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় প্রতিনিধিদল গঠন করা হচ্ছিল।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যখন প্রতিনিধিদলের প্রস্তাবিত তালিকা জমা দেয়, তখন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা- সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে আমার নাম তালিকা থেকে কেটে দেন।

দোহা সম্মেলনের ঠিক আগে দেশের ব্যবসা ও শিল্প খাতের শীর্ষ নেতারা নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যান। সেই সুযোগে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি)-এর প্রেসিডেন্ট জনাব মাহবুবুর রহমান এবং ট্রান্সকম গ্রুপের প্রয়াত লতিফুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যবসায়ী নেতা বাণিজ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে

প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি তোলেন। তারা উল্লেখ করেন যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষে কার্যকর বাণিজ্য আলোচনার জন্য জাতীয় প্রতিনিধিদলে আমার অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

পরবর্তীতে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই)-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সি. কে. হায়দার আমাকে জানিয়েছিলেন, খালেদা জিয়ার উত্তর ছিল- দেশ গড়ার প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকের অবদান প্রয়োজন এবং কেবল রাজনৈতিক কারণে কাউকে বাদ দেয়া অর্থহীন।

এভাবেই সরকারি প্রতিনিধিদলের তালিকায় আমার নাম পুনর্বহাল করা হয় এবং আমি আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে দোহায় যাই। যেখানে আমরা ডব্লিউটিও আলোচনায় অংশ নিই। এই ঘটনাটি আমার ওপর এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। আমি জাতীয় স্বার্থে সংকীর্ণ দলীয় চিন্তার উর্ধ্বে ওঠার (যা প্রায়ই রাজনৈতিকভাবে নিযুক্ত কর্মকর্তারা উক্ষে দিতেন) এক অসামান্য ক্ষমতা খালেদা জিয়ার মধ্যে দেখতে পাই।

গ্যাস ব্যবহার কমিটি

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে আমার শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ হয় ২০০২ সালে। তখন গ্যাস রিজার্ভ ব্যবহার সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির কয়েকজন সদস্য একটি উচ্চপর্যায়ের মন্ত্রিসভা কমিটিকে ব্রিফিং দিচ্ছিলেন। সেই সময় অত্যন্ত আলোচিত ইস্যুটি ছিল- বাংলাদেশের ভারতে গ্যাস রপ্তানি করা উচিত কিনা। প্রকৃতপক্ষে, কিছু আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি প্রচার করছিল যে, বাংলাদেশ গ্যাসের ওপর ভাসছে এবং দ্রুত তা উত্তোলন করে ভারতের বাজারে রপ্তানি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা (চক্ষিণে ক্ষমতাসূচ্য) একটি বক্তব্য জনপ্রিয় করেছিলেন, ৫০ বছরের মজুত রেখে বাংলাদেশ নিরাপদে গ্যাস রপ্তানি করতে পারে।

আমি যখন আমার উপস্থাপনা শুরু করি, খালেদা জিয়া তার প্রথম প্রশ্নটি দিয়েই আমাকে অবাক করে দেন। তিনি বলেন, আপনি কি আমাকে বলছেন যে, আগামী ৫০ বছরের জন্য আমাদের পর্যাপ্ত গ্যাস নেই? তার প্রশ্নের তীক্ষ্ণতা দেখে আমি চমকে গিয়েছিলাম। আমি অকপটে উত্তর দিয়েছিলাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বর্তমানে আমাদের কাছে ৫০ বছরের নিশ্চিত মজুত নেই। গ্যাসের প্রাপ্যতা একটি পরিবর্তনশীল বিষয়। যদি অনুসন্ধান অব্যাহত থাকে, তবে আমরা ৫০ বছর টিকে থাকতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট একটি সময়ে আমাদের ৫০ বছরের গ্যারান্টিযুক্ত মজুত নেই।

তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তাহলে আমরা কীভাবে অনুসন্ধান বাড়াতে পারি? আমি ব্যাখ্যা করলাম, দীর্ঘস্থায়ী বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশকে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স-এর ক্ষমতা শক্তিশালী করতে হবে এবং বিশেষ করে অফশোর ও গভীর সমুদ্র ব্লকের জন্য বিদেশি কোম্পানিগুলোকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

তিনি দ্রুত বিষয়টি বুঝতে পারলেন এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করলেন- গ্যাস রপ্তানি থেকে আমরা আসলে কতো টাকা আয় করবো? আমি তাকে সত্যটা বললাম। সেই আয়ের প্রক্ষেপণ খুব একটা বেশি ছিল না। মোটামুটি দুই বা তিনদিনের রেমিট্যান্স আয়ের সমান। আমি আরও যোগ করলাম, দেশের অভ্যন্তরীণ খাতের জন্যই এই গ্যাসের প্রয়োজন এবং তা ব্যবহার করার মতো অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাংলাদেশের আছে।

সেই পর্যায়ে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান আলোচনায় অংশ নেন। আমি আরও ব্যাখ্যা করি যে, আন্তঃসীমান্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস রপ্তানি করার ক্ষেত্রে গুরুতর নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে। এগুলো কোনো কাল্পনিক উদ্বেগ ছিল না।

খালেদা জিয়া তাৎক্ষণিকভাবে এর ফলাফলগুলো অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী সাইফুর রহমান, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া এবং অন্যান্য একই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। সেই আলোচনাটি একটি যুগান্তকারী মোড় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল।

পেছনে ফিরে তাকালে, আমি সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের অংশ হতে পেরে গর্ববোধ করি যে, বৈঠকটি এমন এক সময়ে ভারত বা অন্য কোথাও গ্যাস রপ্তানি বন্ধ করতে সাহায্য করেছিল যখন বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে ছিল।

নীতিনির্ধারণী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একজন রাজনৈতিক নেতা

একত্রে এই চারটি ঘটনা- ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০২ আমার পেশাগত জীবনের বিভিন্ন সময় এবং খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিভিন্ন পর্যায়কে ধারণ করে। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তার সম্পর্কে তিনটি স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায়।

প্রথমত, তিনি প্রযুক্তিগত বা কারিগরি পরামর্শ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। ব্যাংকিং সংস্কার, বাণিজ্য আলোচনা বা জ্বালানি নিরাপত্তা- যেকোনো জটিল নীতিনির্ধারণী বিষয়ের গভীরে যাওয়ার প্রতি তার অকৃত্রিম আগ্রহ ছিল। আমাদের মতো নীতিনির্ধারণীদের জন্য তার এই শোনার মানসিকতা ছিল অমূল্য।

দ্বিতীয়ত, বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্য তিনি যৌক্তিক ও গভীর প্রশ্ন করতেন। তার প্রশ্নগুলো কেবল বলার জন্য বলা বা রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য ছিল না, বরং সেগুলো ছিল কোনো ধারণাকে যাচাই করা, ফাঁকফোকর খুঁজে বের করা এবং এর ফলাফল বোঝার জন্য।

তৃতীয়ত এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ- তিনি কারিগরি পরামর্শগুলোকে একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্ত নিতেন। তিনি বুঝতেন যে, নীতিনির্ধারণী পছন্দগুলো

কখনোই নিখুঁতভাবে প্রযুক্তিগত নয়। সেগুলোকে অবশ্যই জাতীয় অগ্রাধিকার, রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং দীর্ঘমেয়াদি জনস্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

এগুলো একজন কার্যকর রাজনৈতিক নেতার ক্লাসিক অথচ বিরল গুণাবলি। নেতৃত্বের এই মডেলটির সফল উদাহরণ ছিল খালেদা জিয়া এবং সাইফুর রহমানের মধ্যকার অংশীদারিত্ব। ১৯৯২ সালে ভাট চালু করা হোক বা ২০০৩ সালে ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট পদ্ধতি গ্রহণ- তাদের এই সহযোগিতা ছিল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং কারিগরি দক্ষতার পারস্পরিক শ্রদ্ধার প্রতিফলন।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, বাংলাদেশের পরবর্তী প্রজন্মের নেতারা তার উদাহরণ থেকে শিক্ষা নেবেন। কীভাবে একজন রাজনৈতিক নেতা নীতিনির্ধারণী উপদেষ্টাদের সেরা ব্যবহার করতে পারেন, কীভাবে জটিল কারিগরি বিষয়গুলোকে সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত করা যায় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে নেতৃত্ব কীভাবে সংকীর্ণ চিন্তার উর্ধ্বে উঠতে পারে। এই সময়ে খালেদা জিয়াকে খুব বেশি মনে পড়বে।

(লেখাটি দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে প্রকাশিত মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত)

দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

রওশন জাহান: বোন, শিক্ষক ও সহযোদ্ধা

অধ্যাপক রওনক জাহান

রওশন জাহান বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে গবেষকদের অন্যতম অগ্রদূত। ৪ নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। রওশন জাহান আমার বোন। আমাদের ছয় ভাইবোনের মধ্যে সবার বড়। আমার সঙ্গে বয়সের ব্যবধান চার বছরের। রওশন যেন শিক্ষক হয়েই জন্মেছিলেন। আমি যখন ছোট, যেকোনো প্রশ্নের উত্তর পেতে ছুটে যেতাম তাঁর কাছেই।

কিছু বাংলা ধ্বনি উচ্চারণে আমার ও ছোট ভাই কবিরের সমস্যা ছিল। রওশনের বয়স তখন আট বা নয় বছর। তবু আমাদের শেখাতে পেরেছিলেন জিব কীভাবে নাড়িয়ে সঠিক উচ্চারণ করা যায়।

রওশন ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। চার বছর বয়সেই পড়াশোনা নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, বিশেষ করে সাহিত্যে। রওশন কথাবার্তায় পারঙ্গম ছিলেন, সহজেই বন্ধু বানাতে পারতেন। যেসব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, সবখানেই শিক্ষকরা তাঁর প্রতিভার গুণমুগ্ধ ছিলেন।

আমি ছিলাম তাঁর চার বছরের ছোট। তিনি চাইলেই কেবল সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারতেন, তবু আমাকে অনেক সময় দিয়েছেন। একসঙ্গে খেলেছেন, গল্প শুনিয়েছেন, বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণ শিখিয়েছেন। এমনকি শিখিয়েছেন সাহিত্যও।

আমরা একটি অভিন্ন শৈশবের অংশ ছিলাম। একসঙ্গে থেকেছি স্কুল ও কলেজজীবনজুড়ে। এরপর এল ১৯৬১ সাল। ফুলব্রাইট শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চশিক্ষার জন্য রওশন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমালেন।

শুধু পড়াশোনায়ই নয়, রওশন অন্যান্য ক্ষেত্রেও অসাধারণ ছিলেন। স্কুলে তিনি নাটকে অভিনয় করেছেন, কুমিল্লায় ওস্তাদ আয়াত আলী খানের কাছে শিখেছিলেন সংগীত। সিনেমা আর খেলাধুলাতেও তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। মনে পড়ে, একবার কলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ঢাকায় এসেছিল ফুটবল খেলতে। রওশন আর আমি মাঠে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। পুরো দর্শকভর্তি স্টেডিয়ামে শুধু আমরা দুজনই ছিলাম মেয়ে। সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে রওশন কখনোই দ্বিধা করতেন না।

ইংরেজি সাহিত্যে এমএ শেষ করে রওশন স্বল্প সময়ের জন্য ইডেন মহিলা কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। পরে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন শিক্ষার্থীদের রওশন বাংলা শেখাতেন। তাঁদের অনেকে আজও তাঁকে স্নেহভরে মনে রেখেছেন। ৯২ বছর বয়সেও অধ্যাপক র‍্যালফ নিকোলাস কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলেছিলেন, রওশনই তাঁকে বাংলা শিখিয়েছিলেন। তাঁর শেখানো বাংলা পাঠের রেকর্ডিং বহু বছর ধরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

শিকাগোতেই রওশনের সঙ্গে পরিচয় হয় মোজাম্মের আহমদের। মোজাম্মের তখন অর্থনীতিতে পিএইচডি করছিলেন। ১৯৬৬ সালে রওশন ঢাকায় ফিরে আসার পর তাঁরা একত্রে আবদ্ধ হন যৌথ জীবনে। আমি তাঁদের বিয়েতে থাকতে পারিনি। কারণ, তখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছিলাম।

বয়ের পর রওশন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় ফিরে যাননি। আমি সব সময় মনে করেছি, তাঁর এই সিদ্ধান্ত জাতির জন্য এক বিরাট ক্ষতি হয়েছে। কয়েক প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা এক উত্তম শিক্ষকের কাছ থেকে শেখার সুযোগ হারিয়েছে। কারণ, ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য এবং ভাষাবিজ্ঞানের অসাধারণ সব গবেষক তৈরি করতে পারতেন রওশন। মানুষকে কিছু শেখানোর এক বিস্ময়কর দক্ষতা ছিল তাঁর।

১৯৭৩ সালে আমি নারীদের নিয়ে গবেষণার উদ্যোগ নিলে তাঁকে আমাদের সাপ্তাহিক পাঠচক্রে যোগ দিতে অনুরোধ করি। রওশন সঙ্গে সঙ্গে রাজি হন। সে বছরই উইমেন ইন বাংলাদেশ শিরোনামে ইংরেজিতে আমার প্রথম প্রবন্ধটি লিখি। রওশন সেটি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন, যাতে তা আরও বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছায়।

পরে আহমদ হুফা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক বড় আলোচনার আয়োজন করেন। সেখানে আমি প্রবন্ধটি বাংলায় উপস্থাপন করি। রাজিয়া খান আমিন ও সুরাইয়া খানম ছিলেন আলোচক।

১৯৭৫ সালে আমরা পাঠচক্রের গ্রুপটিকে একটি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) হিসেবে নিবন্ধন করি। নাম দিই উইমেন ফর উইমেন। একই নামে একটি বইও প্রকাশ করেছিলাম। সেখানে রওশন 'বাংলা সাহিত্যে নারী' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। রওশন পরে সংগঠনটির সভাপতি হন। গবেষণা ও লেখালেখির মাধ্যমে দুই দশক ধরে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটিকে সক্রিয় রাখেন।

১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে তিনি নানা বিষয়ে গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন, একই সঙ্গে বহু বই প্রকাশ করেন। সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেও তাঁর গবেষণার পরিসর ছিল বিস্তৃত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, পরিবেশ, আন্দোলন ও রাজনীতি, শ্রমিকের কর্মপরিস্থিতি, নারীর প্রতি সহিংসতা—সব বিষয়েই তিনি কাজ করেছেন।

তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত প্রকাশনা বেগম রোকেয়ার সুলতানাস ড্রিম-এর সম্পাদিত ইংরেজি সংস্করণ। বইটি নিউইয়র্কের ফেমিনিস্ট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার অধ্যয়ন কোর্সে দীর্ঘদিন পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আজও বইটির চাহিদা ব্যাপক।

রওশন রোকেয়ার অবরোধবাসিনীর অংশবিশেষ এবং আহমদ ছফার ওঙ্কার ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন।

গবেষণা ও লেখালেখির পাশাপাশি রওশন নানা নারীবিষয়ক ও নাগরিক সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। মহিলা পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, সিএএমপিই, এডুকেশন ওয়াচ এবং বাংলা-জার্মান সম্প্রীতির মতো সংগঠনগুলোতে তিনি বহু বছর ধরে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠানের বহু প্রতিবেদনের তিনি লেখক বা সম্পাদক। রওশন কখনোই প্রচারের আলোয় আসতে চাননি। তিনি ছিলেন নেপথ্যের নীরব কর্মী, কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর।

রওশন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বহু সম্মেলনেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। আমরা দুজন মিলে ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের নারী সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলাম। পরে ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে চতুর্থ জাতিসংঘ নারী সম্মেলনে আমরা তিন বোন—রওশন, নিলুফার ও আমি একসঙ্গে যোগ দিই। রওশন ও নিলুফার শুধু আমার বোনই ছিলেন না, ছিলেন আমার সহযোদ্ধাও। একই লক্ষ্য ও স্বপ্নের জন্য আমরা একসঙ্গে লড়েছি। রওশনের কন্যা সোহেলা নাজনীনও এখন যোগ দিয়েছে একই মহৎ সংগ্রামে।

রওশন আর আমার নিবিড় সম্পর্ক অনেকের কাছেই বিস্ময়কর লাগতে পারে। কারণ, আমাদের ব্যক্তিত্ব ছিল একেবারেই ভিন্ন। রওশন ছিলেন সত্যিকারের সদয় ও বিনয়ী মানুষ। কখনো কাউকে কষ্ট দিতেন না, নিজেকে কখনো সামনে আনতেন না—প্রায় সন্তের মতো

একজন মানুষ। আর আমি ছিলাম একেবারে উল্টো। তবু আমাদের মধ্যে কখনো ঝগড়া হয়নি, মূলত রওশন এত প্রীতিপূর্ণ ও ক্ষমাশীল ছিলেন বলেই।

তাঁর চলে যাওয়া আমার জীবনে এমন এক শূন্যতা রেখে গেছে, যা কখনো পূরণ হবে না। বাকি জীবনের প্রতিমুহূর্তেই আমি তাঁকে গভীরভাবে অনুভব করব। তবে একই সঙ্গে আনন্দে স্মরণ করব আমাদের একসঙ্গে কাটানো সুখের সময়গুলো। যে বাগানে হাঁটতে হাঁটতে তিনি প্রতিটি গাছ ও ফুল চিনিয়ে দিতেন; আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখাতেন আর সেগুলোর নাম বলতেন; বই বা কবিতা পড়ার সময় পুরোটা মুখস্থ বলতেন; কিংবা কোনো গান শুনে গলা মিলিয়ে গাইতেন—সেই সময়গুলো মনে পড়বে।

রওশন জীবনের সহজ আনন্দগুলো থেকেই সুখ পেতেন। রওশন জাহান ছিলেন আমার প্রথম শিক্ষক। তিনি আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন নিজস্ব সীমানার বাইরের এক বিশাল পৃথিবীর দিকে। আমার সৌভাগ্য যে এমন একজন অসাধারণ মানুষ আমার জীবনে এসেছিলেন এবং এত বছর আমার সঙ্গী হয়ে ছিলেন।

প্রথম আলো

১৬ নভেম্বর ২০২৫



একজন যোগ্য প্রশাসক, মেধাবী নীতিপ্রণেতা ও নীতি বিশ্লেষক

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যাপক ড. আমিরুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের অর্থনীতিবিদ। তিনি সমাজের একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাকে অনেকে শিক্ষক হিসেবে চেনেন। অনেকে গবেষক হিসেবে জানেন। অনেকেই পেশাজীবীদের নেতা হিসেবেও জানেন। তাকে যদি গবেষক হিসেবে স্মরণ করতে চাই তাহলে অবশ্যই তার বিভিন্ন গবেষণা, বিশেষ করে নগর পরিকল্পনা, নগরনীতি ও ভূমি ব্যবস্থাপনার কাজগুলোকে স্মরণ করতে হবে। একই সঙ্গে মনে করতে হবে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কাজ। স্থানীয় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দিক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে অধ্যাপক ড. আমিরুল ইসলাম চৌধুরীর অনেক ভালো কাজ আছে।

তিনি একজন ভালো প্রশাসক ও ভালো প্রাতিষ্ঠানিক নেতা। এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। তিনি যখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিকাশ ঘটেছে তাও স্মরণ করতে হবে। তিনি একজন নিভৃতচারী মানুষ ছিলেন। তাকে আমরা অনেক চেষ্টা করেও অর্থনীতি সমিতির সভাপতি বানাতে পারিনি। আমিরুল ইসলাম চৌধুরী নিঃসন্দেহে একজন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক। খুবই যোগ্য প্রশাসক, মেধাবী নীতি প্রণেতা ও নীতি বিশ্লেষক হিসেবেই তাকে স্মরণ করতে হবে।

আরো দুটি বিষয় স্মরণ করার আছে। প্রথমত, তিনি ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিনি চেয়ারম্যানের পদটি ছেড়ে দেন। এটা লক্ষণীয় বিষয়, স্বাধীন পেশাজীবী মনোভাবের লোকেরা সংভাবে দায়িত্ব পালন করতে চাইলেও রাজনৈতিক সরকারের কাছ থেকে অনেক সময় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন, সেটি তার সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের পদে থাকা বা ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসে তার নাম স্মরণ থাকবে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাজারে বিরাট উত্থান ঘটে। বিভিন্ন ধরনের নিম্নমানের প্রতিষ্ঠান পুঁজিবাজারে নিবন্ধন পায়। দাম নিয়ে কারসাজি হয়, ফটকাবাজি হয়। এমনকি পুঁজিবাজার ব্যবস্থাপনার ভেতরে বাইরে বড় ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক কারসাজি হয়। এ কারসাজিকে উদ্ঘাটন করার জন্য সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষ থেকে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ তদন্ত কমিটির নেতৃত্বে দেয়া হয় অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরীকে।

তিনি ও তার সহযোগীরা তিন-চার মাস প্রচুর পরিশ্রম করে নিষ্ঠার সঙ্গে ১৯৯৭ সালের মার্চে বিভিন্ন বিষয়কে তদন্ত করে গ্রন্থবদ্ধ করে একটি রিপোর্ট জমা দেন। যে রিপোর্টটি দিলেন সেটি নিঃসন্দেহে একটি সং প্রচেষ্টার অংশ ছিল। সাহসী রিপোর্ট ছিল। আগামী দিনে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির লক্ষ্যে বেশকিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা বলা ছিল। সেহেতু পেশাজীবী হিসেবে তার সবচেয়ে সর্বোচ্চ অবদানের কথা আমি স্মরণ করি, তাহলে অবশ্যই এ তদন্ত রিপোর্টের কথা মনে করতেই হবে। কিন্তু সে সময় সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করলেও তদন্ত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এমনকি প্রতিবেদনটি জনসম্মুখে প্রকাশ করতে দেয়া হয়নি। আরো বেশি আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী সময়ে যখন সরকার বদল হয়েছে, সে সরকারও এ তদন্ত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। যদিও তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের পর বেশকিছু গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। কিন্তু ২০১৭ সাল নাগাদ তারা সবাই আবার ছাড়া পেয়ে গেল। ১৯৯৭ সালের পুঁজিবাজারের তদন্ত রিপোর্টটি তখন যদি ঠিকমতো কার্যকরী করা যেত, তাহলে পুঁজিবাজারে বর্তমানে যে পরিস্থিতি সেটি ভিন্নও হতে পারত।

কিন্তু তাতে আমিরুল ইসলাম চৌধুরীর কাজের গুরুত্ব কমে না। সে কারণেই শিক্ষক, গবেষক, প্রাতিষ্ঠানিক নেতা ও একজন সং নীতি বিশ্লেষক হিসেবে তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

বণিক বার্তা

২৩ ডিসেম্বর ২০২৫

গণতান্ত্রিক চর্চা এবং জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া সচল রাখতে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর এই জবাবদিহিমূলক উন্নয়নের সঙ্গে নীতি গবেষণার রয়েছে এক অপ্রতিম সংযোগ। নীতি গবেষণার ফলাফলের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন অংশীজনের কণ্ঠস্বরকে বিস্তৃত পরিসরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক অনন্য বাহক হচ্ছে গণমাধ্যম। সেই সূত্রেই সিপিডি'র গবেষকরা গণমাধ্যমে সমকালীন নানান বিষয়ে কলাম লেখার পাশাপাশি মন্তব্য, সাক্ষাৎকার ও মতামত দেওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ ও অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলোকে সহজবোধ্যভাবে সাধারণ জনগণের কাছে উপস্থাপন করে থাকেন। 'সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা-১০' ২০২৫ সালের বিভিন্ন সময়ে দেশের বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় দেওয়া নির্বাচিত কিছুসংখ্যক মতামতের একটি সংকলন।

এ লেখাগুলোতে রাজনৈতিক পরিবর্তন, নির্বাচন ও অন্তর্বর্তী সরকার; রাজনীতি, রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র; সামষ্টিক অর্থনীতি ও বাজেট; বিনিয়োগ, শিল্প ও কর্মসংস্থান; বাণিজ্য, শুল্ক ও বৈদেশিক খাত; এলডিসি উত্তরণ ও উন্নয়ন কৌশল; জ্বালানি, অবকাঠামো ও খাতভিত্তিক অর্থনীতি; বৈদেশিক সম্পর্ক ও ভূরাজনীতি; বৈষম্য, দারিদ্র্য ও সামাজিক ন্যায় ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে বর্তমান সংকলনটিকে ১২টি আলাদা অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

বস্তুনিষ্ঠ নীতি গবেষণা এবং সমসাময়িক উন্নয়নমূলক বিষয়ে আলোকপাতের মাধ্যমে সিপিডি'র গবেষকরা সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তারই প্রতিফলন এই প্রবন্ধ-সংকলন। নানামুখী বিষয় নিয়ে অনন্য এই সংকলনটি এবারও উৎসুক পাঠকদের আগ্রহ পূরণে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন), ধানমন্ডি

ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ

ফোন: (+৮৮ ০২) ৪১০২১৭৮০-২

ই-মেইল: info@cpd.org.bd

ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd